পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রচনাবলী

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মূল্য ছয় টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭

ভূমিকা

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। আমরা দুই খণ্ডে আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত নির্ব্বাচন ও সঙ্কলন করিলাম। বহু প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও রসরচনা এখনও অবশিষ্ট রহিল, কয়েকটি সাময়িক-পত্র এখনও সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। ভবিষ্যতে সেগুলি হইতে সঙ্কলন করিয়া তৃতীয় খণ্ড রচনাবলী প্রকাশ করিবার পথ খোলা রহিল।

আমরা বর্ত্তমান খণ্ডে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী যোজনা করিয়া দিলাম; বিস্তৃততর পরিচয় 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ৮২ সংখ্যক গ্রন্থে মিলিবে।

জীবনকথা

১৮৬৬ সনের ২০এ ডিসেম্বর (৬ পৌষ ১৭৮৮ শক, বৃহস্পতিবার) ভাগলপুরে পাঁচকড়ির জন্ম হয়। তাঁহার পিতা হালিশহর-নিবাসী বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ভাগলপুরে কলেক্টরী আপিসে ওয়ার্ডস ক্লার্ক ও বাটোয়ারী ক্লার্কের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

পাঁচকড়ি ছিলেন পিতা-মাতার একমাত্র আদরের সন্তান; তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা পিতার সান্নিধ্যে ভাগলপুরেই সমাধা হয়। তিনি ১৮৮২ সনে ভাগলপুর জিলা-স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা (১ম বিভাগ), এবং ১৮৮৫ ও ১৮৮৭ সনে পাটনা কলেজ হইতে এফ. এ. (২য় বিভাগ) ও বি. এ. (২য় বিভাগ, সংস্কৃত অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তরুণ বয়সে পাঁচকড়ি ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের দ্বারা বিলক্ষণ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের 'ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা' ও 'সুনীতিসঞ্চারিণী সভা'র জন্য এক সময়ে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে মনের অকুশল ঘটায় তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে ছাড়িয়া পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হন। পাঁচকড়ি লিখিয়াছেন ঃ—"বি.এ. পাস করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম; পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে লেখক ও

বক্তারূপে সহায়তা করিতাম।...১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত আমি কলিকাতায় আসিতাম যাইতাম, সাহিত্য-চর্চা করিতাম, মাসিক ও সাপ্তাহিকে লিখিতাম, তখন আমাদের একটা বড় দল ছিল, সে দলের আনুকূল্য লাভ করিবার জন্য অনেকে আমার আনুগত্য করিতে বাধ্য হইতেন।

সম্ভবতঃ ১৮৯২ সনে পাঁচকড়ি ভাগলপুরে টী. এন. জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক-পদ গ্রহণ করেন। এইখানে ঔপন্যাসিক শরৎ চন্দ্র তাঁহার ছাত্র ছিলেন। কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করিবার পর তিনি সাংবাদিকের ব্রত বরণ করেন।

সংবাদপত্র-সেবায় পাঁচকড়ির হাতে খড়ি—'বঙ্গবাসী'তে। তিনি ১৮৯৫ সনের শেষাশেষি* 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক হন। স্বনামধন্য ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই 'বঙ্গবাসী'র সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটান। 'বঙ্গবাসী'র সংস্রবে আসিয়া পাঁচকড়ি আত্মোন্নতির প্রভূত সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে স্মরণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন ঃ—"আপনার 'বঙ্গবাসী'র সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমি বাঙ্গালা লিখিতে শিখিয়াছি, আপনার 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক-পদে উন্নীত হইয়া আমি বাঙ্গালীর সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছি।" কিন্তু এ সকলের মূলে ছিলেন ইন্দ্রনাথ,—'বঙ্গবাসী'র হিতৈষী, পরামর্শদাতা ও লেখক। পাঁচকড়ি সাহিত্য-গুরু হিসাবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে কোন দিনই কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

> "তিনি আমার খাঁটি গুরু মহাশয় ছিলেন, হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাইয়াছিলেন, কত ভঙ্গী করিয়া পড়িতে, বুঝিতে এবং বুঝাইতে শিখাইয়াছিলেন।...এখনও তাঁহারই কথা বেচিয়া

---

* ১৮৯৬, ৭ই আগষ্ট "টী. এন. জুবিলী কলেজিয়েট ছাত্রবৃন্দ" ভাগলপুরে তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে যে "শোকোচ্ছ্বাস" মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ—

"গিয়াছিলে দেব, নয় মাস তরে
আশা ছিল প্রাণে ইহা,
হেরিব চরণ, কিন্তু আজি হায়
ভাসিয়া ডুবিল তাহা ॥

খাইতেছি, তাঁহারই সিদ্ধান্তসকল ব্যাখ্যা করিয়া সমাজে স্থান পাইয়া আছি। গুরু, বন্ধু, সখা, ভ্রাতা, পরিচালক—তিনি আমার সব।"

বিশেষ যোগ্যতার সহিত চারি বৎসর কংগ্রেস-বিরোধী 'বঙ্গবাসী' সম্পাদন করিয়া পাঁচকড়ি ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ হইতে কংগ্রেস-সমর্থনকারী 'বসুমতী'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইহার দুই বৎসর পরে স্বত্বাধিকারীর সহিত মতবিরোধের ফলে তিনি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রবর্ত্তিত 'রঙ্গালয়' পত্রে যোগদান করেন। পাঁচকড়ি স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা'তেও নিয়মিতভাবে লিখিতেন। ১৯০৮ সনে তিনি 'হিতবাদী'র সম্পাদক হন। তিনি আরও কয়েকখানি পত্র-পত্রিকা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন; ইহার মধ্যে সাপ্তাহিক 'প্রবাহিণী' (১৩২০-২২) ও দৈনিক 'নায়কে'র নাম উল্লেখযোগ্য; শেষোক্ত পত্রখানির সহিত তিনি দীর্ঘ কাল যুক্ত ছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যু হইলে পাঁচকড়ি সুহৃদের সাধের 'সাহিত্য'কে কিছু দিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন; ১৩২৭ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যা হইতে তিনি 'সাহিত্যে'র সম্পাদন-ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন।

পাঁচকড়ি দীর্ঘায়ু ছিলেন না। ১৯২৩, ১৫ই নবেম্বর (২৯ কার্ত্তিক ১৩৩০), ৫৭ বৎসর বয়সে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও পত্নীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

পাঁচকড়ির রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ:— ১। আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী (বসুমতী, ইং ১৯০০); ২। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (বসুমতী, ইং ১৯০০); ৩। উমা (গৃহচিত্র), ইং ১৯০১; ৪। রূপ-লহরী বা রূপের কথা, ইং ১৯০২; ৫। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস (হিতবাদী, ইং ১৯০৯); ৬। বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয় (বসুমতী, ইং ১৯১৫); ৭। সাধের বউ (উপন্যাস), ইং ১৯১৯; ৮। দরিয়া (উপন্যাস), ইং ১৯২০।

সূচী

প্রবাহিণী

আশা

কুল্ কুল্, কুল্ কুল্, কুল্ কুল্!—দুঃখ দারিদ্র্যের, হতাশা ও নৈরাশ্যের উপলখণ্ডময় আমার বন্ধুর জীবন-পথের উপর দিয়া চল প্রবাহিণী,—তরল তরঙ্গে স্ফাটিকস্বচ্ছ জলকণা বিকিরণ করিয়া, চল প্রবাহিণী!—তোমার স্পর্শে, এ দগ্ধ জীবনের মরু-মারুত আশা-স্নেহের শীকর-সম্পৃক্ত হউক! তোমার কোটিতরঙ্গ-কল্লোল-কোলাহলে জীবনের নীরব বেদনাসকল মুখর হউক! চল প্রবাহিণী,—পর্ব্বত ভেদ করিয়া, স্থবিরকায় তুষাররাশিকে বিগলিত করিয়া, নৈরাশ্যের বালুকা-বিস্তারকে স্নেহ-সেচনে কোমল ও সরস করিয়া, চল প্রবাহিণী,—আগে চল।

কুল্ কুল্, কুল্ কুল্, কুল্ কুল্! কোটি বীচি-বল্লরীর ঘাত-প্রতিঘাতে আশার রজতনিক্কণ শুনিতে শুনিতে আমার জীর্ণ দেহ তোমার তরঙ্গে ভাসিয়া চলুক। প্রবাহিণী, ভাসিয়া চল!—আগে চল! ঐ দেখ,—ঐ দূরে মহাশ্মশান—কোটি চিতার চট্‌পটারবে নিত্য শব্দময় ঐ শ্মশানে রাবণের চিতা জ্বলিতেছে। কোটি কল্পের গৌরব-স্মৃতি, দশস্কন্ধ রাবণরূপে ঐখানে অহরহঃ জ্বলিতেছে! ঐখানেই সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল,—লঙ্কার ঐ মহাশ্মশানেই ধরা-কন্যা নিষ্কলঙ্কা হইয়াছিলেন;—সনাতন কালের, সনাতনী কথার চন্দন-চুল্লী ঐখানেই জ্বলিতেছে! চল প্রবাহিণী,—ঐ ভীম ভৈরব শ্মশানের তিন দিক্ বেড়িয়া আমরা উভয়ে ভাসিয়া যাই। চল, চল, আগে চল!

"যমুনে! এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী—
যার বিমল তটে রূপের হাটে বিকাত নীলকান্ত মণি।"

কাল ও কালিন্দী—ভাই ও ভগ্নী। যম যমুনার সহোদর—কাল ভাবস্রোতে বিশ্বগতির ভিতর দিয়া ছুটিয়াছেন;—কালিন্দী রসের তরঙ্গে প্রেমের ব্রজমণ্ডল দ্বিখণ্ডিত করিয়া অনন্ত রস-সাগরের দিকে ছুটিয়াছেন! চল প্রবাহিণী—সেই রকম কুলু কুলু ধ্বনি করিয়া চল! যে ধ্বনি গোপীদিগের নূপুর-শিঞ্জনের প্রতিধ্বনি বলিয়া এখনও রসিকে মনে করেন! যমুনার সেই রস-তরঙ্গভঙ্গের অভিব্যঞ্জনা করিয়া গুপ্ত বৃন্দাবনের

শ্যাম-শোভা দেখিতে দেখিতে, চল প্রবাহিণী—সেই সনাতন যামুন খাত বাহিয়া চল ;—সেথায় রূপের হাট দেখিবে! তোমার গর্ভসঞ্চিত কোটি নীল জলকণাকে নয়নরূপে পরিণত করিয়া,—চল প্রবাহিণী, রূপের হাট বাহিয়া আমরা চলিয়া যাই! তোমার চঞ্চল গতিতে আবার যমুনা উজান বহিবে। সেই নীলকান্ত মণির তনু-কান্তি-প্রতিচ্ছায়ায় তোমার অঙ্গ নীল বরণ ধারণ করিবে। চল—চল—আগে চল!

কুল্ কুল্, কুল্ কুল্, কুল্ কুল্! আর বিলম্ব সহে না! জীবনের পাড়ি প্রায় শেষ করিয়াছি। সন্ধ্যার ঘন তমিস্রা ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে, অজ্ঞাতসারে চারি দিকে আসিয়া যবনিকার মত ঝুলিয়া পড়িতেছে! সন্ধ্যার মঙ্গল-তারা ঐ দূরে চক্রবালের উপর, কার্ত্তিকের নদী-প্রদীপের মত টিপি টিপি ফুটিয়া উঠিতেছে। অস্তমিত সূর্য্যের সপ্ত দীপ্তি ক্রমে অন্ধকারের ক্রোড়ে লুকাইল। এইবার গৃহস্থের সান্ধ্য মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিবে। আর বিলম্ব সহে না। চল প্রবাহিণী—আগে চল! এখনও যতটুকু সময় বাকী আছে, সেই সময়টুকুর মধ্যে তোমার কৃপায় যত দূর পারি, আগাইয়া যাই! জানি বটে, অনন্ত সাগরের অসীমতায় ডুবিবার অবসর হইবে না ;—জানি বটে, "এবার বা আসা হয় বিফল।" এবারকার যাত্রা, শুভ যাত্রা নহে। এ দুর্গম পথ হাঁটিয়া শেষ করিতে পারিব না। অনন্তের দেখা পাইব না। তবুও আশা ত ছাড়িতে পারি না! তবুও মনে হয়, প্রদোষের এই মুহূর্ত্তকালের মধ্যে তোমার কৃপাস্রোতের—করুণার তরল তরঙ্গের উপর গা ভাসাইয়া যাইতে পারিলে, হয়ত বা অনেকটা পথ আগাইয়া যাইব! সাগর-সঙ্গমে পৌঁছিতে না পারি—মুক্ত-বেণীর মোহনাও ত দেখিতে পাইব! চল প্রবাহিণী—আগে চল! আর যে বিলম্ব সহে না!

মনে পড়ে কত কথা! একে একে স্মৃতির সরোবরবক্ষে কত ব্যথা বুদ্বুদের আকারে ফুটিয়া উঠিতেছে,—নৈরাশ্যের পবন-তাড়নে আবার তাহারা ফাটিয়া গলিয়া কোথায় বিলীন হইয়া যাইতেছে! এই নৈরাশ্য-জাড্যে তুমি আশার গতি! তুমি চলিয়াছ বলিয়া আমিও চলিতে পারিব। তোমার গতি আছে বলিয়া আমার স্থিতির বিসর্পণ সম্ভবপর হইবে! আমার অতীতের কালরাত্রি অনাগতের উষার দ্যুতিতে প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে। চল, চল প্রবাহিণী! স্নেহময়ী—কোটি-আশাবলম্বিত

তরঙ্গিণী—চল! ভাবের জলরাশি শত উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত করিয়া তুমি আগে চল! আমার নিথর নিষ্কম্প নৈরাশ্য-সরোবরে গতির শত-তরঙ্গ-প্রফুল্লিত আশা-মেখলা পরিস্ফুট হইয়া উঠুক! চল, চল—আগে চল।

এই সাধ—এই বাসনা—এই আকাঙ্ক্ষা।

"আমি রূপ-সাগরে, পালের ভরে ভেসে যাব।
তরঙ্গ-তুফানে পড়ে ডুবিয়া মরিব॥"

ডুবিয়া মরিব,—ভাসিব না! অতল তলে একেবারে মিশিয়া যাইব। আমার আছে নাম,—আর আছে রূপ! সে নাম স্মৃতির চিতা-চুল্লীতে অহরহঃ পুড়িতেছে! সে রূপ চিতা-অঙ্গের কোটি অগ্নি-জিহ্বার বেষ্টনে লোল তরঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছে! থাকিবে না কিছু। সব পুড়িয়া ভস্ম হইবে। সে ভস্ম শ্মশান-বায়ুবিতাড়নে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে আমি মরমে মরিব। কিন্তু সে ভস্ম, সে বিভূতি অনন্তের নীল অঙ্গে মিশাইয়া দিতে পারিলে কোটি জন্মের তপস্যা সিদ্ধ হইবে! চল চল প্রবাহিণী—ফেরুপালের হা-হা রবকে স্তব্ধ করিয়া, শুষ্ক বায়ুর স্বননকে নিঃশব্দ করিয়া তোমার রসের তরল তরঙ্গের কোটিকণ্ঠে উল্লাস-গীতি গায়িতে গায়িতে—চল প্রবাহিণী—রূপ-সাগরের দিকে অগ্রসর হও! তোমার প্রত্যেক তরঙ্গাভিঘাতে নামের প্রতিধ্বনি জগন্ময় হইয়া উঠুক! তোমার স্বচ্ছ সলিলবিস্তারে রূপের অমল ধবল সুন্দর রেখা—ঊর্দ্ধে ও নিম্নে যুগল ইন্দ্রধনুর ন্যায় ফুটিয়া উঠুক! আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হউক! মিটিবে না কি? এ সাধ—এ বাসনা মিটিবে না কি? আশা মিটে না,—আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। গগনোপান্তরেখার মত—যত ধরিতে যাইবে, ততই ছুটিয়া পালাইবে; কিন্তু চেষ্টায় যে সুখ আছে—ছুটাছুটিতে যে উন্মাদনা আছে—ধরি ধরি করি ধরিতে নারি, এই প্রয়াসে যে তৃপ্তি আছে, তাহা ত জীবনে আর কিছুতে নাই! তাই বলি, চল প্রবাহিণী, আগে চল। কুল্ কুল্, কুল্ কুল্, কুল্ কুল্,—রজতকিঙ্কিণীর এই নিক্কণে আমায় আশা-সুখে মুগ্ধ করিয়া চল প্রবাহিণী—আগে চল। ('প্রবাহিণী,' ৩ মাঘ ১৩২০)

রূপোল্লাস

"রসো বৈ সঃ"—শ্রীভগবান্ রসময় এবং রসগ্রাহ্য। এই রস নাম এবং রূপের সাহায্যে অনুভূতিগম্য। এই রসকে বুঝিতে পারিলে শ্রীভগবান্‌কে বুঝা যায়। সুতরাং নাম ও রূপ না বুঝিলে ভগবৎ-অনুভূতি সম্ভবপর হয় না। ইংরেজীনবীস দার্শনিকগণকে দুইটি ইংরেজী প্রতিশব্দে নাম ও রূপের মর্ম্মের কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করা সম্ভবপর হইতে পারে। ইংরেজী দার্শনিক ভাষায় নামকে Concept বলিয়া ভাষান্তরিত করিতে পারি; রূপের প্রতিশব্দ Percept বলিলেই বোধ হয়, পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। Concept এবং Percept এই দুই বিষয়ে সমন্বয় সাধন করিতে পারিলে ভগবৎবিভূতির আংশিক অনুভূতি হইতে পারে।

বিষয়টা আরও একটু খুলিয়া বলিবার চেষ্টা পাইব। কেন না, ভক্তি-শাস্ত্র এবং ভগবদারাধনাপদ্ধতি এই নাম ও রূপের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের উপাসনাপদ্ধতি ঠিকমত বুঝিতে হইলে, নাম ও রূপের অন্তর্নিহিত গুপ্ত কথা কিছু বুঝিতেই হইবে। অম্ভৃণকন্যা বাক্‌কথিত দেবী-সূক্তের আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া শাণ্ডিল্য ও নারদ ভক্তিসূত্র রচনা করিয়াছেন;—সেই ব্যাখ্যার বিবৃতি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে সম্যক্ ভাবে করা হইয়াছে;—তন্ত্রের সকল সিদ্ধান্তগ্রন্থেই ঐ ব্যাখ্যাই হেঁট মুণ্ডে গ্রহণ করা হইয়াছে;—বৈষ্ণব ভক্তিসাধনপদ্ধতিতে ঐ ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করা হয় নাই। দেবীসূক্ত না বুঝিলে ভক্তিশাস্ত্র বুঝা যায় না। মনীষী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "কালস্রোত" নামক একখানি পুস্তকের সূচনা লিখিতে যাইয়া দেবীসূক্তের ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রে গত দুই বার দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে এই সন্দর্ভলেখকও দেবীসূক্তের ব্যাখ্যা করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। এই সকল গোড়ার কথার একটু পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন; কেন না, নাম ও রূপ বুঝিতে হইলে একটু গোড়ার কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক।

এই সৃষ্টিপ্রহেলিকার মধ্যে এক জ্ঞাতা আমি; আমি ছাড়া আর যাহা কিছু, তাহা আমারই জ্ঞেয়; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ যাহার দ্বারা সাধিত হয়, তাহাই জ্ঞান। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতাকে বুঝিতে হইবে। জ্ঞাতা

আমি—দশেন্দ্রিয়সংযুক্ত, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনসমেত, একাদশ আসক্তি-সমন্বিত দেহী আমিই জ্ঞাতা। আমি কে? বলিতে পারিলাম না আমি কে। তবে এইটুকু বুঝি যে, আমি সর্ব্বময় ও সর্ব্বব্যাপী। দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, আঘ্রাণ প্রভৃতির সাহায্যে আমি যাহাদের বা যে সকল বিষয়ের অনুভূতি সাধন করিয়া থাকি, সে সকলই আমিময়, আমার আমিত্বে মাখা, আমার বৈশিষ্ট্যবিজড়িত। অম্ভৃণকন্যা বাক্ শ্রুতির অপূর্ব্ব ভাষায় এই সিদ্ধান্তটি মানবসমাজকে এবং সাধকবর্গকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর যে প্রকার সরল ভাষায় দেবীসূক্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর সরল ভাষায় উহার ব্যাখ্যা সম্ভবে না। বাহুল্য-ভয়ে আমি তাঁহার সন্দর্ভের পুনরুদ্ধার করিলাম না, এবং গত কার্ত্তিক মাসের 'সাহিত্যে' প্রকাশিত "উপাসনাতত্ত্ব" শীর্ষক আমার লিখিত সন্দর্ভের অংশবিশেষ উদ্ধার করিলাম না। সুধী পাঠক এই দুইটি সন্দর্ভ পড়িয়া লইলে, লেখকের পরিশ্রমের লাঘব হইবে। ঐ দুইটি সন্দর্ভের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা নাম ও রূপের আলোচনা করিব।

বলিয়াছি ত, নাম concept অর্থাৎ যাহা চিন্তার অভিজ্ঞান, যাহা নিজে বুঝি, পরকে নিজের মতন করিয়া বুঝাইতে পারি না,—যাহা ভিতরে ফুটিয়া উঠে, বাহিরে শব্দমাত্রে অভিব্যক্ত হয়,—যাহা অনেকটা মূকাস্বাদনবৎ, বোবার মিষ্টান্ন আস্বাদনের মতন, ভোজনান্তে যে আহ্লাদের প্রকটন হয়, তাহা কদাচিৎ একটা চীৎকারে অভিব্যক্ত হইলেও হইতে পারে,—তাহাই নাম। শিশুকে দাম্পত্য রসের আস্বাদন দেওয়া যায় কি? যে জন্মমাত্রেই পিতৃহীন, তাহাকে পিতৃস্নেহের মর্ম্ম বুঝান যায় কি? সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত প্রভৃতি নৈসর্গিক লীলা তুমি আমি সবাই দেখি—নয়ন ভরিয়া দেখি। পরন্তু সে রূপ দেখিয়া উভয়ের মনে যে ভাবোদয় হয়, তাহা কেহই কাহাকেও ঠিকমত বুঝাইতে পারি না। বুঝাইতে পারি না বটে, তবে বুঝাইবার চেষ্টায় ইঙ্গিত করিয়া থাকি। তুমি আমার ভাবের ভাবুক হইলে সে ইঙ্গিত কতকটা বুঝিলেও বুঝিতে পার। এই ইঙ্গিতই নাম। অন্তরঙ্গ ভাবের দ্যোতনাকেই নাম বলা যায়। তাই নাম বড়, রূপ তদপেক্ষা ছোট। তাই কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণনামের গুরুত্ব অধিক। রূপবিলাসিনী সত্যভামা এইটুকু বুঝিতে পারেন নাই,—কেবল রূপ-সাগরেই ডুবিয়াছিলেন, রূপের মহত্ত্বে বিমূঢ় ছিলেন; দর্পহারী মধুসূদন

অপূর্ব্ব ছলে সত্যভামার সে ভ্রম অপসারণ করিয়াছিলেন। মহাভারতের পারিজাতহরণ এবং সত্যভামার দর্পচূর্ণ আখ্যায়িকা, নামের মাহাত্ম্যই, অর্থবাদের সাহায্যে বুঝাইয়াছেন।

রূপ—percept। যাহা রসগ্রাহ্য, তাহাই রূপ; যাহা অনুরাগ ও বিরাগের বিষয়ীভূত, তাহাই রূপ; যাহা অনুভবীর মানস পটে ফুটিয়া উঠে, যাহা ছায়া প্রতিচ্ছায়ার হিসাবে ভিতরে ও বাহিরে—বাহ্য প্রকৃতিতে এবং অন্তঃপ্রকৃতিতে প্রকট হয়, তাহাই রূপ। কেবল বাহ্য প্রকৃতি রূপ নহে, দর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা, কেবল তাহাই রূপ নহে। প্রকৃতির আস্তরণে রসের বিকাশ হইলেই রূপ ফুটিয়া উঠে। রূপ ফুটে বটে, পরন্তু উহার উপভোগে তৃপ্তি নাই।

“জনম অবধি হাম সে রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।”

তৃপ্তি হয় না, যত দেখি, তত আরও দেখিতে সাধ যায়,—নয়নময় হইয়া মীনের ন্যায় নির্নিমেষ নয়নে অনবরত দেখিতে থাকিলেও দেখার সাধ মিটে না। কেন না, অনুরাগপিপাসার উপর দর্শন স্পর্শন আদি ক্রিয়ার প্রতিষ্ঠা। এই গতিশীল সৃষ্টিচাতুরীর মধ্যে স্থির কিছু নাই; সব চলিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে সকলের পরিবর্ত্তন হইতেছে। কাজেই যাহা দেখিতে সাধ যায়, নয়ন পালটিলে বা ক্ষণকাল অতিবাহিত হইলে তাহা ত আর থাকে না—যে ছবি নিমেষের জন্য নয়নের উপর পড়িয়াছিল, তাহা ত আর থাকে না—তাই দেখার সাধ আর মিটে না। অনুভূতিতে তৃপ্তি নাই;—রসের পিপাসা মিটে না। তাই রূপের সাগর—অনন্ত উর্ম্মিমালায় আন্দোলিত, কোটি বীচিবল্লরীখচিত, তরঙ্গভঙ্গব্যাকুল রূপের সাগর। এ সাগরে স্থির থাকে কাহার সাধ্য! স্থির থাকে না, স্থির থাকা যায় না বলিয়াই সাধ মিটে না। “লাখ লাখ যুগ” সে রূপ হেরিলেও উহা নিতুই নূতন—ক্ষণে ক্ষণে নূতন, পলে পলে নূতন। নবীনতার অসংখ্য ও অব্যয় আন্দোলনে—প্রকম্পনে—শিহরণে রূপের বিকাশ। ফলে সে রূপে তৃপ্তি নাই।

কিন্তু আছে—তুমি আমায় দেখ, আমি তোমায় দেখি—উভয়ের নবীনতা উভয়ের ভাবে ডুবিয়া যাউক—তাহা হইলেই রূপের তৃপ্তি সম্ভবপর হয়।

"তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে,
লোচন মন দুঁহু ধাব।"

যখন লোচন ও মন—দু-ই রূপ দেখিবার জন্য ধাবিত হইবে, তখন প্রাণ হইতে ঝঙ্কার উঠিবে,

"সজনি, ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঞে তড়িতলতা জনু,
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥"

এই অতৃপ্তি উভয়ের মনে জাগিয়া উঠিবে। যখন উঠিবে, তখন দেখিবে এবং বুঝিবে,—

"যত রূপ তত বেশ ভাবিতে পাঁজর শেষ,
পাপ চিতে নিবারিতে নারি।"

তখন মনে মনে স্বতই এই ভাব জাগিয়া উঠিবে,—

"দুঁহু মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি, রাই কাঁচা সোনা॥"

তখনই রূপের তৃপ্তি। বিভোরতায়—বিহ্বলতায়—বিমূঢ়তায়—রূপ-সাগরে ডুবিয়া অতল তলে ডুবিয়া যাওয়ায় রূপের পরিতৃপ্তি। উপভোগ এবং আস্বাদনে নহে। একেবারে আত্মহারা হইয়া পাথরের মত ডুবিতে হইবে, তবে তৃপ্তি সম্ভবপর হইবে।

বিকাশে ও বিলাসে রূপ, সঙ্কোচে এবং কেন্দ্রীকরণে নাম। নাম—বংশীরব; রূপ—ব্রজবিলাস। নাম—অনাহত ধ্বনি; রূপ—ধ্যানগম্য বিকাশ। নাম—শ্রীরাধা; রূপ—শ্রীমতী। নামের আহ্বানে রূপের বিকাশ। প্রথমে বংশীধ্বনি, তবে অভিসার। আর কেমন করিয়া বুঝাইব—নাম ও রূপ কি ও কেমন? জানি তোমায় নামে; সেই নামের উপর রসের ঢেউ খেলিয়া রূপের কোটিবালেন্দুবিকাশ হয়। গায়ত্রীর ঝঙ্কারে জগজ্জ্যোতির অপরূপ রূপ ফুটিয়া উঠে। সে রূপ দেখিয়া তবে "তৎসবিতুর্বরেণ্যং"কে খুঁজিবার সাধ হয়। শিশু মহাঘোরে মা বলিয়া—ক্রন্দনের নাম-রোলে ভূমিষ্ঠ হয়; তাহার পর ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃরূপ দেখিতে পায়। নব বসন্তের সূচনার পূর্ব্বেই ভিতরে ও বাহিরে কিসের ও কাহার ডঙ্কা বাজিয়াছে, কাহার কাড়া-নাকারা পড়িয়াছে, তাই বৃক্ষচর্ম্ম ভেদ করিয়া নব কিশলয়সকল নবানুরাগে

লোহিতাভ হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, কোকিলের রবে পঞ্চমের শব্দমদিরা কে যেন ঢালিয়া দিতেছে,—আমি নয়নময় হইয়া তোমার নূতন রূপ দেখিতেছি। তুমিও আমায় দেখিতেছ। তোমার নবীনতার আপ্লাবনে আমিও ত নিতুই নূতন; তুমি নবীন কিশোর, রসের সাগর; নবীনা কিশোরীর নবীনতার সুষমা তুমিও ত দেখিবে! আমারই মতন নয়নময় হইয়া পলকহীন নয়নে তুমিও ত দেখিবে! আমি গাছভরা ফুলের আলোয় মুগ্ধ হইয়া দেখিতে থাকি। ফুল কি আমায় দেখে না? নিশ্চয়ই দেখে; নহিলে আমি দেখিব কেন? আমি যাহাকে দেখিয়া পাগল হই, সে নিশ্চয়ই আমাকে দেখিয়া পাগল হয়। চাঁদ দেখে, সূর্য্য দেখে, তারকাগণ দেখে,—গগনের কোটি শোভা কোটি নয়নে দেখে—তরু লতা পাতা, পুষ্প ফল কোরক,—আব্রহ্ম তৃণ পর্য্যন্ত সবাই দেখে। কেন না, আমি যে সকলকে দেখি—বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে কেবলই দেখি। এই দেখাদেখিই রূপোল্লাস, এই নয়নে নয়নে মেশামিশিই রূপোল্লাস।

তুমি আমি দেখাদেখির ব্যাপারে মাতিয়া থাকিলে এ দেখাদেখির মাধুর্য্য উপভোগ করিবে কে? সাধকের সেইটুকুই লাভ। সাধক তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া কেবল দেখেন। এই মাধুর্য্য উপভোগ বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রের বিশিষ্টতা; এই তৃতীয়ের অবধারণই ভক্তিশাস্ত্রের মৌলিকতা। তৃতীয় ব্যক্তি না থাকিলে সাধনা যে দুষ্কর হইয়া পড়ে; বিশেষতঃ মধুর রসের সাধনা—প্রেমের উন্মেষ ঘটাইতে হইলে কিছু কালের জন্য তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইতেই হইবে। দূতী না থাকিলে রসের বিকাশ ঘটিবে কেমন করিয়া! ভক্তি এবং প্রেমের এই বিভিন্নতা বুঝিবার ও বুঝাইবার বিষয়। প্রয়োজন হইলে ইহার আলোচনা পরে করিব। আপাততঃ নাম ও রূপের বিবৃতি সংক্ষেপে দিয়া রূপোল্লাসের চিত্র দেখাইলাম। বলিবার কথা বলা হইল না; যিনি বলাইবার মালিক, তিনি কৃপা না করিলে বলা হইবে না।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"

('প্রবাহিণী,' ১০ মাঘ ১৩২০)

স্মৃতি-কথা

বঙ্কিমচন্দ্র

১

আমার তখন পাঁচ কি ছয় বৎসর বয়স, বঙ্কিমচন্দ্র তখন প্রথম আমাদের হালিশহরের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন,—৺যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ শ্যাম বাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা। আমাদের সহিত পিসতুত সম্বন্ধ। ইঁহারা উভয়েই আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু (মেজদাদা) বাড়ীর ভিতর যাইয়া খবর দিলেন। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে অনেকগুলি বাঁশ ছিল। আমি তাহার একটার উপর বসিয়া ঘোড়া ঘোড়া খেলিতেছিলাম। সহসা আমার একটা পা নীচের স্তূপীকৃত বাঁশের মধ্যে এমনভাবে আটকাইয়া গেল যে, আমি আর টানিয়া পা বাহির করিতে পারিলাম না। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ক্ষণেক পরে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "দেখ ত হে পাঁচু এমন শান্ত হ'য়ে বসে আছে কেন?" মেজদাদা আমার কাছে আসিয়া দেখেন, আমার বাঁ পা-টা বাঁশের ভিতর আটকাইয়া গিয়াছে। বাঁশের কচায় পায়ের পাতা কাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। আমি কিন্তু নীরব, নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছি। মেজদাদা একা আমার পা খুলিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র নামিয়া আসিলেন। উভয়ে মিলিয়া এক-একটি করিয়া বাঁশ সরাইয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তখন আমি মেজদাদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "এ ছেলে বড় অভিমানী হইবে।" ইহাই আমার বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ।

২

পাটনা-কলেজে বি. এ. পড়িতেছি। পূজার পরে কলিকাতায় আসিয়াছি। তখন 'প্রচার' ও 'নবজীবন' জোরে চলিতেছে। রাখালদাদা (বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা) বলিলেন, "তুই বাঙ্গালা লিখ্‌তে শিখেছিস্,—

কেবল 'ধর্ম্মপ্রচারকে'ই লিখিস্ কেন? প্রচারের জন্য কিছু লেখ্ না!" উত্তরে আমি বলিলাম, "আচ্ছা, ছাপ্‌বে ত?" রাখালদা আমার নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন। আমি ১৫ দিন পরিশ্রম করিয়া ছত্রিশ পাতাব্যাপী এক সন্দর্ভ লিখিলাম। তাহার বিষয়—"প্রেম।" ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী, আরবী, সংস্কৃত ও চীন-সাহিত্য হইতে প্রেমের যত প্রকারের বিবৃতি আছে, তাহা লিখিয়া দিলাম। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির সভ্য-অসভ্য, বর্ব্বর-রাক্ষস—সকল জাতির চুম্বন ও আলিঙ্গন-প্রথার বিবরণ দিলাম। প্রেমের এইরূপ এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়া নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের মারফত রাখালদাদাকে পাঠাইয়া দিলাম। দুই দিন পরে, রাখালদা আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই এক চপেটাঘাত লাভ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "হতভাগা, আর কিছু লেখবার পাও নি? শুনেছ, কর্ত্তা (বঙ্কিমচন্দ্র) কি বলেছেন?" আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি?" রাখালদা বলিলেন, "পাঁচুর আর বিয়ে না দিলে চলে না!" রাখালদা আমাকে প্রবন্ধটি ফিরাইয়া দিলেন। আমি উহার সহিত বৈষ্ণব প্রেমের—ঈশ্বর প্রেমের বিবৃতি জুড়িয়া দিয়া, প্রবন্ধটিকে ধর্ম্ম-সন্দর্ভে পরিণত করিয়া, 'ধর্ম্মপ্রচারকে' পাঠাইয়া দিলাম। 'ধর্ম্মপ্রচারকে' উহা ছাপা হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা পাঠ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "ছেলেটা ভারী দুষ্টু!—কিন্তু অসাধারণ মেধাবী।"

৩

'হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র দোকান নূতন খুলিয়াছে। আমি এবং আমার জ্যেঠতুত ভাই (সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগিনেয়) উভয়ে মিলিয়া সাহেবের দোকানে গিয়া জিনিসপত্তর খরিদ করিতেছি। এমন সময় বহরমপুরী গরদের চোগা-চাপকান-পরা, মাথায় এমাম্ আঁটা—দিব্যকান্ত বঙ্কিমচন্দ্র দোকানে ঢুকিলেন। আমরা ত উভয়ে জড়সড়। বিশেষতঃ, দীনদাদা এতটুকু হইয়া গেলেন। আমাদের এত সঙ্কোচের হেতু এই, আমরা উভয়ে, আমার নূতন শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর পাই নাই। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের উভয়কে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "তোরা এখানে?"—আমরা উভয়ে মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ।" বঙ্কিমচন্দ্র একটু মুচ্‌কি

হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, রামতারণের (আমার জ্যেঠশ্বশুর) ওখানে এসে উঠেছিস্ বুঝি ?" উভয়ে নীরব। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কিন্‌লি ?" এই বলিয়া আমাদের পছন্দ-করা জিনিসগুলা দেখিলেন। আমাদের পছন্দ নাকচ্ করিয়া, তিনি নিজের পছন্দ-মত করিয়া আমাদের জিনিস কিনিয়া দিলেন। আমি টাকা দিতে উদ্যত হইলে, তিনি একটি সুমিষ্ট বাপান্ত করিয়া নিজেই বিল চুকাইয়া দিলেন। টাকা বাঁচিল ;—অতএব আমার মনে হইল,—থিয়েটার দেখিতে হইবে। দীনদাদার গা টিপিয়া আমি ইসারা করিলাম। এমন সময় এক জন সাহেব আসিয়া আমাদের দুইটা বাণ্ডিল দিল। বঙ্কিমচন্দ্র দৌহিত্রদের জন্য কি সব জামা-টামা কিনিয়া লইলেন। শেষে আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "চ, বাড়ী যাই !" আমি মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলাম, "একবার খিদিরপুরে পিসিমাকে দেখিতে যাইব।" বঙ্কিমচন্দ্র গ্রীবা বাঁকাইয়া, চক্ষু দুটি ঘুরাইয়া, অধর একটু ফুলাইয়া, কোপের ছল করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হুঁ, বুঝেছি ! আজ শনিবার থিয়েটার দেখতে যেতে হবে।" এমন স্নেহের কোপের ভঙ্গী আমি আর কাহারও মুখে দেখি নাই।

৪

'কৃষ্ণচরিত্র' বাহির হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ শ্যামবাবুর ছোট জামাই ৺কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে করিয়া আমি বঙ্কিমবাবুর বাড়ী গিয়াছিলাম। আহারাদির পর, (বঙ্কিমবাবুর বাড়ী যে সময় যাইতাম, কিছু না কিছু খাইতেই পাইতাম) কৃষ্ণধন কৃষ্ণ-কথা লইয়া শ্বশুরের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিল। আমি নীরবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলাম ও পান চিবাইতে লাগিলাম। কত ক্ষণ পরে বঙ্কিমচন্দ্র আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন, "তুমি পড়িয়া কি বুঝিয়াছ ?" আমি মস্তক অবনত করিয়া অতি ধীরে ধীরে বলিলাম, "পাওনীয়রে দেখেছেন ত কান্দাহারে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে, সে কৃষ্ণ পোষাকে-পরিচ্ছদে খাঁটি পাঠান,—পাঠানের আববাজাববা পরা, পাঠানী পাগ্‌ড়ীর উপর ময়ূর-পাখা আঁটা, যেমন জন্ম, যেমন কর্ম্ম, যেমন সংসার, কৃষ্ণও তেমনি ফুটিয়াছে।" এইটুকু বলিয়া আমি নীরব হইলাম। বঙ্কিমচন্দ্র আমার কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "আর

এক বাটি ক্ষীর খা, আর দুটো রসগোল্লা খা—বাপাস্ত করেছিস্ বটে!" রাখালদাদা তাড়াতাড়ি বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতেই বাড়ীর ভিতর হইতে ক্ষীর ও রসগোল্লা আনিয়া দিলেন। আমার তখন আহারে অরুচি ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ব্যাপার দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তিনটাই একদরের!" তিনি উঠিয়া যাইলেন। আমরা তিন জনে ক্ষীর ও রসগোল্লা কাড়াকাড়ি করিয়া খাইলাম। শেষে পান চিবাইতে চিবাইতে বাটীর বাহির হইয়া সার্কাস দেখিতে চলিয়া গেলাম।

৫

দীনদাদা ও আমি কাঁটালপাড়ায় যাইতেছি। দুই জনে দুখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট লইয়াছি। আমার পায়ে চটিজুতা, পরণে একখানা কালাপেড়ে কাপড়; আর একটা এক-ফর্দ্দ বেনারসী জরির লাল শাল গায়ে জড়ান। কোটের পকেটে তিনটা কমলালেবু—দুই হাতেও চারিটা কমলালেবু। বেঞ্চির উপর বসিয়া আমি কমলালেবু খাইতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমাদের কামরায় দুইটি সাহেব ও আর দুইটি বাঙ্গালী বাবু আসিয়া উঠিল। আমি কমলালেবু খাইতেছি ও বীচি ছাড়াইতেছি। একটি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় যাবে হে!"—আমি উত্তরে বলিলাম, "কেন!" দীনদাদা সেই সঙ্গে বলিলেন, "আমরা কাঁটালপাড়ায় যাইতেছি।" দ্বিতীয় বাবুটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাদের বাড়ী যাইবে?" দীনদাদা উত্তর করিলেন, "বঙ্কিমবাবুর বাড়ী।" আমি লেবু খাইতে খাইতে দীনদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত খবর লয় কেন,—বিয়ের সম্বন্ধ ক'রবে নাকি?" দ্বিতীয় বাবু বলিলেন, "তোমার নাম কি?" আমি এই প্রশ্নের উত্তর ঠিকমত দিব কি না ভাবিতেছি, এমন সময় দীনদাদা, আমার নাম ও তাঁহার নাম বলিলেন। দ্বিতীয় বাবুটি বলিলেন, "বঙ্কিমবাবুর সহিত তোমাদের কোন সম্বন্ধ আছে না কি?" আমি উত্তরে বলিলাম, "এমন কিছু নয়—Distant relation, I would rather say Kinsman." এমন সময় গাড়ী নৈহাটীতে পৌঁছিল। আমরা সকলে নামিলাম। জ্যোতিষ ষ্টেশনে আসিয়াছিল। আমি তাহার ঘাড় ধরিয়া লম্ফ দিয়া পড়িলাম। জ্যোতিষ বলিল, "বেলেল্লামি

করিস্ নে। এরা আমাদের গুরুজন।" আমি বলিলাম, "কে!" উত্তরে জ্যোতিষ বলিল, "ঐ বেঁটে দাড়ীওয়ালা বাবুটির নাম—চন্দ্রনাথ বসু। অপরটি ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।" আমি ত চম্পট। সে বার আর বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত চোখোচোখি করি নাই। আমরা দুই ভাই সঞ্জীব বাবুর কাছে থাকিয়াই আহারাদি করিয়াছিলাম। এবং আড়ালে আবডালে আত্মগোপন করিয়া বেড়াইতাম। কারণ, আমার ইংরেজী বোল্ লইয়া খুব রঙ্গ-রহস্য হইয়াছে। কেহ কেহ তাহার তীব্র সমালোচনাও করিয়াছিলেন। চন্দ্রবাবু, তাহার পর দেখা হইলেই "kinsman" বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। ('প্রবাহিণী,' ১০ মাঘ ১৩২০)

সরস্বতী-বন্দনা

স্তোত্রম্

হ্রীঁ হ্রীঁ হৃদ্যেকবীজে শশিরুচিকমলাকল্পবিস্পষ্টশোভে,
ভব্যে ভব্যানুকূলে কুমতিবনদবে বিশ্ববন্দ্যাঙ্ঘ্রিপদ্মে।
পদ্মে পদ্মোপবিষ্টে প্রণতজনমনোমোদসম্পাদয়িত্রি,
প্রোৎফুল্লজ্ঞানকূটে হরিনিজদয়িতে দেবি সংসারসারে॥
ঐঁ ঐঁ ঐঁ ইষ্টমন্ত্রে কমলভবমুখাম্ভোজভূতিস্বরূপে,
রূপারূপ-প্রকাশে সকলগুণময়ে নির্গুণে নির্বিকারে।
ন স্থূলে নাপি সূক্ষ্মেঽপ্যবিদিত-বিষয়ে নাপি বিজ্ঞাততত্ত্বে,
বিশ্বে বিশ্বান্তরালে সুরবর-নমিতে নিষ্কলে নিত্যশুদ্ধে॥
হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ জাপতুষ্টে হিমরুচিমুকুটে বল্লকীব্যগ্রহস্তে,
মাতর্মাতর্নমস্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধিং প্রশস্তাং।
বিদ্যে বেদান্ত-গীতে শ্রুতিপরিপঠিতে মোক্ষদে মুক্তিমার্গে,
মার্গাতীত-প্রভাবে ভব মম বরদা সারদে শুভ্রহারে॥
ধীর্ধীর্ধীর্ধারণাখ্যে ধৃতিমতিনুতিভির্নামভিঃ কীর্তনীয়ে,
নিত্যেঽনিত্যে নিমিত্তে মুনিগণনমিতে নূতনে বৈ পুরাণে।
পুণ্যে পুণ্যপ্রবাহে হরিহরনমিতে নিত্যশুদ্ধে সুবর্ণে,
মাত্রে মাত্রার্দ্ধতত্ত্বেঽমতিমতিমতিদে মাধব-প্রীতিদানে॥

হ্রীঁ ক্লীঁ ধীঁ হ্রীঁ স্বরূপে দহদহ ত্বরিতং পুস্তকব্যগ্রহস্তে,
সন্তুষ্টাকারচিত্তে স্মিতমুখি সুভগে স্তম্ভনি স্তম্ভবিদ্যে।
মোহে মুগ্ধপ্রবাহে কুরু মম কুমতিধ্বান্তবিধ্বংসমীড্যে,
গীর্গৌর্বাগ্‌ভারতী ত্বং কবিবৃষরসনা সিদ্ধিদা সিদ্ধবিদ্যা।
স্তৌমি ত্বাং ত্বাঞ্চ বন্দে ভজ মম রসনাং মা কদাচিত্ত্যজেথাঃ॥

তরুণশকলমিন্দোর্ব্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ,
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ,
সকলবিভব-সিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ॥

মায়ের কথা

পঞ্চমীর বালেন্দু-গাত্রে এখনও কলঙ্কলেখা ফুটে নাই, হিমজাড্যবিকাশ কুজ্ঝটিকা এখনও অপসারিত হয় নাই, এখনও পীককণ্ঠের পঞ্চম তান স্বরলহরীতে গগন-পবনকে সমান্দোলিত করে নাই, নব বসন্তের সজীবতা-প্রচারক লোহিতাভ কিশলয়-লেখা এখনও বৃক্ষগাত্রে প্রস্ফুটিত হয় নাই,—কেবল একটু প্রফুল্লতার চিহ্ন প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে প্রকট হইয়াছে, ভগবান্ ভাস্কর দেব ধীরে ধীরে উত্তরায়ণের পথে অগ্রসর হইতেছেন, নিসর্গসুন্দরী সাবধানে পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বৃক্ষলতাগুল্মের নগ্নতা দেখাইতেছেন, আর যেন তাড়াতাড়ি সলজ্জভাবে নবকিশলয়ের চিক্কণ বসন ধারণের চেষ্টা করিতেছেন ;—এমনই সন্ধিক্ষণে,—পরিবর্ত্তনের মহামুহূর্ত্তে বাগ্‌দেবীর পূজা হইয়া থাকে। দেবনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, দেবলোকে সূর্য্যোদয়ের অরুণ রেখা ঊষার সীমন্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রাতঃস্নায়ী দেবতাগণের মুখে সামগানের উদাত্ত ধ্বনিতে স্বর্গের বিহঙ্গকুল জাগিয়া উঠিয়াছে, স্বর্গের অরুণোদয় এবং জ্ঞানোদয়ের কালে বাগীশ্বরীর পূজা। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের বিকাশ বলিয়াই মা আমার সবিতা-দুহিতা, বিসৃষ্টির প্রসূতি—বিকাশের দেবী। তন্ত্র বলিয়াছেন, শক্তি বিকাশের প্রথম আস্তরণ শ্বেত ; শ্বেতবর্ণ হইতেই প্রথম বিকাশ সূচিত হয়। আর ঘনঘোর কৃষ্ণবর্ণ সঙ্কোচের সংক্ষোভের বর্ণ। তাই মা আমার শ্বেতাম্বরা,

সিতাজাসীনা, শশিরুচিকমলা, হংসারূঢ়া। তাই সরস্বতী ভদ্রকালী—সৃষ্টিবিতানবিধাত্রী গীর্ব্বাক্‌বাণী—ভারতী।

আগে শব্দ—না আগে সৃষ্টি? শাস্ত্র বলিতেছেন যে, সর্ব্বাগ্রে শব্দ ব্রহ্মের বিকাশ; সেই শব্দের কম্পন হইতে ধীরে ধীরে সৃষ্টির বিকাশ ঘটিয়াছে। তাই সৃষ্টির মূলেই বাগ্‌দেবী; তাই প্রথম প্রভাতেই সরস্বতীর পূজা, তাই বসন্তের প্রথম সূচনা কালেই, সৃষ্টির নবশক্তির প্রভবনকালেই মায়ের বোধন। এই হেতু তন্ত্র বলিতেছেন যে—"তুমি মা ব্রহ্মার মুখকমলে বিরাজমানা রহিয়াছ। তুমি নিখিল জগতের প্রকাশায়িত্রী, সকল গুণময়ী, অথচ তুমি গুণাতীতা, নির্ব্বিকারা, স্থূল-সূক্ষ্মের অতীতা। তুমি বিশ্বময়ী, অথচ বিশ্বের অন্তরালে নিত্য অবস্থিতা রহিয়াছ। তুমি কলাতীতা নিত্যশুদ্ধ স্বরূপা। তুমিই জীবের জড়তা বিনাশ কর এবং প্রশস্তা বুদ্ধি দান করিয়া সকলকে ধন্য কর। তুমিই বিদ্যা, সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র তোমার চরিত্র গান করিয়া থাকে, শ্রুতি তোমার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। তুমি শ্রী স্বরূপা, লোকে তোমাকে ধারণা বলে; তুমি ধৃতি, মতি এবং স্মৃতি নামে পরিচিতা, তুমি নিত্যানিত্য স্বরূপা। তুমি চির-নবীনা: আবার অতি প্রাচীনা—সনাতনী বলিয়া খ্যাতা।"

ইহাই মায়ের পরিচয়। বুঝিলে কি, এ মা কেমন? মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে ব্রহ্মা মায়ের স্তব করিতে যাইয়া বলিয়াছেন;—

"মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥"

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে সংহার পর্য্যন্ত মায়ের সকল রূপই ব্রহ্মা ইঙ্গিতে বলিয়া দিয়াছেন। গোড়ায় মা আমার "মহাবিদ্যা—সরস্বতী। তাই কথাটা আরও ফুটাইবার জন্য ব্রহ্মা আবার বলিয়াছেন,

"ত্বংশ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথাতুষ্টি স্ত্বং ক্ষান্তিঃ শান্তিরেব চ॥

তুমি মা শ্রী; প্রথম বিকাশের যে সৌন্দর্য্য তাহাকেই শ্রী বলে। ঊষার মুদিতা—ঊষার শ্রী। অরুণোদয়ের পূর্ব্বে এবং অর্দ্ধোদয়ের পরে যে প্রফুল্লতা প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠে, যাহার প্রতিচ্ছবি মানবের অন্তরেও উদ্ভাসিত হয়, প্রথম অনুরাগের সেই প্রফুল্লতাকে শ্রী বলে।

জগদীশ্বরী সরস্বতী মা তাই শ্রী স্বরূপিণী সৃষ্টির প্রথম ধাত্রী। এই শ্রীর পুষ্টি হয় হ্রীর সাহায্যে।

প্রথম বিকাশের সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ যেমন পুষ্ট হইতে থাকে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে হ্রীর বা লজ্জার উন্মেষ হয়। আত্মবোধ হইলেই লজ্জার—ব্রীড়ার বিকাশ। এ রূপ, এই অসীম সৌন্দর্য্য আমার—এই বোধটুকু হইলেই হ্রীর বিকাশ হয়। সরস্বতী কেবল প্রথম বিকাশ নহে, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও বোধলক্ষণা, তাই হ্রী উহার বীজ। ঐং বিকাশের ধ্বনি; হ্রীং সেই বিকাশের পুষ্টির দ্যোতক। তাই এই দুই বীজমন্ত্রের জপে সারস্বত আভাস সাধকের হৃদয়পটে হইয়া থাকে। জগৎ ছাড়া আমরা ত কেহই নহি, আমরা প্রত্যেকে প্রকৃতির অঙ্গীভূত। বাহ্য জগতে মায়ের যে লীলার প্রকটন হইবে, মনোময় জগতেও মায়ের সেই লীলার বিস্তার ঘটিবে। বাহিরে বসন্তের প্রথম সূচনা, হ্লাদিনী শক্তির প্রথম বিকাশ; ভিতরে মনোময় রাজ্যেও বাহিরের প্রতিধ্বনি হইবে, সে প্রতিধ্বনির সুর, বাহিরের সুরের সহিত এক করিয়া লইয়া ভিতর বাহির যখন এক সুরে বাজিবে, তখন ভিতরের মাতৃশক্তি বাহিরের জননী-শক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া সাধকের আত্মদর্শনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে। এই উদ্দেশ্যেই সাধন, ভজন, পূজা এবং উৎসব। কারণ মা যে,—

> "ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
> ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥
> বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
> তথা সংহৃতিরূপাঽন্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥"

মা যখন সৃষ্টিস্থিতি সংহারকারিণী; মা যখন এই বিসৃষ্টির সৃষ্টিরূপা এবং পালনকার্য্যের স্থিতিরূপা, মা যখন এই জগতের জগন্ময়ী,—তখন কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে মাতৃশক্তির লীলাবিকাশের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। সেই পরিবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মায়ের গতি অনুসরণ করিতে পারিলে মাতৃসাক্ষাৎকার সম্ভবপর হইতে পারে। মা স্থূলে ও সূক্ষ্মে সমানভাবে বিরাজমানা; এক বৎসরে মাতৃলীলার যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, যুগে যুগে, কল্পে কল্পে তেমনই পর্য্যায় অনুসারে ভাববিপর্য্যয় ঘটে। তাই বর্ষকে সাধনার মানদণ্ড করিয়া ঋতুভেদে মায়ের নানারূপে পূজা ও আরাধনা হিন্দু করিয়া থাকেন। হেমন্তের প্রথমে শীত ঋতুর

গোড়ায় মা আমার শ্যামা—ঘোরা শবাসনা, সংহারমূর্ত্তি। আর বর্ষের প্রথমে, বসন্তের সূচনাকালে, সৃষ্টির আদি যুগে মা আমার অমল ধবল কান্তি, শ্বেত-পদ্মাসনা, মুক্তাহার-শোভনা, হংসারূঢ়া, বাগ্‌বাদিনী সরস্বতী। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, সাধনজগতে উত্তরায়ণের সংক্রান্তির পরদিন হইতে বর্ষগণনা আরম্ভ হয়। এক বৎসরে অহোরাত্র বিদ্যমান, উত্তরায়ণের কাল দিবা—বা জাগরণের কাল; দক্ষিণায়নের কাল নিশা—বা শয়নের কাল। উত্তরায়ণে মা আমার প্রফুল্লবদনা, হেমবরণা, স্মেরাননা। দক্ষিণায়নে মা আমার শ্যামা—শ্মশান কালী—নিশাপূজিতা মহাদেবী। উত্তরায়ণের আস্তরণ শ্বেত; দক্ষিণায়নের আস্তরণ বা আবরণ ঘনঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

মা আমার বাক্‌রূপে কি কথা শুনাইতেছেন? অম্ভৃণকন্যা বাক্ মায়ের কথা লোকসমাজে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

"আমি বসুরুদ্র-গণে করি বিচরণ,
বিচরি, আদিত্যে আর বিশ্বদেব সনে;
মিত্র ও বরুণে করি আমিই ধারণ,
আমি ধরি অশ্বীদ্বয়ে ইন্দ্র হুতাশনে॥

অরি-নাশী অই সোমে আমি আছি ধরি,
আমি করি ত্বষ্টা ভগপূষণে ধারণ;
হবিদাতা সোমযাজী, দেবতৃপ্তিকারী,
যজমান তরে ধরি যজ্ঞ-ফল ধন॥

সবার ঈশ্বরী আমি, ধন-প্রদায়িনী,
আত্মজ্ঞানময়ী আমি যজ্ঞীয় প্রধানা;
বহুভাবে স্থিতা, সর্ব্বভূতাবিষ্টা আমি,
এরূপে সর্ব্বত্র দেবে করেন ধারণা॥

আমার শক্তিতে করে—যে করে ভক্ষণ,
কিম্বা করে প্রাণকার্য্য শ্রবণ-দর্শন;
না জানি আমায়—ক্ষয় হয় লোকগণ,
হে শ্রুত! সে তত্ত্ব কহি করহ শ্রবণ॥

যে তত্ত্ব সেবিত নরে অমর-নিকরে,
তাহাই কহিনু এবে আমিই আপনি ;
রক্ষিতে বাসনা যারে—শ্রেষ্ঠ করি তারে,
তারে করি—ব্রহ্মা, ঋষি, কিম্বা তত্ত্বজ্ঞানী॥

বিনাশিতে ব্রহ্মদ্বেষী হিংস্রক অসুরে,
আমিই রুদ্রের ধনু করেছি বিস্তার ;
যুঝি আমি অরি সনে লোকরক্ষা তরে,
আমিই প্রবিষ্ট স্বর্গ-পৃথিবী-মাঝার ॥

সৃজি আমি পিতা-ব্যোমে ব্রহ্ম-শিব 'পরে,
সলিলে সাগরে আছে কারণ আমারি।
তাহা হতে ব্যাপি বিশ্ব-ভুবন অন্তরে,
মায়াদেহে স্বর্গ তাই আছি স্পর্শ করি ॥

আমিই সৃজনকালে এ বিশ্ব-ভুবন—
ব্যাপি নিজে বায়ু সম হই প্রবর্ত্তিত ;
অতিক্রমি মর্ত্ত্য—স্বর্গ করি অতিক্রম,
ঈদৃশী মহিমা হয়েছিল সমুদ্ভূত ॥"

ইহাই দেবীসূক্ত। এই বাণীই বাক্‌মুখে প্রথম অভিব্যক্ত। ইহাই সারদার প্রথম ঝঙ্কার। ইহারই প্রতিধ্বনি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ব্রহ্মার স্তোত্র। ইহারই ব্যাখ্যায় ও বিকাশে মাতৃত্বের পরিস্ফুরণ এবং বিস্তার ঘটিয়াছে। তন্ত্র এই কথাটা সাধনার পদ্ধতি সাহায্যে বুঝাইয়াছেন। সরস্বতী-পূজার দিনে এই দেবীসূক্ত এবং বেদের ও উপনিষদের মহাবাক্য-সকল পাঠ করিতে হয়।

শব্দব্রহ্মের আন্দোলনে সৃষ্টির বিকাশ। তাই মা গানের দেবতা—সপ্তস্বরা, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী রূপিণী। স্বরের অন্বয় ও ব্যত্যয়ে সঙ্গীতের সৃষ্টি ; সঙ্গীত ভাবের দ্যোতনা, ভাব হইতে রূপের বিকাশ। রূপই সৃষ্টি—আদ্যাশক্তির প্রকটন লীলা। তাই মা সরস্বতী বীণাপাণি—বেণুবিদ্যা-বিধায়িনী।

আন্দোলন নর্ত্তনের নামান্তর মাত্র। স্বর নাচাইয়া সঙ্গীত, শক্তি নাচাইয়া রূপের বিকাশ। মা আমার উষার অরুণ-রেখায় নাচিয়া বেড়ান,

তাই প্রথম প্রভাতে দিব্যধাম উষারাগরঞ্জিত হইয়া উঠে। সূর্য্যের প্রতি দ্যুতিকণায়, অংশুর কনকরেখায় মা আমার নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়ান, তাই আব্রহ্ম তৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত সৃষ্টির সর্ব্বস্ব সমালোকিত হয়—রূপের ছটায় ফাটিয়া পড়ে। কিশলয়বক্ষে, পুষ্পপল্লবে, তৃণস্তম্বে, শীকর-সম্পাতে, ভ্রমরপক্ষে, বিহঙ্গকণ্ঠে—সর্ব্বস্বে এবং সর্ব্বত্রে মা আমার নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়ান—তাই সবাই সজীব, সবাই রূপময়। তাঁহার লাস্যে প্রকৃতির হাস্য বিকশিত হয়, তাঁহার নৃত্যচঞ্চল চরণতাড়নে মৃত্যুর স্থবিরতা অপসারিত হয়,—বীজে অঙ্কুর উদ্গম হয়। তাই মা নৃত্যেরও দেবী—নটীর ঈশ্বরী। নাচে-গানে-বাক্যে-শব্দে-ভাবে মা প্রকৃতিকে হৈমজাড্য-শূন্য করিয়া সৃষ্টিবৈচিত্র্যের বিকাশ ঘটাইয়া থাকেন। অন্তরে ও বাহিরে সমানভাবে তিনি অভিব্যক্ত—স্থূলে সূক্ষ্মে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত।

মা আমার বর্ণাত্মিকা, সপ্তবর্ণসমন্বয়কারিণী; তাই মা শ্বেতাম্বরা, শ্বেতবর্ণা, বালেন্দুনিভাননা। বর্ণাত্মিকা বলিয়াই মা আমার চিত্রকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আলেখ্য-রচনায় বর্ণের বিন্যাস করিতে হয়; বর্ণাত্মিকা মায়ের কৃপা না হইলে সে বিন্যাস ঠিকমত হয় না। তাই মা কলাবতী—কলাবধূ। তন্ত্রে তাই সরস্বতীকে কলাবধূটিকা বলিয়া আদর করিয়া ডাকিয়াছে। রূপবিকাশের বর্ণ যেমন শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকারের আছে; শব্দবিকাশের বর্ণও তেমনি পঞ্চাশৎ প্রকারের আছে। স্বর ও ব্যঞ্জন হিসাবে পঞ্চাশটি বর্ণ; এই বর্ণের আবার তিনটি গ্রাম আছে; যথা গুন্টিকা, মহাশ্বাস ও রুদ্ধশ্বাস। এই তিন গ্রামে পঞ্চাশটি মূল বর্ণের শতাষ্টক চলিত বা প্রকট রূপ আছে। মা আমার পঞ্চাশৎ বর্ণরূপিণী। মা সর্ব্ববর্ণে পরিব্যাপ্তা হইয়া ভাষার সৃষ্টি করেন, গদ্যপদ্যময়ী ভাষার উৎপত্তি সাধন করেন। মা স্বয়ং বাক্য এবং বাক্যের রসাত্মিকা শক্তিও বটেন। তাই মা সপ্তস্বরা, সপ্তবর্ণা, তালমানরূপবিলাসিনী।

বসন্ত পঞ্চমীর দিনে এই মায়ের পূজা হইয়া থাকে। ভারতচন্দ্র এই মায়ের স্তুতি-গীতি এইরূপে করিয়াছেন :—

উর দেবি সরস্বতি স্তবে কর অনুমতি,
বাগীশ্বরী বাক্যবিনোদিনী।

শ্বেতবর্ণ শ্বেতবাস শ্বেত বীণা শ্বেত হাস,
শ্বেতসরসিজ নিবাসিনী ॥
বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র বেণু বীণা আদি যন্ত্র,
নৃত্যগীত বাদ্যের ঈশ্বরী।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরোগণ সেবা করে অনুক্ষণ,
ঋষি মুনি কিন্নর কিন্নরী ॥
আগমের নানা গ্রন্থ আর যত গুণপন্থ,
চারি বেদ আঠার পুরাণ।
ব্যাস বাল্মীকাদি যত কবি সেবে অবিরত,
তুমি দেবি প্রকৃতি প্রধান ॥
ছত্রিশ রাগিণী মেলে ছয় রাগ সদা খেলে,
অনুরাগ যে সব রাগিণী।
সপ্ত স্বর তিন গ্রাম মূর্চ্ছনা একুশ নাম,
শ্রুতিকণা সতত সঙ্গিনী ॥
তান মান বাদ্য তাল নৃত্যগীত ক্রিয়াকাল,
তোমা হৈতে সকল নির্ণয়।
যে আছে ভুবন তিনে তোমার করুণা বিনে,
কাহার শকতি কথা কয় ॥

এস মা, আজ শুভ দিনে শুভ ক্ষণে আসিয়া আমাদের হৃদয়াকাশে উদয় হও। যে বাণী শুনাইয়া বেদকে মুখর করিয়াছ, তন্ত্রকে সাধনপরায়ণ করিয়াছ,—এক বার সেই বাণী শুনাও। হৃদয়-বীণার যে তন্ত্রে ঝঙ্কার দিলে অতীতের স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠে, যে গীত গায়িলে বিস্মৃতির কুয়াশা দূর হয়, কৃপাময়ি, সেই তন্ত্রীতে তোমার কুন্দকলিসম অঙ্গুলি পীড়নে ঝঙ্কার তোল, তোমার সপ্তস্বর-বিজড়িতকণ্ঠে সেই গান গাও। মা—এ জড়তা দূর কর; তুমি বুদ্ধি দেও, শক্তি দেও, আশা দেও, উৎসাহ দেও। আজ বাঙ্গালার বালকগণ—বিদ্যার্থিগণ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিত শ্বেতকুসুমাঞ্জলি লইয়া তোমার শ্বেতচরণে অর্ঘ্য দিতেছে—তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর, তাহাদিগকে সাধক হইবার সামর্থ্য দাও, তোমায় আরাধনা করিবার শক্তি দাও। আমরা চাহি বিদ্যা, চাহি বুদ্ধি, চাহি জ্ঞান, চাহি ধৃতি,—আমরা ত

সুখ, ঐশ্বর্য্য, ভোগবিলাস চাহি না। তোমার সন্ততিগণকে রক্ষা কর মা—রক্ষা কর। ('প্রবাহিণী,' ১৭ মাঘ ১৩২০)

স্মৃতি-কথা

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১

৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে আধুনিক বাঙ্গালী বড় অল্পই চেনে। তাঁহার 'পদ্মিনী উপাখ্যান' উপহারে বিতরিত হইলেও ইংরেজীনবীসদিগের মধ্যে সে পুস্তকের এখন বড় প্রচলন নাই। 'রাজস্থানে'র কথা বাঙ্গালীকে রঙ্গলালই শিখাইয়াছেন। দেশাত্মবোধের তত্ত্ব তিনিই প্রথমে প্রচার করেন। রঙ্গলাল উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং সেকালের হিসাবে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনিও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি করিতেন। পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি জীবনের শেষ কয়টা বৎসর কষ্টে কাটাইয়াছিলেন। খিদিরপুরের পুল পার হইয়া রামকমল মুখার্জ্জির ষ্ট্রীটে বড় বাড়ীর পূর্ব্বদিকে পথের উপরেই তাঁহার বাড়ী। যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, তত দিন সেই বাড়ীর ছাদে সকাল সন্ধ্যায় লাঠির উপর ভর করিয়া তিনি পায়চারি করিতেন। শেষে সে সুখেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। মরণের পূর্ব্ব দুই বৎসর তাঁহাকে শয্যা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি সুগঠিত এবং সুশ্রী পুরুষ ছিলেন।

২

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমার মাতামহকুলের সহিত সংবদ্ধ ছিলেন। আবার অন্য পক্ষে আমার পিসতুতো ভাইদিগের পিসতুতো ভাই ছিলেন। আমি তাঁহাকে 'রঙ্গদা' বলিয়া ডাকিতাম। এক বার ভাগলপুর হইতে আসিবার সময় হুগলীতে রঙ্গলাল দাদার বাসায় আমরা ছিলাম। তখন তিনি হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আমার কিন্তু সে কথা তেমন ভাল মনে নাই। পরে আমার পৈতার সময় তাঁহাকে সজ্ঞানে প্রথম

দেখি। তিনি আমার মুখে হিন্দী দোঁহা চৌপাঈ প্রভৃতি পদ্য ও গাথা শুনিতে ভাল বাসিতেন। হিন্দী কবি নরহরি ও ভূষণের দেশাত্মবোধ-জ্ঞাপক কবিতাসকল যখন আবৃত্তি করিতাম, তখন বৃদ্ধের সেই রোগক্লিষ্ট মুখও যেন জ্বলিয়া উঠিত। এত তেজ, এত ঝাঁজ যে বাঙ্গালীর মধ্যে হইতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে কখনও জানিতাম না।

৩

১৮৮৩ সালের গোড়ায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। কলিকাতায় আসিয়া খিদিরপুরেই আছি। এক দিন রঙ্গলাল দাদাকে দেখিবার জন্য তাঁহার কাছে গেলাম। এবার তাঁহাকে একটু অধিক ক্লিষ্ট দেখিলাম। আমি যাইতেই একখানি 'পদ্মিনী উপাখ্যান' লইয়া বলিলেন, "আমাকে পড়িয়া শুনাও।" আমি বাছিয়া বাছিয়া স্থানে স্থানে পড়িতে লাগিলাম। আমার আবৃত্তি শুনিয়া তিনি যেন বিছানা হইতে ঠেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। আমি তাঁহার মাথায় মুখে জল দিয়া ঠাণ্ডা করিলাম। তিনি আশ্বস্ত হইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাঙ্গালাও এমন করিয়া পড়া যায়;" এই বলিয়া তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে খবর পাইলাম যে, আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি। দাদা যেন আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেলেন। আমাকে কাছে বসাইয়া লেবু ও সন্দেশ খাওয়াইলেন। কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। রঙ্গলাল দাদা ইংরাজী শিক্ষার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, ইংরাজী শিক্ষার যত অধিক বিস্তার হইবে, ততই দেশের মঙ্গল হইবে;—দেশাত্মবোধ আপনি ফুটিয়া উঠিবে।

৪

৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মাইকেল মধুসূদনের বন্ধু ছিলেন। মধুসূদনের কবিত্বের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। মধুসূদন খিদিরপুরে যাইতেন। আমার পিসা মহাশয়ের বাড়ীতে কাজকর্ম্মে এক থেলো হুঁকা হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সেই কোট-পেণ্টলুন-পরা জুল্পি ঝুলান সাহেব সাজা মধুসূদন হুঁকা হাতে করিয়া দাঁড়াইলে এক অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিত। লোকে তাঁহার এই ভঙ্গি দেখিয়া উপহাসও করিতেন। উত্তরে কিন্তু মধুসূদন

প্রায়ই বলিতেন, "কর্ম্মবাড়ীর শোভা থেলো হুঁকো—সে শোভায় বঞ্চিত থাকা ঠিক নহে।" ('প্রবাহিনী,' ১৭ মাঘ ১৩২০)

মদন-তত্ত্ব

১

বসন্ত পঞ্চমীর দিন হইতে দোলপূর্ণিমার দিন পর্য্যন্ত, এই প্রায় দেড় মাস কাল মদন-উৎসবের কাল। বৌদ্ধ যুগে এই সময়টা মদনপূজা এবং মদন-উৎসবে ব্যয়িত হইত। পরে পুরাতন মদন-উৎসব হোলি-উৎসবে পরিণত হইয়াছে। পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত এবং বিহারের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই বসন্ত পঞ্চমীর দিন হইতে হোলি-গান আরম্ভ হয়। এই সময়টা পিলু ও লগ্নী, বসন্ত বাহার ও টোরীর সুরতরঙ্গে নবকিশলয়-সমাচ্ছন্ন গ্রামপল্লীর কুঞ্জকানন যেন মুখর হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানে হোলি এমনই সর্ব্বব্যাপী উৎসব যে, যাহারা রামভক্ত—সীতারামের পূজক, তাহারাও সীতারামের আবীরখেলার কথা লইয়া গান করে। এমন কি, যাহারা শৈব তাহারা শিবকে ফাগ মাখাইয়া হোলিখেলার বর্ণনা করে। হিন্দুস্থানে হোলিখেলা শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার একচেটিয়া লীলা নহে। রাম, লক্ষ্ণ, শিব, গণেশ, সূর্য্য—সবাই হোলি খেলিয়া থাকেন। কেবল জগন্মাতা গৌরী-উমাকে লইয়া হোলিখেলার গান কখনও কাহারও মুখে শুনি নাই।

মদন-উৎসব বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মদন-তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বিষ্ণু পালন-কর্ত্তা, তাই তিনি মদনমোহন। শিব সংহার-কর্ত্তা, তাই তিনি মদনারি—মদনভস্মকারী। কাজেই মদন শব্দের অর্থ বুঝিতে হয়। আত্ম-বিসর্পণকে মদন বলে। আমি আছি—এই জ্ঞানটা যখন জীবের মনে ফুটিয়া উঠে, তখন আমার আমিত্বের বিস্তার করিবার সাধ জীবের মনে স্বতঃএব জাগিয়া উঠে। এই আত্ম-বিতানের বাঞ্ছাকে মদন বলা হয়। "একোঽহং বহু স্যামঃ"—ইহাই মদন-তত্ত্বের মূল সূত্র। এক আমি বহু হইব, এই ইচ্ছা হইতেই

মদন-তত্ত্বের উৎপত্তি। ইহাই সৃষ্টির মূল কথা। স্থাবর-জঙ্গম, জড়-সূক্ষ্ম—সৃষ্ট সকল পদার্থই এক হইতে বহুতে পরিণত হইতে চাহে। সৃষ্ট পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সার্থকতা এই ইচ্ছা পূরণেই সাধিত হইয়া থাকে। জীবন মানেই বিস্তার—এক হইতে বহুতে পরিণতি। এই পরিণাম সাধন হইলেই জীব-জীবনের পর্য্যবসান ঘটে। শাস্ত্র বলেন, এই যে এক হইতে বহুতে পরিণতির চেষ্টা, উহাই সৃষ্টি-চাতুরী, উহাই সৃষ্টি-প্রহেলিকা—উহাই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। যত ক্ষণ সৃষ্টি বজায় থাকিবে, তত ক্ষণ এই চেষ্টা প্রবল থাকিবে। তাই বিষ্ণু মদনমোহন; তিনি যত ক্ষণ পালনকর্ত্তা, যত ক্ষণ সৃষ্টির লীলা রক্ষা করিয়া থাকেন, তত ক্ষণ তিনি "একোঽহং বহু স্যামঃ," এই মহাকাব্যের সার্থকতা সম্পাদন করেন। তাই তিনি মদনমোহন। আর যখন রুদ্রমূর্ত্তিতে তটস্থ, সৃষ্টির বিস্তারকে সংহরণ—আহরণ—সঙ্কোচ করিবার জন্য স্থিরসঙ্কল্প, তখন তিনি মদন-ভস্ম করিয়া থাকেন; কেন না, মদন থাকিতে সৃষ্টির সংহার সম্ভবপর নহে। মদনকে ভস্মসাৎ করিলে, "একোঽহং বহু স্যামঃ" এই বাসনা বিসর্জ্জন করিলে, "ওঁ তৎসৎ" এই মহাবাক্যের সৃষ্টির বিকাশ সংহৃত হইতে আরম্ভ হইলে তবে রুদ্রের সংহারমূর্ত্তি প্রকট হয়। তাই তিনি মন্মথ-রিপু, মারঘ্ন, মদনদমন।

সৃষ্টির সূচনায়, প্রথম বসন্তের মলয়হিল্লোলে, নবকিশলয়ভূষণ তরুচ্ছায়ায় মদনমোহনের অর্চ্চনা করিতে হইবে। সৃষ্টির সর্ব্বত্র, সর্ব্ব ব্যাপারে, "এক আমি বহু হইবার" বাসনা যেন কোটিরেখায় ফুটিয়া উঠিতেছে। নীল গগনের কোলে অরুণকিরণের রক্তরেখা, বৃক্ষগাত্রে, পুষ্পমুখে, লতাকণ্ঠে নবাঙ্কুর উদ্‌গমের সাহ্লাদ লোহিতাভা, ভ্রমরগুঞ্জনে, কোকিলকূজনে, মক্ষিকার চাঞ্চল্যে, বিহঙ্গকুলের কলরবে,—সর্ব্ব বিষয়ে, প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে এই মদনের প্রভাব যেন ফুটিয়া ফাটিয়া উঠিতেছে। ইহাই ত মদনোৎসবের কাল—সৃষ্টিরক্ষার ও সৃষ্টিবিস্তারের শুভ ক্ষণ।

"নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল,
মাতল নব অলিকুল।"

"বিহরে শ্যাম নবীন কাম
নবীন বৃন্দা-বিপিন ধাম
সঙ্গে নবীন নাগরীগণ
নব ঋতুপতি-রাতিয়া।
নবীন গান নবীন তান
নবীন নবীন ধরই মান
নৌতুন গতি-নৃত্যাতি অতি
নবীন নবীন ভাতিয়া॥
সরস কুসুম সরস পবন
সরস কাননে ভেলি ভূষণ
রসে উন্মত ঝঙ্কৃতি কত
সরস ভ্রমর পাঁতিয়া॥"

"মলয়জ পবন পরশে পিক কুহরই
শুনি উলসিত ব্রজনারী।
উলসিত পুলকিত সবহুঁ লতা তরু
মদন ভেল অধিকারী॥
মুকুলিত চূত দূত ভেল ষট্‌পদ,
শবদহিঁ দেওল বাধাই।
সন্ত বসন্ত বর পূজায়ল ঘর ঘর
জগজনে আনন্দ বাঢ়াই॥
চাতক পায়ে কপোত শিখণ্ডক
তুঁহু জন লিখন বুঝাই।
দ্বিজবর সন্ত বিহঙ্গ শুকমুখে
পঞ্চম বেদ পড়াই॥
কুঞ্জ লতাপর সাজল ঋতুপতি
বহুবিধ বিচিত্র বিধানে।
কুসুম বিকাশন রাস-স্থল ঝলমল,
কানু শুনল নিজ কাণে॥"

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বসন্তের বর্ণনা অপরাজেয়। বৈষ্ণব মদনমোহনের পূজক। বৈষ্ণবের বৃন্দাবনে ঋতুরাজ বসন্ত চিরস্থায়ী; কেন না বৃন্দাবন

যে মদনমোহনের স্থান। এই মদনমোহনের ভাবে একটু অপূর্ব্ব মাধুরী লুকান আছে।

"শুক বলে—আমার কৃষ্ণ মদনমোহন;
শারী বলে—আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নইলে শুধুই মদন॥"

বামে রতি, রাধা—হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ না হইলে শ্রীকৃষ্ণ শুধুই—কেবলই মদন। কিন্তু আত্মবিকাশের, আত্মার পৌনঃপুনিক বিস্তারের অবলম্বন—আস্তরণ। হ্লাদিনী রাধিকা বামে থাকিলেই শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন। এক আমি বহু হইব—এই ইচ্ছা মদন। এই ইচ্ছার পরিণতি রতি ও শোভার সাহায্যে হইয়া থাকে। ভগবান্ মদনমোহন না হইলে তাঁহাকে রসময় বলা যায় না। যে হেতু তিনি মদনমোহন সেই হেতু তিনি রসময়। তত্ত্বমসি—মহাবাক্যের পরই "রসো বৈ সঃ" মহাবাক্যের বিকাশ। যে ভগবান্ এক হইতে বহু হইবার সাধ করিয়াছেন, তিনিই রস-স্বরূপ; কারণ রস ব্যতীত এক হইতে বহু হইবার অন্য উপায় নাই। রসের দ্বারা এক দুই হইবে, তবে দুই বহুতে পরিণত হইবে। তত্ত্বমসি মহাবাক্যে দুইয়ের আভাস পরিষ্কার রহিয়াছে। তুমি এবং আমি আছি এই ভাবোদয় হইলে, তুমি আমি যে এক, এই চিন্তা মনে জাগিয়া উঠে। তোমায়-আমায় সম্বন্ধ নির্ণয় হয় রসের সাহায্যে। কেন জানি না, আমি চাই তোমাতে মিশিতে। মিশিতে পারি না বলিয়াই ধনৈশ্বর্য্য লইয়া খেলা করি, দেহসুখে সুখী হইবার চেষ্টা করি। কিন্তু ভোগে তৃপ্তি হয় না, বরং পিপাসা কোটিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া যায়। তাই চাই তোমাকে পাইতে, তোমার কাছে থাকিতে, তোমাকে লইয়া সকল সাধ মিটাইতে। দুই পথ ধরিয়া তোমার কাছে ছুটিয়া যাওয়া যায়। এক বিসর্পণের পথ; আমার আমিত্বকে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বস্বে পরিব্যাপ্ত করিয়া, চিঁড়ের বাইশ ফেরের মতন এক আমিকে নানা গুণযুক্ত করিয়া বহুতে বিসর্পিত করিয়া—অনন্ত তুমি—তোমাকে পাইবার জন্য আমি ছুটিয়া বেড়াই। দ্বিতীয় সংহরণের পথ; আমার নানা সম্বন্ধের সঙ্কোচ ঘটাইয়া—কূটস্থ তুমি—তোমাতে বুদ্‌বুদের মতন মিলাইয়া-মিশাইয়া যাইতে চাই। এই দুই পথেরই রস সম্বল। পথের কড়ি রস না হইলে এ পথ চলা যায় না।

রস কি ? পূর্ব্বে এক বার বলিয়াছি, ইংরেজী ভাষার প্রতিশব্দ দিতে হইলে রস—emotions বলা যায়। যাহার দ্বারা আমার আমিত্বের বিসর্পণ ও সংহরণ সম্ভবপর হয়, তাহাই রস। রতি, আসক্তি, অনুভূতি প্রভৃতিকে রস বলা যায়। আত্মার মোদিনী ও রঞ্জিনী বৃত্তিকে রস বলা হয়। যাহা এককে দ্বিতীয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে, সে আকর্ষণের ফলে যাহা তোমাকে ও আমাকে বহুতে পরিব্যাপ্ত করে, তাহাই রস। রস হইতে রতি, অথচ রসের জন্যই রতি। যে ইচ্ছায় মদনের উদ্ভব, সেই ইচ্ছায় রসের বিকাশ। আমার অনন্ত দুঃখের উপশান্তির জন্য, তৃষ্ণার্ত্ত আমি, তোমার রূপ-সাগরে ডুবিতে চাই। রস ইংরেজী percept-এর মূল তত্ত্ব ; রস-জন্যই percept। তন্ত্র বলেন, এই রসে মতি থাকিলেই মদনমোহনের অর্চ্চনা করিতে হয়, রাধাতন্ত্রের আলোচনা করিতে হয়। আর এই রসে বিরতি হইলে—স্মৃতির বিকাশ হইলে শ্মশানবাসী রুদ্রের অঙ্গে—সদাশিবের শ্রীচরণে বিলীন হইতে হয়। রস রূপের বেদী। রূপারূপের অতীত যিনি তাঁহার সহিত রসের কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি রসময় নহেন।

কিন্তু জীব আমরা, আমরা ত অরূপের ভাবনা ভাবিতে পারি না, ভাবিলেও কোন লাভ নাই। আমার চাই তৃপ্তি ; আশা, আকাঙ্ক্ষা, সাধ, বাসনা, কামনা, অনুরাগ, বিরাগ প্রভৃতির তৃপ্তি। এ তৃপ্তির পথে যাহা বাধা, তাহাই দুঃখ। এই দুঃখ দূর করাই সাধনা। এমন সাধনায় ইষ্টদেবতা তিনিই হইবেন, যিনি নিত্যানন্দময়। মদনমোহন আনন্দস্বরূপ। তাই মদনমোহন আমার ইষ্টদেবতা। কেন এ দুঃখ ? জীব, জন্মের দিন হইতে, ভূমিষ্ঠ হইবার ক্ষণ হইতে, কাঁদে কেন ? এ রোদন চ্যুতি-জন্য। তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়াছি বলিয়াই আমার দুঃখ। এক আমি বহু হইবার সাধ করিয়া তুমি আমাকে তোমা হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছ। তাই আমার বিরহজ্বালা উপস্থিত হইয়াছে। আমি তোমাতে আবার মিশিতে চাই। মিশিতে পারি না বলিয়াই আমার দুঃখ—এ গুরু বিরহ। দেহসুখে সুখী হইয়া সে বিরহজ্বালা ভুলিতে পারি না, পথের কাঙ্গাল কোটীশ্বর হইলে সে দুঃখ দূর হয় না, বিশ্বজয়ী হইয়া ভোগের কোটি চিহ্ন বিকাশ করিয়া তৃষ্ণা নিবৃত্তির চেষ্টা করিলে পিপাসার শান্তি হয় না, প্রাকৃত উপচয়-অপচয় নিয়মাধীন থাকিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তি নাই। কিন্তু

তুমি উপচয়-অপচয়ের অতীত, নিত্যপূর্ণ, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বস্বরূপ; তোমাতে ডুবিতে পারিলে আমার দুঃখ দূর হইবে, আমার পিপাসা মিটিবে। তাই প্রাণ চায় তোমাকে ধরিতে, প্রাণ চায় তোমাতে সকল সাধ মিটাইতে, তোমাকে লইয়া জীবের খেলা সাঙ্গ করিতে। আর পৃথক্ থাকিতে পারি না; স্বতন্ত্র অনুভূতির বড় জ্বালা। সে জ্বালা দূর করিবার উদ্দেশ্যে শীতল সাগর তুমি, তোমাতে ডুবিতে চাই—একেবারে অতল তলে মিশাইতে চাই। ইহাই মদন—ইহাই কাম—ইহাই রস—ইহাই প্রেম।

"কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি,
ঘসিতে সৌরভময়।
ঘসিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥"
"পিরীতি বলিয়া এ তিন আঁখর
সিরজিল কোন ধাতা।
অবধি জানিতে সুধাই কাহাতে
ঘুচাই মনের ব্যথা॥"
"পিরীতি-মূরতি পিরীতি রতন,
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক জনমে জনমে
ভাগ্য করিয়াছিল॥"
"নৌকাতে চড়াঞা দরিয়াতে লৈয়া
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করি ডুবিয়া না মরি,
উঠিতে নারিয়ে কূলে॥"
"কানুর পিরীতি কালের বসতি
যাহার হিয়ায় থাকে।
মনের খলনে যারে সেই জনে
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে॥"

নব বসন্তের প্রথম উন্মেষে এই প্রীতির আহ্বান মনোমধ্যে ধ্বনিত হয়। এ ধ্বনি যে শুনিতে পায় সে-ই বিরহকাতর হইয়া কাঁদিয়া বলে—

"ঐ বুঝি বাঁশী বাজে,
মনোমাঝে, কি বনমাঝে !"

বাঁশী মনোমাঝে বাজিয়া উঠিলেই তাহার প্রতিধ্বনি বনমাঝেও হইয়া থাকে। আবার বনমাঝে সে বংশীরব হইলে মনোমাঝেও তাহার প্রতি-শব্দ শুনা যায়। বাহ্য প্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রথম বসন্তেই রসের বিকাশ, এক আমি বহু হইবার বাঞ্ছা যেন কোটি-মুখ হইয়া ফুটিয়া উঠে—আমি প্রকৃতির শোভা দেখিয়া, শোভাময় তুমি, তোমার কাছে ছুটিয়া যাইতে চাই। কিন্তু আমার স্বতন্ত্র অনুভূতি—আমিত্বের অহঙ্কার—আমার সে ইচ্ছায় বাদ সাধে। মনে ভাবি, তুমি না ডাকিলে যাইব না। তাই তোমার বংশীরবের জন্য উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া থাকি। সমীরসন্তাড়নে যেন সে শব্দের ঝঙ্কার শুনিতে পাই—শেষে বিহ্বল-বিভোর অবস্থায় মনোমাঝে ও বনমাঝে উভয়ত্র একসঙ্গে তোমার বংশীধ্বনি শুনিতে পাই। তখন যেন তোমার প্রতি গলিয়া গড়াইয়া যাইতে সাধ যায়। তুমি মদনমোহন, তাই আমার এমন সাধ হয়। নব বসন্তের নবকিশলয় শোভার উপর ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে দাঁড়াইয়া রাধা সতীকে পার্শ্বে লইয়া তুমি অহরহঃ ঢুলিতেছ, মদনমোহনরূপে জগৎ আলো করিয়া আছ, তাই চিরতৃষ্ণার্ত্ত হৃদয় আমার, তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। তুমি মদনমোহন, তাই এই আকর্ষণ। এই আকর্ষণের পোষণই বৈষ্ণব সাধনা; এই আকর্ষণের বিশ্লেষণই রসতত্ত্বের মূল। এই আকর্ষণই নাম ও রূপের অবলম্বন।

কথাটা আরও একটু ফুটাইয়া তোলা প্রয়োজন। কিন্তু তাহাতেও অনেক বাধা। গোড়া হইতে পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া, বিচারের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া, সামান্য ও বিশেষণের নির্দ্দেশ করিয়া তবে তত্ত্বকথার ব্যাখ্যা সম্ভবপর। কারণ, যাঁহাদের জন্য এই সকল সন্দর্ভ লিখিত হইতেছে, তাঁহারা ইংরেজীনবীস; হিন্দুর চিন্তার ধারা এবং বিচারের পদ্ধতি রীতিমত তাঁহারা অনুসরণ করেন নাই; মধ্য হইতে একটা সিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা করিলে ঠিক হয় না,—তাঁহাদের অনেকের বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হয়। কিন্তু করি কি, রীতিমত আলোচনা কেহ পড়ে না যে! অথচ দেশের শিক্ষিত সমাজের অনেকে পরের মুখে ঝাল খাইতেছে। আমাদের তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও বৈষ্ণবের মধুর রসের সাধনাকে

লাম্পট্যের আকর বলিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন। কাজেই মাঝে মাঝে প্রাণের জ্বালায় এক একটা কথা বলিতে হয়—পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কাজ করা হয় না। বলিয়াছি ত—যিনি বলাইতেছেন, তিনি যেমন করিয়া বলাইবেন, তেমনি করিয়া বলিব। তাই মনের একটা সাধের কথা এইখানে ব্যক্ত করিলাম। ('প্রবাহিণী,' ২৪ মাঘ ১৩২০)

জপ ও কীর্ত্তন

মদন-তত্ত্বের অন্য সকল কথা বলিবার পূর্ব্বে একটা বড় কথার আলোচনা প্রয়োজন হইয়াছে। সেটি জপ—নাম বা মন্ত্র জপ। তন্ত্র বলিতেছেন, "জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ : অত্রৈব নাস্তি সংশয়ঃ"—জপ করিলেই সিদ্ধি—বার বার তিন বার বলিতেছি জপেই সিদ্ধি, ইহাতে অন্য কোন সংশয় নাই। এই জপ-যজ্ঞের ব্যাপারটা আমাদের আধুনিক ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় তেমন ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদের অনেকের মুখেই এই প্রতিবাদ শুনিয়াছি যে, চিনি—চিনি বলিলে কি চিনির মিষ্টাস্বাদ রসনার অগ্রে অনুভূত হয়? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে রাম রাম, হরি হরি বলিলে কি হরির বা রামের অনুভূতি হইতে পারে? যাঁহারা এমন উপমা দেখাইয়া জপের প্রতি উপহাস প্রদর্শন করেন, তাঁহারা জপের মর্ম্মই বুঝিতে পারেন নাই বলিতে হইবে। ভগবান্ অবাঙ্মনসোগোচরম্—তিনি বাক্যমনের অগোচর; তিনি নেতি-নেতি সিদ্ধ; ব্রহ্মনিরঞ্জনকে ভাষার গণ্ডীর মধ্যে আনা যায় না অথচ তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। মানুষ, মানুষী প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি লইয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে। কাজেই মানুষ ব্রহ্মনিরঞ্জনকে কতকটা মানুষের আকারে পরিণত করিয়া তবে তাঁহার উপাসনা করে। অজ্ঞেয় অনন্ত ব্রহ্মকে উপাসনার বিষয়ীভূত করিতে হইলে, তাঁহাকে কতকটা মনুষ্যের ভাবের তথা দেহের আকারে আকারিত করিতেই হয়। ইহাকেই ইংরেজী দার্শনিক ভাষায় Process of Anthropomorphism কহে। তাঁহাকে উপাসনার বিষয়ীভূত করিতে হয় বলিয়াই উপনিষৎ বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ"—তিনি রসময়; অর্থাৎ সাধকের ভাব-রসের

দ্বারা, emotions-এর প্রলেপের দ্বারা তিনি আকারিত হন। এই হেতু তাঁহাকে বাঞ্ছাকল্পতরু বলে; সাধকের যখন যে বাঞ্ছা হয়, তিনি সেই বাঞ্ছাই পূর্ণ করেন। অর্থাৎ ভক্ত সাধক তাঁহাকে যে ভাবে দেখিতে, যে রূপে সাজাইতে চাহেন, রসময়-আনন্দময় পুরুষ তিনি, ভক্তের মনোমত রূপে ও ভাবে ভক্তের হৃদয়ে প্রকট হইয়া থাকেন।

তন্ত্র আবার উপনিষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই কথাটা আরও একটু ঘুরাইয়া সোজা করিয়া বলিয়াছেন। তন্ত্র দেবীসূক্তকে মাথায় করিয়া বলেন, যে,

"সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বমন্ত্রময়ীং পরাম্।
আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবীং পরমানন্দরূপিণীম্॥"

নিজের আত্মাকেই সর্ব্বদেবময়ী এবং সর্ব্বমন্ত্রময়ী বলিয়া চিন্তা করিবে। আত্মাই তোমার ইষ্ট, আত্মাই তোমার উপাস্য। নিরাকার, সর্ব্বাধার, অজ্ঞেয় ব্রহ্মকে ত ধরিতে পারি না, বুঝিতেও পারি না। তবে শুনিয়াছি যে, সেই অনন্ত ভূমাপুরুষের অংশস্বরূপ আমার আত্মা। অনন্তের অংশও অনন্ত; আমার দেহঘটের আত্মাও অনন্ত। এই দেহী আত্মার কতকটা পরিচয় পাই, যেন কতকটা তাঁহাকে ধরিতে পারি। অতএব বিশ্বপরিব্যাপ্ত ভূমাপুরুষের ভাবনা না ভাবিয়া, তুমি তোমার আত্ম-চিন্তা করিবার চেষ্টা কর। ব্রহ্মনিরঞ্জন যেমন রসময়, তোমার আত্মাও তেমনি রসময় এবং রসস্বরূপ। তাই তন্ত্র আবার বলিতেছেন,

"দেব্যাত্মকং সমাত্মানং ভাবয়েদ্‌যতমানসঃ।
তস্যান্যরূপং যদ্‌যত্তৎ স্বকীয়মিতি ভাবয়েৎ॥

স্বীয় আত্মাকে ঐ দেবী হইতে অভিন্ন ভাবিবে। ঐ দেবীর অন্যান্য যে সকল মূর্ত্তি আছে তাহাও আত্মদেবতা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিবে। সর্ব্বদা স্বীয় ইষ্টদেবতা, গুরু এবং আত্মা ইহাদিগের ঐক্য চিন্তা করিবে। ইষ্টদেবতাকে আত্মা হইতে অভিন্ন ভাবে চিন্তা করিলে সাধক তৎস্বরূপতা লাভ করিতে পারে। ইহাই হইল তন্ত্রের উপদেশ।

"আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দ্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥"

আত্মস্থ দেবতাকে ত্যাগ করিয়া যিনি বাহিরের দেবতার (স্বর্গবাসী সৃষ্টিকর্ত্তা স্বতন্ত্র ঈশ্বরের) চিন্তা করেন, তিনি করস্থ কৌস্তুভ পরিহার

করিয়া কাচ-খণ্ডের লোভে ছুটিয়া বেড়ান। যে প্রকার ফেন ও তরঙ্গাদি সমুদ্র হইতেই উত্থিত এবং সমুদ্রেই লীন হয়, তদ্রূপ এই জগৎ আত্মা হইতে উৎপন্ন হয় এবং আত্মাতেই বিলীন হয়। এই সকল সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া তন্ত্র বলিতেছেন যে, তোমাকে আর ইষ্টদেবতার অন্বেষণে বাহিরে যাইতে হইবে না। আত্মাই তোমার ইষ্ট, আত্মাই তোমার সৃষ্টি-কর্ত্তা, পাতা, ধাতা, ধ্যেয় এবং উপাস্য দেবতা।

এমন দেবতার পূজা ও ধ্যান করি কেন? সংসার-দুঃখ উপশান্তির হেতুই উপাসনা। মনুষ্য-দেহটাকে আত্মজ্ঞানে কেবল দেহেরই সেবা করিলে সে দেহের নাশ আছে, রোগ আছে; তজ্জন্য দুঃখও আছে। অতএব বুঝা গেল যে, দেহের সেবায় সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতে দুঃখ দূর হয় না। বরং বলিব যে, দেহই যত দুঃখের আধার। কাজেই যাহার দেহ, যে এই দেহকে সজীব রাখিয়াছে, তাহাকে ধরিতে পারিলে কাজের মত একটা কাজ হয়। অম্ভৃণকন্যা বাক্ দেবীসূক্তে এই দেহগত আত্মার—আমার—যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার সাহায্যে "আমি"র তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। দেবীসূক্তের আত্মা প্রায় বিশ্বব্যাপী আত্মার অনুরূপ; সুতরাং এমন আত্মার উপাসনা সম্ভবপর নহে। তবে দেবীসূক্ত পাঠ করিলে মনে হয় যেন, শ্রুতি এই আত্মার উপর রসের আরোপ করিয়া উহাকে উপাস্য করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। অতএব আমার রসের দ্বারা আমার "আমি"কে সাজাইয়া ধ্যানগম্য করিতে হয়। যে সাধকের যেমন রুচি, যেমন প্রকৃতি, তাহার ইষ্টদেবতাও তদনুসারে স্ত্রী বা পুরুষ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। তাই দীক্ষাকালে গুরু শিষ্যের জন্মকোষ্ঠী দেখিয়া, বংশানুক্রমের ধারা বুঝিয়া, তাহার ইষ্ট-দেবতার রূপ ও মন্ত্র নির্ণয় করিয়া দেন। এই নির্ণয় অনুসারে ধ্যান ও জপ করিতে হয়। কিন্তু ধ্যানে ও জপে অনেক-বাধা, বহু বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ধ্যানে বসিলেই রাজ্যের আলাই-বালাই চিন্তা আসিয়া মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। ধ্যানের সময় মন যেন জোর করিয়া বাহিরে ছুটিয়া যায়। এই মনকে ধরিয়া একাগ্র বা একনিষ্ঠ করিতে হয়। ইহাই সাধনা—ইহাই আরাধনা। জপ এই সাধনার সহায়ক। তন্ত্র বলেন, মন্ত্র তাহাই যাহা মনন হইতে মনকে ত্রাণ করে। শিবের ধ্যান করিতে বসিয়াছি। আর ঠিক সেই সময়ে মনটা ছুটিয়া চাঁদনীর বাজারে গিয়া জুতা দর করিতেছে,

অথবা মকদ্দমার ভাবনা ভাবিতেছে। এই উদ্দাম মনকে যাহার দ্বারা সংযত করা যায় তাহাই মন্ত্র। মন্ত্র আবার তন্ত্রসাপেক্ষ। বীণা বা সারেঙ্গের তার এক সুরে বাঁধা থাকিলে যেমন টানা ও সুরপূর্ণ হইয়া থাকে, তেমনি হৃদয়ের প্রবৃত্তি ও আসক্তিগুলি ভাবের বীণায় বা সারেঙ্গে তারের মত টানা—সুর বাঁধা থাকে। এই তন্ত্রের বা তাতের উপর সাধক সাধনায় যে শক্তি প্রয়োগ করিয়া আঘাত করেন, তেমনই মহামন্ত্র ঝঙ্কার দিয়া উঠে। ক্লীং, হ্রীং প্রভৃতি মহামন্ত্র সকল এই ভাবে আবদ্ধ দেহের বীণায় ঝঙ্কৃত হয়। যাহারা উচ্চাঙ্গের ধ্যানী, তাহাদের দেহ-ঘট হইতে ধ্যান প্রভাবে এই সকল মন্ত্র স্বয়মেব ঝঙ্কৃত হয়। ধ্যানের রূপের সহিত বর্ণের ঝঙ্কার নিত্য সংযুত। এই সকল মন্ত্র কল্পনাজাত নহে। মেজরাব আঙুলে দিয়া সেতারের তারে আঘাত করিলে যেমন একটা শব্দ হয়, তেমনই সাধনার অভীষ্ট স্থির করিয়া কুলকুণ্ডলিনীর সাহায্যে দেহ-বীণায় ঝঙ্কার দিলে স্বয়মেব এই সকল মন্ত্রের ঝঙ্কার হয়। তাই ইহাদিগকে তন্ত্রের মন্ত্র বলে। ধ্যান হইতে মন্ত্রের উদ্ভব, আবার মন্ত্র হইতে ধ্যানগম্য রূপেরও উদ্ভব হয়। ইহা কেবল যুক্তির কথা নহে; কর্ম্মী করিয়া দেখিলে এই ফলই পাইয়া থাকেন। নিম্ন অধিকারীর জন্য গুরু তাই মন্ত্র ঠিক করিয়া দেন, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রগত ধ্যানের রূপও বলিয়া দেন—রূপ ও নাম যখন সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়া উঠে—ধ্যান ঠিক হইলে যখন মন্ত্র আপন-আপনি ঝঙ্কার দেয়; মন্ত্র ঠিক মত উচ্চারিত হইলে, যখন মৃগমরীচিকার আলেখ্যের মতন রূপ আপনি ফুটিয়া হৃদয় জুড়িয়া বসে তখনই সাধকের সাধনা সফলা হয়। বর্ণাত্মিকা মহামায়ার বর্ণ ও শব্দ তত্ত্বের আলোচনা যখন করিব, তখন এ তত্ত্বটা আরও একটু ফুটাইয়া বলিবার চেষ্টা করিব। আপাততঃ এই সিদ্ধান্তটা গ্রাহ্য করিয়া লইতে হইবে। অথবা গুরু-বল থাকিলে সাধক করিয়া-কর্ম্মিয়া উহার যথার্থতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন।

একাগ্র হইবার জন্য মন্ত্রজপ। সে জপের আবার নানা পদ্ধতি আছে। প্রথম অনুলোম-প্রতিলোম পদ্ধতি, দ্বিতীয় আলম্বন, তৃতীয় মানস, চতুর্থ অজপা সিদ্ধি। স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের যত অক্ষর আছে সে সকলগুলিতে একটি অনুস্বর লাগাইয়া বীজমন্ত্রের পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়া তবে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। যথা অং ক্লীং, আং ক্লীং

ইত্যাদি ভাবে ক্ষং ক্লীং পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে হইবে। তাহার পর উল্টাভাবে ক্ষং ক্লীং, হং ক্লীং এইরূপে উচ্চারণ করিতে করিতে অং ক্লীং বলিয়া শেষ করিতে হইবে। ইহাকে বলে অনুলোম-প্রতিলোম জপ। মনঃসংযোগ ঠিক না থাকিলে এ ভাবের জপ সহজে করা যায় না। দ্বিতীয় আলম্বনের জপ। এ পদ্ধতি নামজপেই প্রশস্ত। একটা পাখী পুষিয়া সকাল সন্ধ্যা—অবসর মত তাহাকে নাম পড়াইতে হয়। এই ভাবে নাম পড়াইতে পড়াইতে ভাবের উদ্ভব হয়, রসের সঞ্চার হয়, জীবন সার্থক হয়। তাই একটা হিন্দী গানে আছে,—

"শুগা পড়ায় কে গণিকা তারেও,
তারেও সুজন কসাই।"

অর্থাৎ এক বেশ্যা এই ভাবে শুককে রাধাকৃষ্ণ নাম পড়াইতে পড়াইতে ভাবমুগ্ধা হইয়া ভক্তিমতী হইয়াছিল—সুজন কসাইও ঐ পদ্ধতি অনুসারে ভগবান্‌কে পাইয়াছিল। মনকে শুক পক্ষীর সহিত তুলনা করা হয়। তাই রামপ্রসাদ গাহিয়া গিয়াছেন,—

"কার কথায় ভুলেছ মন, ওরে আমার শুয়া পাখী,
(ওরে) আমারই অন্তরে থেকে আমাকে দিতেছ ফাঁকি!
কালী শিব দুর্গা নাম, জপ কর অবিরাম, (মন রে)—
(তোমার) জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বল রে শাখী।"

গীতাতেই বলিয়াছেন যে মনুষ্যদেহ বৃক্ষের ন্যায়, কেবল উর্দ্ধমূল এবং অধঃশাখ। এই বৃক্ষের শাখী—শুক মন। মনকে অনবরত ইষ্টদেবতার নাম পড়াইতে পারিলে, উহা আর ডাল ছাড়িয়া যাইবে না, কেবলই নাম-জপ করিতে থাকিবে।

আর একটা কথা বলিব। ব্রহ্মনিরঞ্জনের নাম ছাড়া তোমার জ্ঞাত আর কিছু আছে কি? তুমি তাঁহার বিষয়ে আর ত কিছু জান না, জানিতে পারও না। তুমি কেবল জান যে, তিনি আছেন, এবং তাঁহার নাম আছে। তাঁহার concept তুমি ঠাওরাইতে পার; প্রকৃতির আস্তরণ ছাড়া তাঁহার percept রূপ ধরিতে পার না। কাজেই বলিতে হয়, নাম ছাড়া ঈশ্বরকে ধরিবার অন্য উপায় নাই। নামই যখন একমাত্র অবলম্বন, তখন নামজপ ছাড়া তাঁহাকে ঘনিষ্ঠ করিবার অন্য কোন উপায় আছে কি? নাই বলিয়াই জপকে প্রশস্ত উপাসনা-পদ্ধতি বলা হইয়াছে। ইহা

ছাড়া, ঈশ্বরকে যখন আসক্তি বা রসের (emotions) সাহায্যে ডাকিতে হয়, তখন সেই আসক্তি বা রসব্যঞ্জক নাম ছাড়া অন্য উপায়ে তাঁহাকে ত ডাকিতে পারি না। জননী যেমন স্নেহাধিক্যবশতঃ পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকিয়া থাকেন, জনক যেমন বিদেশগত পুত্রকে স্মরণ করিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকেন, সাধকও তেমনি রসের আবেগে রসময়ের নাম ধরিয়া জপ করিয়া থাকে। নাম করিতে করিতে রসের বিকাশ ঘটে, ভাবে হৃদয়-মন উছলিয়া উঠে। চিনি-চিনি করিলে চিনির স্বাদ পাওয়া যায় কি না, জানি না; কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণভাবে হৃদয় ভরিয়া যায়। কৃষ্ণের মধুর রসের প্লাবনে রসনা রসসিক্ত হইয়া যায়; দেহভাণ্ডে সে. রস যেন ধরিয়া রাখা যায় না।

"সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥"

ইহাই রসের সঞ্চার। জপিতে জপিতে তাঁহাকে পাইবার সাধ হয়; মনে হয়, যাহার নাম করিলে এত সুখ, যাহার কথা কীর্ত্তন করিলে এত আনন্দ, তাহাকে দেখিতে পাইলে,—তাহাকে কাছে পাইলে না জানি কি পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। জপ-যজ্ঞের আশাই ইন্ধন, আসক্তি ও অনুতাপ— হবিঃ—নাম, মহামন্ত্র; হেলায়-শ্রদ্ধায় নাম করিতে করিতে হেলা যায়, শ্রদ্ধা প্রগাঢ় হয়; রসে ও ভাবে মন ভরিয়া উঠে। জপ দুই প্রকারের, এক নামজপ, দ্বিতীয় মন্ত্রজপ। রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা প্রভৃতি নামজপ; আর গায়ত্রী, সাবিত্রী, এবং তন্ত্রের বীজসকলকে মন্ত্র কহে, উহাদের জপ মন্ত্রজপ। নামজপ প্রকাশ্যে—সমাজে, প্লুতস্বরে করা চলে—করিতেও হয়। মন্ত্রজপ গোপনে—একান্তে করিতে হয়। মন্ত্রজপে মানস জপই শ্রেষ্ঠ। জিহ্বা, অধর, ওষ্ঠ কিছু না নাড়িয়া, শব্দমাত্র না করিয়া যে মন্ত্র-জপ, তাহাই মানস জপ। এ জপ বড়ই কঠিন, কতক ক্ষণ করিতে করিতে অন্যমনস্ক মন ছুটিয়া কোথায় পলাইয়া যায়। জপও যোগের তুল্য;

রীতিমত জপ করিতে জানিলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ ঘটে, যোগের যাহা ঈপ্সিত তাহাই লাভ হয়। বাঙ্গালায় মন্ত্রজপ বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে; যত দিন এ দেশে তন্ত্রের প্রভাব বিদ্যমান আছে, তত দিন জপ ও মানস পূজা চলিত আছে। তবে নামকীর্ত্তন ও নামজপ শ্রীগৌরাঙ্গের সময় হইতে এ দেশে সাধারণ ভাবে চলিত হইয়াছে।

"নিজ নামামৃতে পহু মত্ত অনুক্ষণ।
পিয়ার সবারে নাম, বিশেষে হীনজন॥"

"গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মেলি দেই করতালি
হরিবোল হরিবোল বলিয়া॥"

জপের ও কীর্ত্তনের ইহাই বহিরঙ্গের কথা। ইহার ভিতরের মাধুরী বুঝিতে হইলে উহাতে ডুবিতে হয়; জপে মগ্ন হইতে হয়, কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইতে হয়। ভিতরের মাধুরী ভাষায় বুঝান যায় না, বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা দেখান যায় না। নিজে না মজিলে, অপরে কথার ছটায় মজাইতে পারে না। ইহার যতটুকু বাহ্য বিচার তন্ত্রে ও শাস্ত্রে আছে, তাহারই সংক্ষিপ্ত-সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম: বোধ হয়, ইহাতেই অনেকের সংশয় দূর হইবে। ('প্রবাহিণী,' ১ ফাল্গুন ১৩২০)

শিব ও শক্তি

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥"

"সেই সূক্ষ্ম আত্মা ধূমশূন্য জ্যোতিসদৃশ নিত্য প্রকাশমান। তিনি ভূত ভবিষ্যতের অধিপতি; তিনি অদ্যও আছেন, আগামী কল্যও থাকিবেন, অর্থাৎ তিনি নিত্য।" মনে হয়, এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র শব্দটা হইতেই শিবলিঙ্গের অনুকল্পনা। হস্তের পঞ্চাঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুষ্ঠা যেন হস্তের অঙ্গীভূত হইয়াও একটু পৃথক্, যেন পরে কে হাতের পার্শ্বে জুড়িয়া দিয়াছে। উহা অঙ্গযুক্ত বটে, কিন্তু অঙ্গীভূত নহে, অথচ উহার সাহায্যে ধারণ কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা হইয়া থাকে। আত্মাও তেমনি জীবদেহের অঙ্গযুক্ত হইলেও

অঙ্গীভূত নহে ; একটু পৃথক্, একটু স্বতন্ত্র ; অথচ আত্মা আছে বলিয়াই দেহের ধৃতিশক্তি আছে। এই তুলনা হইতেই আত্মাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হয়। তন্ত্র বলেন, অঙ্গুষ্ঠ শব্দের অর্থ অঙ্গযুক্ত, যেন দুগ্ধে নবনীতবৎ বিদ্যমান আছেন, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্তবৎ রহিয়াছেন,—দেহকে না ছানিলে, না মন্থন করিলে তাঁহার খোঁজখবর পাওয়া যায় না। এই আত্মতত্ত্বকে লৌকিকী বুদ্ধির গোচর করিবার জন্য বলা হইয়াছে যে, তিনি অঙ্গুষ্ঠার আকারে আকারিত ;—ঠিক বুড়া আঙ্গুলের মতন। ইহার উপর কথা আছে যে, এই ঈশানকে 'লিঙ্গিত' না করিলে, চিহ্নিত করিয়া না দিলে, উঁহার প্রতীক নির্দ্ধারণ না করিলে, উনি উপাস্য হইতেই পারেন না। এই "লিঙ্গ". শব্দ এবং "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ" এই খণ্ডবাক্য হইতে যত গোল ঘটিয়াছে।

মহাপুরুষ গোরক্ষনাথ শিবমূর্ত্তির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আগে তাহাই বলিয়া রাখিব। বাহুল্যভয়ে মূল সংস্কৃত উদ্ধার করিলাম না। শিবমূর্ত্তি, রুদ্রশক্তির সংহার-কার্য্যের মূর্ত্তি ; সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন শক্তির সমাহারে—সামঞ্জস্যে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের সংহরণ ঘটিয়া থাকে, তাই ত্রিশূল শিবের প্রতীক। উপরে বা গোড়ায় ত্রিশূলের তিনটা ফলক স্বতন্ত্র আছে, পরন্তু দণ্ডে তিনের সমন্বয় বা সমাবেশ সাধন হইয়াছে। বৈচিত্র্যের সঙ্কোচেই সংহরণ ; সৃষ্টির বর্ণ-বৈচিত্র্যই প্রথম বিকাশ এবং বর্ণ-সামঞ্জস্যেই প্রথম সঙ্কোচ। শ্বেতবর্ণ সপ্তবর্ণের সমঞ্জসীভূত বিকাশ, তাই শিব রজত-গিরিনিভম্। মদন-বিকাশে এবং হিংসার বিস্তারে সৃষ্টির পুষ্টি ; মদনের সাহায্যে এক হইতে বহুতে পরিণত হয় ; হিংসার সাহায্যে বহু একের বা দশের পুষ্টি করে। বুভুক্ষা, পিপাসা, রিরংসা প্রভৃতি সকল ইচ্ছার মূলে হিংসা আছে। শিব—সংহারমূর্ত্তি, তাই তিনি মদনদহনকারী ; আবার তাই তিনি বাঘাম্বর। সিংহ ও শার্দ্দূলকে শাস্ত্র হিংসার অবতার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। হিংসা হইতেই সিংহ শব্দের ব্যুৎপত্তি। এই হিংসার নাশ করিয়া, তাহার চামড়া লইয়া তিনি বহির্ব্বাস করিয়াছেন। হিংসার শেষটুকু—বিপরিণতিটুকু তাঁহার আবরণ মাত্র,—অঙ্গীভূত নহে। শিব—শ্মশানবাসী ; যেখানে সকল বৈচিত্র্যের পরিণাম সাধিত হয়, যেখানে সৃষ্টির একাকার সাধন হয়, সেইখানেই শিবের বাস। শ্মশান শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে শিবের শ্মশানবাসের ভাবটা আরও স্পষ্ট হয়। শিব—বিভূতিভূষণ। বিভূতি ভস্মও বটে, পদার্থের পরিণামও বটে ; সৃষ্টির

পরিণামের অনুরাগ তাঁহারই, যাঁহার পরিচয় সংহারে। শিব—নাগভূষণ। নাগ শব্দের দুই অর্থ; যাহা যায় না, নিত্যসিদ্ধ, তাহা হইতে যাহার উৎপত্তি তাহাই নাগ। নাগ—শেষ শক্তি। শেষ শব্দের অর্থ যাহা বাকী থাকে; কবিরাজ মহাশয়রা শেষ শব্দ এই অর্থে নিত্যই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সৃষ্টির সংহার হইলে যাহা বাকী থাকে, তাহাই শেষ শক্তি। এই শেষ নাগের বিষ আছে। বিষ অর্থে সার—essence। আয়ুর্ব্বেদ বলেন যে, সকল পদার্থের পরিণামে বিষ আছে—হলাহল আছে। সুধা ও সুরার সংযোগ-বিয়োগে পদার্থের সৃষ্টি; সুধার অপচয় ঘটিলে, সুরার প্রাধান্য হইলে সে পদার্থের নাশ হয়। এই সুরা বা বিষকে হলাহল কহে—হল এবং আহলের দ্বারা যাহা উৎপন্ন তাহাই হলাহল—অর্থাৎ মন্থনজাত। সংহার-মন্থনের পরিণাম হলাহল, তাহাই কণ্ঠে রাখিয়া শিব নীলকণ্ঠ, সুতরাং মৃত্যুঞ্জয়। যিনি মৃত্যু, তাঁহাকেই ত কণ্ঠে রাখিয়াছেন, তাই শিব মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। বিষ খাইলে নরদেহ নীলবর্ণ ধারণ করে; শিবের নরাকার, তাই আশীবিষের বিষে কণ্ঠ নীল হইয়াছে। শিব সিদ্ধি ও তুরীয়ানন্দ গাঁজা খাইয়া নেশায় বিভোর হইয়া থাকেন। তিনি যখন রুদ্রমূর্ত্তি সংহারের অবতার-প্রতিমা, তখন তিনি অতীতের নেশায় মগ্ন, তিনি বর্ত্তমান বুঝেন না, বিদ্যমানের অনুভূতি তাঁহার নাই। যে মাদক দ্রব্যে বর্ত্তমানের অনুভূতি-শূন্যতা ঘটায়, শিবের ঘাড়ে সেই সব নেশার বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শিব—ভূতনাথ; বটেই ত! যাহা অতীত, যাহা ছিল, তাহাদেরই পরিণামের তিনি অধীশ্বর। প্রেত অর্থেও যাহা চলিয়া গিয়াছে, যাহা ছিল এখন নাই। প্রমথ শব্দের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে মথিত হইয়াছে যাহা তাহাই প্রমথ—যাহা মৃত্যুর দ্বারা মথিত, যাহা পঞ্চীকৃত তাহাই প্রমথ। এই সকলের ঈশ্বর বা নাথ—স্বয়ং শিব। ফলে, লৌকিক হিসাবে শিব আর এক রকমের ভূত প্রেতের মালিক হইয়া উঠিয়াছেন! শিব বৃষারূঢ়; বৃষ পুরুষকারের মূর্ত্তিস্বরূপ। সংহারে পুরুষকার নষ্ট হয় না, কেবল পুরুষের অধীন থাকে। কাম ও কামনা না থাকিলে সৃষ্টি হয় না, বৃষত্বেরও প্রয়োজনাভাব ঘটে। তাই রুদ্রের বাহন বৃষ—শক্তিশূন্য, সুতরাং স্থবির। তবে রুদ্রের থাকে কি? থাকে কেবল শব্দব্রহ্ম—ডমরুধ্বনি, আর থাকে সংহারের নিনাদ—শৃঙ্গধ্বনি। তখন নামই থাকে—রূপ যায়; তখন

ধ্বনিই থাকে, বিকাশ যায় ;—তখন শিব একা বসিয়া, তানপুরা হাতে করিয়া আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া, আপনার গানে আপনি মুগ্ধ থাকেন। তখন পার্শ্বে মা নাই—উমা নাই, গৌরী নাই—শক্তি নাই ; তখন তিনি অচল ও সনাতন, তখন তিনি ভবম্ভব্যভূতেশ,—তখন তিনি মীঢ়—কেবল শব্দময়, কেবল ধ্বনিময়—অনাহতের ঝঙ্কারে কেবল ওঁ-কারময়।

ভাবুকের উপমা উপমেয় সকলকে আকারিত করিয়া শিবের মূর্ত্তি এই ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। অথচ মজা এই, শিবের প্রতিমার পূজা কোথায়ও হয় না, শিবের পূজা লিঙ্গে বা চিহ্নে ; সে চিহ্ন প্রতীক মাত্র। আর তন্ত্র ষট্‌চক্র বর্ণনায় বার বার বলিয়াছেন যে, শূন্যরূপং শিবং—শব্দব্রহ্মময়ঃ শিবঃ—স্বয়ম্ভুলিঙ্গং সদাশিবম্—ইহা হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, তন্ত্র শিবকে কেবল existence, কেবল সত্ত্ব, অহমস্মি ইতি জ্ঞানের দ্যোতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন বংশদণ্ডের চারি দিকে লতা জড়াইয়া উঠিয়া পুষ্পাভরণে ভূষিতা হয় ও শোভার বিকাশ করে, তেমনি ওঁ সোঽহম্ এই জ্ঞানের—এই সত্ত্বার চারি পার্শ্বে—হ্লাদিনী কুণ্ডলিনী শক্তি জড়াইয়া উঠিয়া সৃষ্টির বিকাশ ঘটাইয়া থাকেন। দেহের মধ্যে ছয়টা চক্রে এই সোঽহম্ জ্ঞান শিবরূপে ছয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত ; এই বোধটা ষট্‌লিঙ্গে লিঙ্গিত। এই শিববোধের চারি দিকে কুণ্ডলিনী শক্তি ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়া থাকেন। ইচ্ছামত এই শক্তিকে ঘুরাইতে-ফিরাইতে পারিলেই ষট্‌চক্রভেদ করা হয়। গোল বাধিয়াছে এই ষট্‌চক্রভেদের তন্ত্রোক্ত বর্ণনা লইয়া। একটু নমুনা দিব,—

"মাতৃকামালয়া জপ্ত্বা আজ্ঞাচক্রং সমানয়েৎ।
তত্রেতঃ শিবলিঙ্গেন যোজয়েৎ কুণ্ডলীং পরাম্॥
ধ্যাত্বা ব্রহ্মময়ীং তত্র শতমষ্টোত্তরং জপেৎ।
ততো বিশুদ্ধৌ তাং নীত্বা শিবেন সহ যোজয়েৎ॥
তামিষ্টদেবতাং ধ্যাত্বা জপেদষ্টশতং প্রিয়ে।
হৃৎপদ্মে তাং ততো নীত্বা বাণেন সহ যোজয়েৎ॥
দেবীরূপাঞ্চ তাং নীত্বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্।
মণিপুরে তু তাং নীত্বা শিবেন সহ যোজয়েৎ॥"

ইহার উপর বর্ণনা চড়াইয়া শক্তিতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং স্বয়ম্ভুলিঙ্গসংস্থিতাম্।
শ্যামাং সূক্ষ্মাং সৃষ্টিরূপাং সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মিকাম॥

*　*　*

দেবীং রূপবতীং কামসমুল্লাসবিহারিণীম্।
মুখারবিন্দগন্ধেন মোদিতং পরমং শিবম্॥
প্রবোধ্য পরমেশানি তত্রোপরি বসেৎ প্রিয়ে।
শিবস্য মুখপদ্মং হি চুচুম্বে কুণ্ডলী শিবে॥"

এই প্রকারের সালঙ্কার বর্ণনা হইতেই যত অশ্লীলতার উৎপত্তি। তন্ত্রের পরিভাষা গ্রাহ্য না করিয়া, পারিভাষিক অর্থের প্রয়োগ না করিয়া, সোজা সাদা অর্থ ধরিয়া তন্ত্রের ঘাড়ে বহু অশ্লীলতার আরোপ করা হইয়াছে। শেষে জাতি-চরিত্রের অধঃপতনের মুখে অনেক নষ্ট-দুষ্ট এই কুৎসিত ভাবটা বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। উহার ফলে তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতির অধোগতি ঘটিয়াছে। পুরাতন তন্ত্র শ্রুতি উক্তির পদে পদে সমর্থন এবং সম্প্রসারণ করিয়াছেন, কোনখানেই শ্রুতির বিরোধী নহে। বৌদ্ধ প্রভাবের ফলেই, বজ্রযানী এবং কালচক্রযানীদিগের উপদ্রবেই আধুনিক তন্ত্রে এত আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছে। বেদ হইতে তন্ত্রের বিশিষ্টতা এই যে, তন্ত্র সর্ব্ব বর্ণের ও সর্ব্ব জাতির সেব্য। তন্ত্র পৃথিবীর সকল প্রকারের মানব জাতিকে নিজের গণ্ডীর মধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন। দ্বিতীয় বিশিষ্টতা—উহার মন্ত্রভাগ—"মননাত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"—এ মন্ত্রে সকল জাতিরই সমান দাবী আছে, অধিকারীভেদে মন্ত্রভেদ ঘটে মাত্র। জানি না, এই তন্ত্র-উপাসনা-পদ্ধতির সহিত Phallic Worship-এর কোন সমন্বয় ঘটিয়াছিল কি না, অথবা ঐ উপাসনা অধুনা তন্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়াছে কি না। পুরাতন বাবিলন, চাল্‌দিয়া, রোম ও গ্রীসে যে লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত ছিল, উহার সহিত এতদ্দেশ-প্রচলিত শিবলিঙ্গপূজার কোন সাদৃশ্য নাই। তবে ষট্‌চক্র-ভেদের বর্ণনা করিতে যাইয়া, তন্ত্রের কোন কোন গ্রন্থ একটু আদিরসের ছিটা ফোঁটা ছড়াইয়া যে বিষম গোল ঘটাইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে আমি বাধ্য।

শক্তির বিবরণে তন্ত্র বলিতেছেন যে, তিনি "সঞ্চারিণী"—সর্ব্ব-ব্যাপিনী। যথা,—

"ভুজঙ্গরূপিণীং দেবীং নিত্যাং কুণ্ডলিনীং পরাম্।
বিষতন্তুময়ীং দেবীং সাক্ষাদমৃতরূপিণীম্॥
অব্যক্তরূপিণীং দিব্যাং ধ্যানগম্যাং বরাননে।
ধ্যাত্বা জপ্ত্বা চ দেবেশি সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥"

তিনি ভুজঙ্গরূপিণী—পদ্মনালের সূক্ষ্ম সূত্রের মতন, জীবদেহ-পরিব্যাপ্ত, সৃষ্টির সর্ব্বত্র বিসর্পিত। Existence—cogito, ergo sum—সোঽহম্ এই জ্ঞানের—এই শৈব অনুভূতির আবেষ্টন করিয়া যে শক্তি সৃষ্টির বিকাশ ঘটাইতেছেন, তিনিই শিবা, তিনিই জগজ্জননী—জগন্ময়ী। তাই তিনি কুণ্ডলিনী—শিববলয়িতা আদ্যাশক্তি। ইনি মদনমথন-মনোহারিণী;—নহিলে সৃষ্টি যে "যতো ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"র হিসাবে সমুদ্ভূত হয় না! জগজ্জননী বলিয়া ইনি মাতৃত্বের প্রতিমা। তন্ত্র ভক্তিরসের গ্রন্থ, মধুর রসের দিক্ দিয়া যান নাই। তন্ত্র হ্লাদিনীকে মা বলিয়াছেন; মদনকে অনঙ্গ করিয়া বাবা-মায়ের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কেবল সৃষ্টির বিসর্পণ হেতু মাতৃত্ব এবং পিতৃত্বের বিকাশ; এখানে প্রেম নাই, প্রেমরসের আন্দোলন নাই। আছে কেবল—জনক, জননী, জনন ও মরণ। এই হেতু তন্ত্র কেবল মাতৃভাবাসক্তি ও পিতৃভাবাসক্তির উন্মেষ ঘটাইবার সাধনা-পদ্ধতির বর্ণনা করিয়াছেন। তাই মনে হয়, তন্ত্র অশ্লীলতার আকর আদৌ ছিল না। যে তন্ত্র বলিয়াছেন যে, স্বীয় পত্নীর ক্রোড়ে স্তন্যপ শিশু দেখিলে, পত্নীকেও জগজ্জননীর অংশরূপিণী বলিয়া পূজা করিবে—জায়া—মায়া—মাতা বলিয়া স্বীকার করিবে, সে তন্ত্র ইয়ারকির পোষক হইতেই পারে না। কেবল আমাদের ভাগ্যগুণে বা দোষে উহাতে এত আবর্জ্জনা আসিয়া জুটিয়াছে। সে আবর্জ্জনাও পরিভাষার সাহায্যে নির্ম্মল হইতে পারে।

শিব ও শক্তির আলোচনা করিতে যাইয়া তন্ত্র বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক জীবদেহ দুই আধখানায় নিত্যবিভক্ত। একার্দ্ধ স্ত্রীত্ব বা মাতৃত্ব প্রভাব-সম্পন্ন, অপরার্দ্ধ পুংস্ত্ব বা পিতৃত্ব প্রভাবযুত। এই দুইয়ের সমবায়ে একটা জীবদেহ। পুরুষের বামে স্ত্রীত্ব, দক্ষিণে পুংস্ত্ব; নারীর বামে পুংস্ত্ব ও দক্ষিণে স্ত্রীত্ব বিরাজিত। পুরুষের স্ত্রীত্ব এবং নারীর পুংস্ত্ব সম্মূঢ়। উভয়

শক্তি যে ক্ষেত্রে সমগ্রলীকৃত সেখানে অর্দ্ধনারীশ্বরের বিকাশ ;—সে ক্ষেত্রে হরগৌরী মিলিতাঙ্গ। এই স্ত্রীত্ব পুংস্ত্বের ব্যাখ্যা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যায়। গুরুদেব শ্রীযুত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় উহার আংশিক ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করিয়াছেন। তন্ত্র এই স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্বকে কাম ও সোম বলিয়া কোন কোন স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। এই কাম ও সোমের মিলনে সৃষ্টির উৎপত্তি। সোমের ষোলটি কলা। সোমের ষোড়শ কলার নাম পূষা, বশা, সুমনা, রতি, প্রীতি, ধৃতি, শুদ্ধি, সৌম্যা, মরীচি, অঙ্গিরা, বশিনী, ছায়া, তুষ্টি, অমৃতা, সম্পূর্ণমণ্ডলা এবং অংশুমালিনী। কামের ষোড়শ কলা—শ্রদ্ধা, প্রীতি, রতি, ভূতি, কান্তি, মনোভবা, মনোহরা, মনোরমা, মদনোৎপাদিনী, মোহিনী, দীপনী, শোষণী, বশঙ্করী, রজনী, ষোড়শী ও প্রিয়দর্শনা। তন্ত্র বলেন, কাম ও সোমের এই বত্রিশটি কলার নানাবিধ সংযোগ-বিয়োগে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের উদ্ভব। সোমই আত্মশক্তির আধার, কাম সে শক্তির উন্মেষসাধক। এই হেতু আত্মময় শিবকে সোমনাথ বলা হয় ; আর কুণ্ডলিনীকে কামকলানিধি কমলিনী বলা হয়। এই শিবের উদ্বোধন ঘটান হইয়াছে বসন্তের কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীতে ! কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়ের মধ্যে শিবচতুর্দ্দশীর যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাই প্রথমে বলিয়া রাখি। শৈবেরা মনুষ্যদেহকে বিল্ববৃক্ষের সহিত তুলিত করে। মেরুদণ্ডটা বিল্বের স্তম্ভ, পঞ্জর অস্থি সকল শাখা প্রশাখা, অস্থিগাত্রের স্নায়ুবন্ধনীসকল ত্রিপত্র। এই বিল্ববৃক্ষের মূলে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ মহাদেব লুকান আছেন। যথা :—

"স্বয়ম্ভুলিঙ্গং তন্মধ্যে সরন্ধ্রং পশ্চিমাননম্।"

মনোমন্ত্রী হিংসা প্রবৃত্তি ব্যাধরূপে, আত্মতুষ্টির জন্য শিকার করিয়া নানা জীবের মাংস সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। এ দিকে বসন্তের কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী, বাহ্য প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা, অন্তঃপ্রকৃতিও উন্মেষপরায়ণা। তাই ঝড় উঠিল, বন্ধশক্তি কর্ম্মাবর্ত্তে ছুটিতে লাগিল। ব্যাধ বা হিংসা ভয় পাইয়া বিল্বকাণ্ডে উঠিয়া বসিল—শান্তির আশায়, হৃদয়ের সোম-স্থানে, সৌম্যা ও শুদ্ধির শাখার সঙ্গমস্থলে যাইয়া বসিল। এ দিকে প্রাকৃত ক্রিয়াবশে, সোমের প্রভাবে হিংসার সঞ্চয়স্থান হইতে এক বিন্দু সোমরস নীচে পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির ত্রিপত্রও খসিয়া পড়িল। আশুতোষ

স্বয়ম্ভূ অমনি স্থাণুত্ব পরিহার করিয়া স্বয়ম্প্রকাশ হইলেন; তাহা দেখিয়া ব্যাঘ্ররূপী হিংসাও শিবত্ব লাভ করিল। প্রথম বসন্তে—সৃষ্টির প্রথম বিকাশকালে হিংসা প্রবল হইলে ত চলিবে না। তাই হিংসা শিবদর্শন করিয়া পোষমানা সিংহ হইয়া জগজ্জননীর বাহনরূপে বিরাজ করে। তাই মা সিংহবাহিনী। পক্ষান্তরে হিংসাশূন্য হইয়া, বুভুক্ষা পিপাসা প্রভৃতির নিবৃত্তি বা সংযম ঘটাইয়া শিবের আরাধনা করিতে হয়; তাই শিবচতুর্দ্দশীর দিন নিরম্বু উপবাস, ক্ষুধাতৃষ্ণা জয় করিয়া সোমনাথের পূজা করিতে হয়। যাহারা এ পুরুষকারটুকু দেখাইতে পারেন না, তাঁহাদিগকে ব্যাধের মতে চলিতে হয়, শিবের মাথায় জল-বিল্বপত্র দিয়া পরে আহার করিতে হয়। শিবকে আশুতোষ বলে কেন? তন্ত্র বলেন যে, সংহারের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির দ্যোতনা হয়। যাই সংহারকার্য্য শেষ হইল, অমনি সৃষ্টির সূচনা হইবে। শিবত্বে চারি পাঁচ রকমের দেবত্ব বিজড়িত রহিয়াছে। প্রথম তটস্থ সদাশিব ইনি শবাকার—স্থবির, নিত্য স্থাণু; মড়ার মতন কারণ-সমুদ্রে ভাসিতেছেন। ইঁহার তুষ্টিও নাই, তৃপ্তিও নাই, উপাসনা নাই ও উপাস্য নাই। দ্বিতীয় রুদ্রমূর্ত্তি সংহারকারী—ভীম-ভৈরব, ভূতভাবন, প্রেতনাথ, পরমেশ। তুষ্টি এমন ভৈরবের মধ্যে থাকিতে পারে না। তৃতীয় দেহের ষট্‌চক্রবিলাসী ছয় জন বাণলিঙ্গ মহাদেব। ইনি পিতৃত্বের মূর্ত্তিস্বরূপ, ইনিই আশুতোষ; এক কথায়, একটা কাজের মত কাজ করিতে পারিলে ইনি তুষ্ট হন। কেন না ইঁহার তুষ্টি না হইলে—

"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি,
স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ॥"

বহু হ'য়ে জনমিব—এই ইচ্ছা করিয়া সগুণত্ব ধারণ করিয়া, আত্মতপে তপ্ত হইয়া এই সমস্ত যাহা কিছু স্ব-ইচ্ছায় ইচ্ছাময় তিনি সৃজন করিলেন। কেন?

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।
আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।

শ্রুতির—ব্রহ্মসূত্রের এই আনন্দময়কে, আনন্দঘন শিবরূপে তন্ত্র উপাসনা করিয়া থাকেন। তাই শিব আশুতোষ। আশু তুষ্টি না হইলে, আশু

সৃষ্টি হয় কি ? পুংস্তের বা পিতৃত্বের পরিচায়ক যে শিব, সে শিব শ্রুতির আনন্দময় ব্রহ্মতুল্য। তন্ত্র এই সামঞ্জস্যটুকু বজায় রাখিয়াছেন। শিবচতুর্দ্দশী এই আনন্দী ভাবের বিকাশ-ক্ষণ। আর যে দেবতার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

যেখানে তন্ত্র এই ভীম ভয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে শরীর ভয়ে কণ্টকিত হয়। একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিব। চলিত কথা আছে, "যাহা নাই দেহভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" দেহতত্ত্বের সহিত সৃষ্টিতত্ত্বের সামঞ্জস্য করিয়া তন্ত্র উপাসনা, সাধনা, পূজা, পার্ব্বণ প্রভৃতির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শিবচতুর্দ্দশী দেহতত্ত্বের একটা ঘটনা ধরিয়া পর্ব্বাহে পরিণত হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত সকল পূজা-পার্ব্বণই এই দেহতত্ত্বের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কথাও পরে বলিব।

মদন-তত্ত্বের কথা ত বাবা ও মাকে লইয়া বলা চলে না—রস-বৈপরীত্য ঘটে; পরন্তু মদন-তত্ত্বের বেদীর উপর মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। তাই চতুর্দ্দশীর উপলক্ষে এইটুকু বলিয়া রাখিতে হইল। মনে হয়, এই মদন-তত্ত্বের সহিত মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের সামঞ্জস্য ঘটাইতে চেষ্টা করিয়া তন্ত্র একটু গোলে পড়িয়াছেন; পরে প্রয়োজন হইলে এ বিষয়ের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। মধুর রস এবং স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব এক নহে। কাম ও সোমে সৃষ্টির বিকাশ; রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলায় কেবল রসের বিকাশ, আনন্দের নিধুবন। বিষ্ণু সৃষ্টির পালনকর্ত্তা, দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির ধাতা ও পাতা নহেন—সৃষ্টির বৃন্দারণ্যে কেবল বংশীধারী। মদন-তত্ত্বে ইহাই বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে যে, প্রেম ভক্তি নহে। প্রেমের আনন্দ এবং ভক্তির আনন্দ দুইটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অনুভূতি। প্রেমের আনন্দ নিষ্ফল—রাধা সতী হইলেও জননী নহেন, রাধারাণী মাত্র। ভক্তির আনন্দ—সোম-জাত আনন্দ, সফল—মা আমার জগৎসবিত্রী, জগদ্ধাত্রী। কেহ কেহ স্ত্রীত্ব পুংস্ত্ব এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগল লীলার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাই এইটুকু বলিয়া রাখিলাম যে, শ্রুতি ও তন্ত্র ব্যাখ্যাত মাতৃত্বে ও পিতৃত্বের বেদীর উপর রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রতিষ্ঠিত নহে। উহা স্বতন্ত্র ব্যাপার। ('প্রবাহিণী,' ৮ ফাল্গুন ১৩২০)

মদন-তত্ত্ব

২

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তিনি রসময়—রসো বৈ সঃ। রস কি? রসো বৈ মধ্বিবতি শ্রুতিঃ—রসই মধু। এইবার শ্রুতির মধুতত্ত্বটা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মধুর চারিটা অর্থ প্রচলিত আছে। (১) মেঘের অন্তর্ব্বর্তী সলিল বা রসকে মধু কহে; (২) মদতৃপ্তৌ; যাহা পান করিলে প্রাণীদিগের তৃপ্তি হয়,—শীতল সলিল, সুরা প্রভৃতিকে মধু কহে; (৩) মধু অর্থে সার, যথা পুষ্পাদির মধু, দেহের সার, যথা মেদ ও শুক্র, ইত্যাদি; (৪) মন-জ্ঞান বা প্রজ্ঞাননকেও মধু কহে। যাহার দ্বারা জীবোৎপত্তি হয়, সৃষ্টির বিস্তার ঘটে, তাহাকেও মধু বলে। বসন্তকাল জীবসৃষ্টির কাল, প্রাকৃত সকল পদার্থের সার নিষ্কাশনের কাল: তাই বসন্তকালকে মধুমাস—মধুমাধবের ঋতু বলে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে, মধুব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বভূতের পক্ষে এই পৃথিবী মধু, এই পৃথিবীর পক্ষেও সর্ব্বভূত মধু। এই পৃথিবীর অন্তর্ব্বর্ত্তী যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ আছেন এবং এই শরীর অন্তর্ব্বর্ত্তী যে তেজোময় অমৃতময় অধ্যাত্ম পুরুষ আছেন, তিনি সকল ভূতের পক্ষে মধু এবং সকল ভূতই তাঁহার পক্ষে মধু। তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সকল। এই ভাবে জল, অগ্নি, আদিত্য, দিক্‌সকল, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, আকাশ, ধর্ম্ম, সত্য, মানুষ—সৃষ্ট চরাচরের সকল পদার্থ ও শক্তি, বিকাশ ও গতি সকলের পক্ষে মধু, এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের মধুব্রাহ্মণ মধুতত্ত্বের অতি সুন্দর ও মনোহর ব্যাখ্যা। শেষে যজুর্ব্বেদের আশীর্ব্বাদ:—

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধী॥
ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

"যজমানের জন্য বায়ু মধুময় হইয়া প্রবাহিত হউক, নদীসকল মধুময়ী হইয়া প্রবাহিতা হউক, ওষধিসকল মধুময় হউক, দিবাও মধুময় হউক

ও মাতৃরূপা পৃথিবী মধুময়ী হউন, পিতৃরূপ দ্যুলোক মধুময় হউন, বনস্পতি-সকল মধুময় হউক; সূর্য্য মধুময় হইয়া উদিত হউন—আমাদের গো-সকলও মধুময়ী হউক।" বৃহদারণ্যক বলিতেছেন যে, সৃষ্টির সর্ব্বত্র ও সর্ব্বস্থে এক জন তেজোময় অমৃতময় পুরুষ আছেন; সেই তেজোময়-অমৃতময় পুরুষের অধ্যাত্ম শরীরে আর এক জন তেজোময়-অমৃতময় পুরুষ নিত্য বিদ্যমান—তিনিই মধুময়।

মদ্ ধাতু হইতে যে মধু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সে মধু ও মদন একই। মধু বিকাশে,—মদন আত্মবিতানে। বিকাশ ও আত্মবিতান প্রায় একই; তবে বিকাশ রূপ, আত্মবিতান্ কেবল রূপ নহে। যজুর্ব্বেদের এক স্থানে মধু শব্দের, যে ভাবে প্রয়োগ আছে, তাহাতে মধুকে বাক্যও বলা হইয়াছে। যথা—"যা বাংকশা মধুমত্যশ্বিনাসূনৃতাবতী। তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতম্।" মহীধর উহার অর্থ করেন—"তোমাদের যে মধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণোপনিষৎসংযুতা এবং প্রিয় ও সত্য সংযুক্ত বাক্য তাহা দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন কর। বৈদিক যুগে মধুবিদ্যা বলিয়া একটা স্বতন্ত্র বিদ্যা ছিল। দধীচি মুনি ইন্দ্রের নিকট এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই বিদ্যা দধীচির নিকট গ্রহণ করেন। যাউক সে কথা; যে অর্থে বৃহদারণ্যক উপনিষদে মধুব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছে, সাধনাকাণ্ডেও সেই অর্থ গ্রাহ্য ও প্রচলিত হইয়াছে। সে অর্থে—মধু ও মদন এক।

ঋগ্বেদ বলেন, "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ"—অর্থাৎ জীবের পূর্ব্বকল্পকৃত কর্ম্ম থাকায় ভগবানের মনে সৃষ্টির কামনা হইয়াছিল। সংহার ও সৃষ্টির পরম্পরা অনন্ত; কল্পকল্পান্তরের কর্ম্ম-শৃঙ্খলাও অনন্ত, অতএব ভগবানে কামের বা মদনের বিদ্যমানতা নিত্য। সংহারকার্য্য শেষ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির কামনা জাগিয়া উঠিবে, অমনি "একোহহং বহু স্যাম্। সোহকময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" মহাবাক্য ফুটিয়া উঠিবে। এই কামের স্তুতি আমাদের বিবাহ ব্যাপারেও বলিতে হয়।

"ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ; কামঃ কামায়াদাৎ;
কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবসেৎ;
কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্ণামি: কামৈতত্তে।"

"কে তোমাকে দিল? কাহাকে তিনি সম্প্রদান করিলেন? কামই তোমাকে দিয়াছে; কামের জন্য তোমাকে পাইয়াছি; কামই দাতা, কামই প্রতিগ্রহীতা; কামই সমুদ্রব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কামের জন্য আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। কাম যেন সার্থক হয়।" এই কাম-স্তুতিতে "সমুদ্র" শব্দের অর্থ সৃষ্টি। আনন্দ বা মদন যাহার দ্বারা আনয়ন করে, তাহা নিত্যসংযুক্ত যেখানে তাহাই সমুদ্র—অর্থাৎ সৃষ্টির বিস্তার, বিকাশের নিধি যাহা তাহাই সমুদ্র। যেমন পরমাত্মা এক হইলেও বহুধা বিভক্ত হইতে চাহেন, তেমনি জীবাত্মা বহুতে বিস্তৃত হইতে চাহে। পূর্ণের ধর্ম্ম অংশে থাকে, ভূমা পুরুষের বাসনা ঘটবদ্ধ আত্মাতেও থাকে। এই বহু হইবার কামনা পরিতৃপ্তির জন্য বিবাহ। এই হেতুই বলা হয়, পুত্রের জন্য ভার্য্যা, কেন না, পুত্র জন্মিলে বংশের ধারা রক্ষিত হয়, জলপিণ্ডের ব্যবস্থা হয়।

শ্রুতি এই ভাবে মধুতত্ত্বের বা মদন-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন যে, সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশের পারম্পর্য্য অনন্ত; যে নাশ বা সংহারটা ধর না কেন, তাহার পূর্ব্বে স্থিতি ও সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সে সৃষ্টি এবং স্থিতির সংস্কার পরমাত্মায় নিত্যসংযুক্ত। কাজেই 'একোঽহম্ বহু স্যাম্' বাসনাটা হঠাৎ নহে; উহাও কার্য্য-কারণ-পরম্পরার ফলস্বরূপ। অতএব মদন সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের নিত্যসঙ্গী। আবার আরও একটা মজার কথা শ্রুতি বলিয়া থাকেন—জীবের মনে যাহা আছে, ভগবানের মনেও তাহাই থাকে। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, অংশে যাহা থাকিবে, পূর্ণে তাহা অবশ্যই থাকিবে। জীবের মদন নিত্যসঙ্গী, তাই সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতারও মদন নিত্যসঙ্গী। তন্ত্র বলেন, জীব ও শিব উভয়ই এক; কেবল জীব ঘটাবচ্ছিন্ন, শিব সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বাধার। তাই জীবের মদন দেহাবচ্ছিন্ন, শিবের মদন সৃষ্টি অবচ্ছেদে অবচ্ছিন্ন। জীবের মদন দেহবদ্ধ রিরংসায় পর্য্যবসিত; শিবের মদন সৃষ্টির বিকাশে বিস্তারে—প্রফুল্লতায় পরিস্ফুট। উভয়ের উদ্দেশ্য এক—বহুতে পরিণতি, বৈচিত্র্যের বিস্তার। কিন্তু এই বহুতে পরিণতির মধ্যে আরও একটু মজা আছে। সে মজার কথা বৃহদারণ্যকের মধুব্রাহ্মণে স্পষ্টীকৃত—তাহা মধুর আস্বাদ-আনন্দের উপভোগ ও বিস্তার। এই বহুতে পরিণতির ব্যাপারে আনন্দের আদান-প্রদান হয়; সেই আনন্দের আদান-প্রদানের কথাটা মধু-ব্রাহ্মণে সুন্দর-

রূপে ব্যাখ্যাত। এই আনন্দের আদান-প্রদান বুঝি কিসে? ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন—"কম্পনাৎ"—কম্পন হইতে; প্রাণের কম্পন, সৃষ্টির কম্পন ও প্রাকৃত কম্পন হইতে অনুভূতি হয়, অনুভূতি হইতে জ্ঞান জন্মে। কঠ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, "যদিদং কিঞ্চ সর্ব্বং জগৎ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং"—অর্থাৎ এই জগন্ময় যাহা কিছু আছে, তাহার প্রয়াণেতেই প্রাণ কম্পিত হয়। আদান-প্রদানেই কম্পন, গতিতেই কম্পন, অথবা কম্পন-জন্যই গতি। এই যে এক হইতে বহুতে পরিণতির বাসনা, ইহাও কম্পন-জন্য পরিস্ফুট। শ্রুতি বলিতেছেন, কম্পনেই বিকাশ, বিকাশেই কম্পন। সুতরাং মদন কম্পন-জন্য। মদনের এই কম্পন বা আন্দোলনকেই বৈষ্ণবশাস্ত্রে দোল বলিয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতি—রাধাকৃষ্ণ—প্রকৃতির বৃন্দারকবন্দনীয় বৃন্দারণ্যে দোল খাইতেছেন। বৃক্ষপত্রে, পুষ্পগাত্রে, কিশলয়শয্যায়; সূর্য্যের কনকরেখায়, মলয় সমীরে, শীতল সলিলে, সমুদ্রতরঙ্গে; কোকিলকণ্ঠে, ভ্রমরগুঞ্জনে, বিহঙ্গকুজনে, প্রকৃতির শ্যামশোভায়, মানবহৃদয়ের সুখ-সোহাগের আশায়—সর্ব্বস্থে এবং সর্ব্বত্র রাধাকৃষ্ণের দোল-লীলা চলিতেছে। তাঁহারা দুলিতেছেন; আর এক হইতে বহুতে পরিণতি হইতেছে—রূপের কোটি-সমুদ্র যেন ফুটিয়া—ফাটিয়া বাহির হইতেছে। তাই বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—ইদং মানুষং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য মানুষস্য সর্ব্বানি ভূতানি মধু—সর্ব্বভূতের পক্ষে এই মানুষ মধু, এই মানুষের পক্ষে সর্ব্বভূত মধু। এই মানুষের মধ্যে যে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ আছেন এবং তাঁহার শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী যে তেজোময় অমৃতময় অধ্যাত্ম পুরুষ আছেন, তিনি সকল মানুষের পক্ষে মধু, সকল মানুষ তাঁহার পক্ষে মধু। তিনিই অমৃতময়, রস-স্বরূপ আত্মব্রহ্ম—তিনিই সকল। কেন তিনি মধুময়? যে হেতু তিনি সর্ব্বময়। উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে অন্তর্যামীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য যে উত্তর দিয়াছিলেন, বৃহদারণ্যকের তাহাও এক অপূর্ব্ব অধ্যায়। বাহুল্যভয়ে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না।

শ্রুতির এই মধুতত্ত্ব হইতেই বৈষ্ণবের দোল-লীলা ব্যাখ্যা করা যায়। বৈষ্ণব পরমাত্মার বহুতে পরিণতিটুকু দেখায় না, সেই পরিণাম হেতু যে আনন্দ-কম্পন, উল্লাস-নর্ত্তন, তাহাই দেখাইয়া থাকে।

"মন্দ বেগেতে দোলিতে দোলিতে
অলস দুহুঁক অঙ্গ।
ঈষত মুদিত আধ উদিত
দুহুঁ ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আধ বিকশিত কমল যৈছন
মলিন ভ্রমর পাখী॥"

* * * *

"খেলা-দোলায়িত-মণি-কুণ্ডল-রুচি-রুচিবাননশোভম্।
হেলা-তরলিত-মধুর-বিলোচন-জনিত-বধূ-জন-লোভম্॥"

ইহাই দোলের বিকাশ। রাধাকৃষ্ণের তিন রকমের দোল আছে। এক, বসন্তের দোল—মন্থর, ধীর-মধুর স্পন্দন। দ্বিতীয়—ঝুলনের দোল—হিন্দোল, একবার আকাশ স্পর্শ করিতেছে, আবার যেন ভূমি চুম্বন করিতেছে; উহা প্রকট আন্দোলন। তৃতীয়—রাসের নর্ত্তন; রাধাকৃষ্ণের নাচ; শ্রীমতী নাচিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে রূপের বিকাশ ঘটাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ নাচিয়া শ্রীমতীকে নৃত্যের চাতুরী দেখাইতেছেন। এই তিন প্রকারের আন্দোলন বিকাশের তিন পর্য্যায় তিন ভাবে প্রকট। প্রথম—বসন্তে, মধুমাসে বিকাশের স্পন্দন মাত্র—নবানুরাগে লোহিতাভ হইয়া পুরুষ প্রকৃতি বিকাশের প্রথম স্তরে ধীরে ধীরে কাঁপিতেছেন! যেন বড় ভয়, পাছে ভাঙ্গিয়া পড়ে—নূতন কাঁচা প্রকৃতি পাছে নুইয়া বাঁকিয়া যায়। দ্বিতীয়—বর্ষার প্রৌঢ় বিকাশে বিরাট্ প্রকম্পন। সে যেন গগন-পবনকে আলোড়িত করিয়া খেলা। তৃতীয়—শেষে, হেমন্তে—তুমি দেখ আর আমি দেখি—এই হিসাবে নাচ—উভয়ে উভয়ের ভাবে মুগ্ধ হইয়া উভয়ের মধ্যে লুকাইবার চেষ্টায় নর্ত্তন। কম্পনের এই তিন স্তর মধুরতার অনন্ত সমুদ্র—ভাবের অক্ষয় প্রবাহ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, চ্যুতি হইতে বিরহ-বোধ এবং মিলন-আকাঙ্ক্ষা। চ্যুতিটা কি? পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার যে স্বতন্ত্রীকরণ তাহাই চ্যুতি। এই যে আমি, পরমাত্মার অংশ হইয়াও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাই না, তাঁহাকে ধরিতে পারি না—এই যে তিনি, আমার মধ্যে থাকিলেও মৃগমদমত্ত মৃগের ন্যায় তাঁহার গন্ধে বিভোর হইয়া আমি দশ দিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই—ইহাই চ্যুতি। তাঁহা হইতে চ্যুত হইয়া, স্খলিত হইয়া যে

স্বতন্ত্রতা-বোধ, ইহাই চ্যুতি-জন্য। চ্যুতির মূলে অহঙ্কার ; অহঙ্কার হইতে এক পক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টার, অন্য পক্ষে হিংসার অভ্যুদয় হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতেই মদনের বিকাশ, আবার আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে হিংসারও স্ফুরণ হয়। তন্ত্র বলিতেছেন যে, হিংসাই জীবন। অন্যকে চাপিয়া মারিয়া উদরস্থ করিয়া স্বীয় অভ্যুদয়ের যে চেষ্টা, তাহাকেই হিংসা বলে। কাহাকেও বা কোন সামগ্রীকে নিজের পূর্ণায়ত্তে আনিবারই চেষ্টার মূলে হিংসা আছে। কাজেই মদনবিকাশেও হিংসা আছে। তন্ত্র এই হিংসার ঘাড়ে জগদ্ধাত্রীকে বসাইয়া হিংসা-সিংহকে পোষ মানাইয়াছেন। মধুর রসের আলোচনায়—আস্বাদনে বৈষ্ণব ভক্তগণ মান-বিকাশে হিংসার প্রকাশ করিয়া, পরিণামে হিংসার পূর্ণ অপচয় সাধন করিয়াছেন। রাধার দুর্জ্জয় মানই মূল হিংসার আকারান্তর মাত্র।

তন্ত্র এই মদন বা মধু-তত্ত্ব এবং হিংসার বিস্তার হইতে সৃষ্টির বিকাশ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ; বৈষ্ণব ভক্তির শাস্ত্র উহা হইতে মধুর রস নিঙাড়িয়া বাহির করিয়া সেই রসের আস্বাদনে বিভোর হইয়া থাকেন! বৈষ্ণব বলেন,—তোমার লীলা তুমি কর প্রভু, আমি তাহার মর্ম্ম বুঝিই বা কি,—বুঝিবার সামর্থ্যই বা আমার কতটুকু! রসময় তুমি, তোমার রসের ছিটা-ফোঁটা লাগিয়া আমার একাদশ ইন্দ্রিয় এবং আসক্তিনিচয় রসের কাঙ্গাল হইয়া আছে, রসের পিপাসায় বিভ্রান্ত হইয়া আছে। আমি তোমার লীলা দেখিব—নয়নময় হইয়া দেখিব—দেখিয়া মজিব। চিনি হইবার আমার বাসনা নাই, চিনির আস্বাদনে আমি বিভোর হইয়া থাকিব। যখন হিংসার কথা মনে পড়িবে তখন বলিব,—

বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিলুঁ
লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার লয় অন্য জন
ইহা কি পরাণে সয়॥
সই কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া॥
যে দিন দেখিব আপন নয়ানে
আন জন সঙ্গে কথা।

কেশ ছিঁড়ি পেলি বেশ দূর করি,
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥

কেন চাই আমি,—যাহা সুন্দর, যাহা মনোহর, তাহা কেন চাই ? যে হেতু তুমি যে সৌন্দর্য্যের আকর, মাধুর্য্যের সাগর ; আমার হিয়ার ভিতরে আছ, আবার বাহিরে প্রকৃতির সুন্দর আস্তরণে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছ। আমি দেখি বাহিরের সৌন্দর্য্য, কিন্তু ভিতরের সুন্দর পুরুষের সে আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারি না। তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়া, আমি স্বতন্ত্র জীবে পরিণত হইয়াছি বলিয়াই, আমার অহঙ্কার আমাকে তোমার রসে ডুবিতে মজিতে দিতেছে না বলিয়া, আমি যাহা সুন্দর দেখি তাহাকে চাই, যাহা মধুর দেখি তাহাকে চাই, যাহা মনোহর দেখি তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। তখন মনে ভাবি,—

"আমি কৃষ্ণময় জগৎ দেখি।
বৃক্ষমূলে শাখা, শিখিপুচ্ছ পাখা
কৃষ্ণরূপ মাখামাখি।
যে সময় আমি যে স্থানেতে যাই,
আধো উৰ্দ্ধ আদি দশ দিকেতে চাই,
কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেখিতে না পাই,
আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি ॥
নয়ন মুদিয়ে থাকি যে সময়
হৃদিমাঝে কৃষ্ণরূপ দৃষ্ট হয়,
নীলকণ্ঠ কয় মহা ভাবোদয়,
তন্ময় ভাবের শাখি ॥"

এইটুকু ভাবিতে পারিলে ভিতর বাহির সমান হইয়া যায়। এইটুকু স্থির করিবার জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে মধুব্রাহ্মণের কথা, এইটুকু বুঝিবার জন্য মধুতার আশীর্ব্বচন, এইটুকু বুঝিবার জন্য বৃন্দাবনলীলার বিস্তার। কোন্ সূত্র হইতে কোন্ তত্ত্বের বিশ্লেষণ হইয়াছে, রস-তত্ত্বের বনিয়াদ কোথায় এবং কিসে, তাহাই সোজা করিয়া বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি। চেষ্টা সার্থক হইয়াছে কি না, তাহা পাঠকগণই জানেন। ব্যাপার এত বৃহৎ যে, বাকী কথা কয়টা বলিতে হইলে আরও সময় যাইবে, তাহার পর এক একটা বিষয়ের ধারাবাহিক

বিশ্লেষণ চলিতে পারে। এই সকল বিষয়ের চর্চ্চা নাই বলিয়া, গোড়ার স্বতঃসিদ্ধিগুলির আলোচনা করিতে হইল। আমাদের উপাসনা-তত্ত্বের অন্তরালে যে বিরাট্ philosophy আছে, তেমন সর্ব্বব্যাপী তত্ত্বকথা পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য জাতির সাহিত্যে বা শাস্ত্রে আছে কি না, আমি বলিতে পারি না। আমি ত দেখি, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র অনন্ত, অপরিমেয়, অগাধ এবং অতুল্য। উপনিষদ্, তন্ত্র এবং ভক্তিশাস্ত্র এই অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনের প্রকারভেদ হইলেও, উদ্দেশ্য এক। ('প্রবাহিণী,' ১৫ ফাল্গুন ১৩২০)

স্মৃতি-কথা

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

১৮৭৫ ও ১৮৭৬ সালে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজ বা প্রিন্স্ অফ ওয়েলস্-রূপে কলিকাতায় আসেন। আমার তখন নয় বৎসর বয়স। সে সময়ে আমিও কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। আমার চক্ষের ব্যারাম ছিল, অস্ত্র করিবার জন্যই কলিকাতায় আসা হইয়াছিল, কিন্তু তামাশা না দেখিয়া চোখ কাটাইব না স্থির করিলাম। যে দিন গড়ের মাঠে বাজী পোড়ান হয়, সেই দিন ৺মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, ৺যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাকে সঙ্গে করিয়া বাজী পোড়ান ও আলো দেখাইতে লইয়া যান। প্রথমে খানিকটা বেশ রীতিমত বাজী পোড়ান হইল; আমি হেম বাবুর পার্শ্বে বসিয়া বেশ দেখিলাম। সহসা বাজীর ঘরে আগুন লাগিয়া গেল। আমরা গড়ের মাঠের পুরাতন গ্র্যাণ্ড ষ্টাণ্ডে বসিয়াছিলাম। বাজীর ঘরে আগুন লাগাতে লোকসকল ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। আমরা যেখানে বসিয়া ছিলাম, সেখানে ভারী ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইল। ভয়ে আমি হেমচন্দ্রের গলা জড়াইয়া ধরিলাম। তিনিও আমাকে লইয়া বিপন্ন হইলেন। যখন ঠেলাঠেলি বড়ই বাড়িল, তখন পাছে আমি চাপা পড়ি, তাই তিনি আমাকে কাঁধের

উপর তুলিয়া লইলেন। অনেক কষ্টে, যেখানে এখন প্রেসিডেন্সী হস্পিটেল, সেইখানে আসিয়া আমরা পৌঁছিলাম। একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি আমায় বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেন। এ দিকে আমাদের অন্য সকল সঙ্গী এবং আমাদের গাড়ী যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহই জানে না। বাড়ীতে খবর গিয়াছে যে, আমি চাপা পড়িয়াছি। এমন সময় আমাদের উপস্থিত হওয়াতে পিসে মহাশয় ত খুশী হইলেন। কিন্তু হেমচন্দ্রকে তিরস্কার করিতে ছাড়িলেন না।

২

হেমচন্দ্র যখন অন্ধ হইয়াছিলেন, তখন আমি 'বসুমতী'র সম্পাদক। আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে পাইয়া আনন্দ উল্লাসে যেন উন্মত্তবৎ হইয়া বলিলেন, "আয় তোকে আবার এক বার কাঁধে করি!" এই বলিয়া তিনি আমায় জড়াইয়া ধরিলেন। আমি বলিলাম, "দাদা, আপনি কাঁধে করিবেন কেন? এখন আমার কাঁধে করিবার পালা।" আমার কথা শুনিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাঁহার রোদন দেখিয়া আমিও সামলাইতে পারিলাম না। হেমচন্দ্র অন্ধ হইবার পূর্ব্বে পারিবারিক কষ্টে—এক প্রকার উন্মত্তবৎই হইয়াছিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কেরও একটু বিকৃতি ঘটিয়াছিল। সে সব কথা বলিবার নহে। কাজেই বলিতে পারিলাম না।

৩

আমি হেমচন্দ্রের মুখে 'ভারত ভিক্ষা'র আবৃত্তি শুনিয়াছি। তেমন আবৃত্তি আমি আর কোন বাঙ্গালীর মুখে শুনি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। 'বৃত্রসংহারে'র অনেক অংশ তাঁহাকে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমি তাঁহার উচ্চারণভঙ্গী কতকটা নকল করিতে পারিতাম। তাই এক বার ভূদেব বাবুর সম্মুখে 'ভারত ভিক্ষা'র আবৃত্তি আমাকে করিতে হইয়াছিল। সে আবৃত্তি করার ফলে আমার একটা বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। অবশ্য সে বিবাহ হয় নাই।

৪

হেমচন্দ্রের বাড়ীতে বিখ্যাত মনীষী যোগেশচন্দ্র ঘোষের সহিত আমার পরিচয় হয়। ৺নীলকণ্ঠ মজুমদার পরিচয় করাইয়া দেন। এক দিন কথায় কথায় 'তুলসীদাস' ও 'কবীরে'র দোহার কথা উঠিল। আমি গোটাকয়েক দোহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলাম। হেমচন্দ্র বলিলেন, "এগুলির ত বাঙ্গালা করিলে হয়।" আমি বলিলাম, "হইবে না কেন? একটু চেষ্টা করিলেই হয়।" অমনি সঙ্গে সঙ্গে কাশীতে ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের নিকট পত্র লেখা হইল, তিনি যেন ফেরত ডাকে তুলসীদাসের ছাপা দোহাবলী সকল পাঠাইয়া দেন। সেই ঝোঁকেই যে কয়টা দোহার অনুবাদ হইয়াছিল, পরে আর হয় নাই। হেমচন্দ্র ঝোঁকের উপরই সব লিখিতেন। যখন কিছু লিখিতে বসিতেন, তখন যেন বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। ঝোঁক ছুটিলেই সব যাইত। তাঁহার বাড়ীতে যে কত অসম্পূর্ণ কবিতা আমি দেখিয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না। সে সব যে কোথায় গেল, কে জানে! ('প্রবাহিণী,' ১৫-ফাল্গুন ১৩২০)

ভগবান রামকৃষ্ণ

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্॥"

যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য—সমাজ-রক্ষার জন্য আমি নরাকারে অবতীর্ণ হই।—ইহাই ভগবানের কথা। হিন্দু মাত্রেই এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। কথাটা বুঝিতে হইলে গীতার এই শ্লোকে ব্যবহৃত দুইটি শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। প্রথম,—ধর্ম্মের গ্লানি কাহাকে বলি; দ্বিতীয়,—অধর্ম্মের অভ্যুত্থানই বা কেমন?

সহজ অবস্থার বিকৃতিকেই গ্লানি বলে। অর্থাৎ, সামঞ্জস্যের নষ্ট হইলেই গ্লানি হয়। তোমার দেহ সুস্থ আছে, অর্থাৎ দেহরক্ষার সকল শক্তি সমানভাবে কাজ করিতেছে। এই সমান ভাবের কাজে ব্যাঘাত ঘটিলেই

দেহে গ্লানি হয়,—রোগ জন্মায়। তেমনই সমাজ-শরীরের যে সকল শক্তি সমাজপুষ্টির পক্ষে সদা নিযুক্ত, সেই সকল শক্তির মধ্যে কোনও একটা শক্তি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হইতে যদি ব্যাহত হয়, এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটায়, তাহা হইলেই ধর্ম্মের গ্লানি হইল, বুঝিতে হইবে। 'গ্লানি'র শব্দার্থ বিকৃতি, ম্লান, দুঃখ, নিন্দা এবং বিপর্য্যয়।

ধর্ম্মের গ্লানি হয় দুই উপায়ে। প্রথম—প্রবল পরাক্রান্ত রাজা বা বীরপুরুষের উপদ্রবে; যেমন হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস ইত্যাদি। দ্বিতীয়—সমাজের অঙ্গবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের মোহে, বিলাসে, দুষ্ট-আদর্শে সমাজে ধর্ম্মের গ্লানি হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়দিগের বিলাস-উপদ্রবে সমাজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া পরশুরাম অবতার হইয়াছিলেন। ধর্ম্মযাজক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ অর্থলোভী ও বিলাসী হইয়াছিলেন বলিয়া বুদ্ধদেব অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যখন সমাজের সকল অঙ্গ শিথিল হইবে, সকল শ্রেণী বিগড়াইবে, তখন কল্কী অবতার হইবে।

অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, অর্থাৎ দুষ্ট আদর্শের প্রাবল্য। রাবণ-রাজা ব্রাহ্মণ ছিলেন, সিদ্ধ সাধক ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার সাধনলব্ধ শক্তির দ্বারা কেবল বিলাসের পিপাসা মিটাইয়াছিলেন। তাঁহার উপদ্রবে সতীর সতীত্ব রক্ষা হইত না, সাধক নিশ্চিন্তে সাধনা করিতে পারিত না, কুলাঙ্গনারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার আদর্শে দেশটা লাম্পট্যে ভরিয়া গিয়াছিল। এই অধর্ম্মের অভ্যুত্থানকে চূর্ণ করিবার জন্য রামাবতার। রাম সংযমের, বিনয়ের, সমাজ-পক্ষপাতিতার, সামাজিক গুণ-গৌরবরক্ষার আদর্শস্বরূপ ছিলেন। রাম রাবণের ঠিক antidote. রামের পিতা দশরথ, সেই দশরথের ষোল হাজার নারী—কামপত্নী। সেই রাম একপত্নীক, যথার্থ সংযমী ও সন্ন্যাসী। গৌতম বুদ্ধের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে ভারতের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ কেবল কর্ম্মকাণ্ড লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, জ্ঞান ও ভক্তির কোনও ধার ধারিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে সংযম সন্ন্যাস একেবারেই ছিল না। ফলে তাঁহারা বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে দুষ্ট আদর্শকে চূর্ণ করিবার জন্য সিদ্ধার্থের উদ্ভব। ক্রমে তিনি রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, যুবতী স্ত্রী, বিলাস-বৈভব সব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর এমন আদর্শ দেখাইলেন, যাহার প্রভাবে সমাজের মূল পর্য্যন্ত টলিয়া উঠিল। ভার্গব

পরশুরামও ক্ষত্রিয়দিগের বিলাসতেজকে সংযত করিবার জন্য ব্রহ্মতেজের বিকাশ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস ও সংযমের সঙ্গে ক্ষাত্রবীর্য্য কেমন ভাবে পরিস্ফুট হয়, তাহা ভার্গবের জীবনে বুঝা যায়।

ইংরেজের আমলে যখন আমরা ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করি, তখন দেশের অর্থাভাব খুব হইয়াছিল। অথচ, বিলাসের স্পৃহা কম ছিল না। ইংরেজী শিখিলেই তখন অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসেই অর্থোপার্জ্জন করা যাইত। ইহার ফলে সমাজে কাঞ্চন-কৌলীন্যের সৃষ্টি হইল। আর ইউরোপের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতির দুষ্ট আদর্শে মুগ্ধ হইয়া পঙ্কিল বিলাসের স্রোতে আমরা গা-ভাসান দিয়াছিলাম। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় আমলে আমরা সব ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছি। ধর্ম্ম, সমাজ, মনুষ্যত্ব—সর্ব্বস্বই চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই সর্ব্ববিধ্বংসিনী প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া হইল ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভবে। গঙ্গার তরঙ্গে যেমন ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল,—সে বেগ সামলাইতে পারে নাই, তেমন ব্রাহ্মসমাজও ইউরোপের বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া গেল।

"তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্"

তখন কৃপার সাগর সমাজের দুষ্ট আদর্শকে চূর্ণ করিবার জন্য,—দরিদ্রের মান বাড়াইবার জন্য, দারিদ্র্যকে স্বর্ণ-সিংহাসন দিবার জন্য, সেবাব্রতকে সকল ব্রতের সার করিবার জন্য, কাঙ্গাল ফকিরের মধ্যে নারায়ণের অস্তিত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য, ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কর্ম্মের পথ দেখাইবার জন্য—

"রামকৃষ্ণ"

কৃপার অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মের গ্লানির সংহরণ ক্ষাত্রবীর্য্যে সম্ভবপর নহে। তাই তিনি দীনহীন পূজক ব্রাহ্মণের বেশে বাঙ্গালার নিত্য শ্যামায়মান পল্লীবাসের শান্ত, স্নিগ্ধ ছায়ার তলে করুণা ও দয়ার, সংযম ও সন্ন্যাসের, বিনয় ও বৈরাগ্যের, ঔদার্য্য ও তিতিক্ষার ঠাকুররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি সামঞ্জস্যের পূর্ণাবতার। সকল ধর্ম্মের, সকল মতের, সকল বিশ্বাসের, সকল আচারের, সকল সাধনার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি বাঙ্গালায় শান্তিরাজ্য স্থাপনের বনিয়াদ গড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহাতে তন্ত্রের ঔদার্য্য ও বিশ্বপ্রেম ছিল, বৈষ্ণবের মাধুর্য্য এবং

অপরাজের দৈন্য ছিল। তিনি তাঁহার বিশাল যুগল বাহুর দ্বারা বিশ্বমানবতার বিরাট পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের ঈশ্বরপদে বরণ করিতে পারিয়াছিলেন। তন্ত্রের মহামন্ত্র যে নারী মাত্রেই জগজ্জননীর অংশরূপিণী—এই মন্ত্রে একা তিনিই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীকে মা বলিতে শিখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঘৃণা ছিল না, উপেক্ষা ছিল না, অবহেলা ছিল না,—পাপী, তাপী, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ম্লেচ্ছ, যবন সকলকেই—সকল মানুষকেই তিনি কোল দিয়াছিলেন। নব বসন্তের শুক্লপক্ষে নবকিশলয় প্রতিবিম্বিত কৌমুদীধারায় আপ্লুত হইয়া শুক্লাম্বর—শুক্ল ভাবপূর্ণ, শুক্লতেজোময়, শুক্লকর্ম্মময়, শুক্লভক্তি-প্রমত্ত মহাপুরুষ ভগবানের অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া যে সুশিক্ষার ও সদুপদেশের মন্দাকিনী-ধারা ব্রাহ্মণ্যের ব্রহ্ম-কমণ্ডলুতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী যদি মানুষ হয়, তবে তাহা পান করিয়া নিশ্চয়ই অমরত্বলাভ করিবে। যাঁহারা ভগবান্ রামকৃষ্ণের সেবাব্রতের গৈরিক-ধ্বজা উড্ডীন করিয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবায় ব্রতী হইয়াছেন, সমাজকে অপূর্ব্ব আদর্শ দেখাইয়া মুগ্ধ করিতেছেন, ভগবান্ রামকৃষ্ণের করুণার আশিস্ কোটিধারায় তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক। তাঁহারা সর্ব্ব-সিদ্ধির পথে অগ্রসর হউন।

স্বামী বিবেকানন্দ

গুরুর পরীক্ষা শিষ্যে, শিষ্যের পরীক্ষা গুরুতে। শুষ্ক তরু মঞ্জরিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; আর ইংরেজী-শিক্ষিত নবযুবকদিগের মধ্য হইতে ব্রহ্মানন্দ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবান্ রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। আমরা নরেন্দ্রনাথকে জানি, চিনি, সেই নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দে পরিণতিও জানি ও বুঝি, তাই ভগবান্ রামকৃষ্ণের মহিমায় মুগ্ধ। এক বার বিবেকানন্দের সম্মুখেই তাঁহার একটা বক্তৃতার সুখ্যাতি করিতেছিলাম, সে আমাদের মুখে হাত চাপিয়া মুখ বন্ধ করিয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে বলিয়াছিল, "তোরা যদি অমন কথা বল্‌বি ত আমি দাঁড়াব কোথা? কার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সখ্যের

সাধ মিটাইব।”—উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, “দেখ দাদা, শলুই চিনতে পারলে জাত সাপের পরিচয় অনেকটা জানতে পারা যায়। আমি তোমায় দেখে ঠাকুরের মহত্ত্ব চেনবার চেষ্টা করছি। তাঁহাকে ত দুই বারের অধিক দেখি নাই। তোমার মত সামগ্রী যাঁহার কৃপায় তৈয়ার হইতে পারে, তিনি যে কৃপার সাগর—সর্ব্বনিধির আধার।” বিবেকানন্দ আমার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। শেষে গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বীণানিন্দিত কণ্ঠে,—

“আমি সেই ভয়ে মুদি না আঁখি,
পাছে তারা-হারা হ'য়ে থাকি।”

এই গানটি বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে অপূর্ব্ব ভাব মিশাইয়া গায়িলেন।

বিবেকানন্দ কৃপা-সিদ্ধ। তাহার ইংরেজী বিদ্যার বহর জানিতাম। পরে আমেরিকা ও ইয়োরোপে যাইয়া সে যে-বিদ্যার ও যে-তেজের পরিচয় দিয়াছিল, তাহারও অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়াছিলাম। ভগবান্ রামকৃষ্ণ মাতৃভাবের পলিমাটি ছড়াইয়া বাঙ্গালার যে উর্ব্বরতা সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মানবতার বীজ না দিলে ফসল ভাল হইবে কেন! তাই বিবেকানন্দের উপর এই রোয়া বোয়ার ভার পড়িয়াছিল। এ কাজের জন্য যেটুকু তেজ, যেটুকু সাহস, পাকা কৃষির ভূয়োদর্শনজাত যেটুকু স্পর্দ্ধার প্রয়োজন, সে সকলই বিবেকানন্দে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। বিবেকানন্দে ইয়োরোপের তেজস্বিতা, মানবতা এবং ভারতের ভক্তি, বিশ্বাস, একনিষ্ঠা, সংযম ও সাধনা পুরামাত্রায় ছিল। সে জল-বৃষ্টিতে ভিজিয়া, শুখা রুখায় পুড়িয়া যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছে, যখন দেবতার কৃপায় পুরা ফসল হইবে, ক্ষেত-ভরা ধান হইবে, তখন বাঙ্গালী বুঝিবে,—কত বড় পুরুষ-সিংহ তাহাদের জন্য কি কাজ করিয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম ও সাধনার উপর জাতীয়তায় পালিশ চড়াইয়া, সেবাব্রতকে জাতীয় ধর্ম্মে পরিণত করিয়া বিবেকানন্দ—সব্যসাচী অর্জ্জুনের ন্যায়—ভোগবতীর জল টানিয়া শুষ্ক তৃষ্ণার্ত্ত সমাজের উপরের স্তরগুলিকে স্নিগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গরীব-দুঃখী, মূর্খ-পণ্ডিত সবাই এখন একসূত্রে বাঁধা হইয়াছে; সবাই এক আদর্শের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছেন। যে মন্ত্রের প্রভাবে বিলাসী বাবু সন্ন্যাসী হইতে পারে, রোগীর রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া অহর্নিশ সেবা করিতে পারে, প্লেগে ভয় পায় না, বসন্তরোগী দেখিলে সঙ্কুচিত হয় না,

উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগর-সঙ্গমে ঝম্পপ্রদান করিতে ইতস্ততঃ করে না, সে মন্ত্রই বা কেমন, সে মন্ত্রীই বা কেমন—এক বার ভাবিয়া দেখ দেখি! সংসারের সুখ অপেক্ষা, ঘর-বাড়ী স্ত্রী-পরিবারের আয়েস অপেক্ষা বেহেতর, প্রগাঢ়তর—প্রবলতর একটা সুখ, আনন্দ, উন্মাদন না পাইলে মানুষ কি সহজে এ দুনিয়ার চাকচিক্য ভুলিতে পারে? যে গুরু এমন ভাবে শিষ্যকে ভুলাইতে পারেন, সে গুরু সত্যই ত ঈশ্বর,—ঈশ্বরের অবতার।

বিবেকানন্দ গুরুগিরি করিতে আসেন নাই,—কেবল ভাব বিলাইতে আসিয়াছিলেন। তেমন সরল হাস্যময় মিত্র, তেমন তেজস্বী সত্যসন্ধ সহচর আর কখনও দেখি নাই। তাহাকে ফাঁকি দিবার জো-টি ছিল না, মনের কথাটি টানিয়া বাহির করিত। তাহার কখনও অভিমান ছিল না। আমি এক জন পণ্ডিত, আমি এক জন বড় বক্তা,—মিত্র-সংসর্গে এ ভাবটা তাহার কখনই ফুটিয়া উঠিত না। বিবেকানন্দ এক জন বড় দরের ভক্ত ছিলেন। গোপনে ভক্তি-তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে অনেক সময় তাঁহাতে মহাভাবের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু তিনি সে ভাব চাপিয়া রাখিতেন। এক বার ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন—"না ভাই, আমায় মজাইও না। আমি তাল সাম্‌লাইতে পারিব না। আমার যে কাজ, সে কাজ এখন ত শেষ হয় নাই। আমার ও দিকটা ফুটাইও না,—আমি পাগল হইব।" গান গায়িতে গায়িতে বিবেকানন্দ এক এক সময় সত্যই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। এক দিন আমার কন্যাকে লইয়া "তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে নাচ দেখি শ্যামা" এই গানটি গায়িতে গায়িতে চারি বৎসরের কন্যাটিকে নাচাইতে নাচাইতে বিবেকানন্দ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর মেয়েটিও তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া, তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্থির ধীর নিস্পন্দবৎ তাঁহার বুকের উপর শুইয়াছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ এ ভাব প্রায়ই চাপিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "ছ্যাখ্ এই ভাবের বাড়াবাড়ি হওয়াতেই আমরা কলা খেয়ে বসেছি। পৃথিবীতে এমন মদ নেই যাহাকে ভক্তিরসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সকল মদের সেরা ভক্তি-মদ। সেই মদ খেয়ে বাঙ্গালী চার-শ বছর মাতাল হ'য়ে ছিল। আর ও মদ চালান ঠিক নয়।" তাই বিবেকানন্দ কর্ম্ম-জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়া বক্তৃতা করিতেন।

সে চলিয়া গিয়াছে, গুরুদত্ত বীজ ছড়াইয়া, গুরুর গৌরব-ডঙ্কা বাজাইয়া, সর্ব্ব-সামঞ্জস্যের মহামন্ত্র বাঙ্গালীর কানে বজ্রগম্ভীরনাদে উচ্চারণ করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। এখন ত তাহাকে বুঝিবার ও বুঝাইবার সময় আসে নাই। তাই স্মৃতিসুখে সুখী হইয়া আর এক জনের আশা-পথ চাহিয়া আছি। এস তুমি, ডাকার মত ডাকিলে না কি তুমি আসিয়া থাক, তাই তোমায় ডাকিতেছি! তুমি অন্য রূপে আসিয়া অবতীর্ণ হও! তোমার কর্ম্ম পূর্ণ কর। ('প্রবাহিণী,' ২২ ফাল্গুন ১৩২০)

ভক্তি-তত্ত্ব

এই বার ভক্তি-তত্ত্বের গোটা কয়েক মোটা কথার আলোচনা করিতে হইবে। দুঃখ নিবৃত্তির জন্যই উপাসনা; তা সে উপাসনা তন্ত্রের শক্তি-সাধনাই হউক, কিংবা ভক্তিশাস্ত্রের আত্মনিবেদন-জাত উপাসনাই হউক,—সকল উপাসনা এবং সাধনা পদ্ধতির উদ্দেশ্য এক। শাস্ত্র বলিতেছেন যে, ভোগে তৃপ্তি নাই; তৃপ্তি না হইলেই দুঃখের অবস্থিতি অবশ্যম্ভাবী, দুঃখ দূর না করিতে পারিলে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয় না। শাস্ত্র কল্পনা করেন যে, জীব-জীবনটা সুখের একটানা প্রবাহ, সে প্রবাহের মধ্যে দুঃখের গণ্ড-শৈলসকল পরম্পরাভাবে সাজান আছে। যেমন একটা লম্বা ফিতা টানিয়া ধরিয়া সূচ্যগ্র দিয়া তাহাতে মাঝে মাঝে ছেদ করিলে যেরূপ দেখায়, তেমনি মনুষ্য-জীবন সুখের ফিতার মতন, দুঃখ কেবল ছিদ্রের পরম্পরা মাত্র। এই দুঃখ দূর করিতে পারিলে সুখের অনুভূতি অনবরত অবিরল ভাবে বিদ্যমান থাকে, এবং এই সুখের অত্যন্ত অনুভূতিই মুক্তি। যখন দুঃখ অতিমাত্রায় ঘটে তখন মৃত্যু হয়। দুঃখের আত্যন্তিকী বৃদ্ধিকেই মৃত্যু বলে। দুঃখ কি?—বাধনালক্ষণং দুঃখমিতি—প্রতিকূলবেদনীয়ম্ দুঃখমিতি। বাধা যাহার লক্ষণ তাহাকেই দুঃখ বলি অথবা আমার যাহা প্রতিকূল বেদনা আনয়ন করে তাহাকেই দুঃখ বলি। প্রবৃত্তির প্রবাহে, অনুভূতির পারম্পর্য্যে যাহা বাধা বা ব্যাঘাত, তাহাই দুঃখ। যে বেদনা বা অনুভূতি আমার ঈপ্সিতের ও বাঞ্ছিতের প্রতিকূল, তাহাই দুঃখ। এই বাধা ঘটে কিসে? শাস্ত্র বলিতেছেন—বিরোধে। প্রকৃতির সর্ব্বত্রই

বিরুদ্ধা শক্তির ক্রিয়া হইতেছে; এই ক্রিয়া কতকটা কাপড় বোনার টানা-পড়েনের মত; একটা এক দিক্ দিয়া যাইতেছে, অন্যটা অন্য দিক্ দিয়া আসিতেছে। এই টানা-পড়েনের মুখে যেখানে দুই বিরুদ্ধা শক্তি আসিয়া মিলিত হইতেছে, সেইখানেই একটা বাধার, একটা বন্ধনের সৃষ্টি হইতেছে। তুমি চাও দেখিতে—সৃষ্টির সৌন্দর্য্য—প্রকৃতির রূপবিলাস তুমি চাও দেখিতে; কিন্তু এই অনবরত দর্শনের অন্তরায় ঘটায় প্রথম তোমার দেহজ শক্তি, দ্বিতীয় বাহ্য প্রকৃতির অনন্ত কোটিবিধ শক্তিক্রিয়া। দেখিতে দেখিতে তোমার দৃষ্টিশক্তি শ্রান্ত হয়, তুমি আর নয়ন ভরিয়া দেখিতে পার না। দেখিতে দেখিতে আকাশে একখানি মেঘ উঠে, ঝঞ্ঝাবাতের সৃষ্টি করে, তুমি আর দেখিতে পার না। মুগ্ধ হইয়া যে রূপ-বিকাশ দেখিতেছ, তাহাই থাকে না। অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, তোমার সাধ মিটাইয়া দেখা হয় না। এই সকল অন্তরায় ও বাধাই দুঃখ। এই দুঃখের উপশান্তি-চেষ্টাই সাধনা, আরাধনা, যোগ-যাগ-জপ-তপ। এই দুঃখ হইতেই বন্ধন, এবং বন্ধন জন্যই দুঃখ। এই দুঃখতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা দার্শনিকগণকে করিতে হইয়াছে। কণাদ এবং গৌতম প্রভৃতি দার্শনিকগণের ঈশ্বর নিত্যজ্ঞান, নিত্য-ইচ্ছা এবং নিত্যকৃতিমান। তিনি পাপ বা পুণ্য অনুসারে জীবদিগের উপর দণ্ড বা অনুগ্রহের কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এবং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। জীবসকল তাঁহা হইতে ভিন্ন, অথচ তাঁহার অধীন হইয়া শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং সেই কর্ম্মের ফলভোগ করে।

বেদান্তিগণের মতে ভগবান্ স্বপ্রকাশ, অখণ্ড আনন্দস্বরূপ আর ঐ ভগবানের যে সকল অংশ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয়রূপ উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন, অথবা তথাবিধ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত, তাহারাই জীব নামে প্রসিদ্ধ। পাতঞ্জল মতে সেই ভগবান্ই জীবদিগের অনুগ্রাহক। সাংখ্যমতে তাঁহাকেই চিৎশক্তির সমষ্টিরূপ ষড়্বিংশ পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করাও হইয়াছে। মীমাংসাশাস্ত্রে "ঈশ্বরকে উপাসনা করিবে" এই বিধিবাক্য দ্বারা তাঁহাকেই সিদ্ধ করা হইয়াছে। ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যাকার স্বপ্নেশ্বরাচার্য্য বলেন, ব্রহ্মই সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয়ে অবচ্ছিন্ন হইয়া অথবা এই ত্রিগুণময় অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবরূপে

পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার ঐ জীবস্বরূপতা বদ্ধাবস্থা, এবং উক্ত গুণত্রয়ের ব্রহ্মে লয় হইলে তাঁহার যে অনবচ্ছিন্ন স্বপ্রকাশ, এবং আনন্দময় নিজ স্বরূপে অবস্থান—তাহাই মুক্তি। যেমন প্রগাঢ় প্রীতিহেতুক দম্পতিযুগল পরস্পরের অন্তঃকরণে লয় প্রাপ্ত হয়; উভয়ের অন্তঃকরণ একই রূপ হয়—এক জন হাসিলে অন্য জন হাসে, এক জন কাঁদিলে আর এক জন কাঁদে—সেইরূপ অতি প্রগাঢ় প্রীতিরূপা ভক্তির দ্বারা ত্রিগুণ-অবচ্ছিন্ন জীব ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইলে, উহাদের মধ্যে আর ভিন্ন ভাব থাকে না। ইহাই মুক্তি; এই মুক্তি ভক্তির সাহায্যে লাভ করা যায়।

মুক্তি কি? কণাদ বলিতেছেন—দুঃখাৎ অত্যন্ত নিবৃত্তি মুক্তিঃ—দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলি। মীমাংসক ভট্টদিগের মতে "নিত্য-সুখাভিব্যক্তি মুক্তিরিতি" নিত্য সুখাভিব্যক্তিই মুক্তি। সেশ্বর সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে "লিঙ্গ-শরীরের নাশের পর পরম আত্মায় জীবাত্মার লয়প্রাপ্তির নামই মুক্তি।" ব্যাস এবং যোগবাশিষ্ঠের মতে অবিদ্যার নাশের পর আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর জৈনাচার্য্যদিগের মতে "আত্মার সর্ব্ববিধ বিশুদ্ধিই মুক্তি।" শ্রুতি বলিতেছেন—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং,
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেব আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং,
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥"

"যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বেদসকলের উদয় করিয়াছেন, আমি মুক্তি লাভের ইচ্ছায় আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক সেই পরমদেবের শরণাপন্ন হইলাম।"

এই সকল মতামতের আলোচনা করিয়া মহামুনি শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রে বলিতেছেন যে,—

"চেত্যাচিতোর্ন তৃতীয়ম্"

প্রকৃতি এবং পুরুষের অতিরিক্ত তৃতীয় পদার্থ এই বিশ্বসৃষ্টিমধ্যেই নাই। চিৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম; চেত্যা শব্দের অর্থ প্রকৃতি। "সর্ব্ব খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্বই ব্রহ্ম, পাছে এই শ্রুতিবাক্যের বিরোধী

হইতে হয়, এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য শাণ্ডিল্য মুনি নূতন সূত্রে বলিতেছেন,—

"শক্তিত্বান্নানৃতং বেদ্যম্"

বেদ্য অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের শক্তিস্বরূপা, অতএব মিথ্যা নহে। প্রকৃতি—মায়া যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির কার্য্যও সত্য—সৃষ্টিও সত্য এবং সনাতন।

এইবার শ্রেয় এবং প্রেয়, এই দুইয়ের বিচার করিতে হয়। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, শ্রেয় প্রেয় হইতে স্বতন্ত্র। এই উভয়ের মধ্যে শ্রেয়-সাধক কুশল-ভাগী হইয়া থাকেন, প্রেয়-সাধক পরমার্থ হইতে বঞ্চিত থাকেন। শ্রেয় ও প্রেয় এই সংসারে যেন জড়াইয়া মাখাইয়া রহিয়াছে। জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেয়কে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহারই সাধনা করেন, আর মূর্খে অনিত্য সুখের অভিলাষে প্রেয়ের সাধনা করেন। তন্ত্র বলেন যে, এই শ্রেয়কে প্রেয় করিতে হইবে এবং প্রেয়কে শ্রেয় করিতে হইবে, তবেই ত সাধনার বাহাদুরি। ইহাই তন্ত্রের বিশিষ্টতা। উত্তরে ভক্তিশাস্ত্র বলেন যে, শাস্ত্রবিহিত যাহা শ্রেয় তাহাকেই শ্রেয় বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এবং সেই শ্রেয়ের সাধনা করিতে হইবে। এই শ্রেয় অনেক ক্ষেত্রে তোমার-আমার কাহারও প্রেয় নহে, কোন কালে প্রেয় হইবে কি না সে পক্ষে সন্দেহ আছে; যে হেতু শাস্ত্র উহাকে শ্রেয় বলিতেছেন, সেই হেতু উহাকে যেমন করিয়া হউক প্রেয় বিবেচনা করিয়া উহারই আরাধনা করিতে হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণের বিবৃত মধুর রসের সাধনা ব্যাপারে শাণ্ডিল্যের শাস্ত্রশাসনের এই কঠোর নিয়মটা অনেকটা শিথিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, এই শ্রেয় এবং প্রেয়ের বিচার লইয়া শাস্ত্র একটা বিষম বিতণ্ডা উত্থাপিত করিয়াছেন। সুখের অত্যন্ত নিবৃত্তি যদি মুক্তি হয়, এবং মুক্তিই যদি ঈপ্সিত হয়, তাহা হইলে যাহা প্রেয় তাহাই ত আমার শ্রেয় হওয়া উচিত। আমি সর্ব্বজ্ঞ হইলে, আমার যাহা প্রেয়, তাহাই আমার শ্রেয় হইত। যে হেতু আমি সর্ব্বজ্ঞ নহি, যে হেতু দেহী আমি দেহগত সুখ দুঃখ লইয়া সদা ব্যস্ত থাকি, সেই হেতু আমার বুদ্ধিতে যাহা প্রেয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা সর্ব্বথা এবং সর্ব্বকালে আমার পক্ষে শ্রেয় নহে। অতএব যাঁহারা পরিণামদর্শী, জ্ঞানময় পুরুষ, সেই তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিমুনিগণ যাহাকে শ্রেয় বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়াছেন, তাহাকেই শ্রেয় বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। তন্ত্র বলেন, অত বিতণ্ডার মধ্যে আমি যাইতে চাহি কেন! এই সংসারে আমি দেখিতেছি যে, আমি আছি—আমি দ্রষ্টা, আমি ভোক্তা, আমিই সব; আর দেখিতেছি একটা শক্তি আছেন, সেই শক্তির প্রভাবে আমার ইন্দ্রিয়-সকল কার্য্য করিতেছে, আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, আস্বাদন করিতেছি, অনুভব করিতেছি—সেই শক্তির প্রভাবে জগতের সকল পদার্থ আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতেছে। অতএব এই শক্তিকে ধরিতে পারিলে আমার কাজ অনেকটা আগাইয়া যাইবে। শক্তিকে চিনিতে পারিলে আমি আমাকে চিনিব, তাঁহাকেও চিনিব। চিনি না, জানি না বলিয়াই ত যত গোল। এক বার আত্মপরিচয় হইয়া গেলেই ত সকল ধোঁকা দূর হয়। অতএব শ্রেয়-প্রেয়ের বিচারে কোন প্রয়োজন নাই, তোমার অধিকার অনুযায়ী সাধনপথ অবলম্বন করিয়া তুমি শক্তিরূপিণী প্রকৃতিকে ধরিতে জানিতে চিনিতে চেষ্টা কর। পুরুষ এবং প্রকৃতি ছাড়া সংসারে অন্য তৃতীয় পদার্থ নাই। যে প্রকৃতির লীলারসে তুমি পরম পুরুষের অংশরূপে জীবদেহ-অবচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হইয়াছ, সেই প্রকৃতিকে পাইলেই শ্রেয় প্রেয় সব এক হইয়া যাইবে, বুদ্‌বুদ সাগরে মিশিয়া যাইবে। তন্ত্র, বেদ উপনিষদের উপর, ভক্তিসূত্রের সিদ্ধান্তের উপর এই ভাবে সমাধান করিয়া কেবল কর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তন্ত্র বলিতেছেন, যেমন খেজুর গাছে না উঠিলে, যথারীতি গাছ কামাইয়া দিয়া, ভাঁড় না বসাইলে রস পাওয়া যায় না, তেমনি কর্ম্ম না করিলে, অহঙ্কার-রূপ খেজুরের গলা কাটিয়া একনিষ্ঠার ভাঁড় টাঙ্গাইয়া না দিলে, ভক্তির রস চোয়াইয়া তোমাতে সঞ্চিত হইবে না। আচার্য্য স্বপ্নেশ্বর বলেন যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির সহায়ক মাত্র। তন্ত্রে ব্রহ্মানন্দ গিরি বলিয়াছেন যে, আচার্য্যের কথা ঠিক বটে; পরন্তু জ্ঞানের জ্যোতি সাহায্যে কর্ম্মী যথাবিধি কর্ম্ম না করিলে তাহার পক্ষে ভক্তিরস লাভ দুষ্কর হইয়া পড়ে। যাহা সহায়ক বা সাধক তাহার চর্চ্চা গোড়ায় করিতে হয়, তবে পরে ঈপ্সিত লাভ হয়। অতএব সর্ব্বাগ্রে অবহিত চিত্তে কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্মের মুখে অভিজ্ঞতার জ্ঞান আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবে। কোন কোন উপনিষদ্ বলেন যে, জ্ঞান ফুটিলে সকল অন্ধকার দূর হয়, কর্ম্ম ও ভক্তি কাহারও প্রয়োজন হয় না। কেন না "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এবং "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমম্" এই দুই

সূত্রে জ্ঞানের প্রাধান্য লক্ষিত হইতেছে। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ, এবং ব্রহ্মজ্ঞ যিনি, তিনি পরম পুরুষকে লাভ করিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ, যথা ব্রহ্মসূত্র—

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ।
আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"

অর্থাৎ—

"আনন্দই ব্রহ্ম ইতি তত্ত্বজ্ঞানোদয়।
আনন্দ সম্ভূত সর্ব্বভূত সুনিশ্চয়॥
আনন্দে সঞ্জাত ভূত আনন্দে জীবিত।
চরমে পরমা গতি আনন্দে মিলিত॥"

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বুঝাইতেছেন যে, আনন্দময় আত্মা রসস্বরূপ; সেই রসাস্বাদন-সাধনাতেই জীবের আনন্দ লাভ হয়। এই রসই ভক্তি। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আনন্দ রস ভক্তি আপনা আপনি উৎপন্ন হইবে। তন্ত্র বলিতেছেন, জ্ঞানও ত কর্ম্মসাপেক্ষ; কাজেই কর্ম্মের হাত কেহ এড়াইতে পারিতেছেন না। গোড়ায় কর্ম্ম করিতেই হইবে। বাজে কর্ম্ম করিয়া প্রয়োজন নাই; যিনি ব্রহ্ম হইতে আমাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই জগন্মায়া মহামায়া আদ্যাশক্তি শিবপ্রসূতিকে ধরিবার চেষ্টা করা যাউক। যত জীব তত শিব, কেন না, শ্রুতি বলিতেছেন, "সোঽকামত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি, স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ"—

"বহু হ'য়ে জনমিব এই ইচ্ছা করি,
আত্মতপে তপ্ত হ'য়ে সগুণত্ব ধরি,
এ সমস্ত যাহা কিছু—অখিল ভুবন;
স্ব ইচ্ছায় ইচ্ছাময় করিলা সৃজন॥"

কাজেই জীবকে ধরিতে পারিলে, শিবকে ধরা যাইবে। এই শ্রুতি হইতেই তন্ত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যাহা নাই দেহভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। অতএব দেহতত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বুঝা যাইবে। ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বুঝিলেই স্বয়ং ব্রহ্মকে বুঝিতে পারা যাইবে। ব্রহ্মাণ্ড আমার

আয়ত্তে নহে, দেহভাণ্ড কিন্তু আমার আয়ত্তে। বিদ্যার্থীকে যেমন মানচিত্র দেখাইয়া এই মেদিনীমণ্ডলের বিন্যাস বুঝান হয়, সাধককেও তেমনি দেহভাণ্ড দেখাইয়া ব্রহ্মাণ্ডের অনুমান স্থির করিতে শিখান হয়। দেহের কুণ্ডলিনী শক্তি এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি শক্তি—দু-ই এক। কুণ্ডলিনীর ক্রিয়া বুঝিতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডের চেষ্টা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই পরিচয় পাইলে শ্রেয় এবং প্রেয়ের পার্থক্য থাকিবে না। যাহা শ্রেয় তাহাই প্রেয় হইবে, যাহা প্রেয় তাহাই শ্রেয় হইবে। তন্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিয়া কৃষ্ণানন্দ বৃহৎতন্ত্রসার রচনা করিয়া গিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলেন যে, জীব ও ব্রহ্ম নিত্য পৃথক্, উহাদের আর এক করিয়া প্রয়োজন নাই। পুরুষ এবং প্রকৃতির নিত্য লীলায় সৃষ্টির বিকাশ। জীব আমি সেই লীলাই দেখিব—দেখিয়া সুখী হইব। সুখটুকু আমার ঈপ্সিত, কিন্তু যাহাতে সুখ তাহাতে বুদ্‌বুদের ন্যায় ডুবিয়া যাওয়া আমার ঈপ্সিত নহে। চিনি হইব না, চাটিয়া চাটিয়া, তারাইয়া তারাইয়া চিনি খাইব, আর আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিব। তোমাদের যেমন নানা রকমের চিনি আছে, আমারও তেমনি শান্ত, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি নানা রকমের চিনি আছে। আমি এক একটা চিনি সাধ মিটাইয়া খাইয়া, নূতন রকমের চিনি চাটিতে আরম্ভ করিব। এই ভাবে আমার কোটিকল্প কাটিয়া যাইবে। আমার ইহাতেই সুখ, ইহাতেই তৃপ্তি। স্বপ্নেশ্বর আচার্য্য এ সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করেন নাই।

"অস্তু জ্ঞানং চার্চ্চনাদি ক্রিয়াস্তু
স্তত্যং সর্ব্বং বাসুদেবাশ্রয়ত্বাৎ॥
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রার্থয়েঽহং তু ভক্তিং
তাং যা চিত্তে গোপিকানাঞ্চকাস্তি॥"
"মাথায় থাকুক জ্ঞান, অর্চ্চনাদি কৃত্য।
কৃষ্ণের-সম্বন্ধ-হেতু সে সকলি-স্তুত্য॥
আমি কিন্তু পুনঃ পুনঃ সেই ভক্তি চাই।
গোপীদের চিতে যাহা জাগিত সদাই॥"

এই ক্ষেত্রে ভক্তিই সাধ্য এবং সাধনা—উভয়ই। তোমাতে মিশিতে চাহি না, তোমাময় হইতে চাহি না—চাহি তোমাকে দেখিতে, শুনিতে,

ভাবিতে—চাহি তোমাকে লইয়া সাধ মিটাইয়া খেলা করিতে—যাহা করিলে তোমাতেই আমার সকল আসক্তির ও প্রবৃত্তির পর্য্যবসান ঘটে, চাহি তাহাই করিতে।

"স্মরণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

এই কয় উপায়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র কর্ম্মের কল্পনা করিতে পারেন না। যাহা কিছু করিব সকলই তোমার পূজা হইবে—ইহাই তন্ত্রের এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত।

শ্রুতি, তন্ত্র এবং ভক্তির—এই ভিন্ন পন্থা লইয়া তিনটি বিরাট্ সাধন-পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে। সে সকল পদ্ধতির বিশ্লেষণ করিলে একটা বিশাল Philosophy বাহির হইবে। তন্ত্রের কথা যেমন অসীম, ভক্তি-শাস্ত্রের কথাও তেমনই অসীম। এক জীবনে সকল কথা বলা যায় না, এক মুখে সকল কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। তবুও যত দিন পারি, তত দিন তিনি বলাইলে এই ভাবে বলিতে থাকিব। ('প্রবাহিণী,' ২৯ ফাল্গুন ১৩২০)

ব্রাহ্মণ জাতি

চিরকালই বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের চাষ করিতে হইয়াছে। এ দেশে—বাঙ্গালা দেশে, ব্রাহ্মণ্যের গাছ চিরস্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে না। যেন মনে হয়, জল বায়ুর দোষে উহা মাঝে মাঝে মুষড়াইয়া যায়। অধুনা পুরাতত্ত্বের চর্চ্চাপ্রভাবে ইহা অনেকেরই বিশ্বাস হইয়াছে যে, আদিশূরের বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বহু বার পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশ হইতে সুপণ্ডিত ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আমদানি করিতে হইয়াছিল। আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আমদানি করিবার পর, পাশ্চাত্ত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের আমদানি করিতে হইয়াছিল। তাহাতেও যখন কুলাইল না, তখন দেবীবর মেলবন্ধন করিলেন; রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আচার-পদ্ধতির নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

বাঙ্গালায় কখনও—কোন কালে কোন যুগে—কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণের আদর নাই। যে সকল ব্রাহ্মণ এ দেশে আসিয়া আদর পাইয়াছেন, তাঁহারা চরিত্রের গুণে, পাণ্ডিত্যের ও সাধনার প্রভাবে সে আদর অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। একটা কিছু অলোকসামান্য,—একটা কিছু অতিপ্রাকৃত দেখাইতে না পারিলে খাঁটি বাঙ্গালী, ব্রাহ্মণের কাছে মাথা হেঁট করেন নাই। শুষ্ক গজারীস্তম্ভে আশীর্ব্বাদের অর্ঘ্য নিক্ষেপ করাতে তৎক্ষণাৎ সে স্তম্ভ মঞ্জরিত হইয়াছিল।—এই অতিপ্রাকৃত ঘটনা দেখিয়া তবে ত বাঙ্গালার লোকে আদিশূর-আনীত পাঁচ জন কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিমান হইতে পারিয়াছিল।

বাঙ্গালায় ন্যায়ের চর্চ্চা অতিমাত্রায় হওয়াতে বাঙ্গালী কাহারও কোন কথা সহজে হেঁটমুণ্ডে গ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গালায় তাই সকলে স্ব স্ব প্রধান। বাঙ্গালায় প্রত্যেকেই নিজের বুদ্ধির মাপকাটিতে অপরের কথা মাপিয়া-জুকিয়া তবে গ্রহণ করে। এখানে সম্প্রদায়ের প্রভাব নাই। এক জন একটা হুকুম করিল, আর বাঙ্গালাশুদ্ধ লোক সেই হুকুম অনুসারে কাজ করিল, এমন ঘটনা বাঙ্গালা দেশের কোন কালে, কোন যুগে ঘটে নাই। বাঙ্গালা দেশকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জগন্নাথের গোবর্দ্ধন মঠের অধীন রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা কিন্তু সে স্বাধীনতা স্বীকার করে নাই। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতও বাঙ্গালার সর্ব্বত্র গ্রাহ্য এবং মান্য হয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্তি-ধর্ম্মের সিদ্ধান্তসকল বাঙ্গালী গ্রাহ্য করে নাই। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রের উপদেশসকল বাঙ্গালী অবলম্বন করে নাই। কত আর দৃষ্টান্ত দেখাইব! বাঙ্গালা ভারতবর্ষের মধ্যে এক অপূর্ব্ব দেশ। বাঙ্গালী জাতি অপূর্ব্ব জাতি। এ দেশে রাজশক্তি ও সাধনশক্তি ছাড়া অন্য কোন শক্তি কেহ মানে নাই। বোধ হয়, ভবিষ্যতেও মানিবে না।

আদিশূরের সময় যখন পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আমদানি হয়, তখন ব্রাহ্মণ কায়স্থকে অবলম্বন করিয়া বঙ্গীয় সমাজে স্বীয় প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণকে কায়স্থ ও বৈদ্য জাতি হইতে বিচ্যুত করা চলে না। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ-বৈদ্য জাতিকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতে পারেন না। কায়স্থ-বৈদ্য জাতিও বাঙ্গালার আধুনিক ব্রাহ্মণ-সমাজকে পরিহার করিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে

পারেন না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য তিনের মধ্যে এই যে একটা অঙ্গাঙ্গী ভাবের সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধ ছিন্ন করিলে বাঙ্গালার অন্য সকল জাতি কেবল সংখ্যার পেষণে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। এ কথাটা এখন অনেক ইংরেজী শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ তলাইয়া বুঝেন না, বা বুঝিবার চেষ্টা করেন না। বাঙ্গালায় কিছু কম চৌদ্দ লক্ষ ব্রাহ্মণ, ১১॥ লক্ষ কায়স্থ, এবং ৮৮ হাজার বৈদ্য হইবে। আর রাজবংশী ২০ লক্ষ; নমঃশূদ্র ২৭ লক্ষ; কৈবর্ত্ত ও পোদ ২২ লক্ষের কম হইবে না। সংখ্যায় অন্য সকল জাতি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক হইলেও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদ্য বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, অর্থ-সামর্থ্যে এবং সামাজিক ঘনিষ্ঠতায় অন্য সকল জাতি অপেক্ষা অতিমাত্রায় প্রবল। এই প্রাবল্য যে দিন নষ্ট হইবে, সে দিন হইতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের শ্রেষ্ঠতা নষ্ট হইবে।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাই। আজ কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় সাজিবার হুজুগটা খুব চলিতেছে। বৈদ্যের প্রতি ঈর্ষা-পরতন্ত্র হইয়া কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করেন। মনীষী সিবিলিয়ান্ স্যার হার্ব্বার্ট রিজলী বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ-বিন্যাসের গুপ্ত তত্ত্ব জানিতেন। তাই তিনি বৈদ্যে ও কায়স্থে একটা আড়াআড়ির সৃষ্টি করিয়া দেন। তাঁহার এই চালের ফলে কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় সাজিতে উদ্যত হয়। কিন্তু এ উদ্যমের সহায়তা ব্রাহ্মণে না করিলে তাহা ব্যর্থ হইতে পারিত। এই সময় বৈদ্য জাতিও আড়াআড়ির মোহে বিভ্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণ-সমাজকে হাতে রাখিতে ভুলিয়া যান। তাহার ফলে বাঙ্গালার শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয় বর্ণের দাবীর সমর্থন করেন। কায়স্থ ত ক্ষত্রিয় সাজিল, পাল্টা জবাবে বহু বৈদ্য নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যে স্বার্থের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল, তা এত কাল পরে ছিন্ন হইয়া গেল। অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন যে, অর্থোপার্জ্জনের এ উপায় ত মন্দ নহে;—পাঁতি দিলেই টাকা। পক্ষান্তরে রাজবংশী, পোদ, ঝালোমালো, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতিসকল দাবী করিয়া বসিল যে, তাহারাও ব্রাত্যক্ষত্রিয়। অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—বটেই ত। উপযুক্ত তৈলবট দিলে আমরা তোমাদিগকে ক্ষত্রিয় সাজাইয়া দিতে পারিব। ঘটিলও তাই। রাজবংশী, পোদ, ঝালোমালো প্রভৃতি

জাতি পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার প্রভাবে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইলেন। নমঃশূদ্র ও যোগী জাতি ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজেদের ঘোষণা করিলেন। ফলে কায়স্থ বলিয়া কায়স্থের প্রাধান্য আর রহিল না। কায়স্থও ব্রাত্যক্ষত্রিয়। রাজবংশী, ঝালোমালোও ব্রাত্যক্ষত্রিয়। নমঃশূদ্রও ব্রাহ্মণ, বৈদ্যও ব্রাহ্মণ। এখন ইহারা কায়স্থ বৈদ্যের সহিত পংক্তি-ভোজনের দাবী করিতে পারে। এমন কি এই ব্যাপার লইয়া নালিশ ফরিয়াদও চলে। একটি বিষম বিরাট্ সমাজ-বিপ্লবের সূচনা এখন হইতে হইয়া রহিল। জানি না, ভবিষ্যতে এ বিপ্লব কেমন আকার ধারণ করিবে।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালায় কেবল দুই জাতি আছে ও থাকিবে। তাহা ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। কায়স্থ ও বৈদ্য সৎশূদ্র, এবং ব্রাহ্মণের বাহক। এই দুই জাতির আচার ও ব্যবহার ব্রাহ্মণের ব্যবহারের অনুযায়ী হইবে। কথাটা বড় পাকা। দেশে হিন্দুয়ানি রাখিতে হইলে, পুরোহিত-জাতিকেও রাখিতে হইবে। হিন্দু ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাহাকেও পুরোহিতের পদে বরণ করিতে পারিবে না। আর এই ব্রাত্যত্বের হাঙ্গামায় অন্য সকল জাতি এক হইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং করিবেও। সেই একাকারের ফলে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর জাতি ছাড়া বাঙ্গালায় আর তৃতীয় জাতি থাকিবে না। মনে হয়, এই সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন যে, কলিকালে ব্রাহ্মণ শূদ্র ছাড়া তৃতীয় জাতি থাকিবে না।
('প্রবাহিণী,' ৬ চৈত্র ১৩২০)

তুমি ও আমি

আমি আমাকে চিনিলাম না, তোমাকেও জানিলাম না। অথচ আমি চাই তোমার সন্নিহিত হইতে,—তোমাতে মিশিতে। কি জানি কেন, আমার বড়ই একলা বোধ হয়,—এত একলা, এমনই নির্জ্জন বোধ হয় যে, এক এক সময়ে ভয়ে কাঁদিয়া উঠি। যাহাদের আমার আপনার বলিয়া হৃদয়ের উপর টানিয়া রাখিতে চাহি, তাহারা আমার হইয়া—আমার

মনের মতন হইয়া থাকিতে চাহে না,—বুঝি বা থাকিতে পারে না। মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধুবান্ধব সবাই নিজের নিজের সুবিধা দেখে, নিজ নিজ কর্ম্মফল অনুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া চলিয়া যায়। তাই আমি চাহি তোমাকে; যাহাকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না, নিয়তির ব্যবস্থা অনুযায়ী চলিতে হয় না, যাহার জনম-মরণ ভয় নাই, গতাগতির চিন্তা নাই—আমি চাই তোমাকে! তুমি আমার সাধ মিটাইতে পার, বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পার, আমার নির্জ্জনতার ভয় দূর করিতে পার;—তুমি যে অচ্যুত, অক্ষয়, অদ্বিতীয় ও অনন্ত! তাই আমি চাই তোমাকে।

"ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
পতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকম্
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্॥"

তুমি এমন বলিয়াই, আমি তোমাকে চাই। শোকে, দুঃখে, দারিদ্র্যে, রোগে—আমি তোমায় চাই; কেন না, তোমাকে যে আমি ঠিক আমারই মতন গড়িয়া তুলিতে পারি। তুমি আমার সাধ মিটাইতে বাঞ্ছাকল্পতরু সাজিয়া থাক, আমি যাহা চাই, তুমি তাহাই দিতে পার। তোমার কাছে আমার লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই—হৃদয়ের কবাট খুলিয়া আমি তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব দেখাইতে পারি—দেখাইয়াও থাকি। তুমি লজ্জা-নিবারণ, পতিতপাবন; তুমি অনাথের নাথ, অন্ধের যষ্টি; তুমি দরিদ্রের ধন, দুঃখীর জীবন—তুমি শান্তি, তুমি তুষ্টি, তুমি তৃপ্তি, তুমি স্থিতি—"ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি তুঁহু মোর"—আমি যে তোমায় চাই।

এই যে দেহী আমি—কেমন করিয়া, কোথা হইতে আসিলাম? তন্ত্র বলিতেছেন—

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রণীয়তে।
দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম্ম পুনর্দ্দেহে প্রলভ্যতে॥

যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং।
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি॥"
"প্রাক্তনং বলবৎ কর্ম্ম কোঽন্যথা তৎ করিষ্যতি।
দেহঃ কর্ম্মাত্মকঃ প্রোক্তস্তত্ত্বদ্দেবি প্রতিষ্ঠিতম্॥
চরাচরমিদং দেবি সর্ব্বং কর্ম্মাত্মকং প্রিয়ে।
মাতা কার্য্যং পিতা কর্ম্ম কর্ম্মৈব পরমো গুরুঃ॥"

অর্থাৎ অদৃষ্ট কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ আমার এই দেহ; পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্যই জন্মে জন্মে নানা জাতীয় দেহ ধারণ করিয়া ইহ সংসারে বিচরণ করিতে হয়। কর্ম্মের হাত এড়াইবার উপায় নাই; যেমন সহস্র ধেনুর মধ্যে বৎস স্বীয় জননীকে বাছিয়া লয়, তেমনই তোমার কর্ম্ম ঠিক তোমাকেই বাছিয়া লইবে। প্রাক্তন কর্ম্মকে কেহই অন্যথা করিতে পারে না, সকলকেই কর্ম্মভোগ করিতে হইবে। কর্ম্মফল অনিবার্য্য—অপরিহার্য্য। কর্ম্মই মাতা, কর্ম্মই পিতা, কর্ম্মই পরম গুরু, বিশ্বচরাচর কর্ম্মাত্মক ও কর্ম্মময়।

বেশ কথা। সংসারে দেহী হইয়া আসিলেই কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। সে ফল ভোগ করিবে কে? সে ফল দেহই ভোগ করিয়া থাকে এবং দেহসংলিপ্ত চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সে ফল ভোগ করিয়া থাকে। দেহাত্মবুদ্ধি জীবাত্মার তাই কর্ম্মেই অধিকার আছে। লূতাতন্তুর তন্তু বিস্তারের মতন সে কেবল কর্ম্মের তন্তু বিস্তার করিতেছে এবং ভোগ হইলে এক একটি করিয়া তন্তুর নাশ ঘটাইতেছে। কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের শৃঙ্খলা অনন্ত, যাবৎ জীব তাবৎ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল। কিন্তু ভোগী ও ভোগ ছাড়া যে একটা আমি, আমার এই দেহের মধ্যে লুকান আছে, তিনিও কেবল ভোগ চাহেন না। তিনি যেন আর কাহার সঙ্গে মিলিতে মিশিতে চাহেন—সমুদ্রবক্ষের ক্ষুদ্র বুদ্বুদটি ফাটিয়া সমুদ্রের অনন্ত জলবিস্তারে আত্মগোপন করিতে চাহে। এই যে আকাঙ্ক্ষা—আর এক জন কাহাকে ধরিবার বাসনা—আর এক জন পুরুষকে দেখিবার সাধ—ইহাই রস। এই রসে পূর্ণ যিনি,—তিনিই রসময়, সুখময়, সুধাময়, মধুময়। এই রসের এক আকার ভক্তি, অন্য আকার—প্রেম। এই রসের জন্যই আমি বহু হইতে চাই, বহুকে একে পরিণত করিতে চাই। আমি যখন তুমি, তুমিই যখন আমি, তখন এই রস

ভগবানের স্বরূপ; কেন না, এই রসের জন্যই তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাঁহার অস্তিত্বের অনুভূতি সম্ভবপর হয়।

মানুষ চাহে যে, আমি যত দিন থাকিব, তত দিন আমার যাহারা তাহারা আমার তুষ্টি ও তৃপ্তি সাধন উদ্দেশ্যে বজায় থাকিবে। কিন্তু এ সাধ কাহারও পূর্ণ হয় না। আমি থাকিতে পুত্র পৌত্র মরে, ভাই ভগিনী, পত্নী সহচরী, পিতা মাতা—সবাই মরে, সবাই আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়। আমার সাধ মিটে না, পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। তাই আমি এমন এক জনকে চাহি, যিনি, আমি যত দিন তত দিন আমার মতন হইয়া থাকিবেন। যাঁহার মৃত্যু নাই, রোগ-শোক নাই, শ্রান্তি-ক্লান্তি নাই—আমি তেমন এক জন চাই। কেবলই কি এইটুকু? যাঁহার দ্বারা আমার সকল সাধ মিটিবে—আমি তেমন এক জনকে চাই। তন্ত্র বলিতেছেন, তেমন এক জন তোমারই মধ্যে আছেন, তিনিই তুমি, তুমিই তিনি। তিনি তোমাতে আছেন—বিশ্বচরাচরে আছেন। বিশ্বচরাচরের ভাবনা নাই ভাবিলে, তোমার নিজের ভাবনা ভাবিয়া দেখ, তুমি তোমার তুমিত্বকে চিনিতে ও বুঝিতে পারিবে।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

উপাসকের সাধ মিটাইবার জন্যই চিন্ময়—জ্ঞানময়, অদ্বিতীয়, পূর্ণ ও নিষ্ফল, অশরীরী আত্মার নানাবিধ রূপ কল্পনা করা হয়। কেন কল্পনা করা হয়? আমি যে আমার আমিত্ব লইয়া তুষ্ট থাকিতে পারি না। আমি আর এক জনকে চাই—আমা ছাড়া দ্বিতীয় এক জনকে লইয়া আমার আসক্তির সাধ আমি মিটাইতে চাই। তাই তন্ত্রের গোড়ার কথাটা ভাল লাগে না; আমি আমার অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিতে যে পারি না। এই হেতু আমি আমার বাহিরে যাহা কিছু সুন্দর, মনোহর, উজ্জ্বল, মধুর দেখিতে পাই, তাহাকেই জড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করি। তন্ত্র জীবের এই প্রকৃতিগত অভাবের দ্যোতনাটুকু বুঝিয়াই বলিয়াছেন,—

"বিনা চোপাসনং দেবি
ন দদামি ফলং নৃণাম্।"

উপাসনা ব্যতীত অন্য কিছুতেই মানুষ ঈপ্সিত ফল লাভ করিতে পারে না। আমার যাহা নাই, তাহা পাইবার জন্য যে চেষ্টা—আকাঙ্ক্ষা,

তাহাই উপাসনা। আমি যদি আমাকেই সর্ব্বময় করিয়া দাঁড় করাইলাম, তাহা হইলে উপাসনা করিব কাহার? তাই আমি মনে করি যে, আমি দীনাতিদীন, দুর্ব্বল জীব, তুমি জ্ঞানময়, গুণময়, রসময় পুরুষ, তোমাকে পাইলে আমার সকল অভাব দূর হইবে, সকল পিপাসার নিবৃত্তি হইবে, সকল সাধ মিটিবে। এইটুকু মনে করি বলিয়াই তোমাকে মনের মত সাজে সাজাইয়া থাকি—তখন তুমি পিতা, মাতা, বন্ধু, সখা, গুরু, রাজা, পুত্র, কন্যা—নানা রূপে আমার হৃদয়-পটে ফুটিয়া উঠ। অচ্যুত হইতে কর্ম্মপ্রভাবে জীব চ্যুত হইয়াছে বলিয়াই তাহার মনে এই ক্রটির ভাব—ন্যূনতার ভাব সদাই জাগরূক থাকে। নহিলে জীব-শিব যখন অভিন্ন, তখন শিবের পূর্ণতা ও সদানন্দময়তা জীবের নিত্য প্রকট থাকিত। যে হেতু জীব শিব হইতে চ্যুত, কর্ম্মের দ্বারা সংবদ্ধ, সেই হেতু জীব সদাই অভাবগ্রস্ত, জীবের হৃদয়ের মধ্যে সদাই রাবণের চিতা হা হা করিয়া জ্বলিতেছে। রামানুজাচার্য্য-প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, জীবের চ্যুতি নিত্য, জীব কখনও শিব হইবে না; তবে জীবের এইটুকু অধিকার আছে যে পরমাত্মার—প্রকৃতিপুরুষের—শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলা দর্শন করিতে পারে, কিঙ্করের ন্যায় দূরে থাকিয়া মীনের মতন নির্নিমেষ নয়নে লীলা দেখিতে পারে। তন্ত্রের সাধনা অদ্বৈত তত্ত্বের পথানুগামিনী; বৈষ্ণবের সাধনা নিত্য দ্বৈত। বৈষ্ণব বলেন, দুই কখনও কি এক হয়? লীলা অনন্তকাল-স্থায়িনী, তাই সাধ্য ও সাধকও নিত্য বিযুক্ত; নিত্য প্রভিন্ন, নিত্য বিচ্ছিন্ন। তন্ত্র যেমন বেদ-উপনিষৎ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছেন, বৈষ্ণব আচার্য্যগণও তেমনি ঐ একই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, কেবল ব্যাখ্যার পার্থক্য ঘটাইয়া, স্বমত পোষণ করিয়াছেন।

তর্কের ও বিতণ্ডার কথা এখন থাকুক। যিনি যাহাই বলুন, কর্ম্মসদৃতি, কিন্তু, উভয় পক্ষেরই প্রায় সমান। তন্ত্র বলেন,—

"দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্।
তত্ত্বদ্বীজাত্মকং মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥"

যাহার যে ইষ্টদেবতা-মূর্ত্তি বীজ মন্ত্র হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব সেই বীজাত্মক মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মময় হইতে পার। তাই তন্ত্র বলেন, জপাৎ সিদ্ধিঃ—জপের দ্বারায় সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। বৈষ্ণব বলেন—

তাঁহার নাম ছাড়া অন্য কিছু ত জানি না, অতএব হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্‌—হরিনামই সার, হরিনামই সার, হরিনামই সারাৎসার জানিবে। জপের একটা মহিমা এই যে, নাম জপ করিতে করিতে হৃদয়ে এক একটা আসক্তির বিকাশ হয়। এক বার একটা আসক্তি প্রকট হইলে এবং তাহা ভগবানে আরোপিত হইলে, আর কোন দুঃখ থাকে না, আর কোন ভাবনা থাকে না। সেই এক রসে মুগ্ধ থাকিয়া একনিষ্ঠার প্রভাবে মন নিশ্চিন্ত হইতে পারে। ভক্তিশাস্ত্র বলেন যে, মানুষের হৃদয়ে একাদশটি আসক্তি আছে। এই এগারটি আসক্তির বিকাশ এগার ভাবে হইয়া থাকে। শ্রীভগবানকে মা বলিয়া ডাকিতে পার, পিতা বলিতে পার, সখা বলিতে পার—আর তদনুরূপ রূপের ধ্যান করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিতে পার। তন্ত্র বলেন, অত শত কল্পনা করিতে আমি পারি না। আমি জানি একটা শক্তির প্রভাবে আমি সঞ্জীবিত দেহী; সুতরাং এই শক্তিই আমার জননী। এই শক্তি আমার আমিত্বের জ্ঞানকে বেড়িয়া আমার দেহের সর্ব্বত্র বিসর্পিত রহিয়াছেন। এই কুণ্ডলিনী শক্তির আরাধনা করিতে পারিলেই সাধকের ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। মাতৃত্বের আরোপ ছাড়া ইহাতে আর কোন ভাবের আরোপ সম্ভবপর নহে। আচার্য্যগণ বলেন যে, যখন তিনি রসময়, তখন তাঁহাতে সকল রসেরই আরোপ সম্ভবে, তোমার ভাল লাগে, তুমি তাঁহাকে কেবল মা বলিয়া ডাকিতে পার; আমি তাঁহাতে নাগর, মাধব, বল্লভ, সখা, প্রভৃতি মধুর রসের সকল সম্বন্ধেরই আরোপ করিতে পারি। এই সম্বন্ধ আরোপ ব্যাপারে একটা পদ্ধতি নির্দ্দেশ করা আছে। সে পদ্ধতি রসতত্ত্বের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। তন্ত্র সাধনা, আরাধনা, উপাসনা স্বীকার করেন, রসের বিন্যাস করিয়া ভগবান্‌কে লইয়া খেলা করিতে চাহেন না। তন্ত্র ভক্তি মানেন, প্রেম স্বীকার করেন না। ভক্তিশাস্ত্র বলেন,—বাঃ! যাঁহাকে পিতা বলিতে পারি, মাতা বলিতে পারি, প্রভু, গুরু বলিতে পারি; তাহাতে কোন দোষ ঘটে না; আর স্বামী-নাগর-পতি-প্রেমিক বলিলেই যত দোষ? আমার যাহা, তাহা দিয়া আমি ভগবানের সেবা করিব—আমার আসক্তির আবার ভালমন্দের বিচার কি? প্রাণনাথ-জগন্নাথের কাছে এমন বিচার করিতে নাই—করিবার প্রয়োজন নাই—করিলে পাপ আছে।

ভালবাসার কোমল কমলাসনে পৃথক্ করিয়া তোমাকে বসাইয়া রাখিয়াছেন কেবল ভক্তিশাস্ত্র—মধুর রসের অবতার প্রেমময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

"সকলসকলচঞ্চদ্‌গোপবালাবলোক—
ব্যতিকরপরিষিক্তোল্লাসিতশ্রীবিলাসম্।
হসিতরসিতবম্মদ্বাললীলাতরঙ্গং
প্রণয়পরিণতাম্ভোরাশিমীনং প্রপদ্যে॥"

অখিল কলা(নৃত্যগীতাদি চৌষট্টি প্রকার)-সম্পন্ন গোপকন্যাগণের সপ্রেম দৃষ্টিসেচন যাঁহার শরীরে শ্রী উল্লাসিত হইয়াছিল, এবং যাঁহাতে হাস্যরূপ রসিতের সহিত বাল্যলীলার তরঙ্গসকল উত্থিত হইয়াছিল, প্রেমের গভীর সাগরস্বরূপ সেই ঈশ্বরকে আমি ভজনা করি।

"দ্রব্যং নেচ্ছতি নাপি বাঞ্ছতি গুণং কর্ম্মাপি নাপেক্ষতে
জাতিং নাঞ্চতি নো বিশেষময়তে সম্বন্ধবন্ধোজ্‌ঝিতঃ॥
ভাবাভাবকথাং বহিঃ কৃতবতী যো প্রীতিরুজ্জৃম্ভতে।
শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবারিজোজ্জ্বলদৃশাং তাং নিত্যমীহামহে॥

ব্রজবাসিনী কমলনয়নাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাদৃশী প্রীতি উচ্ছলিত হওয়ায় দ্রব্য শরীর বা অর্থ অপেক্ষা করে নাই, গুণের দিকে চাহে নাই, ভালমন্দ কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখে নাই, জাতি ও বংশমর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি দেয় নাই, কোনরূপ বৈশিষ্ট্যের বিচার করে নাই; সম্বন্ধ-বন্ধন একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং ভাব ও অভাব চিন্তাকে সর্ব্বপ্রকারে হৃদয়ের বাহিরে রাখিয়াছিল, আমিও নিত্য শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশী প্রীতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি।

সে প্রীতি—কেমন? পরে বলিব। ('প্রবাহিণী,' ১৩ চৈত্র ১৩২০)

ভক্তি ও আসক্তি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভক্তি বা রস একাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া মহর্ষি নারদ একাদশ আসক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। নারদ বলিয়াছেন যে, ভক্তি একরূপ হইয়াও একাদশ প্রকার আকার ধারণ করিয়াছে। যথা—

(১) গুণমাহাত্ম্যাসক্তি ;—রাজা পরীক্ষিৎ, নারদ, হনুমান, পৃথুরাজা (যিনি হরিগুণ শ্রবণ জন্য দশ সহস্র বর্ষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন) প্রভৃতি গুণমাহাত্ম্যাসক্ত ভক্ত। ভগবানের গুণে ও মহিমা-কীর্ত্তনে যে মোহ বা আসক্তির উন্মেষ ঘটে, তাহাকেই গুণমাহাত্ম্যাসক্তি বলে।

(২) রূপাসক্তি ;—শ্রীকৃষ্ণের বালগোপালরূপে নন্দোপনন্দ যশোদাদি এবং কিশোররূপে ব্রজনারী, ব্রজের গোপাল আদি রূপাসক্ত ভক্ত। জপের ফলে হৃদয়ে যে রূপের অভ্যুদয় ঘটে, সেই রূপের প্রতি যে অত্যন্ত অনুরাগ, তাহাকেই রূপাসক্তি কহে।

(৩) পূজাসক্তি ;—পৃথুরাজা পূজাসক্ত ভক্ত। গুণমাহাত্ম্যাসক্তি ও পূজাসক্তির মধ্যে একটু সাদৃশ্য আছে। তবে গুণমাহাত্ম্যাসক্তির প্রয়োগ কেবল শ্রবণের সাহায্যে হইয়া থাকে, রূপাসক্তি কেবল নয়নের সাহায্যে ফুটিয়া উঠে, পূজাসক্তিকে শ্রবণ, নয়ন ও হস্ত যুগলের সাহায্যে ভাব ফুটাইতে হয়।

(৪) স্মরণাসক্তি ;—প্রহ্লাদ স্মরণাসক্ত ভক্ত। ধৃতির সাহায্যে এই আসক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। সাধুসজ্জনের মুখে ভগবানের গুণের কথা শুনিয়া, স্মৃতির সাহায্যে তাহারই সর্ব্বদা আলোড়ন করিলে স্মরণাসক্তির উন্মেষ হয়।

(৫) দাসাসক্তি ;—হনুমান, অক্রূর, বিদুরাদি ভগবানের দাসাসক্ত ভক্ত। ভগবানের কিঙ্করতার যে সাধ তাহাকেই দাসাসক্তি বলে। শ্রীরামানুজাচার্য্য এই আসক্তির বিশ্লেষণ করিয়া উহারই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণ দাসাসক্তির আদর্শ পুরুষ।

(৬) সখ্যাসক্তি ;—অর্জ্জুন, সুগ্রীব, উদ্ধব, কুবের, সুবল, শ্রীদামাদি সখ্যাসক্ত ভক্ত। দ্রৌপদী আদর্শ সখী। সখা, মিত্র, সহচর বোধে ভগবানের প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ করিতে হয়, তাহাকেই সখ্যাসক্তি বলা হয়।

(৭) কান্তাসক্তি ;—রুক্মিণী, সত্যভামা এবং ব্রজগোপিকাগণ কান্তাসক্তির প্রভাবে ভক্তিমতী। এই আসক্তির বিকাশে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ করিতে হয়, সর্ব্বাঙ্গের ব্যবহার করিতে হয়—তনু ও মন সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিতে হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই ভাবের ব্যাখ্যাতা।

(৮) বাৎসল্যাসক্তি ;—নন্দ, যশোদা, কৌশল্যা, দশরথ, কশ্যপ আদি বাৎসল্যাসক্ত ভক্ত। ভগবান্‌কে স্বীয় পুত্র বা কন্যারূপে কল্পনা করিয়া তদনুসারে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতে হয়। এই বাৎসল্যা-সক্তির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তন্ত্র অতি সুন্দরভাবে করিয়াছে।

(৯) আত্মনিবেদনাসক্তি ;—বলিরাজা আত্মনিবেদনাসক্ত ভক্ত। আমার যাহা কিছু তাহা তোমার ; আমার ধন ঐশ্বর্য্য, মানমর্য্যাদা, সংসারে প্রতিষ্ঠার আমার যাহা কিছু আছে তাহা তোমারই—তোমাকেই দিলাম। এই ভাবকে আত্মনিবেদনাসক্তি বলা হয়।

(১০) তন্ময়তাসক্তি ;—স্বয়ং মহাদেব অভেদভাবে তন্ময়তাসক্ত ; শ্রীমতী রাধিকা প্রেমের প্ররূঢ়তাবশতঃ তন্ময়তাসক্তা ভক্তিমতী। দেহস্থ আত্মাকে পরমাত্মার অংশরূপে—তাঁহার স্ফুরণ রূপে মনে করিয়া সেই পরম পুরুষে লীন হইবার চেষ্টা করিলেই এই আসক্তির উন্মেষ ঘটে। তন্ত্রে ইহার সুন্দর বিশ্লেষণ আছে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে মধুব্রাহ্মণে ইহার পর্য্যাপ্ত ব্যাখ্যা আছে।

(১১) পরমবিরহাসক্তি ;—শ্রীকৃষ্ণ ধরাধাম ত্যাগ করিবার পর গোপীগণ যে বিরহে প্রমত্তা হইয়াছিলেন, তাহাই কতকটা পরম বিরহা-সক্তির পরিচয়। তন্ত্র বলেন যে, শ্রীভগবান্ অচ্যুত, তিনি পূর্ণ এবং নিষ্কল ও সকল বলিয়া তিনি অচ্যুত। তিনি যখন সর্ব্বময়—জগন্ময়—বিশ্বময়, তখন তাঁহার চ্যুতি কোথায় হইবে? কিন্তু মায়াবশতঃ জীবদেহবিশিষ্ট আত্মা নিজকে চ্যুত বা স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে। তখন সে ভগবান্‌কে নিজের বাহিরে বিশ্বচরাচরে খুঁজিতে থাকে, এই অন্বেষণ পরমবিরহাসক্তির দ্যোতক। কোথায় তুমি অনাথের নাথ, পতিতপাবন ; আমি তোমাকে হারাইয়া, তোমা হইতে চ্যুত হইয়া বালুকাকণার মত সমীর সঞ্চালনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছি, কিছুতেই আমার তৃপ্তি নাই, তুষ্টি নাই—কোথায় তুমি—দেখা দেও, আমাকে তোমার চরণছায়ায় রক্ষা কর। এই উপাসনা বা ভাব পরমবিরহাসক্তির কতকটা পরিচায়ক। শ্রীমতী রাধিকা পরমবিরহাসক্ত সাধিকা। শ্রীচৈতন্য এই আসক্তির ভাব ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন।

শাস্ত্র বলিতেছেন যে, মানুষের একাদশটি ইন্দ্রিয় আছে। সেই একাদশটি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-কারণ অনুসারে একাদশ আসক্তির উদ্ভব।

এই একাদশ আসক্তিকে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের দ্বারা গুণ করিলে তেত্রিশটি আসক্তি হয়। নারদ বলেন যে, এই এক একটি আসক্তি ভগবানে প্রযুক্ত হইলে কোটি রূপে ও কোটি গুণে বর্দ্ধিত হয়। অতএব এই তেত্রিশটি আসক্তিকে কোটি গুণ করিলে তেত্রিশ কোটি রূপ হয়। পুরাণে এই ভাক্ততত্ত্বের কথাটা রকম করিয়া বলিতে যাইয়া বলা হইয়াছে যে, তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে; অর্থাৎ ভক্তের অনুরাগের মুখে শ্রীভগবানের তেত্রিশ কোটি রূপ হৃদয়-পটে উদ্ভাসিত হইতে পারে।

এইবার 'রস' শব্দের আচার্য্যগণ কি ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিতে হইবে। 'রস' বলিতে শৃঙ্গার রসের স্থায়ী ভাব "রতি"ই বুঝিতে হয়। ঐ স্থায়ী ভাব যখন দেবাদি-বিষয়ক হয় তখন উহা রতি নামে প্রসিদ্ধ হয়, যখন কান্তা-বিষয়ক হয় তখন ব্যক্ত অর্থাৎ বিভাবাদি সহযোগে, এক প্রকার আনন্দকর আস্বাদের উৎপাদক হইয়া 'শৃঙ্গার' নাম ধারণ করে। রতি বলিতে অনুরাগ ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। ঐ অনুরাগই কান্তিরূপ আলম্বন-বিভাব, চন্দ্রোদয় প্রভৃতি উদ্দীপন-বিভাব, কটাক্ষাদি অনুভব, এবং চিন্তা-হর্ষ প্রমুখ সঞ্চারি-ভাবের সহিত মিলিত হইয়া নাটকে অভিনয় স্বরূপ, আর কাব্যে ব্যঞ্জনাদি জন্য উপস্থিতি স্বরূপ আনন্দকর অনুভব-বিশেষের সংযোগবশতঃ 'রস'-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্থায়ী ভাব এবং রস এই উভয়ের মধ্যে কিছুই ভেদ নাই। শ্রীপাদ আচার্য্য বলেন, 'রস' এই শব্দটি উৎকট ইচ্ছার বাচক, কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে এই রস শব্দটি ইচ্ছা বা অভিলাষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে মনের অনুকূল আলম্বনজনিত সুখানুভব-বিষয়ক উৎকট ইচ্ছাই প্রীতি, আনুরক্তি, এবং রাগ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। তথাবিধ ইচ্ছারহিত জ্ঞানের উপকরণসকলকে সঙ্কুচিত করিয়া ব্রহ্মরূপ আনন্দ সাক্ষাৎকারের হেতু হয়। শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—

"ন ক্রিয়া, কৃত্যানপেক্ষণাৎ, জ্ঞানবৎ।"

ভক্তি ক্রিয়া নহে, কারণ ইহা যত্নের অপেক্ষা রাখে না; যেমন জ্ঞান।

ভক্তি ক্রিয়াস্বরূপা নহে, কেন না, উহা যত্নের অপেক্ষা রাখে না। পুরুষের প্রযত্ন ব্যতিরেকে জন্মায় বলিয়া ভক্তির উৎপত্তির প্রতি কোনরূপ প্রযত্ন বা মনুষ্য ব্যাপারের অপেক্ষা হয় না। যাহার উৎপত্তির প্রতি

উহাকে ক্রিয়া বলা যায় না। সকল পুরুষের প্রযত্ন অপেক্ষিত না হয়, কিন্তু কখনও কাহারও প্রাক্তন সময়ে সকলের উপর কিছু প্রীতি হয় না, অদৃষ্টজনিত সংস্কার-বিশেষের প্রভাবে বিষয় অর্থাৎ প্রীতির পাত্রের সহিত সম্বন্ধ ঘটিলেই প্রীতি জন্মে। ঐ প্রীতিও নিজের উৎপত্তির প্রতি কোনরূপ প্রযত্ন বা মনুষ্য ব্যাপারের মুখাপেক্ষা করে না। অতএব ভক্তি ক্রিয়া নহে। তাই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, অনেক পূর্ব্বজন্ম-পরম্পরা-চরিত তপশ্চরণ এবং যজ্ঞাদি সৎকার্য্যজনিত শুভাদৃষ্টের পরিপাক নিবন্ধন ভগবৎপ্রসাদসম্ভূত ভগবৎপ্রীতির উন্মেষ হইয়া থাকে। এইখানে তন্ত্র আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন। তন্ত্র বলিতেছেন, যখন ভক্তি প্রযত্নসাপেক্ষ নহে, তখন ভক্তিকে পার্শ্বে রাখিয়া কর্ম্মের *প্রাধান্য* স্বীকার কর। কর্ম্ম সকলের আয়ত্ত, অধিকার অনুসারে কর্ম্ম করিতে সকলেই পারে। কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞানের উন্মেষ হইবে, জ্ঞানোদয় হইলে অনুরাগ বা রসস্বরূপা ভক্তি কমলোন্মীলনের তুল্য আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিবে। তন্ত্র বলিতেছেন,—তোমার *পুঁজি ত দেহ*; উহাই তোমার মূলধন, উহাই তোমার সংসার বেসাতির কড়ি। ঐ দেহে ছয়টা রিপু আছে, এগারটা ইন্দ্রিয় আছে, এগারটা আসক্তি আছে, এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি আরও কত কি আছে। তুমি দুঃখ দূর করিবার জন্য, সুখ লাভের আশায় এই দেহের সাহায্যে সুখের হাট বাজার বসাইয়া থাক। সে সুখ চিরস্থায়ী হইয়া থাকে না, সে সুখ দুঃখের নামান্তর হয়। অতএব এমন কিছু চাই, যাহার প্রাপ্তিতে আর কখনও দুঃখের শঙ্কা থাকিবে না। বেশ কথা। তোমার এই ঈপ্সিত বিষয়ের জন্য দুইটা প্রশস্ত পথ আছে। প্রথম কর্ম্মের পথ, দ্বিতীয় অনুরাগের বা রসের পথ। অনুরাগ চেষ্টা করিয়া ঘটে না, উহা আপনি আসে, আপনি যায়; উহা ক্রিয়া নহে, প্রযত্নসাপেক্ষ নহে। কর্ম্ম; তোমার পূর্ণায়ত্তে আছে। জপ, ষট্‌-চক্রভেদ, যজ্ঞ, সাধনা ও আরাধনা কর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে। তোমার সামর্থ্যে যতটুকু কুলায়, ততটুকু কর্ম্ম তুমি করিতে পার। যিনি তোমাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি তোমার আত্মা, সেই আত্মা শিবস্বরূপ। তিনি আছেন, এই মাত্র। তাহা বেষ্টন করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজ করিতেছেন। দেহের পঞ্চ কোষে এই শক্তি পরিব্যাপ্তা। এই শক্তির প্রভাবই তোমার জীবত্ব,

তোমার ষড়রিপুর বিকাশ, একাধারে আসক্তির উদ্ভব। পার যদি তবে এই শক্তিকে আয়ত্ত কর, তোমার আত্মদর্শন ঘটিবে।

আর ভক্তির পথে যদি যাও, তাহা হইলেও একটা সদুপায় বলিতে পারি। তুমি দেহী, তোমাতে আসক্তি ত আছেই। তোমাতে নানারূপ পিপাসা আছে। সেই একটা পিপাসাকে ঈশ্বরে সমর্পণ কর; যদি তাহাও না পার, তবে সেই পিপাসার বিষয়-বিশেষকে অবলম্বন করিয়া তাহাতেই সর্ব্বস্ব নিবেদন কর। যেমন বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বেশ্যাকে প্রাণ মনঃ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়া, সে বেশ্যাপ্রীতি এক কথায় ভগবানের চরণে অর্পিত হইয়াছিল। ভাবের ঘরে চুরি করিও না, প্রাণ ঢালিয়া ভালবাস, তোমার উদ্ধারের পথ আছেই। অথবা, তুমিও ভোগী—তুমি ভোগ করিতে চাও। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিজে ভোগ না করিয়া প্রসাদভোজী হও না কেন! তোমারই সব, তুমিই সব বটে, কিন্তু তুমি একটা দেবতা খাড়া করিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবায়েৎ হইয়া থাক না কেন। পাথরের বা কাঠের দেবতা কিছু হাত পা বাহির করিয়া খাইবে না। তুমি তাঁহাকে দেখাইয়া, তাঁহাকে নিবেদন করিয়া তাঁহারই সামগ্রী, তাঁহারই অনুমতিক্রমে ব্যবহার করিতে পার; ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদভোজী হইতে পারিলে যে সুখ আছে, সর্ব্বাগ্রে তোমার সে সুখ লাভ হইবে। মমত্ববোধের তীব্রতা জন্য দুঃখের ও নৈরাশ্যের দংশনজ্বালা অনেকটা কমিয়া যাইবে। দুঃখের লাঘব হইবে, সুখের উপচয় হইবে। অতএব দেবতার ঘর-সংসার পাতাইয়া নিজে প্রসাদভোজী হইয়া থাক।

শেষ কথা। যখন তুমি জীব, তখন তোমার ভয় আছেই—মরণ-ভয় আছে, দুঃখভয় আছে; শোকভয় আছে। জীবনের কোন এক সময়ে ভীত হইয়া তোমাকে কোন অজ্ঞেয় শক্তির উপাসনা করিতেই হয়। অথবা, বিহ্বল হইয়া তোমা অপেক্ষা প্রবলতর কোন শক্তির অন্বেষণ-চেষ্টা তোমাকে করিতেই হয়। কদাচিৎ কোটি মনুষ্যের মধ্যে একটি মনুষ্য ভাগ্যক্রমে সুখে দিন কাটাইয়া যাইতে পারে, তাহাকে আর শক্তিধর পুরুষের আরাধনা করিতে হয় না। কিন্তু সংসারের নিয়ম এই যে, জীব মাত্রকেই ভয়ে ভীত হইয়া শক্তিধর পুরুষের আরাধনা করিতেই হয়। যাহা চাই তাহা পাই না, যাহা পাই তাহা রাখিতে পারি না, কে একটা প্রবলতম, শক্তিধর পুরুষ আমার হাত মোচড়াইয়া আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া

লইয়া যায়। যখন কাড়ে তখনই কাতর কণ্ঠে, দুর্ব্বল জীবের মত তাহারই আরাধনা করি। তাঁহাকে মা, বাবা, ভাই, বন্ধু, গুরু, রাজা, প্রভু, ঈশ্বর বলিয়া ডাকিতে হয়। এই ডাকই—এই আহ্বানই উপাসনার মূল। যখন ডাকিতেই হয়, তখন যে ভাবে ডাকিব সেই ভাবটাকে স্থায়ী করিয়া, সেই ভাবকে আকারে পরিণত করিয়া, আসক্তির সাহায্যে সেই ভাবে মশগুল হইয়া থাকিব না কেন? এই জিজ্ঞাসা হইতেই সাধনা-পদ্ধতির বিন্যাস ঘটিয়া থাকে। এই জিজ্ঞাসার উত্তরে একাদশ আসক্তির তেত্রিশটি রূপ গড়িয়া মনের মত একটা রূপ ধরিয়া সেই রূপেই ডুবিয়া থাকিতে হয়। উহাই ভক্তিসাধনা। ভক্তিসূত্রেই বলা হইয়াছে—

"ঈশ্বরতুষ্টেরেকোঽপি বলী।"

ঈশ্বরতুষ্টির নিমিত্তে একটা আসক্তিই কার্য্যকারিণী হইয়া থাকে। এক ভাবে উঠিতে পারিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়।

নারদ বলিতেছেন, ইষ্টদেবতা ঠিক হইলে, তাহাতে আসক্তি স্থিরা হইলে "তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকন্তস্মিন্নেব করণীয়ম্।" সমস্ত আচার ভগবানে অর্পণ করিয়া কাম, ক্রোধ, অভিমান, দ্বেষ, হিংসা—যাহা কিছু করিতে হয় তাঁহারই উপর করিবে। তিনি তোমার সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তিস্থান, সকল রিপুর পর্য্যবসানের আধার। সাধারণ বা সামান্য প্রেমোদয়ে যেমন যেমন অবস্থা ঘটিয়া থাকে, ভগবৎপ্রেমে ঠিক তেমনই ভাবে সকল পর্য্যায়ের বিকাশ হইবেই। শ্রীমতী রাধিকা দ্বিভুজ মুরলীধর রূপকে কান্তভাবে গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত নায়ক-নায়িকার সকল সাধ মিটাইয়াছেন। উমাকে কন্যারূপে ধরিয়া মেনকা কন্যার সকল সাধ উমার দ্বারা মিটাইয়া লইয়াছেন। তিনি যে বাঞ্ছাকল্পলতিকা, তাই তিনি সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। বাসনা সমুদ্ভূতা বলিয়া, মদনবিভাবিতা বলিয়া তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু বা লতিকা। এই হেতুই তাঁহাকে রসময় বা রসময়ী বলা হয়। তিনিই রস, তিনিই রসিক, তাই তাঁহার কাছে লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই। তন্ত্র বলিতেছেন, সেই তিনিই তুমি। রসের সাহায্যে তোমাকে তুমি চিনিবার ও জানিবার চেষ্টা করিতেছ মাত্র। অধ্যাত্মতত্ত্বের মধ্য দিয়া দেখিলে ব্যাপারটা সোজা হয় বটে, তাহা হইলে লীলার যথার্থতার প্রতি সংশয় বৃদ্ধি পায়। সে কথা পরে বলিব। ('প্রবাহিণী,' ২০ চৈত্র ১৩২০)

বিবাহে পণ

ইংরেজী ১৮৮৫ সালের পূর্ব্বে, বাঙ্গালার ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যাদানে পণপ্রথার জ্বালা এমন তীব্র ছিল না। পূর্ব্বে কন্যাদায় ছিল। কন্যা বয়স্থা হইলে, পিতা ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং কন্যার বিবাহ দিতেন। পূর্ব্বে কন্যাদায় জানাইলে বাঙ্গালার ধনী-সজ্জন মুক্তহস্তে দান করিতেন। কন্যাদায়গ্রস্ত লোকে পশ্চিমে লাহোর পর্য্যন্ত যাইয়া ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। শেষে ভিক্ষা ব্যবসায়ে দাঁড়াইল। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে লোকের মতিগতিও বিগড়াইল। কন্যাদায় জানাইলে আর কেহ ভিক্ষা দেয় না।

পূর্ব্বে যখন ইংরেজী শিক্ষার এত প্রচার হয় নাই,—চাকরি বাঙ্গালীর উপজীবিকা বলিয়া গ্রাহ্য হয় নাই, তখন হিন্দু মাত্রেই ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, দৌহিত্র প্রভৃতি লইয়া ঘর-সংসার করিতেন। বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে এমন খুব কম লোকই ছিলেন, যাঁহারা শ্বশুরের অন্নে পুষ্ট হন নাই, মাতুলাশ্রয়ে প্রতিপালিত হন নাই। তখন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কায়স্থ কৃষিজীবী ছিলেন। তালুক-মুলুক লইয়া সংসার চালাইতেন। তখন একান্নবর্ত্তী সংসারের উপযোগিতা ছিল, প্রয়োজন ছিল, তাই সবাই একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকিতেন। চাকরি-জীবী হইয়া বাঙ্গালীকে এখন নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িতে হইয়াছে। ম্যালেরিয়া এবং চাকুরী এই দুইটার প্রভাবে বাঙ্গালার একান্নবর্ত্তী প্রথা এক রকম উঠিয়া গেল।

পূর্ব্বে যখন লোকে মেয়ের বিয়ে দিত, তখন পাত্রের দিকে বড় বেশী দৃষ্টি রাখিত না। কেবল দেখিত—কাহাদের বাড়ী কন্যা যাইয়া পড়িতেছে, কোন্ সংসারভুক্ত হইতেছে। পাত্র সবল সুস্থকায় হইলে, একটু লেখা-পড়া জানা থাকিলেই কন্যার পিতা কন্যাদান করিতেন। তখন সকল কাজেরই একটা নিরিখ বাঁধা ছিল। সে নিরিখের বাহিরে কেহ যাইতে পারিতেন না। অতি বড় বড়মানুষেও নিরিখ অনুসারে অর্থব্যয় করিয়া কন্যাদান করিত। সাধারণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কন্যার একান্ন টাকার মধ্যে বিবাহ হইয়া যাইত। পরে দৌহিত্র হইলে, কন্যার পিতা—কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রকে ভূমি-সম্পত্তি দান করিতেন।

ইংরেজী লেখাপড়ার প্রথম বিস্তারের কালে, যখন ইংরেজী জানিলেই বাঙ্গালীর চাকরি হইত, যখন ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালার পল্লীগ্রামসকল নষ্ট হইতেছিল, যখন বাঙ্গালী আর কৃষিকর্ম্মে দিনযাপন করিতে পারিতেছিলেন না, তখন ইংরেজীনবীস পাত্রের খোঁজ অনেকেই করিতে লাগিলেন। সেই সময় বাঙ্গালী দেখিল যে আর বংশ দেখিয়া, পরিবারের পরিচয় দেখিয়া কন্যাদান করিলে চলিবে না। কেন না, ম্যালেরিয়ার ও চাকরির হ্যাপায় একান্নবর্ত্তী পদ্ধতি উঠিয়া যাইতেছিল। 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হইতেছিল। আশ্রিত প্রতিপালন এখন বন্ধ হইয়াছে। ফলে, পাত্রের যোগ্যতার প্রতি কন্যার জনকদিগের দৃষ্টি অধিকতর পড়িল, তখন লোকে বুঝিল, পাত্র উপার্জ্জনশীল না হইলে কন্যার অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা হইবে না। পক্ষান্তরে, পাত্রের জনকগণ বুঝিলেন যে, বড় বড় ঘর ত ভাঙ্গিল। পূর্ব্বেকার মত দুই দশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর দিলে একটা সংসার চলিবে না। মাতুলাশ্রয় অবলম্বন করিলে পৌত্রদের দিন কাটিবে না। চাকরির খাতিরে সবাই বাস্তু-চ্যুত, সমাজের সংস্রব-চ্যুত হইয়া যখন ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছেন—সবাই কলিকাতার বা মফস্বলের অন্য সদর নগরে, যেখানে আইন আদালত আছে, ব্যবসা বাণিজ্য চলিতেছে, সেই সব স্থানে প্রবাসী হইয়াছেন, তখন পুত্রের জনকগণ পাস-করা ছেলের জন্য নগদ টাকার দাবী করিলেন। এ পক্ষে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন সর্ব্বাগ্রে সুবর্ণবণিক-সম্প্রদায়, তৎপশ্চাতে কলিকাতার ধনী কায়স্থ-সম্প্রদায়। কলিকাতার এই দৃষ্টান্ত এখন বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যেখানে ইংরেজী লেখাপড়া প্রবেশ করিয়াছে, পাস-করা ছেলে গজাইয়াছে, সেইখানেই বিবাহের নগদ টাকার দাবী-পদ্ধতি চলিয়াছে। একটা এম. এ., বি. এল. পাস-করা ছেলে তৈয়ারী করিতে দশ হাজার টাকার কমে হয় না। ইংরেজী-শেখা ছেলে উপার্জ্জনশীল হইলে, বঙ্কিমী ঢঙের নায়িকা ভাব সমন্বিতা কমলমণি শৈবলিনীর আদর্শে গঠিতা পত্নীর পতি হইলে, বাপ মায়ের যে বিশেষ ধার ধারিবে না, একটু তফাৎ হইয়া থাকিবে, বাপ মাকে কাশীবাস করাইবার চেষ্টা করিবে, তাঁহাদের ভরণ-পোষণের ব্যয় হিসাবে যত কম পারিবে, তত কম টাকা দিবে। কাজেই অনেক হিসাবপটু জনক জননী পাস-করা ছেলের বিবাহের সময় অন্ততঃ সুদের টাকাটা আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। যে সব

ছেলে লেখাপড়া শিখিতে পারে না, তাহাদের বিবাহ পাঁচ সাত-শ হাজার টাকায় মধ্যে হইয়া যায়। এমন কি, বড়মানুষের বাড়ীর বোকা ছেলের দামও খুব কম।

ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে সমাজে একটা বিরাট্ ওলট-পালট ঘটিয়াছে, বনিয়াদী সংসার ধূলায় লুটাইতেছে। আধুনিক অনেকে বড়মানুষ হইয়াছে। যাহারা ছেলেবেলার সঙ্গী সহচর ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে লক্ষপতি হইয়াছে। তাহাদের ছেলেরা এম. এ., বি. এ. পাস করিতেছে। তাহাদের ছেলেদের বিবাহে কুটুম্বেরা সোনার ঘুঘু পর্য্যন্ত দান করিতেছে। পাড়া-প্রতিবেশী, পূর্ব্বেকার সহচর অনুচর ভাবিতেছেন, আমরাই বা কম কিসের! আমাদের ছেলেরাও ত পাস করিয়াছে। আমরাই বা ছেলের বিবাহে সোনার ঘুঘু পাইব না কেন? আব্দার,—পুরুষ অপেক্ষা বাড়ীর গৃহিণীরাই অধিক করিয়া থাকে। কন্যাদানের পণের মূলে নারীর অহঙ্কারই উৎকট হলাহলরূপে বিরাজ করিতেছে।

বলিয়াছি ত কন্যাপণের জ্বালা ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই অধিক। বাঙ্গালায় ১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণ আছেন, ১১ লক্ষ কায়স্থ আছেন, সবাই কি পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে পারে, না,—দিতেছে? অথচ অবিবাহিত কন্যা ত থাকিতেছে না। এই পণের জ্বালা কেবল ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যাপ্ত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নকলে যাহারা চলে, তাহাদের মধ্যেই এ বীজ ঢুকিয়াছে। বাকী বিরাট্ হিন্দু সমাজে এ জ্বালা নাই। এ জ্বালা নিবারণ করিতে হইলে ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই সচেষ্ট হইতে হইবে। পণ উঠাও বলিলে উঠিবে না। এই অর্থ-প্রাধান্যের দিনে, যখন পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্থোপার্জ্জন আইনবিরুদ্ধ নহে, তখন পণ বন্ধ হইবে না। তবে দুইটা পথ অবলম্বন করিতে পারিলে পণ বন্ধ হইতে পারে।

১। ধনীর সন্তানেরা দরিদ্রের গৃহ হইতে যদি কন্যা বাছিয়া আনিয়া ঘরে তুলেন, যদি ধনী ধনীর সহিত আদান-প্রদান না করেন, পূর্ব্বেকার পদ্ধতির মত ধনী লোকে যদি গরীবের ছেলেকে জামাতা করেন, গরীবের মেয়েকে পুত্র-বধূ করেন, তাহা হইলে পণের জ্বালা একটু কমে।

২। একটা 'ফণ্ড' করিয়া যদি গরীব অথচ সম্ভ্রান্তবংশ মেয়েদের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলেও পণের জ্বালা অনেকটা কমে।

কেবল ছেলে ক্ষেপাইলে চলিবে না। ছেলেরাও যে টাকার পিপাসী। ইংরেজী শিখিয়া তাহারা বিবাহকে সংস্কার বলিয়া গ্রাহ্য করে না, পত্নীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া জ্ঞান করে না। তাহারা বিবাহকে একটা উপভোগের বিষয় মনে করে। কাজেই বিবাহের সঙ্গে অর্থের সংস্রব না থাকিলে, তাহারা ত বিবাহ করিবে না। সুতরাং ছেলে ক্ষেপাইয়া পণ-প্রথা বন্ধ করিবার প্রশস্ত উপায় নাই, বরং উহাকে অপায় বলিয়া মনে হয়। কারণ, এই পথে চলিলে পরে বিবাহ ব্যাপারেও ছল চাতুরী ও কপটতা প্রবল হইবে। ব্যাপারটা "Economy" অর্থাৎ, অর্থশাস্ত্রের বিষয়ীভূত। ব্যাপারটা এই পরিবর্ত্তন-যুগে একটা বিস্ফোটক মাত্র। উহাকে কেবল টিপিয়া, বা উহাকে সামান্য প্রলেপ দিয়া এ বিস্ফোটক আরোগ্য হইবে না। তাই রোগের নিদানের কথা একটু বলিয়া রাখিলাম। অভিজ্ঞ চিকিৎসক থাকেন যদি, তিনি ঔষধ নির্দ্ধারণ করিবেন। ('প্রবাহিণী,' ২০ চৈত্র ১৩২০)

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র

যখন সমাজে ধর্ম্মের গ্লানি ঘটিয়া থাকে, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ভগবান্ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যাহার দ্বারা ধারণ হয় তাহাই ধর্ম্ম। যাহা পদার্থবিশেষের গুণ বা বিশিষ্টতার পরিচায়ক তাহাকেও ধর্ম্ম বলে; যথা অগ্নির দাহিকা ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শক্তিবিশেষ। যে শক্তির সাহায্যে পদার্থের এবং জীবের বৈশিষ্ট্য সুরক্ষিত হয়, তাহাই সেই পদার্থ বা জীবের ধর্ম্ম। বিশিষ্টতা বা characteristics বজায় যাহাতে থাকে, তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। সমাজ-ধর্ম্মের এই বিশিষ্টতা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা আছে; সমাজের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইলে সমাজ-বন্ধন শিথিল হয়, সমাজও চূর্ণ হইয়া যায়। তাই সমাজ-ধর্ম্মকে ইংরেজীতে social cohesiveness বলা চলে। উহাই সমাজের সর্ব্বস্ব—প্রাণ—মহাপ্রাণ। যখন এই সমাজ-ধর্ম্মের গ্লানি ঘটে, সমাজ-সংহতি নষ্ট হইবার উপক্রম হয়, সমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষার পক্ষে সামাজিক অনেকেই উদাসীন হইয়া পড়েন,—যখন আবার অধর্ম্মের, বিলাসের ভোগায়তন দেহের তুষ্টি পুষ্টির

জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার প্রাবল্য ঘটে, তখনই শ্রীভগবান্ নররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া সাধুদিগের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে, দুষ্কৃতদিগকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, ধর্ম্মসংস্থাপনের বাসনায় মানবতার উচ্চ আদর্শ প্রকট করিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন, যে যুগে যেমন ভাবে ধর্ম্মের গ্লানি ঘটে, সেই যুগে তেমনই আকার ধারণ করিয়া ভগবান্ অবতীর্ণ হন। যুগাবতারকে সেই যুগপ্রচলিত ধর্ম্মাধর্ম্মের মাপকাঠি দিয়া মাপিয়া দেখিতে হয়; অন্য যুগের আদর্শ লইয়া অবতার-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিতে নাই।

শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতা যুগের অবতার। তাঁহার পূর্ব্বে ভৃগুরাম অবতরি হইয়াছিলেন। জামদগ্ন্য ব্রাহ্মণ অবতার, রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় অবতার। বামন, নৃসিংহ, ভৃগুরাম এবং কল্কী, দশ অবতারের মধ্যে এই চারি জন অবতার ব্রাহ্মণ; বাকী ছয় জন ক্ষত্রিয়। চারি জন ব্রাহ্মণ অবতার ধ্বংসের অবতার—বিনাশায় দুষ্কৃতাম্—এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার অবতার। বামন বলী রাজাকে দমন করিয়া ক্ষান্ত, নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে মারিয়া নিবৃত্ত, ভার্গব একবিংশতি বার ভারতকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া নিরস্ত এবং কল্কী সব সাফ করিয়া দিবেন। দেবতার মধ্যেও রুদ্র বা শিব সংহারকারী; তিনি ব্রাহ্মণ। সৃষ্টি ও সংহারকার্য্য ব্রাহ্মণ্য শক্তির দ্বারা হইয়া থাকে; পালনকার্য্য ক্ষাত্রশক্তির সাহায্যে ঘটে। তাই ব্রহ্মা ও শিব ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু ক্ষত্রিয়। অবতারগণের মধ্যে যাঁহারা কেবল নাশ করিতে বা পাপের উচ্ছেদ করিতে আসিয়াছিলেন বা আসিবেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, এবং যাঁহারা উদ্ধার করিতে, রক্ষা করিতে, ধর্ম্মসংস্থাপন করিতে, দণ্ডমুণ্ডের ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছিলেন বা আসিবেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়। রাম অবতারের পূর্ব্বে উপর্য্যুপরি দুই ব্রাহ্মণ অবতার হইয়াছিল। বলী মহারাজ অতিদানে সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাই বামন-রূপ ধারণ করিয়া শ্রীভগবান্ বলীকে বদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু একা বলীকে বাঁধিয়া সমাজ রক্ষা হইল না। ত্রেতা যুগের গোড়ায় ক্ষত্রিয় নরপতিগণ অতি দুর্দ্দান্ত হইয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বিলাস ও প্রভাব জগতের পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল; তাহার আদর্শে ক্ষত্রিয় সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা রক্ষা করিবে, পালন করিবে, সেই ক্ষত্রিয়বর্ণই বিবর্ণ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ের দোষে অধর্ম্মের প্রবল অভ্যুত্থান হইয়াছিল, তাই জামদগ্ন্য অবতার—রুদ্রের বা নাশের অবতার হইলেন।

তিনি একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ধরার ভার হরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু চাতুর্ব্বর্ণ-প্রতিষ্ঠা বজায় থাকিলেই সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। ক্ষাত্রশক্তির সঙ্কোচ ঘটাতেই সিদ্ধসাধক ব্রাহ্মণগণ রাবণাদির ন্যায় রাক্ষসে পরিণত হইয়াছিলেন। কাজেই ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য নূতন অবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাই চারি অংশে বিভক্ত হইয়া রাম অবতারের উদ্ভব। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এই চারি অংশে পূর্ণব্রহ্ম বিভক্ত হইয়াছিলেন।

যখন সমাজে নাশের প্রাবল্য ঘটিয়াছিল,—বামন পরশুরাম দুই নাশের অবতার, ক্ষত্রিয়গণ নাশবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল, রাবণাদি দুর্দ্দান্ত নাশবুদ্ধিপ্রবল ব্রাহ্মণ সাধক রাক্ষসে পরিণত,—তখন যাহাতে সমাজে পালনী শক্তির উন্মেষ ঘটে, তাহারই ব্যবস্থা করিতে রাম অবতার হইয়াছিলেন। পাকা মালীর মত আগাছা সকল উপড়াইয়া দিয়া তিনি সুষ্ঠু ব্যবস্থা অনুসারে সমাজের বাগিচা তৈয়ার করিয়াছিলেন। কাট-ছাঁট করিতে যতটুকু নাশের প্রয়োজন হয়, ততটুকুই রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সাহায্যে অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার আসল কাজ ক্ষত্রিয়ত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সমাজ রক্ষা। এই কার্য্যে তাঁহার তুল্য আর কেহ হয় নাই, বুঝি বা হইবেও না। শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ রাজা, আদর্শ পতি। বিলাসী দশরথের পুত্র হইয়াও তিনি একপত্নীক—সীতাগতপ্রাণ, সীতাময় জীবন। ভ্রাতা লক্ষ্মণ সংযমের অবতার—ভ্রাতৃসেবায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগী, কৈঙ্কর্য্যের আদর্শ। লক্ষ্মণের মত ভাই জগতের সাহিত্যে আর নাই। ভরত সন্ন্যাসী—বিশাল কোশল রাজ্য পাইয়াও সন্ন্যাসী, অগ্রজের পবিত্র স্মৃতিরক্ষায় অবিশ্রান্ত অগ্নিহোত্রী, শত্রুঘ্ন এমন সন্ন্যাসী ভরতের দোসর। চারি ভাই একপত্নীক, সংযতচরিত্র আদর্শ পুরুষ। এমন অতুল্য আদর্শের প্রভাবে ত্রেতা যুগের নবপ্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয় সমাজ নরদেবতার সমাজে পরিণত হইয়াছিল। ইহাদের চারি পত্নীও যেন কমলা চারি অংশে বিভক্তা। যে-কালে কৈকেয়ীর মতন রাণীর প্রভাব অসহ্য হইয়াছিল, সে-কালে সীতার মতন পতিগতপ্রাণা লক্ষ্মীর জীবন-আলেখ্য সমাজকে নতশির করিবেই—করিয়াছিলও। উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি—ইহারা তিন জনে যেন সীতা-চরিত্রের উন্মেষ-সঙ্গিনী। যে সকল গুণের উপচয় ঘটিলে সমাজ পুষ্ট ও শক্তিশালী হয়, রামাবতারে সেই

সকল গুণের সম্যক্ বিকাশ হইয়াছিল। শম, দম, সত্য, দয়া, ক্ষমা, বিনয়, তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণের যেরূপ বিকাশ রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এই চারি ভাইয়ের জীবনে হইয়াছিল, তেমন আর কোন অবতারে হয় নাই। ধর্ম্ম-সংহিতার আদর্শ অনুসারে যেন রামচরিত্র গড়িয়া তোলা। রাম আত্মবিস্মৃত পুরুষ ছিলেন। অর্থাৎ নিজের ক্ষমতা, প্রভাব, শৌর্য্য, বীর্য্যের পরিচয় তাঁহার ছিল না। যে ব্যক্তি নিজের প্রভাবের পরিচয় রাখে, সেও অহঙ্কারবিমূঢ় হইবে। রামচন্দ্রে অহঙ্কারের লেশ মাত্র ছিল না; অতএব তিনি আত্মবিস্মৃত ছিলেন। তিনি নিজেকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জানিতেন না, অসীম শক্তিশালী বলিয়া ভাবিতেন না। তিনি ভাবিতেন, আমি এক জন সামান্য মানুষ, দয়া-ক্ষমা-বিনয়-সৌজন্যে আমি সকলকে স্বীয় আয়ত্তে রাখিব। যেখানে দয়া, ক্ষমা-বিনয় ব্যবহারে কুলাইত না, সেইখানেই বাধ্য হইয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বে তিনি যুদ্ধ করিতেন। যিনি সমাজে পালনী শক্তির বিন্যাস করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি কি ঔদ্ধত্যবশে ধরাবক্ষ নরশোণিতে সুরঞ্জিত করিতে পারেন?

রাজা রামচন্দ্র—শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ রাজা। এমন রাজা ভারতবর্ষে হয় নাই, আর হইবেও না; কবি-কল্পনাতেও বোধ হয় এমন আদর্শ আর ফুটিয়া উঠিবে না। রামচন্দ্র লোকরঞ্জক ও প্রজাপালক রাজা। রামচন্দ্র রাজকর্ত্তব্য(duty)কে সর্ব্বোচ্চ স্থানে বসাইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় জীবনে দেখাইয়াছেন যে, রাজকর্ত্তব্য পালন ব্যাপারে দয়া মায়া, স্নেহ-মমতা, স্ত্রী-পুত্র কিছুই নাই; সব ভুলিয়া, সকলকে উপেক্ষা করিয়া প্রজাপালন করিতে হইবে, রাজ-চরিত্রকে কলঙ্কের অতীত করিয়া রাখিতে হইবে। যে কালে ক্ষত্রিয় মাত্রই লম্পট ছিল, নারী মাত্রেই বিলাসিনী হইয়া উঠিয়াছিল, সে কালে সংযমের আদর্শ দেখাইতে হইলে, একটু অধিকতর কঠোরতার সহিত দেখাইতে হয়। যে যুগে প্রজারঞ্জনের আদর্শ ক্ষত্রিয় নরপতিগণ হারাইয়াছিলেন, সেই যুগে প্রজারঞ্জনের আদর্শ দেখাইতে হইলে একটু ফুটাইয়া, একটু ফলাইয়া দেখাইতে হয়। শ্রীরামচন্দ্র লোকমত—প্রজা-মতকে শিরোধার্য্য করিতে যাইয়া সীতা হেন সহধর্ম্মিণীকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজার হিসাবে তিনি সীতাকে বনবাসে পাঠাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পতির হিসাবে তাঁহাকে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই—সহধর্ম্মিণীর হিসাবে তিনি স্বর্ণ সীতা গড়াইয়া,

সেই সোনার প্রতিমাকে বামে রাখিয়াছিলেন, তবে অশ্বমেধ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রই ভারতের ক্ষত্রিয় সমাজকে এই আদর্শ দেখাইয়াছিলেন যে, রাজা সম্রাট্ হইলেও দ্বিজ ক্ষত্রিয়ের বহু পত্নী করিতে নাই, এক ভার্য্যাই প্রশস্ত। রাজা কামপত্নী করিলে সে আদর্শ প্রজার পক্ষে বড়ই বিষময় ফল উৎপাদন করে; সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটে, সমাজ-ধর্ম্মের অপহ্নব ঘটে। তাই রাম একপত্নীক। রাবণ বধ করিয়া, বিলাসীর উপদ্রব ও উৎপাত হইতে সমাজকে উদ্ধার করিয়া শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতা যুগের হিন্দু-সমাজকে যৌন সম্বন্ধ বিষয়ে পবিত্র ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতীও হইয়াছিল। তিনি রাজপরিবারকে নিন্দার ও গ্লানির প্রয়াস হইতে দূরে রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে, সাধ্বী সীতাদেবীর প্রতি কলঙ্কের আরোপ করা হইয়াছে, সে নিন্দা অসঙ্গত নিন্দা নহে, তখন তিনি কঠোর কর্ত্তব্যের পথ হইতে চুল মাত্র বিচলিত হন নাই। লম্পট, চরিত্রহীন রাবণের আশ্রয়ে সীতাদেবীকে দীর্ঘ কাল থাকিতে হইয়াছিল। তখন সীতার পূর্ণ যৌবন কাল; রাবণ মায়াবী, বহুরূপধারী লম্পট ছিল। তখন সীতার অলোকসামান্য চরিত্রের কোন পরিচয় প্রজাবর্গ পায় নাই। সীতা বিবাহের কিছু দিন পরেই বনে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন; তাঁহার কিশোর ও যৌবন কাল বনবাসেই ব্যয়িত হইয়াছিল। রাবণবধের পরে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা প্রজাবর্গ দেখে নাই, তাহারা একটা গালগল্প বানর ও রাক্ষসের মুখে শুনিয়াছিল। ফলে, তখন সীতার চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হওয়া প্রজাবর্গের পক্ষে নিতান্ত অনুচিত ও অযুক্তিযুক্ত কার্য্য হয় নাই। তাই রাজার হিসাবে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন যে, আমার সম্মুখে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তুমি আমার মনের তৃপ্তিসাধন করিয়াছ বটে, আমি স্বামীর হিসাবে তোমাকে অম্লান মুখে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আমি ত কেবল স্বামী নহি, আমি রাজা—কোটি কোটি নরনারী প্রজার রাজা। আমি রাজা হইয়া প্রজাবর্গকে সাধুতার, সংযমের ও একনিষ্ঠার পথ দেখাইতেছি। তুমি আমার ধর্ম্ম-পত্নী—অর্দ্ধাঙ্গিনী, রাজার সহধর্ম্মিণী—মহিষীর যেমন পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, নিরাবিল চরিত্রের হওয়া কর্ত্তব্য, তোমাকেও তেমনি হইতে হইবে। এ কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য তোমাকে প্রজাবর্গের সমক্ষে আবার অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হইবে। প্রজারা তোমাকে সতী-সাধ্বী

বলিলে তবে আমি তোমাকে মহিষীর পদে বজায় রাখিতে পারি। সীতা অভিমানের প্রভাবে আবার অগ্নি-পরীক্ষা দিতে অস্বীকৃতা হইলেন। এ অভিমান অন্যায় নহে। কেন না, সে সময়ে সীতা অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিলেন, পঞ্চ মাস গুর্ব্বিণী ছিলেন। তখন প্রজারঞ্জক, লোকপালক, ধর্ম্ম-সংস্থাপক, আদর্শ রাজা শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলেন। সীতার বনবাসের সময়ে লক্ষ্মণের মুখে সীতা-চরিত্রের ঔৎকর্ষ্যের কথা প্রজাসাধারণ্যে অনেকটা প্রকাশ পাইয়াছিল। অনেকে সে কথায় আস্থা স্থাপন করিয়াছিল, অনেকে করে নাই। তাহার পর মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে সীতার বাস, লব-কুশের জন্ম, মহর্ষির মুখে সীতার চরিত্রের মহিমা ঘোষণা, শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠার পরিচয়, অশ্বমেধ যজ্ঞে সোনার সীতার প্রতিষ্ঠা, রাজসভায় সীতার আগমন, পরিশেষে সীতার পাতালে প্রবেশ। এতগুলা ঘটনা ঘটিবার পর প্রজাবর্গ বুঝিয়াছিল যে, সীতা সাক্ষাৎ দেবী—লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ছিলেন। সীতা আদর্শ নারী, আদর্শ রাজরাণী, আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। তখন সীতা জগৎপূজ্যা হইয়াছিলেন, তখন কোশল রাজ্যের—অযোধ্যার প্রজাবর্গ সীতাকে দেবীর আসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছিল। রাবণবধের কালে সীতা-চরিত্রের ত কোন উন্মেষ ঘটে নাই; সীতার বনবাসের পর সীতার মহিমা ফুটিয়া উঠিল।

সীতাবর্জ্জন হেতু বাঙ্গালার আধুনিক লেখকগণের মধ্যে অনেকেই শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। একে ত তাঁহারা আধুনিক যুগের মাপকাঠি লইয়া রামচন্দ্রকে মাপিয়াছেন, তাহার পর তাঁহারা বাল্মীকি রামায়ণ পড়িয়া সীতার প্রতি পূর্ব্ব হইতেই অনুরাগী এবং সীতায় পক্ষপাতী। চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের পর রাম যখন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন ত অযোধ্যার প্রজাবর্গ রামায়ণ শুনে নাই, লঙ্কার রাবণ-বধের সকল কাহিনী তাহাদের কর্ণগোচর হয় নাই। তাহারা জানিত যে, রাবণ প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিল, দুর্দ্ধর্ষ দুর্দ্দান্ত যোদ্ধা ছিল। তাহার অত্যাচারে বিমানচারিণী অপ্সরাসকলও পবিত্র থাকিতে পারিত না। সেই রাবণের ঘরে সীতা হেন সুন্দরী যুবতী নারী দীর্ঘ কাল বাস করিয়া আসিয়াছিলেন। কাজেই প্রজার মনে সন্দেহ। সে সন্দেহ দূর করিতে হইলে হয় আবার অগ্নি-পরীক্ষা দেখাইতে হইবে,

নয়ত সীতাকে বর্জ্জন করিতে হইবে। সীতা দ্বিতীয় বার অগ্নি-পরীক্ষা দিতে রাজি হইলেন না, তাই রাম সীতাকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলেন। পরে লব কুশের মুখে মহর্ষি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ গান শুনিয়া এবং রামচন্দ্রের ব্যবহার দেখিয়া প্রজাবর্গ সীতাকে সতী সাধ্বী বলিয়া জানিয়াছিল। সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে এই সকল অবস্থার কথা ভাবিয়া ও বুঝিয়া কথা কহিলে কোন দোষ ঘটে না। রামচন্দ্র ত্রেতা যুগের আদর্শ রাজা, আদর্শ মনুষ্য; সে আদর্শের অপহ্নব ঘটাইতে, কলি যুগের আমরা—আমাদের ত কোন অধিকার নাই।

এই সঙ্গে বালীবধের কথাটাও বলিব। বালী বানরের রাজা—প্রবল পরাক্রান্ত, এবং অতিশয় উদ্ধত। বালীর উপদ্রবে সুগ্রীবাদি ধর্ম্মভীরু বানরগণকে বনবাস করিতে হইয়াছিল; বালীর উৎপাতে বানর-সমাজে ধর্ম্মের সংস্থা নষ্ট হইয়াছিল, বিলাস এবং ব্যসন সমাজের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। বালী বানর জাতির রাবণতুল্য ছিল। এ হেন বালীকে বধ করিতে না পারিলে ধর্ম্মসংস্থাপনকার্য্য সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইবে না; এইটুকু বুঝিয়া রাম বালীবধ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যগ্রাহী পরস্বাপহারী বীর ছিলেন না। বালীবধ করিয়া ধার্ম্মিক সুগ্রীবকে সেই রাজ্যে বসাইয়াছিলেন, রাবণ বধ করিয়া বিভীষণকে লঙ্কার রাজা দিয়াছিলেন, স্বয়ং কিছুই গ্রহণ করেন নাই। সাধুদিগের পরিত্রাণ সাধন জন্য তাঁহার জন্ম, তিনি সে পরিত্রাণকার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুগ্রীব সাধু, বিভীষণও সাধু। রামচন্দ্র দুষ্কৃত বালী ও দুর্দ্দমনীয় রাবণকে বধ করিয়া সুগ্রীব ও বিভীষণের পরিত্রাণ সাধন করিয়াছিলেন;—আগাছা ছাঁটিয়া ধর্ম্মবৃক্ষের রোপণ করিয়াছিলেন। এখন বালীবধের পদ্ধতিটার আলোচনা করিতে হইবে। ছল, বল, কৌশল,—সাম, দান, দণ্ড, ভেদ—এই কয় উপায়ে রাজাকে রাজ্য রক্ষা ও দুষ্টের দমন করিতে হয়। বালীবধে রাম ছলের পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সংহিতাকারের হিসাবে দোষের কার্য্য করেন নাই। এখন যেমন পশ্চিমোত্তর সীমান্তদেশের বর্ব্বর জাতিসকলকে শাসনে আনিতে হইলে ইংরেজ সৈনিক দম্‌দম্ গুলি ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু বুয়র যুদ্ধে, ইউরোপের খ্রীষ্টান সভ্য জাতিদের সহিত যুদ্ধে সেগুলি ব্যবহার করিতে পারে না, তেমনি বানর জাতির দুর্ব্বিনীত রাজাকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে রাম যে ছল অবলম্বন

কার্য্যের সহযোগী ফল। তেমনি দুষ্টের দমন করিতে যাইয়া যদি কোন সতী সাধ্বীর, পিতৃহীন অনাথ বালকের শোকসন্তপ্ত নিশ্বাসে তোমার অঙ্গ জ্বলিয়া যায়, তোমাকে কষ্টভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে দুষ্টের দমনরূপ সৎকার্য্যের নিন্দা করিও না। উহা ঐ কার্য্যের সহযোগী ফল। রামকর্তৃক বালীবধ দোষের নহে, নীতিবিরুদ্ধ নহে, ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে। ঐ কার্য্য করিবার জন্যই রামাবতার।

অনেকে বলেন, রাম-চরিত্র যেন মিন্‌মিনে—কাঁদুনে চরিত্র। কথাটা এক হিসাবে ঠিক, এক হিসাবে ভ্রান্ত। বলিয়াছি ত, রাম পালনী-শক্তি বিকাশের উদ্দেশ্যে, সমাজ-প্রতিষ্ঠার কামনায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কাজেই যেখানে নাশের কথা, দমনের কথা, নরশোণিত-প্লাবনের কর্ত্তব্য উঠিয়াছে, সেইখানেই তিনি সঙ্কুচিত হইয়াছেন। তিতিক্ষার এই সঙ্কোচকে ঠিকমত বুঝিতে না পারিয়া আমরা গোলে পড়িয়াছি ;—ভাবি, রাম-চরিত্র অতি মোলায়েম, অতিশয় কাঁদুনে। যে বিশ্বাসটা প্রকৃতির সহিত গাঁথা, যে প্রকৃতিটা মেদমজ্জার সহিত মাখান, কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহার বিরুদ্ধে কাজ করিতে হইলে, মাঝে মাঝে একটু কাঁদুনে ভাব আসে বৈ কি! রাম দয়ার, কৃপার, বিনয়-সৌজন্যের অবতার, রাম সহিতে আসিয়াছিলেন, ভাঙ্গিতে আসেন নাই ; রাম রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, নষ্ট করিতে আসেন নাই। সেই রামকে বাধ্য হইয়া সোনার লঙ্কা ছারেখারে দিতে হইয়াছে। তাঁহার সেই শিরীষ-কুসুম-তুল্য কোমল হৃদয়ে ব্যথা লাগিবে বৈ কি! সে ব্যথা, অতিরঞ্জনে একটু কাঁদুনে ভাব আসিবে বৈ কি! কিন্তু এই বাহ্যিক বিহ্বলতার অন্তরালে কর্ত্তব্যপরায়ণের কঠোরতা যে মর্ম্মর প্রস্তরের স্তরের ন্যায় সুবিন্যস্ত, তাহা ভাবুক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। সীতাকে বর্জ্জন করিয়া রাম কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। রাম-চরিত্রে "গোঁয়ার্ত্তুমি" নাই। অহঙ্কারী না হইলে গোঁয়ার হয় না। রাম ত অহঙ্কারী নহেন, বিনয়ের অবতার। ইতর সাধারণ পুরুষের শ্রবণে ব্যর্থ বাহ্বাস্ফোট শুনিতে লাগে ভাল। বিশেষতঃ আমরা বাঙ্গালী প্রকৃত বীরত্বের আদর্শে বঞ্চিত, আমরা 'রে পাষণ্ড' শুনিলেই মাতিয়া উঠি। রাম মহাবীর বটেন, কিন্তু তাঁহার বীরত্ব শমদমাদির দ্বারা সংযত প্রণালীকৃত। বাল্মীকি এই সংযমের বন্ধনী অতি সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। তুলসী-কৃত রামায়ণেও

চরিত্রে কৃষ্ণচরিত্রের অত্যুজ্জ্বল উন্মেষ ঘটিয়াছে, কৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্মের স্বরূপে পরিণত করিয়াছে। এই রাম ও কৃষ্ণকে হিন্দু ভুলিতে পারেন না; এই রাম ও কৃষ্ণ হিন্দুসমাজ-শরীরের আত্মা এবং পরমাত্মা। পৃথিবীর সাহিত্যে এমন দুই গ্রন্থ নাই, জগতের ইতিহাসে এমন অলোকসামান্য চরিত্রোন্মেষ সম্ভবপর নহে। রামায়ণ অক্ষয় মণি খনি, মহাভারত অনন্ত নন্দনকানন। রামায়ণের স্যমন্তক শ্রীরামচন্দ্র, মহাভারতের পারিজাত শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরামচন্দ্র হিন্দুর আদর্শ রাজা, শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুত্বের সখা—সারথি। আইস হিন্দু, আজ চল্লিশ কোটি কর যুক্ত করিয়া বিশ্ব-অবতার এই অনিন্দ্যসুন্দর যুগল আদর্শকে,—ভূমা পুরুষের নররূপে এই প্রকট প্রকাশকে আমরা বার বার নমস্কার করি। ইঁহারা আমাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, ইহ-পরকালের রক্ষাকর্ত্তা, নিয়ন্তা ও ধাতা; ইঁহারা আমাদের জীবনের সঙ্গী, মরণের সহায়, সংসারের পথপ্রদর্শক, শোক দুঃখে অসীম সান্ত্বনা। ইঁহাদিগকে বার বার, কোটি বার নমস্কার করি। ইঁহারাই সংসারের সার, অকূল পাথারে কর্ণধার। এই দুই জনই ইষ্ট-দেবতা। ইঁহারাই হিন্দুর বৈশিষ্ট্যের সাধক এবং রক্ষক। ইঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার। ('প্রবাহিণী,' ২৭ চৈত্র ১৩২০)

শাস্ত্র-শাসন

১। মনুসংহিতায় দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ আছে। সেই দশবিধ সংস্কার বাঙ্গালা দেশের কোন হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে কি? কিম্বা কখনও ছিল কি? বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতির মধ্যে দুইটি সংস্কার আছে; বিবাহ ও উপনয়ন। অধুনা অনেক কায়স্থও উপনীত হইতেছে। সেই বিবাহ ও উপনয়ন কি ঠিক বৈদিক আচারসম্মত হইয়া থাকে? অনুকল্প ছাড়া বাঙ্গালার কোন কর্ম্ম হয় কি? দ্বিরাগমন ও গর্ভাধান আছে কি? শূলপাণি হইতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সকল ব্যবস্থাপকই বৈদিক আচার ব্যবহারের সহিত বাঙ্গালীর আচার ব্যবহারের আপোস করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না বলিয়া দর্ভময় ব্রাহ্মণের অনুকল্প করা হইয়াছে।

২। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ বৈদ্য শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে তান্ত্রিক ধর্ম্মের অতি প্রচলন ছিল। বড় বড় তান্ত্রিক সাধক 'কারণ' করিতেন। অর্থাৎ, সুরাপান করিতেন। চক্রে বসিতেন। অর্থাৎ, সকল জাতির সঙ্গে মিলিয়া ভৈরবী চক্রে শক্তির আরাধনা করিতেন। ইহাদের কাহারও ত জাতি যায় নাই। শবসাধনা, লতাসিদ্ধি, পঞ্চ মকার সাধনা প্রভৃতি করিলে মনুসংহিতার হিসাবে ব্রাহ্মণের জাতি থাকে কি? কিন্তু বাঙ্গালার কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, সর্ব্বানন্দ, ত্রিগুণানন্দ, সদানন্দ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজ রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধক ও গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণের জাতি যায় নাই, বরং তাঁহারা সমাজে পূজ্য হইয়াছিলেন। মনুসংহিতার মাপকাঠি লইয়া মাপিলে ভক্ত রামপ্রসাদ সেন বাঙ্গালার সকল জাতির পূজ্য হইতে পারিতেন কি?

৩। বাঙ্গালায় আবার বৈষ্ণব ধর্ম্মের অতি প্রচার আছে। বৈষ্ণব গোস্বামীগণের মধ্যে বার আনা ব্রাহ্মণ। অদ্বৈতাচার্য্যের বংশধরগণ, নিত্যানন্দের বংশধরগণ সবাই ব্রাহ্মণ। অথচ তাঁহারা ছত্রিশ জাতিকে দীক্ষিত করিয়া থাকেন। বেশ্যাকেও শিষ্যাশ্রেণীভুক্ত করেন। চণ্ডালের দানও গ্রহণ করেন। তাঁহাদের জাতি ত যায় না! তাঁহাদের কেহই ত আজ পর্য্যন্ত অপাংক্তেয় হয় নাই! বড় বড় কুলীনের ছেলে ধরিয়া ত তাঁহারা কন্যাদান করিয়া থাকেন। তাহার উপর বৈদ্য ও কায়স্থ গোস্বামীগণ ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদের মহোৎসবে জাতি-বিচার নাই। মনুসংহিতার মাপকাঠি দিয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণবদিগকে মাপিলে, সকলকেই ধরা পড়িতে হইবে

৪। ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজাদের মধ্যে জাতি-বিচার নাই। মেহেরপুরের বলা হাড়ীর শিষ্যদের মধ্যে জাতি-বিচার নাই। নিহারের সর্ব্ববিদ্যা-সন্তানদের মধ্যে দীক্ষা-ব্যাপারে জাতি-বিচার নাই। শ্রীখণ্ডের গোস্বামীরা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না। ক্ষেতুরী, কৈতলী প্রভৃতি স্থানের গোঁসাইদেরও ঐ ভাব। কত আর নাম করিব! বাঙ্গালায় সাধনা ব্যাপারে কখনও কেহ জাতি-বিচার করে নাই। মনুর শাসন মানে নাই। তান্ত্রিকেরা শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ও তন্ত্রশাস্ত্রের দ্বারায় শাসিত। বৈষ্ণবেরা হরিভক্তিবিলাসের দ্বারা পরিচালিত। তবে মনু-পরাশরের স্থান কোথায়?

৫। বঙ্গে কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে মেল, থাক্, পালটি, পটি প্রভৃতির যে ব্যবস্থা আছে, তাহার ইতিহাস জানিলে ত অবাক্ হইতে হয়। যে সকল পাপ, যে সকল দোষ, ধর্ম্ম-সংহিতার হিসাবে আর হজম করা যায় না, সেই সব দেবীবর ঘটকের প্রসাদে হজম হইয়াছে। বংশজ ব্রাহ্মণেরা 'ভরা'র মেয়ে খরিদ করিয়া বিবাহ করিত। সেরূপ বিবাহে কি জাতি থাকে? আমরা ত জানি, মুচীর মেয়েকে ব্রাহ্মণের মেয়ে সাজাইয়া বংশজ ব্রাহ্মণের ঘরে বিবাহ দিয়াছে। বরিশাল, নোয়াখালী ও খুলনা প্রভৃতি দেশে মগের মেয়েও ব্রাহ্মণের ঘরে আসিয়াছে। এ সব ঘটনা দেখিয়া কেমন করিয়া বলিব যে, বাঙ্গালায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম চিরদিনই প্রবল, এবং মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারায় বাঙ্গালা দেশ চিরকালই শাসিত?

৬। তান্ত্রিকদের মধ্যে পূর্ব্বে শৈব-বিবাহ খুব প্রচলিত ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের কাল পর্য্যন্ত শৈব-বিবাহ নিন্দনীয় ছিল না। শৈব-বিবাহে সকল জাতির কন্যাকেই, এমন কি, ম্লেচ্ছ যবন, চীনে প্রভৃতি কন্যাকে পূর্ণাভিষিক্ত করিয়া পত্নীতে গ্রহণ করা যাইত। শৈব-বিবাহের পুত্রগণ জনকের জাতি পাইতেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও কণ্ঠিধারণ ছিল—এখনও আছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বৈদ্যাদি উচ্চজাতীয় বৈষ্ণবগণ অম্লানমুখে নীচ-জাতীয়া কন্যার সহিত কণ্ঠিবদল করিয়া, তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করিত। ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন্ বচন অনুসারে কলিকালে এই সকল বিবাহের সমর্থন করিতে পার?

৭। ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, ঋতুমতী কন্যাকে অবিবাহিত রাখিলে চৌদ্দ পুরুষকে নরকস্থ হইতে হয়। আদ্য ঋতু হইলেই গর্ভাধান করিতে হয়। কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে ত অবিবাহিত কন্যা ঢের থাকিত,—পাপের পথটাও ত বেশ প্রশস্ত হইয়াছিল, কিন্তু সেজন্য কাহারও জাতি গিয়াছিল কি? না, কোন কুলীন একঘরে হইয়াছিল?

একটু ভাল করিয়া দেখিলে, বাঙ্গালা দেশের সামাজিক ইতিহাস একটু পর্য্যালোচনা করিলে, বেশ বুঝা যায় যে, বাঙ্গালায়—বৈদিক হিঁদুয়ানির প্রাধান্য কখনও ছিল না,—কখনও হয় নাই। সেন ও শূর রাজাদের সময় বৌদ্ধপ্লাবিত বাঙ্গালায়—মহাযান ও বজ্রযান বিড়ম্বিত বাঙ্গালায় বৈদিক আচার ব্যবহারের একটু পালিশ চড়াইবার উদ্দেশ্যে কান্যকুব্জ, মিথিলা, দ্রাবিড়, উৎকল প্রভৃতি স্থান হইতে বেদজ্ঞ ও বেদাচারী ব্রাহ্মণের

আমদানি করিতে হইয়াছিল। যত দিন বাঙ্গালায় হিন্দুরাজা ছিলেন, তত দিন এ পালিশ চটে নাই, ফাটে নাই। তাহার পর কিন্তু বাঙ্গালার কুলীন ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে খাঁটি বাঙ্গালীর আচার ব্যবহারের সহিত আপোস করিয়া চলিতে হইয়াছিল। এক দিকে তান্ত্রিক ধর্ম্ম, অন্য দিকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম। এই দুই ধর্ম্মের মাঝখানে পড়িয়া বৈদিক আচার ব্যবহার অনেকটা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বেদাচার রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া একটা আপোসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর, ইংরেজের আমলে, ইংরেজের আইন আদালতে হিন্দুর দায়াধিকার গ্রাহ্য হইলে কেবল বিবাহে ও শ্রাদ্ধে হিঁদুয়ানি বজায় আছে। চৈতন্যের উদ্ভবকালের পূর্ব্বে ইতিহাস যদি দেখা যায় ত বেশ বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালার তান্ত্রিক 'পাষণ্ডী'গণ এখনকার বিলাত ফেরতাদের মত সর্ব্বভূক ছিলেন। মহামাংস বলিলে তন্ত্রের হিসাবে গোমাংস, উষ্ট্রমাংস, মহিষের মাংস প্রভৃতি বুঝায়। তান্ত্রিকগণ মহামাংস ব্যবহার করিতেন; ইহার প্রমাণ—জয়ানন্দ প্রমুখ বৈষ্ণব লেখকগণ দিয়া গিয়াছেন। আধুনিক তান্ত্রিক সাধকদিগের মধ্যে দুই এক জনকে পঞ্চ মকারী মহামাংস (গোমাংস) ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে আর কিছু না হউক, তন্ত্রের ঔদ্ধত্য, একাকার ও অনাচারের সঙ্কোচ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব জন্য তান্ত্রিকগণ সমাজে পতিত হন নাই। যখন তান্ত্রিক গুরু বিগ্‌ড়াইল, তখনই কুমারহট্ট ও ত্রিবেণী সমাজের ব্রাহ্মণগণ যশোর হইতে রামাৎ বৈদিকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া ভাটপাড়ায় বাস করাইয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও কুমারহট্ট বা হালিশহর ব্রাহ্মণ-প্রধান ও পণ্ডিত-প্রধান স্থান ছিল। বলরাম, রামনিধি প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কুমারহট্টের শোভা সংবর্দ্ধন করিত, তখনও ভাটপাড়া হয় নাই। ভাটপাড়ায় রামাৎ বৈদিকগণকেও আপোস করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা রামমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের শিষ্যগণকে তন্ত্রকথিত ব্যবস্থা অনুসারে তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হয়। মনুসংহিতা বা কোন সংহিতায়, গুরু-গীতায় বা কোন গীতায় এমন আপোসের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু সমাজবিপ্লবের কালে,

দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া এইরূপ আপোসই করিতে হয়।
('প্রবাহিণী,' ২৭ চৈত্র ১৩২০)

স্মৃতি-কথা

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

আমার তখন পইতা হইয়াছে। দুই কানে দুই সোনার মাকড়ি, মাথা নেড়া, পায়ে কাশীর জরির জুতা, পরনে গেরুয়া রঙের থানপেড়ে কাপড়, গায়ে গেরুয়া রঙের এক ভাগলপুরী বাপ্তার কোট। তখন আমি বোধ হয় কিপ্থ্ ক্লাসে পড়ি। স্কুলে যাইয়াই শুনিলাম, ইনেস্পেক্টার ভূদেব বাবু স্কুল দেখিতে আসিবেন। হেড মাষ্টার ছিলেন—বাবু বেণীমাধব দে।

ঠিক বেলা দুইটার সময়, ভূদেব বাবু আমাদের ক্লাসে আসিলেন। আমাদের মাষ্টার ছিলেন—ঋষিকল্প পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়। ইহার কথা পরে কোন সময়ে বলিব। ভূদেব বাবু ক্লাসে আসিয়াই পার্ব্বতী বাবুকে প্রণাম করিলেন। উভয়ে কোলাকুলি হইল। আমি ক্লাসের প্রথম ছেলে। আমাকে দেখিয়া ভূদেব বাবু একটু হাসিলেন; বলিলেন, 'তোমার পইতা হইয়াছে?' উত্তরে আমি বলিলাম, 'হাঁ।' "তুমি সন্ধ্যা মুখস্থ করিয়াছ?" উত্তরে আমি বলিলাম, 'হাঁ।' "বল দেখি সন্ধ্যার সই কোথা?" আমি অমনি বলিলাম, "মৈনস।" ভূদেব বাবু হাসিলেন। এই সময়ে হেড মাষ্টার বেণীবাবু ভূদেব বাবুকে বলিলেন,—"জিজ্ঞাসা করুন ত ওর বাপের নাম কি?" ভূদেব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবার নাম কি?" আমি রাগ করিয়া বলিলাম, 'যাঃ।' কথা এই যে, আমার পিতৃদেবের নাম বেণীমাধব, আমাদের হেড মাষ্টারের নামও বেণীমাধব। আমি পিতার নাম বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলে, হেড মাষ্টার বেণীবাবু—'একটু ভুল হইয়াছে' বলিয়া আমাকে লইয়া রঙ্গ করিতেন। ভূদেব বাবুও সে রঙ্গের লোভ ছাড়িতে পারেন নাই। আমার মহা রাগ হইল। শেষে ভূদেব বাবু কাছে ডাকিয়া, আমাকে একটু আদর করিলেন। আমাদের বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা

করিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মাতামহের নাম কি?" আমি মাতামহকুলের কোন পরিচয় জানিতাম না। আমি বলিলাম, "মা'র আবার বাবা আছেন না কি?" আমার কথা শুনিয়া বেজায় একটা হাসি পড়িয়া গেল। তাহার পর ভূদেব বাবু আমাকে লেখাপড়ার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সকল প্রশ্নের উত্তর করিয়া বলিলাম, "আমাকেই খালি খালি জিজ্ঞাসা করিলেন—অন্য ছেলেদের জিজ্ঞাসা করুন না?" উত্তরে ভূদেব বাবু বলিলেন, "বটেই ত। আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব না। এখন, তুমি কি করিতে চাও?" আমি বলিলাম, "খেলা করিতে।"

সেই বৎসরের শেষে—ছোট লাট স্যর য়্যাশলি ভাগলপুরে গিয়াছিলেন। আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিয়াছি। প্রাইজও পাইয়াছি। ছোট লাট স্বয়ং প্রাইজ বিতরণ করিতেছেন; খুব ধুম। আমার ভাগ্যে অনেকগুলি বহি প্রাইজ পড়িয়াছে। আমি সেই প্রাইজগুলি লইয়া ফিরিয়া আসিব, এমন সময় ভূদেব বাবু আমাকে ধরিয়া দাঁড় করাইলেন। এবং স্যর য়্যাশলিকে ইংরেজীতে কি বলিলেন। স্যর য়্যাশলি আমাকে ডাকিলেন। আমার বড় ভয় হইল। তথাপি ছোট লাটের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। ছোট লাট বলিলেন, "তুমি সেই স্তবটি আমায় পড়িয়া শুনাও।" সে এক অপূর্ব্ব স্তব। অমৃত বাজার পত্রিকায়—স্যর জন ক্যাম্বেলের উপর এক স্তব বাহির হইয়াছিল, আমার এক খুল্লতাত আমাকে তাহা শিখাইয়াছিলেন। আমাকে কেহ স্তব পড়িতে বলিলে, আমি সেই স্তবটি আবৃত্তি করিয়া শুনাইতাম। ছোট লাটের হুকুম—কি করি! হাতের প্রাইজ বহিগুলি নীচে রাখিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্লুতস্বরে আমি সেই স্তব পড়িতে লাগিলাম; তাহার একটা ছত্র আমার মনে আছে।

"জয় জর্জ্জ বার্ণাড বলীবর্দ্দবাহনম্"

আমার স্তব পড়া শেষ হইলে, ছোট লাট হইতে আরম্ভ হইয়া ঘরশুদ্ধ সকলে হাসিয়া উঠিল। স্যর য়্যাশলি আমাকে কাছে বসাইয়া রাখিলেন। প্রাইজ বিতরণ শেষ হইলে, তিনি সম্মুখের দুইটি বড় ফুলের তোড়া আমার হাতে দিলেন। আমি বহি ও তোড়া লইয়া সামলাইতে পারিলাম না। ভূদেব বাবু আমার বহিগুলি লইয়া, তোড়া দুটি আমার হাতে দিয়া আমাকে

সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাসায় আসিলেন। সেখানে আমি এক কোঁচড় সন্দেশ পাইলাম। সন্ধ্যার পর তিনি আমাকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। ইহার পর যত দিন ভূদেব বাবু জীবিত ছিলেন, আমার খবর রাখিতেন। আমি যখন পাটনা কলেজে পড়িতাম, তখন ভূদেব বাবু পাটনা-বিভাগে ইনেস্পেক্টার ছিলেন। পাটনা কলেজে আমাকে দেখিতে পাইয়া বাসায় লইয়া গিয়া আমাকে খুব আম খাওয়াইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে চুঁচুড়ায় গিয়া তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলাম। আমি ভূদেব বাবুকে অনন্যসাধারণ ধ্যানশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়াই জানিতাম। বোম্বাই প্রদেশে ভ্রমণকালে নামেযোশী কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলেঙ, ডাক্তার ভাণ্ডারকর, মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে প্রভৃতি মনীষীর সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলাম। কিন্তু ভূদেব বাবুর ন্যায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ এক স্যর টি. মাধব রাও ছাড়া আর কাহাকেও দেখি নাই। ভূদেবকে বাঙ্গালী চিনিতে পারে নাই। কখনও চিনিবে কি না, জানি না; কিন্তু যখন চিনিবে ও বুঝিবে, তখন বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের কল্যাণ হইবে। ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ভূদেবের শিক্ষা ও সিদ্ধান্তের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের দল ত সঞ্জীবিত হইয়াছিল। আমার সাহিত্যগুরু ইন্দ্রনাথ ভূদেবকে গুরুতুল্য পূজা করিতেন। দাদা অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই ভূদেব ব্রাহ্মণকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছেন।

('প্রবাহিণী,' ৪ বৈশাখ ১৩২১)

শ্রীশ্রীহনুমান

হাসিও না বাঙ্গালী! এ হনুমান তোমার কুমড়াখেগো হনুমান নহে; ইনি দাস্যভাবের আদর্শ, আত্মনিবেদনাসক্তির প্রতিমূর্ত্তি। হনুমান বেদের টীকা করিয়াছিলেন, মহানাটক লিখিয়াছিলেন, শ্রীরামের সেবায় ইহ-পরকাল সমস্ত রাখিয়াছিলেন। হনুমান পুরাণের একটি আদর্শ চরিত্র। হনুমান বহু সাধকের ইষ্টদেবতা।

গোড়ায় একটা কথা বলিব। আমাদের পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইতিহাস-গ্রন্থ হইলেও ইংরেজী হিসাবে History নহে। আমাদের শাস্ত্রে

তিন প্রকারের বাণী আছে। উহাকে রাজবাণী, মিত্রবাণী ও কান্তাবাণী বলে। রাজবাণী আদেশের বাণী—হুকুমের কথা। আপ্তবাক্যপূর্ণ বেদ—রাজবাণী। রাজা যেমন কেবলই আদেশ করেন, যুক্তি-তর্কের উত্থাপন করেন না; বেদও তেমনি বিধি-নিষেধের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেন নাই। তাই বেদবাক্য রাজবাণী। দর্শনশাস্ত্র—মিত্রবাণী। যেমন মিত্রের সহিত লোকে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া উপদেশের কথা বলে, তেমনি দর্শনশাস্ত্রে বুঝান-কথা, শিখান-কথা নানা যুক্তি-তর্কের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া বলা হইয়াছে। তাই উহাকে মিত্রবাণী বলে। শেষ কান্তাবাণী: পুরাণ, ইতিহাস, আখ্যায়িকা, উপাখ্যান কান্তাবাণী-প্রকাশক। যেমন কুলাঙ্গনার সহিত—মাতা, ভগ্নী, কন্যার সহিত কোন কথা কহিতে হইলে, গল্পগাছা করিয়া, মিষ্ট মনোহর করিয়া বলিতে হয়, তেমনি পুরাণেও ধর্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্তসকল অর্থবাদের ভিতর দিয়া, রোচক ও মনোহর করিয়া বলা হইয়াছে। তাই পুরাণকে কান্তাবাণীপূর্ণ বলা হয়। বেদ বীজ, দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্র পত্রপল্লবসমন্বিত কল্পদ্রুম। আর পুরাণ ইতিহাস সেই কল্পবৃক্ষের ফল ও ফুল। পুরাণে যেমন কোনও আষাঢ়ে গল্প হোক না, জানিও সে গল্পের মধ্যে অবশ্য একটা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত লুকান আছেই। লোক-শিক্ষার জন্য, লোক-হিত সাধনের উদ্দেশ্যে জাতি ও ধর্ম্মের বিশিষ্টতা রক্ষাকল্পে পুরাণসকল রচিত হইয়াছিল। অধুনা-প্রচলিত সকল পুরাণ ও উপ-পুরাণ ভারতের নানা প্রদেশের নানা যুগের ভাববিপ্লবের এক একটা স্তর মাত্র। এই হিসাবে পুরাণসকল বিশ্লেষণ করিলে ভারতের অতীত ইতিবৃত্তের কথা অনেকটা জানা যাইতে পারে।

রামায়ণ ভারতের একটা বড় যুগের কথায় পূর্ণ। যে বাল্মীকি-রামায়ণ অধুনা আমরা পাঠ করিয়া থাকি, তাহা কবে রচিত হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে উহা যে প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন গ্রন্থ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাহার পূর্ব্বেও রামায়ণী কথা এ দেশে প্রচলিত ছিল। রামায়ণ আবার অনেক রকমের আছে। অদ্ভুত রামায়ণ, অপূর্ব্ব রামায়ন, অধ্যাত্ম রামায়ণ, জৈনদিগের রামায়ণ, বাশিষ্ঠ রামায়ণ, এমন যে কত রামায়ণ আছে, তাহা হিসাব করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। সকল রামায়ণের কথা এক রকম নহে। কোন কোন রামায়ণে

আবার সীতাকে রামের ভগ্নী করা হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া অনেক পণ্ডিতে অনুমান করেন যে, রামায়ণ একটা কাল্পনিক কথা মাত্র। যুগে যুগে ঐ কথা অবলম্বনে কবিশ্রেষ্ঠগণ অপূর্ব্ব কাব্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যাউক এ কথা; প্রত্নতত্ত্বের বিচার আর নাই করিলাম। আমাদের আলোচ্য বিষয় বাল্মীকির রামায়ণ; এবং বাঙ্গালীকে উদ্দেশ করিয়া যখন লিখিতেছি, তখন কৃত্তিবাসের উল্লেখ না করিয়াও থাকিতে পারিব না।

শ্রীরামচন্দ্রের আলোচনায় বলিয়াছি যে, ভারতের আর্য্যসমাজে সৎধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে—ধর্ম্মের দশটি লক্ষণকে উদাহণের দ্বারা পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে রাম-অবতারের উপ-কল্পনা। সংযম, সন্ন্যাস, বিনয়, ধৃতি, ক্ষমা, দম, আস্তেয়, সেবা, সখ্য প্রভৃতির উদাহরণ দেখাইবার জন্যই যেন রামায়ণ লিখিত হইয়াছে। যে যুগে রাবণের উদ্ভব, যে যুগে দশরথের ন্যায় ক্ষত্রিয় নরপতি ষোড়শ সহস্র কাম-পত্নী রাখিয়াও রাজর্ষি, সেই যুগে এক দিকে রাম, অন্য দিকে জনক চরিত্রের বিন্যাস করিয়া কবি সমাজ-সংস্কারের এক অপূর্ব্ব পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন; লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ, বিভীষণ, জাম্বুবান, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি চরিত্রসকল প্রতিবেশ-প্রভাব ফুটাইবার জন্যই বিন্যস্ত। ভুঁইফোঁড় কিছুই হয় না। আকাশ হইতে কেহ পড়ে না। নেপোলিয়ন একা আসেন নাই, চৈতন্যও একা আসেন নাই। সম্প্রদায়-যুক্ত না হইয়া মহাপুরুষ উদ্ভূত হন না। এই সাম্প্রদায়িক শক্তি বিশ্বমানবতার উন্মেষে প্রতিবেশ-প্রভাব। হনুমান রাম-চরিত্রের ক্ষেত্র-স্বরূপ। হনুমান ও রাম অঙ্গাঙ্গীভাবে বিন্যস্ত। রামায়ণ বুঝিতে হইলে, রাম-তত্ত্বের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। রামায়ণ ভাল করিয়া পড়িতে হইবে।

হনুমান দাস্যভাবের আদর্শ,—কিঙ্করতার অনুপম ও অতুলা আদর্শ। তুমি প্রভু,—আমি দাস। তুমি মনিব, আমি ভৃত্য। আমার দেহ, মন, আত্মা,—আমার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি—আমার আসক্তি অনুভূতি—আমার বুদ্ধি, মেধা, মনীষা, প্রতিভা আমার ইহকাল-পরকাল, আমার সর্ব্বস্ব তোমার সেবায় বিনিযুক্ত। তোমা ছাড়া আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তোমার সেবা ছাড়া আমার স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য নাই। আমি তোমার,—তোমাময়,—তোমাগত প্রাণ—ইহাই দাস্যভাবের মূল সূত্র। সেবক সম্ভব-অসম্ভবের বিচার করিবে না,—পাপ-পুণ্যের বাছাই করিবে না,—স্বীয়

সামর্থ্য অসামর্থ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া বিমূঢ় হইবে না, সে কেবল আদেশ পালন করিবে, হুকুমের চাকর হইয়া প্রভুর ঈপ্সিত সাধন করিবে। হনুমান এই আদর্শের, এই বিবৃতির স্থূল, সচল, সাবয়ব, সাকার অভিব্যঞ্জনা। উহার চরিত্রে তত্ত্বসিদ্ধান্তের তিলমাত্র অপপ্রয়োগ নাই; ভক্তিশাস্ত্রের বিবৃতির কণামাত্র অপচয় ঘটে নাই।

হনুমান অমর; কেন না, প্রভুর সেবায় সে ত মরণকে ভয় করে না; কেন না, প্রভুর কার্য্যে সে যে ইহকাল পরকাল সমর্পণ করিয়াছে; কেন না, রাম-আরাধনায় সে যে আমিত্বকে রাম-চরণ-সরোজে ডুবাইয়া দিয়াছে। কাজেই যত দিন রাম, তত দিন হনুমান। বিরাট্ বিশ্বব্যাপী আমি বা পরমাত্মা যত দিন রামরূপে সোনার কমল হইয়া ভারতবাসীর মানস-সরোবরে ফুটিয়া থাকিবে, তত দিন সেই সোনার কমলের তলে কমল-পত্রের ন্যায় হনুমান-চরিত্র ভাব-সলিলে ভাসিতে থাকিবে। তাই হনুমানের মরণ নাই।

হনুমান কখনও 'ভাবের ঘরে চুরি' করেন নাই। তিনি মুখে একটা, পেটে একটা রাখিয়া কাজ করেন নাই। তাই হনুমান বুক চিরিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, দেখ, আমার হৃদ্‌পিণ্ডের উপর রাম-সীতার স্বর্ণ চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। দেহের প্রত্যেক অস্থিতে, পঞ্জরে পঞ্জরে, শোণিত-লেখায় রাম-সীতার নাম লিখিত রহিয়াছে। হনুমানের আমিত্ব, হনুমানের দেহগত জীবাত্মার অহঙ্কার, হনুমানের সেই দেহের কোনখানেই পরিস্ফুট নাই। হনুমানের মেদ-মজ্জা, অস্থি-বসা, চর্ম্ম-রোমাবলি—দেহের সর্ব্বত্র এবং সেই দেহজড়িত মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি যাবৎ বিষয়গুলি সর্ব্বস্বই রাম-সীতার সেবায় উৎসর্গীকৃত। হনুমানের স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, বন্ধু নাই, সখা নাই, গৃহ নাই, বিষয় নাই, জুড়াইবার জন্য কোন কিছু নাই,—আছেন কেবল রাম-সীতা। সীতা-রামের সেবায় তাহার সুখ। তাঁহাদের আজ্ঞাকারিতাই তাহার ঘর-সংসার। হনুমান অন্য কিছু মানে না, অন্য কিছু চাহে না, অন্য কিছু ভাবে না,—বুঝে, ভাবে, জানে, দেখে কেবল সীতারাম। রাম-সেবায় পাপ-পুণ্যের বিচার করিবার তাহার অবসর নাই। কেন না, রাম ছাড়া তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই। রাম-সেবায়, রাম-কার্য্যে সে রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়াছে, সহস্র সহস্র নারীকে বিধবা করিয়াছে, সহস্র সহস্র বালককে অনাথ পিতৃহীন

করিয়াছে। ক্ষণেকের জন্যও তাহার মনে এই হেতু ক্লৈব্য দেখা দেয় নাই। সে কখনও অবসাদে অবসন্ন হয় নাই। কারণ, তাহার ত স্বতন্ত্র আমিত্ব-বোধ ছিল না। সে জানিত, আমার রাজা রামচন্দ্র, আমার প্রভু রামচন্দ্র, আমার ইষ্টদেবতা রামচন্দ্র, আমার ইহকাল পরকাল সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য সবই রামচন্দ্র। সে হুকুমের নফর, দাসানুদাস—গোলামের গোলাম। রামচন্দ্র ছাড়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাহার ছিল না বলিয়াই, হনুমানের স্বতন্ত্র অনুভূতিও ছিল না। দাস্যের এমন আদর্শ জগতের সাহিত্যে আর নাই।

হনুমান মহাপণ্ডিত ছিলেন; তপঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত-পরিচালিত মহাপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ, মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের অবতার ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও হনুমানের পাণ্ডিত্যের পরিচয় রামায়ণের কোনখানে পাইয়াছ কি? ঠিক যতটুকু হুকুম, হনুমান ততটুকু কাজ করিত। নিজের বিদ্যার, নিজের বুদ্ধির তিল মাত্র প্রয়োগ করিত না। হনুমান বলিত, "দাস আমি, সেবকাধম আমি—আমার আবার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়? আমি শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ পালন করিয়া জীবন সার্থক করিব।" দাস্যভাবে তন্ময়তা না ঘটিলে, সত্য সত্যই আত্মনিবেদন করিতে না পারিলে, এতটা আত্মগোপন দেহীর পক্ষে সম্ভবপর হয় না। হনুমান অঘটন ঘটাইয়াছেন; নর হইয়া, নরশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া, বিশ্বমানবতার আদর্শ শিবের অংশাবতার হইয়া, বেদজ্ঞ বটুক হইয়া, মন্ত্রসিদ্ধ মহাবিদ্ হইয়া, বানর সাজিয়াছিলেন,—সেবকের অতুল্য আদর্শ ফুটাইবার জন্য, পশুত্বের আবরণে, বর্ব্বরতার অবগুণ্ঠনে চিরদিন আত্মগোপন করিয়াছেন।

হনুমান পুরুষ প্রকৃতির—রাম সীতার যুগলরূপের সেবক ও সাধক; যত ক্ষণ যুগল রূপ অবিযুক্ত, তত ক্ষণ হনুমান দাসানুদাস, অবিচারিত চিত্তে আজ্ঞাকারী সেবক। কিন্তু যখনই সীতার বর্জ্জন, তখনই হনুমানের আত্মবিলোপন। সীতার পাতাল প্রবেশের পর রামায়ণে হনুমানের কথা আর নাই। তখন হইতেই হনুমান সংমূঢ় ও সংমূর্চ্ছিত অবস্থায় রহিয়াছেন। কেবল গোস্বামী তুলসীদাস বলিয়াছেন যে, চিত্রকূট পর্ব্বতে রামনবমীর পর শয়ন-একাদশীর পূর্ব্বে সীতারাম যুগল রূপে বিচরণ করেন। সেই সময়ে হনুমানও যুগল রূপের সম্মুখে দাসানুদাসরূপে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিরাজ করেন।

হনুমান-চরিত্র অপূর্ব্ব, অনুপমেয় এবং অসাধারণ। এমন হয় না, হইবার নহে। এমন হনুমান যে-দেশের দেবতা, সে দেশে স্থৈর্য্য ধৈর্য্য এবং কৈঙ্কর্য্যের এত অভাব ঘটে কেন? ('প্রবাহিণী,' ১১ বৈশাখ ১৩২১)

পঞ্চ কন্যা

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্॥"

বহু দিন হইতে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছেন যে, সীতা সাবিত্রীর নাম গেল, প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী—এই পঞ্চ নারীর নাম করিতে হয় কেন? আমরা ইহার উদ্দেশ্য যতটুকু অনুমানে জানিতে পারিয়াছি, তাহাই আজ ব্যক্ত করিব।

প্রথমতঃ—এই শ্লোকে অহল্যাদি পাঁচ জনকে "কন্যা" বলা হইয়াছে। রসমঞ্জরী গ্রন্থে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায়, এম-এ মহাশয় "কন্যা" শব্দের এই অর্থ লিখিয়াছেন :—

"যৌবন আগত কিন্তু বিবাহ না হয়।
কন্যা-নামে রসশাস্ত্রে তার পরিচয়॥"

যাহার যৌবন ফুটিয়া উঠিয়াছে, অথচ পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি অভিভাবকবর্গ যাহাকে সৎপাত্রে দান করিতে পারেন নাই, তাহাকেই রসশাস্ত্রে কন্যা বলা হইয়া থাকে। ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইলে যে যুবতী পাত্রসাৎ না হন, তিনি স্বয়ং চেষ্টা করিয়া পতি বাছিয়া লইতে পারেন। কন্যার এই অধিকার আছে; সাবিত্রী এই অধিকার ব্যবহার করিয়াছিলেন। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী,—ইহারা পাঁচ জনেই কন্যা এবং কন্যার অধিকার ব্যবহার করিয়া পতিলাভ করিয়াছিলেন। রসমঞ্জরীতে কন্যার এইরূপ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে।

"ঈষৎ বাঁকিছে হার, সরল ভ্রূলতা আর,
ছলে হাসি করিছে গোপন,

নয়ন-তারকা ঘোরে, লাগিয়াছে ভূজ 'পরে,
নীলোৎপল-প্রবাল ভূষণ ;
অঙ্গুলে অঙ্গুরী-ভাতি ছড়ায় বিমল জ্যোতিঃ,
ক'রে তাহে গণ্ড কণ্ডূয়ন ;
রাজ-কন্যা ছল ক'রে এ ভাবে হেরেছে যারে,
কে সে বটে পুণ্যবান জন !"

কন্যা এইরূপ স্বাধীনা ; কন্যা অনেকটা স্বৈরিণী, কিন্তু গণিকা নহে। Free love বা স্বাধীন প্রেম যাহাতে ফুটিতে পায়, যিনি ইচ্ছা করিয়া পতি বাছিয়া লইতে পারেন, তাঁহাকেই "কন্যা" বলা হয়। অহল্যাদি পাঁচ জন—কন্যা, পুরস্ত্রী বা কুলাঙ্গনা নহেন। কাজেই ধর্ম্মশাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়া ইহাদের জীবন-কাহিনী মাপিলে চলিবে না। ইহারা স্বতন্ত্রা, স্বচ্ছন্দনা, স্বাধীনা। এই স্বাধীনতার জন্য ইহাদিগকে পাপ-পঙ্কে পড়িতে হইয়াছিল ; কিন্তু সে পঙ্ক হইতে ইহারা উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন।

এই পঞ্চ কন্যা জীবনের এক সময় না এক সময়ে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। অহল্যা, শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় পাপমুক্তা হইয়াছিলেন ; দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের সখা ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লজ্জানিবারণ, পতিতপাবন, বিপদ্‌ভঞ্জন ; কুন্তীও শ্রীকৃষ্ণের কৃপা চিরজীবন আকাঙ্ক্ষা করিতেন, কৃষ্ণসঙ্গ-লাভ আশায় কুন্তী দুঃখকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না ; তারা শ্রীরামচন্দ্রের কৃপালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই আদেশে তিনি আবার রামসুহৃদ্‌ সুগ্রীবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন ; মন্দোদরী শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, তাই ভগবৎ-আদেশে বিভীষণকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্তি-শাস্ত্রের হিসাবে পাপ-নাশের ইহা একটা বড় লক্ষণ। যাঁহার স্মরণে পাপ দূর হয়, যাঁহার দর্শনে অতি পাপীও পুণ্যবান হয়, সেই সংসারের সার, সর্ব্বগুণাধার, করুণানিধান ভগবানের দর্শন যাহারা পাইয়াছে, যাহারা তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছে, ভগবান্‌কে লইয়া ঘর-সংসার করিয়াছে, তাহারাই ত প্রাতঃস্মরণীয়। আমি প্রাতঃকালে, শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে স্মরণ করিব কাহাকে ? যে আমারই মত স্বেচ্ছাবশে পাপসংলিপ্ত হইয়া আবার সেই স্বেচ্ছাবশে পাপ-সাগর হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে। যে একনিষ্ঠার বলে পাষাণী হইয়া অহল্যা পড়িয়া ছিল, রামের আশাপথ

নিরীক্ষণ করিয়া অনুশোচনার কোটি বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা ভোগ করিয়া রাম-আগমনের জন্য দিন গণিতেছিল, সংসার-দাবদগ্ধ জীব আমি—আমার পক্ষে সে একনিষ্ঠার মূল্যও নাই। বড় সাধ হয়, অমনি অহল্যার মত পাষাণময় হইয়া, সংসারের সকল প্রলোভনের অতীত হইয়া ভক্তের ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে থাকি। অহল্যার সার্থক জীবন, সার্থক দেহধারণ, তাই সে রামরূপ দর্শন করিতে পারিয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে অহল্যার নাম করিব না ত, আর কাহার নাম করিব? দ্রৌপদী কৃষ্ণ-সখী, সুখে দুঃখে কৃষ্ণই তাহার সহায়, বল, বুদ্ধি, ভরসা; দ্রৌপদীও প্রাতঃস্মরণীয়া। যাঁহার দর্শন পাইবার জন্য কত যোগীজন জন্ম জন্ম কঠোর তপস্যা করিতেছেন, যাঁহার এক বার দর্শন পাইলে কোটিকল্পের পাপরাশি ক্ষণেকের মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া যায়, সেই দীননাথ ভবতারণ, লোকপাবন পরমাত্মার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যাহারা কৃতার্থ হইয়াছে, তাহারাই আমাদের মত দুর্ব্বল জীবের প্রাতঃস্মরণীয়। আমাদের পদে পদে পদস্খলন হইতেছে, অনৃত ভয় আমাদের নাই, কথায় কথায় মিথ্যা বাহির হইতেছে,—অতএব তাহারাই আমাদের আদর্শ, যাহারা পড়িয়া উঠিয়াছে, যাহারা পাপী হইয়া পাপমুক্ত হইয়াছে, যাহারা আমাদের মতন সুখ দুঃখের জালে জড়াইয়াছে, আমাদেরই মত সুখের মোহে বিপথে গিয়াছে। এই পঞ্চ কন্যা সুখের মোহ জানিয়াছে, দুঃখের জ্বালা সহিয়াছে, শেষে শ্রীভগবানের কৃপায় পরমানন্দ লাভ করিয়াছে। দুর্ব্বল সংসারী জীবের পক্ষে এই পঞ্চ কন্যাই ত প্রাতঃস্মরণীয়। কেন না, ইহারাই ত মহাপাতকনাশন। ফলে, ইহারাই আমার পথপ্রদর্শক, জীবনের উৎসাহদাতা ও অবলম্বন। যখন ভগবানের প্রার্থনা করি, তখন আমি তাঁহাদেরই নাম করিয়া থাকি, যাঁহারা পাপী হইয়াও পরে করুণাময়ের করুণায় উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন। অস্কা, বঙ্কা, সুজন, কসাই, কেবল, কুবা, বিল্বমঙ্গল, জগাই, মাধাই প্রভৃতিরই জীবন-কথা স্মরণ করিয়া আমি আশান্বিত হইয়া থাকি। যে আমাকে আশাপথ দেখাইবে, সেই ত আমার আদর্শ, সেই ত আমার প্রাতঃস্মরণীয়। প্রাতঃকাল, আশার কাল, উৎসাহের কাল, উদ্যমের কাল; এই কালে তাহাদেরই স্মরণ করিতে হয়, যাহারা মহাপাপী হইলেও আশার আশায়, উদ্যম এবং উৎসাহের বলে চিরজীবনের পাপ ক্ষালন করিয়াছিল,—শ্রীভগবানের

দর্শন লাভ করিয়াছিল। এই পঞ্চ কন্যার নাম করিলে মনে হইবে, ভাবনা কি, একনিষ্ঠা থাকিলে, দৃঢ়ব্রত হইলে, আমারও উদ্ধার সম্ভবপর হইবে, আমিও কৃপাময়ের কৃপায় তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিব। প্রথম প্রভাতে, দিনের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যিনি এমন আশার কথা হৃদয়ে ধরিয়া শয্যাত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার আর ভাবনা কিসের, তাঁহার সকল কার্য্যই কল্যাণময় হইবে।

ভাবের ঘরে চুরি করিতে নাই, তাই প্রার্থনা-কালে বলিতে হয়,—

"ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং
ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত-
র্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবন্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥"

এই ত আমরা, নিজমুখে আমাদের এই স্তোত্র পাঠ করিতে হয়। আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় তাঁহারাই, যাঁহারা আমাদের মতন পদে পদে পতিত হইয়া পতিতপাবনের কৃপায় উদ্ধারলাভ করিয়াছিলেন। ইহার উপর, যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে দেখিয়াছেন, তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহার মুখারবিন্দ-নিঃসৃত সুধাময়ী বাণী শ্রবণ করিয়াছেন, শ্রীভগবানের আদেশ পালন করিয়া দেহমন সার্থক করিয়াছেন, বিপদে সম্পদে, অরণ্যে রণে যাঁহারা শ্রীভগবানের সঙ্গলাভ করিয়াছেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত এক স্থানে বসবাস করিয়াছেন, তাঁহারাও জীবন্মুক্ত ধন্য কৃতার্থ; বেশ্যা হইলেও তাহারা সতী, পতিতা হইলেও তাহারা প্রাতঃস্মরণীয়া। ইহাই ভক্তি-শাস্ত্রের আদেশ। এ আদেশ লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা কোন হিন্দুরই

নাই। বিশেষতঃ যখন "কন্যা" বলিয়া ইহাদের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন ধর্ম্মশাস্ত্রের হিসাবেও ইহাদিগকে দোষী করা যায় না।

প্রাতঃকালে কেবল পঞ্চ কন্যার নাম করিলেই পর্য্যাপ্ত হইল না। পুণ্যশ্লোকদিগেরও নামোচ্চারণ করিতে হয়। যথা,—

"পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকাচ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥"

এখানেও কেবল কর্ম্মীর নাম—যাহারা মোহবশতঃ পতিত হইলেও পরে কর্ম্মপ্রভাবে জগতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে, তাহারাই পুণ্যশ্লোক। নল ও যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব হারাইলেও পরে কর্ম্মপ্রভাবে স্বপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। এক বার অগ্নিতে দেহ দগ্ধ হয়, পরন্তু সে দাহজ্বালা ও দাহক্ষত কত দিন থাকে! সে জ্বালা ও ক্ষতের ব্যথা দূর করিতে কি বিষম চেষ্টা করিতে হয়! নল ও যুধিষ্ঠিরের জীবনে এই সত্যই পরিস্ফুট। বৈদেহী সীতা মায়ামৃগলোভে কি কষ্টই না পাইয়াছিলেন! সোনার মৃগ সজীব হয় না, ইহা ত তিনি জানিতেন; তথাপি কেমন লোভ; স্ত্রীজনসুলভ সোহাগের বশ হইয়া স্বামীর কাছে আবদার। তাহারই ফলে অসীম কষ্ট;—সে কষ্টের সাগর কেমন একনিষ্ঠার বলে তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন! তাই তিনি পুণ্যশ্লোক। আর জনার্দ্দন—শ্রীকৃষ্ণ, তিনিও পুণ্যময়, কর্ম্মময়, তাঁহার কর্ম্মকথা ভারত-কথা, তাঁহার জীবন—ভারতজীবন। এই চারিটি পুণ্যশ্লোকের নাম করিয়া শয্যাত্যাগ করিলে লোভের ভয় থাকে না, মোহের পাশে বদ্ধ হইতে হয় না, কর্ম্মের উন্মাদনা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে। প্রাতঃকালে স্মরণ করিতে হইবে যে, আমি হিন্দু; যাহাদের দ্বারা আমার হিন্দুত্বের পুষ্টি, আমার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি ও বিস্তৃতি; যাহারা আমার বংশের ধারা নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, আমার শ্লাঘার সূচনা করিয়া গিয়াছেন—তাহারাই আমার প্রাতঃস্মরণীয়—আমার জীবন-যজ্ঞের অবলম্বন—আমার সংসার-সমরাঙ্গণের অস্ত্রশস্ত্রস্বরূপ। রামায়ণ-মহাভারতের কথাই আমাকে হিন্দুভাবে বাঁচাইয়া রাখে, পঞ্চ কন্যা এবং চারি জন পুণ্যশ্লোক আমার জাতিগত শ্লাঘার পুষ্টি করে, হিন্দুত্বের প্রণালীর মধ্যে আমাকে সংবদ্ধ রাখে—আমার পিতৃপরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখে। তাই উহারা প্রাতঃস্মরণীয়, তাই হিন্দু পুত্র পৌত্রাদিক্রমে প্রতি দিন প্রত্যূষে

উঁহাদের নাম আবৃত্তি করিয়া আসিতেছে। যে দিন এ আবৃত্তি বন্ধ হইবে, সেই দিন হিন্দুত্বের অপচয় ঘটিবে, সে দিন হিন্দু নাম লোপ পাইবে। এই কয়টা নামই অতীতের সহিত আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই কয়টা নাম বিস্মৃত হইলে অতীতের সহিত সকল সম্বন্ধচ্যুত হইতে হইবে। অতীত নষ্ট হইলে হিন্দুর থাকে কি?
('প্রবাহিণী,' ২৫ বৈশাখ ১৩২১)

জামাইষষ্ঠী

জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠী। বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে যত ব্রতপূজা আছে, তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম—আত্মজন্য; দ্বিতীয়—সমাজজন্য; তৃতীয়—সম্বন্ধজন্য। আত্মরক্ষা ও আত্মার উন্নতির জন্য যে সকল ব্রতপূজা তাহা আত্মজন্য; যেমন কালীপূজা, শিবচতুর্দ্দশী প্রভৃতি। সমাজরক্ষা ও সমাজের পুষ্টির জন্য যে সকল ব্রতনিয়ম তাহাকে সমাজজন্য বলে; যেমন দোল-দুর্গোৎসব, নন্দোৎসব প্রভৃতি। সংসারের বা পরিবারের সম্বন্ধ যাহাদের সহিত আছে, তাহাদের কল্যাণ কামনা করিয়া যে সকল ব্রতপূজা করিতে হয়, তাহাদের সম্বন্ধজন্য বলে; যেমন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, সাবিত্রীচতুর্দ্দশী, জামাইষষ্ঠী, শীতাষ্টমী প্রভৃতি। এই তিন শ্রেণীর ব্রতপূজায় সাক্ষাতে বা পরোক্ষে আত্মার উন্নতি চেষ্টা আছেই, তবে বিনিয়োগ কখনও বা জগদ্ধিতায়, কখনও শ্রীকৃষ্ণায়, কখনও বা ব্যক্তিবিশেষের নাম করিয়া বলিতে হয়। জামাইষষ্ঠীটি সম্বন্ধজন্য ব্রত বা উৎসব। ষষ্ঠীপূজা পুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া করিতে হয়; জামাতাও পুত্রবৎ, তাই জামাতার কল্যাণজন্য একটা ষষ্ঠীর ব্রত স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। এই দিনে প্রত্যেক বিবাহিতা কন্যার জননী নিজ নিজ কন্যার পতিকে পুত্রের আসনে বসাইয়া, পুত্রোচিত আদর ও পূজা করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। প্রথমে ষষ্ঠীর পূজা, তাহার পর মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও কথা; শেষে ফলপূর্ণ অর্ঘ্যপাত্র দিয়া জামাতার আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাদ এই যে, জামাতা পুত্রতুল্য হউক—পুত্রের স্থানীয় হউক এবং

স্বয়ং বহু পুত্র-কন্যার জনক হইয়া আমার মাতৃত্বের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখুক। পুত্র যেমন পিতার আত্মজ, কন্যা তেমনি জননীর আত্মজা। পুত্রের সাহায্যে পিতার পিতৃত্বের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে; কন্যার সাহায্যে মাতার স্ত্রীত্বের বা জননীত্বের ধারা অব্যাহত থাকে। কেন না, স্ত্রীত্ব এবং পুংস্ত্ব এই দুয়ের সমবায়ে মনুষ্যত্ব; সেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটাইবার জন্য জামাইষষ্ঠী ব্রত।

যত দিন কন্যা জামাতা দৌহিত্র জীবিত থাকিবেন, অথবা যত দিন দৌহিত্র দৌহিত্রী এবং জামাতা জীবিত থাকিবেন, তত দিন বর্ষে বর্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীর দিন জামাতার পূজা করিতেই হয়। বিশেষতঃ জামাতা পুত্রপৌত্রাদি পরিবৃত হইলে তেমন জামাতার পূজা সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। কিন্তু আমাদের সমাজে, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার তাড়সে জামাইষষ্ঠীটা নূতন জামাতা লইয়া জমাইয়া তোলা হয়। পুরাতন জামাতা, যাহার পুত্রপৌত্রাদি হইয়াছে, তাহার আদর ও পূজা হয় না। অথচ শাস্ত্রের আদেশ মান্য করিতে হইলে যে জামাতার পুত্রপৌত্রাদি হইয়াছে, কন্যা সহ তাহারই পূজা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কেন না, সে যে বহুপোষী হইয়া কল্যাণ-কামনায় পূর্ণতা সাধন করিয়াছে। তাহার দ্বারা মাতামহ-কুলের ধারা সুরক্ষিত হইয়াছে, জননী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মাতৃত্বের ধারা সে অব্যাহত রাখিয়াছে; জামাইষষ্ঠী বাবুয়ানির উৎসব নহে—ইয়ারকির উৎসব নহে—বংশানুক্রমের বা heredityর উৎসব। কিন্তু দুঃখের বিষয় কালবশে এমন উৎসবটা বিলাসের উৎসবে পরিণত হইয়াছে। নূতন জামাতা দুই বৎসর কাল শ্বশুরবাড়ীর আদর যত্ন পাইয়া থাকেন; তাহার পর চিরজীবনটা জামাতার সহিত শ্বশুরগৃহের তেমন স্নেহ-সম্পর্ক থাকে না;—শ্বশুর শাশুড়ী কোন সম্বন্ধ রাখেন না, জামাতা ত রাখেনই না। কন্যাদান করিলেই শ্বশুর শাশুড়ী মনে করেন, ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল; জামাতা মনে করেন, যা পারিলাম জন্মের মতন আদায় করিলাম। যাহাতে উভয়ে সদ্ভাব থাকে—আত্মীয়তা বজায় থাকে—দুইটি সংসার এক হয়, সে চেষ্টা কাহারও নাই। তাই মনে হয় যে, এখনকার দিনে দৌহিত্র-দৌহিত্রী লইয়া সংসার-সুখে কেহ সুখী হইতে পারে না; বাঙ্গালী বাবুদের মধ্যে পারিবারিক আনন্দ-উল্লাস আর নাই, সব দোকানদারি, সব লেন-দেনের কাণ্ড হইয়াছে। কন্যা-বিবাহের পণ

কমাইবে কেমন করিয়া? তুমি চাও, যত সস্তায় পারি কন্যা পাত্রসাৎ করি; পুত্রের পিতা চাহে, যত পারি গামোছা-নিঙড়ানর মত কন্যার পিতার নিকট হইতে টাকা আদায় করি। ফলে, উভয় পরিবারের মধ্যে কোন মতেই আত্মীয়তা স্থাপন হইতে পারে না; জামাইকে দেখিলেই কন্যার বাপ ভয়ে কাঁপেন। আবার ইংরেজীনবীস জামাই বাবুরা পত্নীকে লইয়া কেবল নায়িকার সাধ মিটান, নভেলী লভের মক্স করেন। ভাব লইয়া সংসার; এই ভাবকে মধুময় করিতে পারিলে সংসারযাত্রাটাও মধুময় হইয়া যায়। আমাদের শাস্ত্র মধুময় ভাব দিয়া জীবনযাত্রাকে মধুময় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শাস্ত্রের সে মাধুরী বর্জ্জন করিয়াছ, জীবনটাও তাই কঠোর হইয়াছে, সদা হাহাকারে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; তোমরা কিছুতেই সুখী ও তুষ্ট হইতে পারিতেছ না।
('প্রবাহিণী,' ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১)

স্মৃতি-কথা

কেশবচন্দ্র সেন

নিতান্ত শৈশবের কথা মনে নাই; ১৮৭৮।৭৯ সালে যখন কেশবচন্দ্র ভাগলপুরে যান, তখনকার কথাটা আমার বেশ মনে আছে। তিনি ভাগলপুরে এক 'Band of Hope' প্রতিষ্ঠা করেন। আমার সহপাঠী শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত মিত্র, এম. এ. এবং আমি এই 'Band of Hope'এর প্রথম সম্পাদক হইয়াছিলাম। এই সভা প্রতিষ্ঠার পর কেশব বাবু ছেলেদের একটা ভোজ দিয়াছিলেন। সেই ভোজে মাটির ছোট ছোট হাফ্ গ্লাসে সরবৎ খাইতে দিয়াছিলেন। এই গ্লাসগুলিকে হিন্দীতে 'চুক্কড়' বলে। বেহারে এই 'চুক্কড়ে' করিয়া ধেনো মদ খাইবার রীতি আছে। আমরা ত ভোজ খাইয়া আসিলাম। আমাদের পণ্ডিত নিত্যানন্দ মিশ্র হাসিয়া বলিলেন, "আরে খায়ো, খায়ো—চুক্কড়মে খায়ো।" পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে কথাটা শুনিয়া বড় লজ্জা হইল—রাগও হইল। সেই 'চুক্কড়' হাতে করিয়া কেশব বাবুর কাছে গেলাম। তখন আমার বয়স ১১ বৎসর। রাগে আমার মুখ লাল হইয়াছে। কেশব বাবুর সম্মুখে একটা জলচৌকির

উপর সেই 'চুক্কড়' জোরে রাখিয়া বলিলাম, "আমি আর আপনার সভায় থাকিব না।" শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম. এ. মহাশয় (কৃষ্ণনগরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট এস. সি. মুখার্জির পিতা এবং শ্রীমান্ দেবকুমার রায়ের পিসা মহাশয়) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমার সঙ্গে অন্য সব ছেলেও ছিল। আমার ভঙ্গী দেখিয়া নিবারণ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে বাবা ?" আমি আর তাল সামলাইতে না পারিয়া হিন্দীতেই বলিয়া ফেলিলাম, "চুক্কড় মে পানি পিয়াবা ? এইসি গোস্তাকি।" আমার কথা শুনিয়া তখন কেশব বাবু মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারখানা কি ? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন নিবারণ বাবু একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কাজটা দোষের হইয়াছে বটে, 'চুক্কড়ে' সরবৎ খাইতে দেওয়া ঠিক হয় নাই। সুরাপানের যাহা নির্দ্দিষ্ট পাত্র, এ দেশের ইতর লোকে যাহাতে সুরাপান করে, 'Band of Hope'এর উৎসবে সে পাত্র ব্যবহার করা ঠিক হয় নাই।" এই সব কথা শুনিয়া কেশব বাবু আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমার কাছে আসিয়া নীরবে মাথায় ও পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমি পূর্ব্বে হইতেই কেশবচন্দ্রকে 'জ্যেঠা মহাশয়' বলিয়া ডাকিতাম। সুতরাং জ্যেঠা-মশায়ের এই নীরব আদরে আমি যেন সোহাগে গলিয়া গেলাম। সে নীরব স্নেহের আদর আমি এখনও ভুলি নাই। পরে তিনি আমাকে হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। ভিতরে ভাগলপুরের ব্রাহ্মশ্রেষ্ঠগণের মহিলাসকল উপস্থিত ছিলেন। আমি সকলের নিকটই পরিচিত ছিলাম। বিশেষতঃ, ৺কৃষ্ণধন ঘোষের ভ্রাতা ৺বামাচরণ ঘোষের পত্নীকে খুড়ীমা বলিতাম, এবং তাঁহার কাছে আমার আবদার আদর খুব চলিত ; তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহার কোলে মুখ লুকাইয়া এই কান্না আরম্ভ করিলাম। কেন যে কাঁদিলাম, তাহা এখনও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না। খুড়ীমা অনেক আদর করিলেন। তবে আমি কতকটা ঠাণ্ডা হইলাম। সেই দিন রাত্রে কেশবচন্দ্র 'সাধের বেদনা' শীর্ষক এক 'Sermon' দিলেন। সেই উপদেশের গোড়াটা আমার এই গল্প লইয়াই ফাঁদা হইয়াছিল। এই রোদন, এই অভিমান, শেষে মায়ের কোলে যাইয়া, মায়ের আঁচলে মুখ মুছিয়া সেই অভিমানের উপশান্তি—এই সব কথা ধরিয়াই কেশবচন্দ্র এক অপূর্ব্ব

—অসাধারণ অমিয়-মাখা 'Sermon' ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার পর যত বার কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, তত বারই কেশবচন্দ্রের সহিত দেখা করিতাম এবং তাঁহার পত্নীর আদরে ও সোহাগে কৃতার্থ হইতাম। আমি 'কমল কুটীরে' যাইলে তিনি যে কি সুখী হইতেন, তাহা ভাষায় ফুটাইয়া বলিতে পারি না। আমি কোনখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, তিনি বলিতেন, "হ্যাঁ বাবা, অমন ক'রে রয়েছ কেন? সোনার গোপাল তুমি—নেচে নেচে ছুটে বেড়াবে।" পাঁচ বছরের ছেলেকে মেয়েরা যে ভাষায় আদর করে, তিনি আমাকে ঠিক সেই ভাষায় ও সেই ভাবে আদর করিতেন। সে আদরের কথা, সে স্নেহের কথা মনে পড়িলে আমার এখনও চোখ ফাটিয়া জল পড়ে। তাঁহার মৃত্যুর পর আর আমি কমল কুটীরে যাই নাই। বোধ হয় যাইবও না। কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণা আমাদের অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিল। সে আমাকে ছোট ভাইটির মত অত্যন্ত স্নেহ করিত এবং নানা প্রকারের খেলনা কিনিয়া দিত। আমি কেশব বাবুর সহিত কখনও কোনও ধর্ম্মের কথা কহি নাই। তাঁহার সহিত কেবল আবদারই করিতাম এবং নানা সামগ্রীর ফরমায়েশ করিতাম। তিনি দিন-কয়েক স্বপাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমাকে এক দিন স্বহস্তে রন্ধন করা পায়েস খাইতে দিয়াছিলেন। আমি খানিকটা খাইয়া বলিয়া দিলাম, "জ্যেঠাইমার রান্না পায়েস ঢের ভাল হয়,—আমি তাহাই খাইব।" এই বলিয়া সেই পায়েস আমি ফেলিয়া দিয়াছিলাম।

আমার পিতামহী যখন শুনিতে পাইলেন, আমি কেশব বাবুর বাড়ীর ভাত খাইয়াছি, তখন তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "কিশ্‌বে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আমার পাঁচিরও জাত মারিয়াছে।" এই বলিয়া তিনি আমায় পঞ্চ গব্য খাওয়াইতে উদ্যত হইলেন। অনেক কান্নাকাটি, অনেক খোশামোদের পর আমাকে তখনকার নূতন খেলনা রেলগাড়ী কিনিয়া দিয়া তবে পঞ্চ গব্য খাওয়াইতে পারিয়াছিলেন। আমি শুদ্ধসাদ্ধা হইয়া কিন্তু চুপি চুপি নিবারণ বাবুর বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাকে পঞ্চ গব্যের ব্যাপারটা বলিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। ভাগলপুরে 'Band of Hope' বহু দিন টিকে নাই। ব্রাহ্মদের প্রতিপত্তিও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। আমরা এই সময় হইতে হিঁদু হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ভাই

প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের এক বক্তৃতাতেই ভাগলপুরের হিন্দু-সমাজ চটিয়া উঠিয়াছিল। সে কথা পরে বলিব। ('প্রবাহিণী,' ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১)

আমার কথা

"আমার বন্ধুয়া, আন বাড়ী যায়,
আমারি আঙ্গিনা দিয়া!"

এই দুঃখেই আমি মরমে মরিয়া আছি। আমার বন্ধু—আমার সাধের, সখের বন্ধু, কত আদরের, কত যতনের, কত সোহাগের বন্ধু—আমি সাগর ছেঁচিয়া তাহাকে পাইয়াছি, আমি শত চাঁদ নিঙাড়িয়া সুধা মাখাইয়া তাহাকে সাজাইয়াছি,—আমার নয়নের মণি, হৃদয়ের নিধি, স্নেহের পুত্তলি—আমার বন্ধু, আমার দেশের, আমার সমাজের, আমার ঘরের বন্ধু,—আমার ইহ-পরকালের সর্ব্বস্ব, আমার মানব-জীবনের অবলম্বন,—আমার শ্লাঘা, আমার দর্পদম্ভ, আমার স্পর্দ্ধা, আমার অহঙ্কার—আমার বন্ধু! সে আমাকে অবহেলা করিয়া, আমার দিকে এক বার চকিতের মতন না তাকাইয়া, আমারই আঙ্গিনা বাহিয়া পরের ঘরে যায়! এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই, এ দুঃখের পরিচয় শুনিবার মানুষ নাই। আমার কি কম দুঃখ!—এ দুঃখের চাপে এক একখানা পাঁজর যেন মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, হৃৎপিণ্ডের শোণিতপ্রবাহ যেন শুকাইয়া উঠিতেছে, নয়নের দীপ্তি যেন কমিয়া যাইতেছে, চোখের কোল ফাটিয়া অশ্রুধারার পরিবর্ত্তে শোণিতধারা পড়িতেছে। আমার কি কম দুঃখ! আমার দুঃখের গাথা দেশপাবন পবন বহন করিয়া আকাশ-ক্রোড়ে ছড়াইয়া দিতেছে, গগনতল সে দুঃখের গাথায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে, নৈরাশ্যের হাহাকারে পূর্ণ হইতেছে। আমার দুঃখে ঐ দূরে গগনক্রোড়ে চাতক "ফটিক জল" বলিয়া চিৎকার করিতেছে, সহকারপল্লবের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া পাপিয়া "চোখ গেল" বলিয়া বুক ফাটাইতেছে, আর নিরাশার দাবদাহে দগ্ধ হইয়া কোকিল নিসর্গসুন্দরীর সকল শোভাকে কু-দৃষ্টিতে দেখিয়া কু—উ—উ বলিয়া ধিক্কার দিতেছে। আমার কি কম দুঃখ! শুন শুন ঐ গৃধিনীর চিৎকার,—ঐ ফেরুপালের

হাহারব—ঐ শ্মশানের চট্‌পটা শব্দ,—ঐ আর্ত্তের অরুন্তুদ রোদনধ্বনি! আমার কি কম দুঃখ! ঐ ত্রিকুলপাবনী, দুকূলপ্লাবনী ভাগীরথী সর্ব্বস্বান্তের নয়নধারার ন্যায় শীর্ণকায়া হইয়া কুল্-কুল্, কুল্-কুল্ শব্দে কেবল কাঁদিয়া চলিয়াছেন। যে ভাগীরথীর বিশাল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্তরে স্তরে পেলব মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া এই বাঙ্গালার উৎপত্তি, যে বাঙ্গালায় কঠোরতা নাই, মৃত্তিকাতে নাই, মানুষের হৃদয়ে নাই, যে বাঙ্গালায় প্রস্তর কঙ্কর নাই, শুষ্কতা কঠোরতা নাই, রূঢ়তা বন্ধুরতা নাই,—মাধুরী যাহার ঐশ্বর্য্য, কোমলতা যাহার সম্পত্তি, ভাব যাহার সম্বল, কীর্ত্তন যাহার জীবন,—সেই বাঙ্গালার ভাগীরথীতে আজ জল নাই, পদ্মা আজ শুষ্কতোয়া, কেদার কান্তার আজ বালুকাপূর্ণ, বনভূমি আজ বিহঙ্গকলরবশূন্য, গ্রামপল্লী আজ হাস্য-লাস্য-বিবর্জ্জিত, বাস রূপ-হাব-ভাব-বিহীন। আমার কি কম দুঃখ! আমার দুঃখের শেষ নাই। কুরুক্ষেত্রের নারী পর্ব্বের রোদন-দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত, যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া কাঁদিতেছি, তথাপি আমার দুঃখের উপশান্তি হইল না। বুঝি বা কালের শেষ পর্য্যন্ত এ দুঃখের প্রবাহ অব্যাহতভাবে বহিয়া যাইবে।

দুঃখ কি কম!

"কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই॥

* * *

চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়পড়সীর ডরে।"

দুঃখ কি কম!

"কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কালরূপখানি।"

সে কাল রূপ কেমন?

"বদন চাঁদ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো—
কে না কুন্দিল দুই আঁখি,
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাথী॥
রতন কাঢ়িয়া কে বা যতন করিয়া গো—
কে না গঢ়িয়া দিল কাণে,

মনের সহিত মোর এ পাঁচ পরাণ গো—
যোগী হবে উহারি ধেয়ানে ॥"

আমার এমন বন্ধু আমারই আঙ্গিনা দিয়া আন ঘরে যায়! তাই বলিতে ইচ্ছা করে—

"এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদমুখ ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই, নাহি টুটে ভুক্।
কে মোর বেথিত আছে কারে কব দুখ ॥"

আমার নাই কি? যুগ-যুগান্তরের গৌরব-গাথা আছে, বেদ-বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র আছে, দর্শন উপনিষদ্ আছে! আমার নাই কি? আমার সপ্ত সরিদ্বরা জন্মভূমি, সে জন্মভূমির সর্ব্বাঙ্গে জগজ্জননী সতীদেবীর দেহের পঞ্চাশ খণ্ড খচিত রহিয়াছে;—আমার দেশের জগৎপাবন পবন হিমগিরির চূড়া চুম্বন করিয়া সাগর-শীকর-ভারে প্রমত্ত হইয়া উর্ম্মিমালার উপর গড়াইয়া পড়িতেছে, বিহঙ্গ-কলরবধ্বনি সামগানকে স্তব্ধ করিয়া গগন-ক্রোড়কে মুখর করিতেছে। আমার নাই কি? আমাদের জন্মভূমির প্রত্যেক বালুকাকণা শ্রীভগবানের চরণতাড়নে পবিত্রীকৃত,—বার বার দশ বার শ্রীভগবান্ এ দেশে অবতীর্ণ হইয়া কুল পবিত্র এবং জননীকে কৃতার্থা করিয়াছেন। আমার যাহা আছে, তাহা আর কাহার আছে? আমার দেশে ষড় ঋতু নিত্য বিদ্যমান; আমার দেশে ব্রহ্মাণ্ডের সকল তত্ত্ব নিহিত। এখানে তুষারকিরীটী গিরিশ্রেণী অনন্ত কাল হইতে বিরাজ করিতেছে; এখানে মরু মারুতের উষ্ণ শ্বাসে প্রকৃতি বিশুষ্কা হইয়া আছেন, এখানে আবার সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী হইয়া শ্যামা প্রকৃতি জলে স্থলে বনস্পতিবক্ষে, প্রতন্বীমানা তটিনীপার্শ্বে ক্রীড়া-কৌতুকময়ী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। রূপের অনন্ত সাগর, নামের অক্ষয় মণিখনি আমার জন্মভূমি। আমার যাহা নাই, জগতে তাহা নাই; আমার যাহা আছে, বিশ্বের কোন স্থানে সে সকলের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইবে না। দেহভরা রূপ লইয়া, হৃদয়ভরা স্মৃতির নামাবলী লইয়া,—স্থির জীবন, স্থির যৌবন, স্থির প্রেমের পসরা লইয়া তোমায় দিতেছি, তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া আর কোথায় যাইতেছ? এক বার দাঁড়াও, তোমায় নয়ন ভরিয়া দেখি—

"কাম্ন সে জীবন জাতি প্রাণ ধন,
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলী
নিমিসে নিমেসে হারা।"

আমার সবই ত তুমি। তোমা লইয়া আমার জাতি, তোমার জন্য আমার কুল, তোমার জন্য ইতিহাস, তোমার হেতুই এখন এত পরিহাস। তুমি আমার পরিচয়,—আর আমিও তোমার পরিচয়। তুমি আমার পরিচয়কে উপেক্ষা করিয়া কোন্ সাহসে আন ঘরে যাও? সে ত আমাকে মানে না, আমার পরিচয় চাহে না, আমার ইতিহাসে তাহার শ্লাঘা বোধ নাই—তবুও তুমি তাহার কাছে যাও কেন? সে যে চন্দ্রাবলী—চন্দ্রধ্বনিত কান্তি তাহার, তুষারমণ্ডিত কুঞ্জ তাহার, দেহসর্ব্বস্ব সুখ তাহার,—তুমি তাহার দুয়ারে যাও কেন? মনে থাকে যেন, আমি রাখিলে তুমি থাকিবে, আমি থাকিলে তুমি রহিবে—আমায় ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাও? ছিঃ ছিঃ, তোমার কলঙ্কের স্পর্দ্ধা বোধ নাই। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী। বটেই ত—সে যে আমাদের দ্রৌপদী! অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী ইহারা যে আমার—যাহাই হউক, যেমনই হউক, ইহারা যে আমার—তাই আমার প্রাতঃস্মরণীয়! আমার ব্যাস মৎস্যগন্ধার গর্ভজাত, তথাপি সে নারায়ণের অংশস্বরূপ, কারণ তাহার যে মাতৃকলঙ্কের শ্লাঘা আছে। কলঙ্কই আমার গৌরব, কলঙ্কই আমার জাতীয় বিশিষ্টতা, কলঙ্কই আমার সর্ব্বস্ব। সেই কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য তুমি আন ঘরে যাও! তোমায় ধিক্! কিন্তু ধিক্কার দিব কি—সে যে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে আসিয়া বিঁধে। তোমায় ত কিছু বলিতে পারি না—বলা যায় না। তাই অশেষ দুঃখে আমি কষ্ট পাইতেছি। যুগ যুগ কাটিয়া গেল—কল্প-কল্পান্তর চলিয়া গেল, আমার দুঃখের উপশান্তি হইল না। তাই—

"অনুক্ষণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি,
দুয়ারের বাহির পরবাস।
আপনা বলিয়া বলে, হেন নাহি ক্ষিতিতলে
হেন ছারের হেন অভিলাষ।"

('প্রবাহিণী,' ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩২১)

আমার সাধ

"কানু পরিবাদ মনে ছিল সাধ,
সফল করিল বিধি।
কুজন বচনে ছাড়িতে নারিব,
সে হেন গুণের নিধি॥
বন্ধুর পীরিতি শেলের ঘা
পহিলে সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে ব্যথাটি বাড়িল
এ দুখ কহিব কাকে॥
অন্য ব্যথা নয় বোধে সোধে রয়
হিয়ার মাঝারে থুইঞা।
কোন কুলবতী কুল মজাইয়া
কেমনে রৈয়াছে শুইঞা॥
সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে
কি তার আপন-পর।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পীরিতি,
কেবল দুঃখের ঘর॥"

বলিব কি হাসির কথা, দুঃখই আমার সাধ, আমার ঈপ্সিত। দর্শন-শাস্ত্রে লেখা আছে যে,—বাধনা লক্ষণং দুঃখমিতি—প্রতিকূল বেদনীয়ং দুঃখম্; বাধাই দুঃখের লক্ষণ, প্রতিকূল বেদনা যাহা হইতে পাওয়া যায় তাহাই দুঃখ। তটিনীর জলকল্লোল বড় মিঠে; কেন—জান? সে যে পদে পদে বাধা পাইতেছে, ক্ষুদ্র বৃহৎ উপলখণ্ডে তাহার স্রোতোমুখ ব্যাহত হইতেছে; তাই সে কাঁদিয়া উঠিতেছে, আর তাহার রোদনধ্বনি কল্-কল্, ছল্-ছল্ শব্দে ফুটিয়া উঠিতেছে। রোদনধ্বনি কি না, তাই অত মধুর, অত শ্রবণমনোহর। দুঃখই জীবনের মাধুর্য্য, দুঃখই জীবনের সার। তাই চুলকাইয়া ব্রণ তুলি; সাধ করিয়া দুঃখকে আলিঙ্গন করি। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস না হইলে রাম-সীতার চরিত্রের অপরিমেয় মাধুরী কি ফুটিয়া উঠিত, বাল্মীকি-রামায়ণের মত অনুপম মহাকাব্যের রচনা

কি হইত? শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে বাস না হইলে বৃন্দাবন-লীলার অমিয়-সাগরে স্নান-সুখ কি আমরা উপভোগ করিতে পারিতাম? আবার মাথুর লীলা না হইলে কি বৃন্দাবনে বিরহের মহিমা বুঝিতে পারিতাম? সংসারে যাহা ভাল তাহা দুঃখ-জাত, যাহা মধুর তাহা দুঃখের মন্থনে নিষ্কাশিত। আমাদের অষ্টাদশ পুরাণ পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, কেবল দুঃখের কাহিনী গীত করিয়াছেন, আমাদের জাতির ইতিহাস একটা বিশাল দুঃখের পরম্পরা মাত্র—ভীষণ ট্রাজেডি মাত্র, আমার সংসার-যাত্রা কেবল দুঃখের হাটবাজার, আমার শ্রীভগবান্ দুঃখকে ক্রোড়ে করিয়া বার বার এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমার শ্রীচৈতন্যদেব বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কেবল দুঃখের মহিমাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়া গিয়াছেন, আমার পিতৃপিতামহ-সম্পত্তি যাহা পাইয়াছি তাহার স্তরে স্তরে দুঃখ মাখা। তাই রামপ্রসাদ গান করিয়াছেন,—

"আমি কি দুঃখেরে ডরাই?
ভবে দেও দুখ মা, দেখি গো তাই।
আগে পাছে দুঃখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই,
তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে, দুঃখ দিয়ে মা বাজার বসাই।
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই,
আমি এমন বিষের কৃমি মা গো, বিষের বোঝার করি বড়াই॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি, বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই,
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই॥"

আমার সুখটা কোন্‌খানে আছে—জান? ঐ যে—বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই—ঐ জিরান সুখই আমার জীবনের সুখ। বাস্তবিক জিরান ছাড়া, একটু নিশ্বাস ফেলিবার অবসর ছাড়া অন্য সুখ ত হইবার জো নাই। সুখ ত অনুকূল বেদনীয়ম্ সুখম্—আমার অনুকূল বেদনা কোথা হইতে হইবে? আমি চিরপরাধীন—কাম—ক্রোধ—লোভ—মোহের, ক্ষিত্যপতেজ মরুদ্ব্যোমের, আত্মীয়স্বজন পরিজনের, রাজা রাজবল্লভগণের—আমি কাহার পরাধীন নহি! আমার ভাগ্যে অনুকূল-বেদনা হইতে পারে না। আমাকে সকলের মুখ চাহিয়া কাজ করিতে হয়, আইন-কানুন বিধি-নিষেধের ভয়ে আমাকে সঙ্কুচিত থাকিতে হয়। আমি পরের সেবা করি, পরের মন যোগাই, আমার মন যোগাইবে কে?

আমার অনুকূল বেদনা হইবে কিসে? সুতরাং দুঃখই আমার জীবনের অবলম্বন। কিন্তু অনবরত তৈলধারাবৎ দুঃখের ধারা-প্রপাত সহিতে আমি প্রস্তুত নহি,—আমার ক্ষমতায় তাহা কুলায় না, তাই ক্ষণেক জিরাইবার জন্য, একটু স্বস্তির প্রশ্বাস ফেলিবার সুখের আশায়, একটু শ্রান্তি দূর করিবার তৃপ্তির আশায় ব্রহ্মময়ীকে করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি—বোঝা নামাইয়া রাখ মা, একটু জিরাই। এ জন্য মায়ের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি না, আমি অবিশ্রান্ত বোঝা বহিতে অপারক হইলে মায়ের ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের সুশৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটিবে, তাই বলিতেছি—ব্রহ্মময়ি, বোঝা নামাইয়া রাখ। দয়াময়ী করুণাময়ী জগজ্জননীকে ডাকি নাই, ডাকিয়াছি ব্রহ্মময়ীকে, ডাকিয়াছি নিয়ম-প্রণেত্রী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরীকে। যদি দুঃখ হইতে ভীত হইতাম, যদি দুঃখের ত্রাসে সঙ্কুচিত হইতাম, তাহা হইলে করুণাময়ীকে ডাকিতে পারিতাম। কিন্তু আমি ত দুঃখকে ডরাই না,—দুঃখই আমার শ্লাঘা, দুঃখই গর্ব্বস্পর্দ্ধা—আমার সবই উল্টা রীতি। লোকে বিষ খাইলে মরে; আমি বিষের কৃমি, বিষে থাকি, বিষ খেয়ে প্রাণ রক্ষা করি—আমি দুঃখের হলাহলকে ভয় করিব কেন? তাই ব্রহ্মময়ীকে ডাকিয়া বিধি-নিষেধের পরম্পরা রক্ষা করিবার জন্য বোঝা নামাইবার অনুরোধ করিয়াছি মাত্র। এতটা আছে বলিয়াই ত আমি হিন্দু—আমি ব্রাহ্মণ—আমি ভারতবাসী।

আমার কি কম দুঃখ! আমার কৃষ্ণ আমাকে ছাড়িয়া, আমারই আঙ্গিনা দিয়া আন ঘরে যায়। আমার সে কৃষ্ণ কেমন?—

"আমি কৃষ্ণময় জগত দেখি,
বৃক্ষমূল-শাখা, শিখিপুচ্ছ-পাখা,
কৃষ্ণরূপ মাখামাখি!
যে সময়ে আমি যে স্থানেতে যাই,
অধো-উৰ্দ্ধ আদি দশ দিকেতে চাই,
কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেখিতে না পাই,
আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি॥
নয়ন মুদিয়ে থাকি যে সময়,
হৃদিমাঝে কৃষ্ণরূপ দৃষ্ট হয়,
নীলকণ্ঠ কয়, মহা ভাবোদয়, তন্ময় ভাবের কামী॥"

ইহাই আমার কৃষ্ণ। তোমার কৃষ্ণকেশে, কৃষ্ণবেশে, কৃষ্ণতার নেত্র-দীপ্তিতে, কৃষ্ণতনুর বর্ণদ্যুতিতে,—সর্ব্বস্বে সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণকেই দেখিতে পাই। তোমার দেশ—জন্মভূমি কৃষ্ণরূপময়ী। নীল আকাশে নীলবরণের তুলনা নাই, সাগরের নীল জলে কৃষ্ণতোয়া কালিন্দীর স্মৃতি জাগিয়া উঠে, শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা নব দূর্ব্বাদল শ্যামতনুর মাধুরী লইয়া খেলা করে, গগনভরা নবসজলজলদ, নবসজলজলদ-কায়ের সুষমা ফুটাইয়া তোলে, বৃক্ষপত্রে-ব্রততীগাত্রে, নবকিশলয়-বিকাশে, বাসন্তসৌন্দর্য্য-প্রকাশে, বিহঙ্গ-কূজনে, দ্বিরেফ-গুঞ্জনে, কোকিলের তানে, শ্যামার গানে—আমি কৃষ্ণ ছাড়া আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাই না। আমার ইতিহাস—মহাভারতগ্রন্থ কৃষ্ণকথায় পূর্ণ, আমার ধর্ম্ম কৃষ্ণকলঙ্কে সমাচ্ছন্ন, আমার জাতি কৃষ্ণবর্ণ, সমাজ কৃষ্ণকায়ে পূর্ণ,—আমি কৃষ্ণ ছাড়া কি থাকিতে পারি! কিন্তু 'চণ্ডীদাস কহে কানুর পীরিতি, কেবল দুখেরই ঘর"; সুতরাং দুঃখই আমার সাধ, দুঃখই আমার সুখ। যশোমতী কৃষ্ণচন্দ্রকে পাইয়া কি হাসিবার অবসর কখনও পাইয়াছিলেন? কাঁদিতে কাঁদিতেই তাঁহার সুখের দিন কাটিয়াছিল, যখন দুঃখের দিন আসিয়াছিল তখন অনবরত অবিশ্রান্ত রোদন বজায় ছিল। শ্রীরাধিকার মিলনে দুঃখ, বিরহে দুঃখ, মানে দুঃখ, মানভঞ্জনে দুঃখ—সুখ কোথায়? নন্দ ঘোষেরও ঐ দশা;—কেবল চিন্তা, কেবল উদ্বেগ, কেবল বাধা, কেবল বিঘ্ন—সদা প্রাণ হারাই হারাই। সুতরাং স্নেহে ও মধুর রসে কোনটাতেই সুখ নাই—হাসি নাই; স্নেহে নন্দ যশোদা সদা দুঃখী, মাধুর্য্যে মধুময়ী শ্রীমতী চিরদুঃখিনী। কাজেই আবার বলিতে হয় যে, দুঃখই আমার সাধ, দুঃখই আমার জীবনের সুখ; কেন না, ধর্ম্মে-কর্ম্মে, ইতিহাসে, জাতির উত্থান-পতনে দুঃখের পরম্পরা হইতেই আমার সৃষ্টি। আমি দুঃখ ছাড়া কি থাকিতে পারি?

বল—বল—আমি কালার জাতি, কালার পূজক, লম্পটের সেবক, শঠের উপাসক! বল—বল—আমি চির-নির্জ্জিত, চির-নিপীড়িত, জড় ও স্থবির! বল—বল—আমি মূর্ত্তিপূজক, কুসংস্কারের সমর্থক, জাতি-বিচারের প্রবর্ত্তক, পুরাণের গল্পগাছার অনুরাগী! বল—বল—আমার কৃষ্ণের, আমার কৃষ্ণকায়ের, আমার কৃষ্ণকথার, কৃষ্ণপ্রেমের যত নিন্দা, যত পরিবাদ, যত গ্লানি, তোমার ভাষায় যুয়ায় সেই সবই বল! আমি শুনি, শুনিয়া আমার শ্রবণ জুড়াইয়া যাউক। কৃষ্ণকলঙ্কের কালিই ত

আমার বিশিষ্টতার পরিচায়ক। রামপ্রসাদই ত বলিয়াছেন—"দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই,"—আমার বড়াই আমার কলঙ্ক—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, তিন কালের কলঙ্ক। তুমি স্বাধীনতার গর্ব্ব কর, বিলাস-বৈভবের গর্ব্ব কর, বিদ্যাবুদ্ধির স্পর্দ্ধা কর, রূপ-যৌবনের দম্ভ কর। আমি পরাধীনতার গর্ব্ব করি, "আমি তুয়া দাস—দাস দাসীপুত্র হই" বলিতে পারিলেই আমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়; আমি ভিক্ষার গর্ব্ব করি,—সমাজ-শিরোমণি ব্রাহ্মণ আমার ভিখারী; ব্রজের পথে মাধুকরী করিয়া জীবনধারণ করিতে পারিলে আমার মানবজীবন ধন্য হয়: আমার বিদ্যাবুদ্ধি নাই, আমি রাখালের গোপাল মাত্র, রূপ যৌবন আমার নাই, কারণ আমাদের সকলের রূপ যৌবন সমর্থন করিয়া আমার শ্যামসুন্দরকে আমি সাজাইয়াছি। আমি মণিমাণিক্যের আদর জানি না, ব্রজের রজোরাশিই আমার অঙ্গের আভরণ, কুরুক্ষেত্রের ধূলিরাশিই আমার স্পর্দ্ধার পরিচায়ক। তুমি রাজ্য চাও, ঐশ্বর্য্য চাও—আমি ভিক্ষা চাই, ভিখারী চাই। তুমি মণিকুটীরে নৃত্য করিতে চাও—আমি ব্রজের পথে গড়াগড়ি দিতে চাই, শ্মশান-ভস্ম মাখিতে চাই। তুমি জগজ্জয়ী সম্রাট্ হইতে চাও—আমি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে চাই। ধনী তোমার মাথার চূড়া, ধন আমার জুতার চামড়া। তোমায়-আমায় আকাশ পাতাল প্রভেদ; তোমার সমবিধাতা এবং আমার সমবিধাতা এক নহে। তুমি গৌরবের ধ্বজা উড়াইতে চাও, আমি যুগে যুগে কেবল কলঙ্কের পতাকা উড়াইয়াছি। তোমায় আমায় এতটা পার্থক্য বলিয়াই তোমার মুখে আমার কলঙ্ক-কথা শুনিতে আমার এতটা ভাল লাগে। আমি শ্যামকলঙ্কে নিত্যকলঙ্কী, তুমি তুষার-ধবল কান্তিতে অমল—গৌরবের শ্বেত পতাকা উড়াইয়াছ। বল,—বল, কলঙ্কের কথা ভাল করিয়াই বল।

লজ্জা কেন পাও ভাই! "বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না—" এই ত আমার ভক্তের কথা। আমার প্রেমিকেরও ঐ একই সুর। তবে লজ্জা কেন পাও ভাই? তোমার যাহা তাহা তোমারই আছে, তোমারই থাকিবে—তোমার কৃষ্ণকলঙ্ককে কেহ কখনও কাড়িতে আসিবে না, কাড়িতে পারিবে না। তবে এত লজ্জা কিসের? লজ্জা পাও বলিয়াই ত তোমার দুঃখের উপর এমন বিছার বিষের জ্বালা। লজ্জা পাও বলিয়াই ত

"আমারি বন্ধুয়া পর ঘরে যায়, আমারি আঙ্গিনা দিয়া"—আমার আঙ্গিনা এই সপ্তসরিদ্বরা ভারতভূমি, আমারি আঙ্গিনা ভারতের পুরাণতন্ত্রের আস্তরণ, বেদবেদাঙ্গের আবরণ, কর্ম্মকাণ্ডের জাতিবিচারের অবগুণ্ঠন,—সেই আমারই আঙ্গিনা ভেদ করিয়া, আমারই ইতিহাসের আলেপনকে পদদলিত করিয়া, লক্ষ্মীর চরণচিহ্নকে ধূলিধূসরিত করিয়া আমারই বন্ধু—আমার স্বজন পরিজন—আমার জাতি কুটুম্ব পর ঘরে যায়। ইহাই ত দুঃখ, ইহাই ত খেদ, ইহাই ত শোক। এই শোক—খেদ—দুঃখের আলোড়ন করিতেই আমি ভালবাসি। ভালবাসি বলিয়াই ডঙ্কা মারিয়া কলঙ্কের ঘোষণা করি। যে আমার মত পরাজিত—পরাধীন নহে, আমার মত নিরাশার দাবদাহে দগ্ধ নহে, যে আমার মত ব্যর্থপ্রয়াস হয় নাই, আমার মত জগতের সাম্রাজ্য হারায় নাই, আমার মত ধূলায় লুটাইয়া কাঁদে নাই, আমার মত সর্ব্বনাশের জ্বালা সহে নাই, আমার মত দুঃখকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লয় নাই,—সে আমার কলঙ্কের স্পর্দ্ধা বুঝিবে কেমন করিয়া? যাহার স্মৃতি আছে, অতীত আছে, সে-ই আমার ব্যথা বুঝিবে। বড় দুঃখ আমার, পুটপাকের অরুন্তুদ জ্বালা অপেক্ষা তীব্রতর জ্বালা আমার, বজ্রসূচিবেধের মর্ম্মস্পর্শী বেদনা অপেক্ষা বেদনা আমার,—কেন না, আমার তুমি, স্মৃতিকে ভাসাইয়া, লজ্জার প্রেরণায় পরের বাসে বাসা বসাইতে যাইতেছ! "ঘর থাকৃতে বাবুই ভিজে"—তুমি যে বাবুইয়ের অধম হইলে? তোমার বিস্মৃতির সুখ অপেক্ষা আমার স্মৃতির তুষানল শ্রেয়, তোমার বিলাসের উপভোগ অপেক্ষা আমার দারিদ্র্যের মাধুকরী শ্রেয়।

তাই বলিতেছি—"কানু পরিবাদ, মনে ছিল সাধ, সফল করিল বিধি"—আমার সে সাধ সফল হইয়াছে। কলঙ্কের একটা মজা আছে; যাহার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হয়, লোকে তাহার সহিত—তাহার নামের সহিত তোমার নাম জুড়িয়া রাখে। অন্য প্রকারের বিরহ ঘটিতে পারে, পরন্তু নাম-বিরহ কখনই ঘটিতে পারে না—লোকে ঘটিতে দেয় না। কলঙ্কের দুঃখে ইহাই বড়ই সুখ; এই সুখের লোভেই দাশরথি রায় শ্রীমতীর মুখে এত বড় স্পর্দ্ধার কথা দিয়া দিয়াছেন—

ননদি ব'লো গিয়ে নগরে—সবারে,
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণকলঙ্ক-সাগরে।"

আমি কৃষ্ণকলঙ্কে কলঙ্কী, এ কথা দেশে—দশে জানিলে—বুঝি যে, লোকমুখে কৃষ্ণনাম হইতে আমার নাম আর কখনও বিচ্যুত হইবে না। সে পরিবাদের সাধ ছাড়িয়া তুমি "আন ঘরে যাও"? সে পরিবাদের সাধ আছে বলিয়াই আমি আবার আসিয়াছি, প্রবাহিণীর নীলতরঙ্গে আবার হংসী হইয়া নাচিতেছি, খেলিতেছি—ভাসিয়া যাইতেছি। সে পরিবাদের সাধ এখনও মনে সজীব আছে বলিয়াই তুমি পরঘরে যাইতেছ বলিয়াই তোমার যাইবার পথে কাঁটা বসাইতেছি—আমার সাধের দুঃখের বড়াই করিতেছি—আমার সাধের দুঃখের বড়াই করিতেছি,—দেশের দশ জনকে সে দুঃখের পরিচয় দিতেছি। আমার কানু—তুমি আর তিনি; তিনি তোমার, তুমি তাঁহার, তাই তোমাতে আর তাঁহাতে আমার দৃষ্টিতে তেমন পার্থক্য পাই না। তবে তুমি আর তিনি—এক নও; এক রকমের বট, এক মানুষ নও। তোমাতে তিনি আছেন; অথচ তুমি ক্ষুদ্র, তিনি মহান্ হইতে মহত্তর। তাঁহাতে তুমি আছ, কেন না, তুমি বুদ্‌বুদ, তিনি সাগর। তাই তোমার পরিবাদ এবং তাঁহার পরিবাদকে মাখামাখি করিয়া আমি দুঃখের বড়াই করিয়া লইলাম। এ বড়াইয়ের মহিমা বুঝিতে পার যদি, তখন আমার সাধের মাধুরীও বুঝিতে পারিবে।

আমার সাধ—বাধা। নন্দের অপার স্নেহ শ্রীকৃষ্ণের লীলানাট্যের বাধা ঘটাইত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নন্দের বাধা মাথায় করিয়া বহিতেন। পার কি—তেমনি করিয়া বাধা বহিতে—ধর্ম্মের বাধা, সমাজের বাধা, পুরাণেতিহাসের বাধা, দেশের জল বায়ুর বাধা, পিতামাতার বাধা, পুত্রকন্যার বাধা—আত্মপরিচয়ের সকল বাধা বহিতে পারিবে কি? বাধা বহিতে জান না—পার না বলিয়াই, বাধা ছিঁড়িয়া বাহিরে পালাইতে চাও,— "আন ঘরে যাও, আমারি আঙ্গিনা দিয়া।" শ্রীমতী রাধিকার আরও কত বাধা—কুলের বাধা, শাশুড়ী-ননদীর বাধা, কলঙ্কের, বাধা, স্বীয় স্বামীর বাধা। তাই সোহাগ করিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন ঃ—

"হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল,
প্রেম-প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন পৌর চৌর সদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহু ভাগি।
সজনি এত দিনে ভাঙল দ্বন্দ্ব।

কানু অনুরাগ— ভুজগে গরাসল
কুল-দাদুরী মরু মন্দ ॥"

আমার সাধ—এই বাধা এবং এই বাধার এমনই উপেক্ষা। এই সাধ পুরাইতে হইলে হৃদয়-মন্দিরে কানুকে ঘুম পাড়াইতে হইবে এবং একনিষ্ঠ প্রেমকে তাহার প্রহরী করিয়া রাখিতে হইবে,—তবে ত সাধ মিটিবে, বাধার সুখ বুঝিবে। স্নেহের বাধা এবং প্রেমের বাধা এমনই ভাবে বহন করিতে হয়। স্নেহের বাধা মাথায় করিয়া লইতে হয়, প্রেমের বাধা হৃদয়-মন্দিরে রাখিয়া ঘুম পাড়াইতে হয়। স্নেহের বাধায় গৌরব আছে, প্রেমের বাধায় মাধুরী আছে। স্নেহের বাধায় লজ্জা নাই, প্রেমের বাধায় দর্প নাই। "কানু অনুরাগ—ভুজগে গরাসল"—আমি কিছু করি না, আমি কিছু পারি না, আমার সকল কাজ, সকল বাধা-বিঘ্ন, আমার "কুল-দাদুরী মন্দ" কানুর অনুরাগ-ভুজঙ্গেই গ্রাস করিল। ইহা অপেক্ষা সুখের কথা আর কি হইতে পারে? ছার সুখ, ছার ঐশ্বর্য্য, ছার রাজ্য, ছার বীর্য্য,—কানু অনুরাগ, মনে আছে সাধ—এখন সফল করিবে কি বিধি? বাঞ্ছা-কল্পতরু তুমি, আমার সাধ পূর্ণ কর। অনুরাগেই পরিবাদ, প্রেমেই কলঙ্ক, কলঙ্কেই সুখ—আমার সাধ মিটিবে কি? তুমি যাহার আমি তাহার, আমি তোমার মারফতে তাহারে ধরিব, তোমার কলঙ্কে তাহার কলঙ্ক অর্জ্জন করিব,—আমার সাধ মিটিবে কি? এ সাধে কেহ বাদ সাধিলে দুঃখের ভিতর দিয়া সুখের ফোয়ারা ছুটিয়া বাহির হয়,—আমার এমন সাধ মিটিবে কি? তুমি যদি নিজ নিকেতনে ফিরিয়া আইস, তবে আমার সাধ মিটিতে পারে। এ দীনহীনের সাধ মিটাইবে কি? ('প্রবাহিণী,' ৬ পৌষ ১৩২১)

৺শিশিরকুমার ঘোষ

যে যুগে ইংরেজী এবং ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘাতে বাঙ্গালার মনীষা যেন শতদল পদ্মের মতন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ৺শিশিরকুমার ঘোষ সেই যুগের মানুষ ছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের প্রতিভায় যে যুগের প্রথম অরুণোদয় হয়, যে যুগে দীনবন্ধু এবং রঙ্গলাল প্রথম প্রভাতের সঙ্গীত-ধ্বনি করিয়াছিলেন, যে যুগের মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, যে যুগে

ভূদেব, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, চন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রশেখর, তারকনাথ, শিবনাথ প্রভৃতি ধার্ম্মিক, চিন্তাশীল, জ্ঞানী, কর্ম্মী, সাধকগণ উৎপন্ন হইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যকে অদ্বিতীয় এবং বাঙ্গালী জাতিকে ভারতবর্ষের শিরোমণি করিয়াছিলেন, যে যুগের প্রদোষমাধুর্য্য রবীন্দ্রনাথের কলনাদে স্ফুরিত;—সেই যুগের রাজনীতিক্ষেত্রে শিশিরকুমারের অভ্যুদয় হইয়াছিল। শিশিরকুমার আমাদের আধুনিক পলিটিক্সের (Politics) এক জন প্রথম ও প্রধান সাধক ছিলেন। তিনি প্রথম বাঙ্গালা কাগজ লিখিতে ব্রতী হন, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রথমে বাঙ্গালা ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছিল। অমৃতবাজারের ভাষার ও বিষয়-নির্ব্বাচনের একটা বিশিষ্টতা ছিল। 'সোমপ্রকাশে'র সংস্কৃত-প্রধান, শুষ্ক পণ্ডিতী ভাষা অমৃতবাজার গ্রহণ করে নাই, 'সাধারণী'র মধুর বঙ্কিমী ছন্দের ভাষা অমৃতবাজারে স্থান পায় নাই,—স্থান পাইয়াছিল সেই ভাষা যে ভাষা বাঙ্গালার পল্লীবাসী অনায়াসে বুঝিতে পারে, সেই ভাষা যে ভাষায় বাঙ্গালার প্রজায় কথা কহে। অমৃতবাজার পত্রিকা বাঙ্গালার আদি প্রজার পত্র; বুঝি বা উহাই অন্ত, উহাতেই সে অপূর্ব্ব চেষ্টার পর্য্যবসান হইয়াছে। মাঝে বৎসর কয়েক ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিভা-পরিচালিত হইয়া 'বঙ্গবাসী' হিন্দু প্রজার, পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মুখপত্র হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আর 'বঙ্গবাসী'র সে বিশিষ্টতা নাই। বাঙ্গালী প্রজার সুখ দুঃখের পরিচয়দাতা হইবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শিশিরকুমার দূর যশোহরে অমৃতবাজার গ্রামে, কপোতাক্ষের তীরে তাঁহার সাধের পত্রিকার প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু খবরের কাগজ ত খাঁটি বাঙ্গালার সামগ্রী নহে, বাঙ্গালার খাঁটি পল্লীগ্রামের মাটিতে উহা ভাল গজায় না, তাই বাধ্য হইয়া শিশিরকুমারকে ভ্রাতৃগণ সহ কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। কলিকাতার জমিতেই অমৃতবাজার পত্রিকা ফলে ফুলে শোভিত হইয়া উঠে, শেষে লর্ড লীটনের আইনের প্রভাবে উহা পুরাদস্তুর ইংরেজী কাগজে পরিণত হয়।

যখন শিশিরকুমার কলিকাতায় আসিলেন, তখন কলিকাতার রাজনীতি-ক্ষেত্রটা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন জুড়িয়া বসিয়াছিলেন, তখন শোভাবাজার ও পাথুরিয়াঘাটার মহারাজগণ, লালাবাবুর বংশধরগণ

পলিটিক্সের অধিনায়ক ছিলেন, রাজা রাজেন্দ্রলাল, কৃষ্ণদাস, শম্ভুচন্দ্র প্রভৃতি সে রাজনীতির ব্যাখ্যাতা ছিলেন, তখন তরুণ বাঙ্গালা (Young Bengal) মাথা তুলিতেছিল বটে, পরন্তু মুখ ফুটিয়া নির্ভয়ে কথা কহিতে পারিতেছিল না। শিশিরকুমার সেই তরুণ বাঙ্গালাকে কথা কহিতে শিখাইয়াছিলেন, তাহার বুকে সাহস দিযাছিলেন, কোমরে বল দিয়াছিলেন। পারম্পর্য্যের হিসাবে আসে শিশিরকুমার, তাহার পরে সুরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, কালীচরণ, মনোমোহন, লালমোহন, আনন্দমোহন। স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেলের সময় হইতে স্যর এশলী ঈডেনের কাল পর্য্যন্ত অমৃতবাজার পত্রিকা যেরূপ নির্ভয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিল, শাসক-সম্প্রদায়ের কার্য্যাকার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিতে পারিয়াছিল, তেমন আর বাঙ্গালার কোন সমাচার-পত্র পারে নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ, সে বিশ্লেষণ বিদারণ, সে কঠোর যুক্তির কশাঘাত, অমন সুযোগমত অমন অবস্থার ও ঘটনার সহিত থাপ খাওয়াইয়া আর কোন বাঙ্গালী ব্যবহার করিতে পারিবেন না। সে দিন নাই, তেমন অবসরও আর হইবে না। শিশিরকুমার বাঙ্গালার রাজনীতি-চর্চ্চায় একটা যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে এই হিসাবে একটা যুগপ্রবর্ত্তক পুরুষ বলা যায়।

শিশিরকুমার যে কেবল দেশহিতৈষী পেট্রিয়ট ছিলেন তাহা নহে, দেশের এবং সমাজের বহু ব্যাপারে তাঁহার একটা শ্লাঘাবোধ ছিল। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে এক শ্রেণীর এমন পেট্রিয়ট আমাদের দেশে উৎপন্ন হইয়াছেন যাঁহাদের স্বদেশহিতৈষণা “যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে” তাবৎ প্রকট হয় না; যাঁহারা আচারে ব্যবহারে, বসনে অশনে সাড়ে আঠারো আনা ইংরেজ বা ফিরিঙ্গী,—অথচ তাঁহারা দেশহিতৈষী! শিশির-কুমার এই শ্রেণীর দেশহিতৈষী ছিলেন না। তিনি তাঁহার বাঙ্গালীত্বকে হ্যাটকোটে ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই, তিনি তাঁহার বাঙ্গালী প্রকৃতিকে নির্ভুল ইংরেজী লিখিয়া, নিরেট ফিরিঙ্গী উচ্চারণ করিয়া বিকৃত করিতে প্রয়াস পান নাই। বাঙ্গালী বলিয়া, ভারতবাসী বলিয়া তাঁহার একটা শ্লাঘাবোধ ছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার ইংরেজী নিখুঁত কোরা বিলাতী ইংরেজী নহে, ব্যাকরণ-দোষ, পদ্ধতি-দোষ উহার সর্ব্বাঙ্গে খচিত থাকিত; কিন্তু সে ইংরেজী বদলাইবার উপায় ছিল না। শিশিরকুমারের ইংরেজী

শুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে তাহার বিশিষ্টতা, তাহার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধুর্য্য—তাহার মজা সবটাই নষ্ট হইয়া যাইত। এক দিন তাঁহার সহিত ইংরেজী লইয়া আমার কথা হয়। তিনি স্পষ্টই বলিলেন, "আমি বাঙ্গালী, ইংরেজ নহি; আমার ইংরেজী লেখার উদ্দেশ্য বাঙ্গালীর মনের ভাব শাসক-সম্প্রদায়কে বুঝান, কাজেই আমার ইংরেজী বাঙ্গালীর ইংরেজীই হইবে। ইংরেজী ভাষার আবরণে আমি আমার বাঙ্গালীত্বকে ঢাকিব কেন? ইংরেজ কি বাঙ্গালা ভাষার আবরণে উহাদের ইংরেজীয়ানাকে ঢাকে বা ঢাকিতে পারে? বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদখানা পড়িয়া দেখ দেখি, সে ভাষার সর্ব্বাঙ্গ হইতে গোরার বোট্‌কা গন্ধ ফুটিয়া উঠিতেছে; সে বাঙ্গালা বাঙ্গালীর নহে—গোরার। তেমনি আমার ইংরেজী হইতে বাঙ্গালার সরিষার তৈল ফুটিয়া উঠিবেই, যেখানে তেল ভাসাইতে পারিব না, সেখানে সর্ষপের গন্ধ ছুটাইব।" কথাটা বড়ই স্পর্দ্ধার, বড়ই গভীর। তাঁহার এই বাঙ্গালীত্বের শ্লাঘার মহিমা তাঁহার সমসময়ের সাধারণ বাঙ্গালী বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিয়াছিলেন অক্ষয়চন্দ্র এবং ইন্দ্রনাথ। তবে খাঁটি সরিষার গন্ধ এখনও বাঙ্গালীর নাকে না কি বড়ই ভাল লাগে, তাই প্রকৃতির টানে অমৃতবাজার পত্রিকার ভাষার মোহে বাঙ্গালী মুগ্ধ হইয়াছিল।

শিশিরকুমার যেমন খাঁটি বাঙ্গালীর মতন ইংরেজী লিখিতেন, তেমন খাঁটি বাঙ্গালীর মতন বাঙ্গালা লিখিতেন। সে বাঙ্গালায় ইংরেজী ভাবের আমেজ পর্য্যন্ত থাকিত না, ইংরেজী শব্দের অনুকরণে তিনি কখনও একটাও সংস্কৃত শব্দের সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার 'নয়শো রূপেয়া' খাঁটি বাঙ্গালীর বাঙ্গালা, তাঁহার 'অমিয়নিমাই-চরিত' নিরাবিল বাঙ্গালীত্বের নির্ম্মল মন্দাকিনী প্রবাহ। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা পড়িতে ও বুঝিতে কোন বাঙ্গালীর কষ্ট হয় না। তিনি বাঙ্গালী-প্রধান ছিলেন, তাই বাঙ্গালীকে খাঁটি বাঙ্গালা কথাই শুনাইয়া গিয়াছেন। তাই মনে হয়, শিশিরকুমার বাঙ্গালা-সাহিত্যকে যে সামগ্রী দিয়া গিয়াছেন, সে সামগ্রী যত দিন বাঙ্গালার বাঙ্গালীত্ব বজায় থাকিবে, তত দিন অক্ষয় অজয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার লেখা বুঝিতে ইংরেজী বিদ্যার প্রয়োজন হয় না, তাঁহার ভাব সংগ্রহ করিতে ইংরেজী-সাহিত্যের পরিচয়ের আবশ্যক হয় না, তাঁহার ব্যবহৃত শব্দসকলের অর্থবোধের জন্য সংস্কৃত অভিধানের টানাটানি

পড়ে না। যে বাঙ্গালা জানে, বাঙ্গালার পুরাতন খাঁটি সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত, সে-ই তাঁহার লেখা বুঝিতে পারিবে এবং তাহার রসাস্বাদে সুখবোধ করিবে। সাগরপারের ইংরেজী সভ্যতার এই লোনা জলে মহাপ্লাবনের দিনে বাঙ্গালীর হরীতকী-পুষ্করিণীর মিঠা জল এমন করিয়া ছাঁকিয়া বাহির করিয়া আর কেহ বাঙ্গালার কাব্যপুরুষোত্তমের স্নানযাত্রার আয়োজন করিতে পারে নাই। ইহাই শিশিরকুমারের বিশিষ্টতা, আর এই জন্যই বাঙ্গালা-সাহিত্যে তাঁহার আসন স্বতন্ত্র থাকিবে। শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিয়াছেন যে, 'অমিয়নিমাই-চরিত' পড়িলে যেন মনে হয়, কোন্ কালের বাঙ্গালীর ভাষা যেন পড়িতেছি, সে ভাষায় ফারসী আরবীর পলাণ্ডুর গন্ধ নাই, বর্ত্তমান ইয়োরোপের পমেটমের ও সাবানের গন্ধ নাই। বটেই ত; সে যে খাঁটি বাঙ্গালার—পুরাতন বাঙ্গালার ভোগবতীর ভাষা, তাহাতে অর্ব্বাচীনতা থাকিতেই পারে না।

যিনি যাহাই বলুন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, দেশাত্মবোধের প্রবল প্রেরণার ফলেই শিশিরকুমার শ্রীগৌরাঙ্গের বৈষ্ণবধর্ম্মকে বুকে করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিতেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিচয় রাখিতেন, কিন্তু কোন তাতেই তাঁহার প্রবল দেশাত্মবোধের পিপাসা মিটে নাই। শেষে সে পিপাসা মিটিয়াছিল বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মে। তিনি প্রজার দূত ছিলেন, পতিতের বেদনার পরিচয় দিতেন, তিনি পতিত-পরাধীনকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যেই প্রথমে রাজনীতির পথ দিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সমাজ-সংস্কারের কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন। সে পথে বাঙ্গালী মজে না, সে পথ দিয়া অধিক দূর বাঙ্গালী অগ্রসর হইতে চাহে না। ধর্ম্মের জন্য, ভাবের জন্য, বাঙ্গালী জাতি, মান, কুল, শীল সবই হেলায় ভাসাইয়া দিতে পারে। এইটুকু যখন শিশিরকুমার বুঝিলেন, তখনই তিনি বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মকে অবলম্বন করিলেন। সে ধর্ম্মের স্বাদ পাইয়া যতই তিনি ভিতরে যাইতে লাগিলেন, স্তরে স্তরে নামিয়া যতই ধর্ম্মানন্দের নির্ম্মল পীযূষ-প্রবাহের আস্বাদ তিনি লাভ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভাবোদয় হইতে লাগিল; সে ভাবের বন্যার মুখে পেট্রিয়টিজম্ ও রাজনীতি ভাসিয়া গেল বটে; কিন্তু গোড়ায় ঐ পেট্রিয়টিজমের প্রেরণায়, ঐ ভারতের ছত্রিশ জাতি ও ছাপ্পান্ন দলকে একীকরণের বাসনায়, ঐ হিন্দু মুসলমানকে সম্মিলিত করিবার

আশায়, তিনি একটির পর একটি করিয়া নানা বাহিরের অনুপযোগী ধর্ম্ম ছাড়িয়া শেষে বৈষ্ণবধর্ম্মের শীতল ছায়া লাভ করিয়াছিলেন। সে আশ্রয় লাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালার ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সুখের সমাচার জ্ঞাপন করিতে তিনি উদ্যত হন। যখন তিনি টের পাইলেন, গুরু না বুঝিলে শিষ্য বুঝিবে না, ইংরেজ ভাল না বুঝিলে, মার্কিনে ও ইয়োরোপে উহার প্রশংসার দুন্দুভি-নাদ না হইলে, ইংরেজীনবীস বাঙ্গালী বুঝ মানিবে না, তখন তিনি 'অমিয়নিমাই-চরিতে'র ইংরেজী অনুবাদ করিয়া Lord Gouranga পুস্তক বাহির করিলেন। ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রভাবে যতটুকু হইতে পারে, তীব্র দৃষ্টি ও মনীষার প্রভাবে যতটুকু হইতে পারে, ততটুকু তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের জন্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারকের personal magnetism ব্যক্তিগত প্রভাব, সম্মোহন-শক্তি তাঁহার ছিল না। তিনি সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ ও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, ভাবুক রসিক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বক্তা ছিলেন না, ব্যাখ্যাতা ছিলেন না, লোকমোহনের সামর্থ্য তাঁহাতে ছিল না। তাই সমাজে তাঁহার প্রভাব তেমন জমে নাই, তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের মধুর রসটা ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জমাইয়া যাইতে পারেন নাই। বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সাহিত্যের মান-মন্দিরের গোড়ায় তিনি আর একটা পারিজাত-মালা গাঁথিয়া দিয়া গিয়াছেন বটে, সে মালা তুলিয়া পুরুষোত্তমদেবের গলায় পরাইবার লোক এখনও পাওয়া যায় নাই।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখিব। কি-জানি-কেন জানি না,—বাঙ্গালার তথা ভারতবর্ষের মাটির গুণেই হউক বা দেশের জল বায়ুর গুণেই হউক,—এ দেশে সন্ন্যাসী সর্ব্বত্যাগী না হইলে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। গৃহী যত বড় মনীষাই হউন না কেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম বা সাধন-পদ্ধতি যেন এ দেশে টিকে না। বুদ্ধদেবের সময় হইতে সন্ন্যাসী-পরম্পরাই এ দেশে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কেবল সন্ন্যাসী হইলেই হয় না, বিভূতিমান্ বা ঐশ্বর্য্যশালী সিদ্ধ সাধক না হইলে যেন তাঁহার কথা কেহ শুনে না। পুরাতন ইতিহাসের কথা তুলিব না, এই ইংরেজী যুগের নব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের বিষয় আলোচনা করিলেই কথাটা বুঝা যাইবে। রাজা রামমোহন রায় যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ

যাহার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, তাহা ত এখন বর্ষাকালের অর্কবৃক্ষের মতন পত্রপুষ্পশূন্য। আর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে পাঁচ লক্ষ ভারতবাসীর সেব্য হইয়াছে। পরমহংস রামকৃষ্ণ যে অভিনব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন বিশাল ন্যগ্রোধের ন্যায় বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজকে যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে, এমন কি গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যে সাধন-পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রভাব এখন ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা প্রবল। কেন এমন হয় বলিতে পারি না, কিন্তু দেখিতে পাই গৈরিক বসনের অন্তরালেই যেন ভারতের ধর্ম্মভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, চাপরাস না পাইলে ভগবানের এই খাস তালুক ভারতবর্ষে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিবার অধিকার যেন কাহারও হয় না। গৈরিক বসন—সন্ন্যাস ও সর্ব্বত্যাগ যেন চাপরাস, সে চাপরাস যাহার নাই তাহার অপূর্ব্ব মনীষা থাকিলেও, অসাধারণ প্রতিভা থাকিলেও, তাহার দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজসংস্কার যেন সুসিদ্ধ হয় না। তাই এক দিন ভক্তকুলচূড়ামণি রামপ্রসাদ গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমি শ্যামার খাস তালুকের প্রজা।"

শিশিরকুমার সন্ন্যাসী ছিলেন না; গৃহী বিষয়ী ছিলেন। যে ধর্ম্মের আলোচনা তিনি করিয়া গিয়াছেন, সে ধর্ম্ম সন্ন্যাসী—সর্ব্বত্যাগীর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম। শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় উৎকট সন্ন্যাসী বাঙ্গালায় বোধ হয় তাহার পরে আর কেহ হয় নাই। কেবল তিনি সন্ন্যাসীই ছিলেন না, ভাবের সকল পর্য্যায়, ভক্তির সকল লক্ষণ তিনি নিজে স্বদেহে ফুটাইয়া, নিজে করিয়া-কর্ম্মিয়া এক একটির উন্মেষক্রম দেখাইয়া গিয়াছেন। ভক্তির সকল লক্ষণ তাঁহাতে প্রস্ফুটিত হইত বলিয়াই তাঁহাকে ভক্তগণ সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়াই মনে করিত। ভক্তির এমন সজীব দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে আর কেহ তেমন করিয়া দেখাইতে পারিয়াছিল কি না সন্দেহ। শিশির-কুমার সে ভক্তির মহিমা বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার বিভূতি বিকাশে সমর্থ হন নাই। তিনি নিজে বুঝিয়া নিজে মজিয়াছিলেন, এবং যাহাদের সৌভাগ্য প্রবল ছিল, তাহারা তাঁহার সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এ পদ্ধতি অনুসারে বাঙ্গালা দেশে ধর্ম্মপ্রচার সম্ভবপর

নহে, তাই তাঁহার বৈষ্ণব বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্র সেন এবং শিশিরকুমার ঘোষ— এই দুই মনীষা যদি সম্মিলিত হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালায় একটা যুগবিপর্য্যয় ঘটিত। কিন্তু তাহা হইবার নহে, তাই হয় নাই। কেশবচন্দ্রে বৈষ্ণব ভাব ফুটিতে না ফুটিতে তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সে কাজটা ভগবান্ রামকৃষ্ণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সে কার্য্যের বিস্তৃতি সাধন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ফলে, বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম এখনও নূতন ভাবে সঞ্জীবিত হয় নাই। যে ক্রম অবলম্বন করিলে আবার মাটির প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর, শিশিরকুমার সেই ক্রম দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যতে যদি করুণানিধান শ্রীভগবানের কৃপায় কোন মহাপুরুষ সন্ন্যাসী সংসারের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়া এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনিই আবার বৈষ্ণবধর্ম্মের সংস্কার করিতে পারিবেন। শিশিরকুমার উদ্বোধনের যোগাড় করিয়া গিয়াছেন, ঘটস্থাপনা করিয়া গিয়াছেন,— এখন চাই এক জন সিদ্ধিসাধক পুরোহিত। যখন কাল পূর্ণ হইবে, ভগবানের দয়া হইবে, তখন সে অভাবও দূর হইবে। আপাততঃ আমরা কর্ম্মবীর শিশিরকুমারের নিরাবিল বাঙ্গালীত্বের প্রগাঢ় ভাবুকতার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে পারিলে, আমাদের জীবন সার্থক হইল জ্ঞান করিব।
('প্রবাহিণী,' ২০ পৌষ ১৩২১)

স্মৃতি-সভা

স্মৃতি-সভা বা স্মারক সভা এখন ফ্যাশান হইয়াছে। যখন বাঙ্গালায় হিন্দু সমাজ ছিল, মৃতের তখন রীতিমত শ্রাদ্ধ করিয়া, ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, কাঙ্গালী বিদায় করিয়া স্মৃতিটা জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইত। এখন ইংরেজী সভ্যতার গুণে সব সস্তায় সারিবার চেষ্টা। পাঁচ সিকাতে টি-পার্টি বা সান্ধ্য সম্মিলন হয়, দশ পনর টাকা খরচ করিলেই স্মৃতি-সভা হয়। কলিকাতার বাঁধা আসরের জন-কয়েক বাঁধা গাইয়ে এবং নাচিয়ে আছে, তাহারাই শুষ্ক মুখে, খালি পেটে, হাত-পা নাড়িয়া খানিকটা

বকে—সে বকুনির মাথামুণ্ড নাই, আগাগোড়া নাই, আর ছেলের পাল হাততালি দেয়, হাসে, মাতে, কথা কয়। বস্, সভা ভঙ্গ হয়, স্মৃতি-সভা শেষ হইয়া যায়। পথে যাইতে যাইতে হয়ত গোটাকয়েক ছেলে কাহার বক্তৃতা কেমন হইল, তাহারই আলোচনা করে—বকাবকি করে।

ইহাই কি স্মৃতি-সভা? যে লোকটার স্মৃতি রক্ষা করিতে চাও, সে কেমন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া কি কি কাজ করিয়াছিল, কেমন ভাব বিলাইয়া সে চলিয়া গিয়াছে, সে ভাব সমাজে টিকিয়াছে কি না; যদি না টিকিয়া থাকে, তবে কেন সে ভাব নষ্ট হইল—ইত্যাদি সমাজ-উন্মেষ বিষয়ক কোন কথারই আলোচনা হয় না। বড়-জোর মৃত ব্যক্তির এক পশলা প্রশংসাবাদ হয়, সে প্রশংসার সহিত বর্ত্তমান সমাজের কোন সম্বন্ধ থাকে না। যাহারা স্মৃতি-সভার যোগাড় করে, তাহারা কেবল হুজুগ চায়—একটা নামজাদা পুরুষকে সভাপতির আসনে বসাইয়া দেয়—আর সেই থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়ের ওড়-পাড়ন হয়। সেই প্রথম পাঁচকড়ি, হীরেন্দ্র, যতীন্দ্র, গুরুদাস, দেবপ্রসাদ, সুরেশ, যোগেশ, প্রভৃতি বচনবাগীশতার শ্রীজান দেলজানের দল বক্তৃতা করে। সভায় বড় বড় প্রস্তাব গ্রাহ্য করা হয়—মর্ম্মরপ্রতিমা, বৃত্তির মহিমা, পদকের চটক, পটের নাটক—এমন কত কথা, কত সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সভা ভাঙ্গিলে, তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হইতে আজ পর্য্যন্ত এই অভিনয়ই হইতেছে।

ক্রীণ সাহেব বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালী জাতিটা বেজায় ও বিষম অভিনয়প্রিয়। বাঙ্গালীর কংগ্রেস কন্ফারেন্স, সম্মিলন সম্মেলন, স্মৃতি-সভা, শোক-সভা—সবই অভিনয় মাত্র; কেবল থিয়েটার, কেবল রঙ্গ। এই রঙ্গে কেহ ছোট হয়, কেহ বড় হয়, কেহ পতি সাজে, কেহ বক্তা সাজে, কেহ সম্পাদক, কেহ উপপাদক। এই রঙ্গেতে ছোট বড়র বিচার লইয়া মানাপমানের যাচাই হয়, মনীষা মেধার ওজন করা হয়। যে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হইল, সম্মেলনের পতি হইল, সে-ই দেশনায়ক পুরুষ, সে-ই পেট্রিয়ট, সে-ই বক্তা ও বড়লোক। আর এবম্প্রকারের রঙ্গরাজ এক একটি করিয়া মরিলে তাহাদেরই জন্য স্মৃতি-সভা এবং শোক-সভা হইয়া থাকে। তাহারা যেমন ফাঁকা রঙ্গে জীবনটা কাটাইয়াছিল, মরণের পরও তেমন ফাঁকা রঙ্গে তাহাদের স্মৃতি রক্ষা করা হয়।

আমাদের দেশে স্মৃতিরক্ষা করিত পুত্রে এবং শিষ্যে। পুত্র শ্রাদ্ধ শান্তি করিয়া পিতার ধারা বজায় রাখিত; শিষ্য গুরু-উপদেশের বহুল প্রচার করিয়া গুরুর মহিমা দেশব্যাপী করিত। যাহার পুত্র নাই, শিষ্য নাই, সে জলবুদ্‌বুদের মতন মরিলেই তাহার সব শেষ হইত। বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ গুরুপূজা করিতে জানে এবং পারে। তাহারা গুরুর তিরোধানের দিনটাকে উৎসবে পরিণত করিয়া, গুরুবাক্যের পঠন-পাঠন করিয়া গুরু-স্মৃতি সজীব রাখে। এই পদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া ভগবান্ রামকৃষ্ণের এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যগণ গুরুর স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকেন। দেশের লোকের মতিগতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিলে মনে হয়, তাঁহাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে না। বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণের মেলা বর্ষে বর্ষে বিশাল আকার ধারণ করিতেছে। শিষ্যের গুণে গুরুর মহিমা প্রচারিত হয় এবং পুত্রের প্রভাবে পিতার গৌরব বর্দ্ধিত হয়। ভগবান্ রামকৃষ্ণের প্রভাব স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় শিষ্যের গুণে বাড়িয়াছিল—জগৎময় হইয়াছিল। আর স্বামী বিবেকানন্দের মহিমা বাড়িয়াছে ভক্ত শিষ্যগণের প্রভাবে।

আমাদের দেশে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন কর্ম্মের জন্য কাহারও স্মৃতি চিরকাল রক্ষিত হয় নাই। কবির স্মৃতি কাব্যে রক্ষিত হয়, লেখকের স্মৃতি লেখায় সঞ্চিত থাকে; আর ধনীর স্মৃতি দান পুণ্যে সুরক্ষিত হয়। কেবল ধর্ম্মপ্রচারক, সিদ্ধ সাধক ও গুরুগণের স্মৃতি সাধারণ ভাবে শিষ্যগণ দ্বারা রক্ষা করা হইয়া থাকে। দান পুণ্যের জন্য রাণী ভবানীর, রাজা রামকৃষ্ণের, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের, গঙ্গাগোবিন্দ দেওয়ানের; তারক প্রামাণিক প্রভৃতির স্মৃতি আপনিই সুরক্ষিত আছে। এই তত্ত্বটা ইংরেজীনবীস মহাশয়গণ মনে রাখেন না বলিয়াই তাঁহারা বাজে স্মৃতি-রক্ষার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া থাকেন। তাই তাঁহাদের চেষ্টা-অভিনয়ের বাহারটাই অধিক ফুটিয়া উঠে। দেশের লোকের মতিগতি তাঁহাদের চেষ্টার অনুকূল যে নহে, এইটুকু বুঝিতে পারিলে অনেক বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়। কথাটা বলিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করিয়াই এত কথা বলিলাম, হয়ত অনেকের ভাল লাগিবে না। ভাল না লাগিলেও কথাটা কিন্তু সত্য। ('প্রবাহিণী,' ১১ মাঘ ১৩২১)

বসন্তপঞ্চমী

সেকালের হিসাবে আজ হইতে মদনোৎসব আরম্ভ, চৈত্র মাসের কন্দর্প-চতুর্দ্দশীর দিন এই উৎসবের শেষ হইত। পুরা বসন্তকালটা আমোদে, প্রমোদে, উৎসব আনন্দে কাটিত। সঙ্গীত, কবিতা রচনা, কাব্যামোদ, রং লইয়া খেলা, কুঙ্কুমের ছড়াছড়ি, আর ফুলের বাহার—মদনোৎসবের ইহাই উপাদান ছিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ফুলের সাজে সাজাইয়া, বাসন্তী রঙ্গের কাপড় পরাইয়া বাহির করা হইত। তাহারা নাচিত খেলিত, হাসিয়া বেড়াইত। কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতীর দলও সাজিয়া কুঙ্কুম কস্তুরী লইয়া বাহির হইত এবং নানা রসের কবিতা আবৃত্তি করিত, কথা-কাটাকাটি করিত এবং নাচ-গান করিত। ইহা ছাড়া মদনের পূজা, আরতি এবং শোভাযাত্রাও হইত। এই উৎসবে যেন একটা আনন্দের ঢেউ সমাজের উপর দিয়া বহিয়া যাইত।

এই মদনোৎসবই আকারান্তরিত হইয়া হোলি উৎসবে পরিণত হইয়াছে। কাব্যামোদের পরিবর্ত্তে গালাগালি চলিয়াছে, কুৎসিত ভাবের আলোচনা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন আমরা সজীব জাতি ছিলাম, তখন মদনোৎসবে মধুর রসেরই আধিক্য হইত—সাজে মাধুর্য্য, ভাষায় মাধুর্য্য, সঙ্গীতে মাধুর্য্য, চিত্রলিখনে মাধুর্য্য—সর্ব্বত্র মাধুরীর প্রবাহ বহিয়া যাইত। জাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর পরিবর্ত্তে কৌৎসিত্য প্রবল হইয়াছে, আমোদ-প্রমোদ অশ্লীল—কুরুচিকর আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের পুরাতন উৎসবসকলের বিপরিণাম দেখিলেই বুঝা যায় আমরা কতটা হীন হইয়াছি।

বসন্তপঞ্চমীর দিন সরস্বতীপূজাটা তন্ত্রের কীর্ত্তি। বাঙ্গালায় যেমন মাটির সরস্বতী গড়িয়া পূজা হয়, ভারতের আর কোন প্রদেশে এমন হয় না। এমন কি বাঙ্গালীর মতন পুস্তকপূজা—ভারতীর আরাধনা আর কোন প্রদেশে হয় না। অন্ত অনধ্যায় বটে, কিন্তু বাঙ্গালী যেমন একেবারেই কলম স্পর্শ করে না, গ্রন্থাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করে না—এত কঠোর অনধ্যায় ভারতের আর কোন প্রদেশে প্রচলিত নাই। সরস্বতীপূজা বাঙ্গালার খাস সামগ্রী—খাস উৎসব। বিহারের হিন্দুগণ

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন দোয়াত পূজা করিয়া থাকে, আজ সরস্বতীপূজার দিনে তাহারা দোয়াত পূজা বা গ্রন্থ পূজা করে না। আজ হইতে তাহাদের হোলি আরম্ভ হইল, আজ হইতে আবীর ও গালাগালি চলিতে আরম্ভ হইল, আজ হইতে দোলপূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে তাহারা হোলি গান করিবে। হোলির সূচনার দিন বলিয়া আজ বসন্তপঞ্চমী তাহাদের পক্ষে আমোদের দিন। যুক্তপ্রদেশে এবং পঞ্জাবে বিহারের মতন হোলির প্রথম দিন বলিয়া বসন্তপঞ্চমীর আদর। কেবল বাঙ্গালায় আজ শক্তিপূজার বোধন বসিল, বাসন্তী দুর্গোৎসবের বিজয়ার পর চতুর্দ্দশীর দিন এই বোধনের শেষ হইবে।

আমরা ইংরেজীনবীস বাঙ্গালী মেকী সভ্যতার খাতিরে দেশের পুরাতন উৎসব আনন্দ ছাড়িয়া দিয়াছি বটে, পরন্তু নূতন উৎসব আনন্দ অবলম্বন করিতে পারি নাই। আসল কথা—আমরা উৎসব আনন্দে মত্ত হইতে ভুলিয়াছি। তাহার একটু কারণ আছে। দশ জনকে লইয়া উৎসব আমোদে প্রমত্ত হইতে হয়। উৎসব বলিলেই সংহতি বুঝায়। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবাসী, বন্ধুবান্ধব লইয়া উৎসব করিতে হয়। দশ জনকে লইয়া আনন্দ করিতে হইলে ট্যাঁকের কড়ি খরচ করিতে হয়, নিজে একটু সংযমী ত্যাগী হইতে হয়। যে বিলাসী সে অত পরের উপদ্রব সহিবে কেন, পরের জন্য পয়সা খরচ করিবেই বা কেন ? বিশেষতঃ বাবু বিলাসীর বিলাসের আকাঙ্ক্ষাটা খুব বড়, অথচ তদনুরূপ অর্থসামর্থ্য অর্থোপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি বিলাসে ইংরেজের নকল করেন বটে, কিন্তু ইংরেজ বা ইয়োরোপীয় জগৎ ছানিয়া টাকা রোজগার করে এবং বাবুয়ানি করে, তিনি ইংরেজের এঁটো পাত চাটিয়া তাহার চাকরি—দালালি—মোসাহেবি করিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করেন। এমন নকলনবীস বিলাসীর আধিক্য সমাজে হইলে সামাজিক আমোদ উৎসব একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। আর একটা কথা; আজকালকার সামাজিক বাবুরা আর অল্পে তুষ্ট নহেন; তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হইলে বাদশাহী খোরাক না তৈয়ারী করিতে পারিলে তাঁহারা খাইতে আইসেন না। দশ জনে মিশিতে হইলে যে দশ জনকে একটু একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। ফলে আনন্দময়—উৎসবময় বাঙ্গালা দেশ এখন নিরানন্দ এবং উৎসবহীন

হইয়াছে। তাহার ফলে রোগ শোক অল্পায়ু অন্নভোগী হইয়া আমরা কষ্ট পাইতেছি, বল বুদ্ধি ভরসা চল্লিশ পেরুলেই ফরসা হইয়া যাইতেছে।

কাজেই বলিতে হয় আজ বসন্তপঞ্চমীর দিন একবার বুক-ভরা, গাল-পোরা হাসি হাস না ভাই। হাসি না পায়, জোর করিয়া হাস—শুষ্ক হাসি হাস। হাসির ভান করিতে করিতে আসল হাসি ফুটিয়া উঠিবেই। সুখ দুঃখ লইয়াই সংসার; কাহারও ভাগ্যে নির্জ্জলা সুখ বা নির্জ্জলা দুঃখ ঘটিতেই পারে না;—সুখের মধ্যে দুঃখ থাকে, দুঃখের মধ্যে সুখ থাকেই। যে হাসিতে জানে সে সুখেও হাসে, দুঃখেও হাসে—সে হাসিয়া সুখ-দুঃখকে এক করিয়া ফেলিতে পারে। মুসলমানের আমলে এমন কি অধিক সুখ ছিল যে, বাঙ্গালা উৎসবময় হইয়াছিল। আসল কথা, তখন বাঙ্গালী আমোদ করিতে জানিত—হাসিতে হাসাইতে জানিত। এখন বাঙ্গালী হাসিতেও জানে না, হাসাইতেও পারে না। তাই বঙ্গভূমি নিরানন্দময়ী। হাস না?—বসন্তপঞ্চমী বড় সুখের, বড় ভোগের উৎসব, এই শুভ দিনে এক বার আপনা ভুলিয়া হাস না? তোমার মঙ্গল হইবে, তোমার জাতির কল্যাণ হইবে, তোমার পরমায়ু বৃদ্ধি হইবে, বংশ রক্ষা হইবে, প্রকৃত সুখোদয় হইবে। মা-সরস্বতীকে সামনে রাখিয়া—এক বার গাল-ভরা সরল হাসি হাস! উৎসব সার্থক হউক, বাঙ্গালী জীবন ধন্য হউক। ('প্রবাহিণী,' ১১ মাঘ ১৩২১)

মাটি নিবি গো

'মাটি নিবি গো'—চীরপরিধানা, শুষ্কা, শীর্ণা, কর্দ্দমপরিলিপ্তা দুঃখিনী মাথায় এক ঝুড়ি মাটি লইয়া পাড়ায় মাটি বেচিতেছে। অনাহারে তাহার কণ্ঠরব মৃদু, দারিদ্র্যের পীড়নে তাহার দেহযষ্টি কিঞ্চিৎ ন্যুব্জ, তাহার আশা নাই, ভরসা নাই, সুখ নাই, স্বস্তি নাই,—আছে কেবল পেটের জ্বালা, আছে কেবল জীবনের মায়া। সে বাঁচিতে চাহে—জীবন-সুখেই সে কেবল বাঁচিতে চাহে; কিন্তু বাঁচিবার উপায় তাহার কিছু নাই, আছেন কেবল মা গঙ্গা; যখন ভাঁটার টানে জল নামিয়া যায়, তখন সে গঙ্গার মাটি, নখাঙ্গুলের শীর্ণ নখের সাহায্যে চাঁচিয়া আনিয়া পাড়ায়

পাড়ায় বেচিয়া বেড়ায়। অথবা যখন কোন ঐশ্বর্য্যশালী ধনবান পুরুষ নূতন ভবন নির্ম্মাণ করিবার আয়োজন করেন, তখন বুনিয়াদ খুঁড়িতে যে মাটি বাহির হয়, তাহাই কিছু সংগ্রহ করিয়া সে ক্ষুধার অন্ন সঞ্চয় করে। মাটিই তাহার অন্ন। মাটিই তাহার জীবন।

'মাটি নিবি গো'—কাতরকণ্ঠে দুঃখিনী আবার ডাকিল। কই, কেহ ত সাড়া দেয় না, কেহ ত দরজা খুলিয়া মাটি কিনিতে পথে আসিয়া দাঁড়ায় না! বুঝি, দুঃখিনী আর মাটির বোঝা বহিতে পারে না। বুঝি, তাহার আজ অনাহারে দিন যায়! বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, কলিকাতার শান-বাঁধান 'ফুট পথে' আর পা পাতিয়া চলা যায় না; পিপাসায় তাহার তালু শুষ্ক হইয়াছে, অধরোষ্ঠে ধূলা উড়িতেছে; দুঃখিনী আর সহিতে পারে না, তাহার দুই চক্ষুর কোণ হইতে অশ্রুর দুইটি মোটা ধারা গড়াইয়া পড়িল। হা বিধাতঃ! মাটিও কেহ কিনিতে চায় না! এমন সময় বাবুদের বাড়ীর একটি চাকরাণী চাঁচা বাখারির মত কালো-কোলো দেহখানিকে দোলাইয়া, এক পিঠ চুল নাচাইয়া, আহারান্তে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে সেই পথে আসিয়া দাঁড়াইল। রোরুদ্যমানা মৃত্তিকা-বিক্রয়িত্রীকে চোখের জল ফেলিতে দেখিয়া ঝি মহাশয়া চোখমুখ বাঁকাইয়া বলিল—"আঃ, মর মাগী, দরজায় ব'সে আবার কান্না হচ্ছে।"

ঝিয়ের মিষ্ট সম্ভাষণ শুনিয়া, একটু সামলাইয়া, মাটিওয়ালী উদাসভাবে বলিল—"হ্যাঁ মা, তোমাদের পাড়ায় কি কেহ উনান পাতে না, কাহারও বাড়ীতে কি রসুই-ঘর নাই, কোন গৃহে কি তুলসীমঞ্চ নাই? তোমরা কি হাতে মাটি কর না?"

এক গাল হাসিয়া, যেন সোহাগে আটখানা হইয়া ঝি উত্তর করিল—"না রে না;—এ যে বাবু সাহেবদের পাড়া। এখানে কাহারও চাল-চুলা নাই, তুলসীমঞ্চ নাই, হাতে মাটির রেওয়াজও নাই। এ পাড়ায় কি মাটি বেচিতে আসিতে আছে?"

মাটিওয়ালী—তবে ইহারা খায় কি! খায় না! সেতখানাও যায় না।

ঝি—খাবে না কেন! দিনের মধ্যে পাঁচ বার খায়। বাবুর্চ্চিখানায় রান্না হয়, রসুই-করা সামগ্রী ঘরে আনিয়া খায়। হাতে মাটি

দেয় না, সাবান মাখে। বুঝিলি, এ পাড়ায় কোন বাড়ীতেই মাটি বিকাইবে না।

মাটিওয়ালী ঝিয়ের কথা শুনিয়া চোখের জল মুছিল, এবং নিরাশভাবে মাটির ঝুড়িটা মাথায় তুলিতে চেষ্টা করিল। বৃদ্ধা দুই দিন একটি চণকও দাঁতে কাটে নাই, ক্ষুধায় স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছে না, মাটির ঝুড়ি মাথায় তুলিবে কি! ঝুড়ি তুলিতে গিয়া সে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। ঝি নিতান্ত হৃদয়হীনা নহে, সেও এক দিন অনাহারে কষ্ট পাইয়াছে, ক্ষুধার্ত্তের জ্বালা সে বেশ বুঝে; সে-বেদনার স্মৃতি এখনও সে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। ঝি তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর হইতে এক ঘটি জল আনিয়া মাটিওয়ালীর চোখে মুখে দিল। দুঃখিনীর একটু জ্ঞান হইল, পাঁজর-ভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার বলিল, "হা ভগবান্, মাটি কেহ খরিদ করিতে চাহে না!" এই কথা শুনিয়া, এবং দরজায় একটা হাঙ্গামা হইতেছে বুঝিয়া বাড়ীর গৃহিণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "মাটিওয়ালী, তোর এক ঝুড়ি মাটির দাম কত?" অতি ধীরে দুঃখিনী বলিল, "চারি পয়সা।"

গৃহিণী—অত মাটির দাম চার পয়সা! আমি দুই আনা দেব, আমায় সব মাটি দিয়ে যা।

শীর্ণমুখে একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া মাটিওয়ালী উত্তর করিল, "আর দয়া করিতে হবে না মা। দেবতাই আমাকে যথেষ্ট দয়া করিয়াছেন। চারি পয়সা পাইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।"

গৃহিণী—সে কি! দয়া কেমন! দেবতার দয়া কি দেখিলে?

মাটিওয়ালী—যখন আমার দেহে বল ছিল, তখন আমি যত মাটি বহিতে পারিতাম, তাহার দাম পাড়ার লোকে চারি পয়সা দিত। এখন তাহার অর্দ্ধেক বহিতে পারি, তবু চারি পয়সাই পাই। বার্দ্ধক্যে ইহাই আমার পক্ষে দেবতার দয়া। আর তুমি মা যখন নেমে আসিয়াছ, তখন দেবতার দয়া বাকী কি আছে!

গৃহিণী—চাট্টি ভাত খাবি? ভাত যদি খেতে না চাস্ ত একটু গরম দুধ দিব—খাইবি?

মাটিওয়ালী—অত সুখ সহিবে না মা! আমায় চারিটি পয়সা দেও, আমি ঝুড়িটা উপুড় করিয়া খালি ঝুড়ি লইয়া চলিয়া যাই।

এইটুকু বলিয়া মাটিওয়ালী জোর করিয়া উঠিয়া বসিল, জীর্ণ বস্ত্রাঞ্চলে কোটরগত দুইটি চক্ষু মুছিল, একটা ঢোক গিলিয়া সামলাইয়া গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিল—"মাটি কেনা বন্ধ করিও না মা;—আমার কথা শুন—যখন তোমার দ্বারে আমার মত আর কেহ মাটি বেচিতে আসিবে, অমনি তখনই দুই এক পয়সার মাটি তাহার নিকট হইতে খরিদ করিও। মাটি লক্ষ্মী, মাটি শেষের সম্বল। যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তাহার মাটি আছে। মাটি আছে বলিয়াই, মা আমি এমন দুঃখিনী হইয়াও ভিখারিণী হই নাই—কাঙ্গালিনী সাজিতে পারি নাই। চারিটার উপর আর চারিটা পয়সা তুমি আমায় ভিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলে। আমি তাহা লইব কেন? যত ক্ষণ মাটি আছে, তত ক্ষণ আমার অন্ন আছে। আমি ভিক্ষা করিব কেন মা? সৌখীন ঘরের গৃহিণী তুমি মা, তোমার নয়নটাও সৌখীন রকমের। আজ তুমি আমায় দুধ খাওয়াইতে চাও, কাল আমার কি দশা হইবে? আজ তুমি আমার চার পয়সার মাটি আট পয়সায় কিনিলে কাল অমন দাম কে দিবে? লাভের মধ্যে আমার লোভ বাড়িয়া যাইবে, আমার মাটি বেচায় ব্যাঘাত ঘটিবে। না মা, তোমার পয়সা তোমার থাকুক, আমাকে ন্যায্য মূল্য দিলেই আমি সুখী হইব। তোমার মাটির প্রয়োজন নাই, তবুও যে মাটি কিনিলে, দুঃখিনীর বোঝার লাঘব করিলে, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট দয়া।"

গৃহিণী নীরবে মাটিওয়ালীকে চারিটা পয়সা দিয়া, স্বয়ং নিজ হস্তে মাটির ঝুড়ি তুলিয়া ঘরে রাখিলেন। কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অঞ্চলের বস্ত্র জড়াইয়া গললগ্নীকৃতবাসে, সাষ্টাঙ্গে মৃত্তিকার স্তূপকে প্রণাম করিলেন, এবং করজোড়ে বলিলেন—"মাটি, তুমি সত্যই মা-টি। যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তাহার মাটি আছে। তুমি শেষ, তুমি অনন্ত। মা-টি আমার, তুমি স্থির হইয়া আমার ঘরে থাক। মূঢ়া আমি, জানিতাম না, তাই তোমায় তোমার যোগ্য মর্য্যাদা দিই নাই, তোমার উপাসনা করি নাই। আজ আমার সুপ্রভাত, এমন মহীয়সী দুঃখিনী আমার গৃহদ্বারে আসিয়াছিল, তাইতে তোমার মহিমা বুঝিলাম। থাক মা, যুগে যুগে যেমন আমার শ্বশুর-বংশে পূজিতা হইয়া আসিয়াছ, আবার তেমনি ভাবে থাক। তুমি অন্ন, তুমি প্রাণ, তুমি মান, তুমি ধর্ম্ম, তুমি

বাঙ্গালার বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব, তুমি আমার ঘরে স্থির হইয়া থাক। তোমায় বার বার নমস্কার করিতেছি।"

এই ভাবে মৃত্তিকার স্তব করিয়া গৃহিণী চোখের জল মুছিয়া পবিত্রা হইলেন—ধন্যা হইলেন। জ্ঞানময়ী, ভাবময়ী লক্ষ্মীস্বরূপিণী তিনি, মাটিওয়ালীর কথায় তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল, তাঁহার জীবনের ভাবের ধারা নূতন প্রণালী অবলম্বন করিল। তিনি বাঙ্গালীত্বের *মহিমা বুঝিলেন।*

আইস বাঙ্গালী, একবার মাটিওয়ালীর মতন আমরাও মাটির—আমাদের মা-টির ফেরি করিয়া জীবন ধন্য করি। মাটি নিবি গো—যে মাটিতে তুমি মা শিব গড়িয়া পূজা কর, এবং সংসারে কল্যাণের ধারা প্রবাহিত করিয়া দেও—সেই মাটি নিবি গো? এ মাটি চোরে চুরি করে না, বিদেশী ব্যবসায়ী কাটিয়া দেশান্তরে লইয়া যায় না; এ মাটির মূল্য নাই, যথার্থ মূল্য আজ পর্য্যন্ত কেহ করিতেও পারে নাই। তোরা কেউ মাটি নিবি গো! এ মাটির প্রতি কণা বিশাল ভারতবর্ষের বক্ষবিধৌত হইয়া সঞ্চিত হইয়াছে, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার কোটি তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া এ মাটি সর্ব্বতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া গঙ্গার স্রোতোমুখে বাঙ্গালার বক্ষে আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। এ মাটির স্তরে স্তরে ভারতেতিহাস গাঁথা রহিয়াছে, যুগ-যুগান্তরের কত গাথা ইহাতে খচিত রহিয়াছে। আমাদের বড় সাধের মা-টি নিবি গো! এ মাটি আমার সত্যই কল্পলতিকা; যাহা চাও তাহাই দিবেন, দিতেছেন, দিয়াছেন। এই মা-টির প্রভাবে আমাদের সকল অভাব দূর হইয়াছে, সকল কষ্টের মোচন হইয়াছে। এই মাটি হইতেই বাঙ্গালার কার্পাস, এবং সেই কার্পাস হইতে ঢাকার মল্‌মল্‌। এই মাটি হইতেই বাঙ্গালার কার্পাস, এবং সেই কার্পাস হইতেই তুঁতের চাষ আর সেই তুঁতে হইতেই রেশমের গুটি এবং বাঙ্গালার পট্টবস্ত্র। এই মাটি হইতেই অন্ন, আর সেই অন্নের জোরেই বঙ্গভূমি ভারতবর্ষের অন্নপূর্ণা। আমাদের বাঞ্ছাকল্পলতিকা মৃত্তিকা তোরা কেউ নিবি গো! ছার রজতকাঞ্চন, ছার দ্বিরদরদনির্ম্মিত আসন, ছার মণিমুক্তা, প্রবাল হীরা—ছার বিভব বাণিজ্য! আমার মাটি বজায় থাকিলে, তাহা হইতে পাট উৎপন্ন হইয়া কোটি কোটি টাকা ঘরে আনিয়া দেয়। আমার মাটি বজায় থাকিলে তাহা হইতে ঘাস উৎপন্ন হইলেও, অন্নজলের

সংস্থান করিয়া দেয়। আমার মাটির বাঁশবনেও টাকার তোড়া সাজান আছে, কলাবনে মণিমুক্তা ছড়ান আছে। হায় বাঙ্গালী, এমন মাটিকেও অবহেলা করিতেছ।

মাটি নিবি গো—যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তাহার মাটি আছে। ঐ শুন, ইয়োরোপে মহারণের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। আর ব্যবসায়ীর জাহাজ আসিবে না, আর বিলাসদ্রব্য পাইবে না, আর নগদ টাকার মুখ দেখিতে পাইবে না। সর্ব্বস্ব যাইবে, থাকিবে কেবল মাটি। সে মাটিকে মাথায় করিয়া রাখিতে পার যদি, তবেই ক্ষুধার অন্ন পাইবে, তৃষ্ণার জল পাইবে, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র জুটিবে। এমন শ্যামা মাটিকে—তোমাদের বাঙ্গালী জাতির মা-টিকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিও না। তোমার আধুনিক শহর, নগর, রাজধানী—সকলই ব্যাসকাশী; ঐখানে মরিলে গাধা হয়, বাঁচিয়া থাকিলে মর্কট হইতে হয়। এ সব থাকে না, থাকে নাই। গৌড়, রাজমহল, একদলা, পাণ্ডুয়া, রমাবতী, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা—একে একে কত হইয়াছে, কত গিয়াছে। কোথায় নবদ্বীপ—কোথায় বা জগদ্দল! সব গিয়াছে, সব যাইবে—থাকিবে কেবল মাটি, স্তরবিন্যস্তভাবে, সদাস্নিগ্ধ কোমল পেলবরূপে থাকিবে কেবল মাটি। ঐ মাটিই অহঙ্কারের এবং স্পর্দ্ধার চিহ্নগুলিকে স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে—এখনও তেমন অনেক দর্পের ভস্মস্তূপ বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গে এবং সর্ব্বত্র ঢাকা আছে। ঐ মাটির গুণে আজ বাঙ্গালা মরুভূমে পরিণত হয় নাই। ঐ মাটির স্তন্যপীযূষধারা শত ধারায় বিদূরিত হইয়া তোমাকে এখনও ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল দিতেছেন। এমন অক্ষয় ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার মাটিকে ঘরে তুলিয়া রাখ না? এই মাটি অমূল্য নিধি। এই মাটিতেই খোল হয়, যে খোলের চাঁটি শুনিলে এখনও বাঙ্গালী নাচিয়া উঠে। এই মাটিতে নিমাই ও নিতাইয়ের দিব্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, যাহাদের পুণ্য প্রভাবে আজও বাঙ্গালায় ভাবের তরঙ্গ উছলিয়া উথলিয়া উঠিতেছে। এই মাটিতেই দশভুজার প্রতিমা গড়িয়া বাঙ্গালী জীবন সার্থক কর! এক বার এই মা-টিকে মা-মা বলিয়া বাঙ্গালী একবার গড়াগড়ি দেও; তোমার দেহ পবিত্র হউক, তোমার মনুষ্যজন্ম সার্থক হউক।

মা-টি নিবি গো—বাঙ্গালার মাটি-হারা, মায়ের ছেলে, তোমরা যদি দেহ পবিত্র রাখিতে চাও, তৈজসপত্র পবিত্র রাখিতে চাও, পবিত্র অঙ্গনে

যদি গোপালদের লইয়া দেবতার খেলা খেলিতে চাও,—তবে মাটি লও। মেয়েদের প্রবচন আছে—কোলের ছেলে কোলন্যাংড়া, মাটির ছেলে সোনার চাঙ্গড়া। এ মাটিতে গড়াগড়ি দিলে সত্যই সোনার চাঙ্গড়া হওয়া যায়। এই মাটি মাখিয়া আমরা নীরোগ, এই মাটি হইতেই আমাদের সর্ব্বস্ব। যে দিন হইতে মাটি ছাড়িয়াছি, সেই দিন হইতে চিররোগা, দুঃখী হইয়াছি। যে দিন হইতে মাটি ভুলিয়াছি, সেই দিন হইতে মা-টির স্নেহ হারাইয়াছি। বাঙ্গালার মাটি অতি পবিত্র, তাই বাঙ্গালার মাটিতেই দেবপ্রতিমা নির্ম্মিত হয়। বঙ্গভূমি মৃন্ময়ী, তাই বাঙ্গালার সর্ব্বস্ব মৃন্ময়। এ মাটিতে কাঁকর নাই, পাথর নাই, কোনখানে কাঠিন্য নাই। এমন মাটি লইবে না? লও—লও, আমার সোনার মাটি, ক্ষীরের মাটি—লও, লও! দুধটুকু মারিয়া যেমন ক্ষীরটুকু হয়, ভারতের পীযুষধারাকে শুকাইয়া, গঙ্গার কটাহে নাড়িয়া বাঙ্গালার ক্ষীর মাটি হইয়াছে। এমন ক্ষীরের মাটিকে অবহেলা করিও না। বলিয়াছি ত, এ মাটি কেহ কাড়িয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। তুমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে, এ মাটি তোমারই থাকিবে, তোমারই আছে। যে মাটি ভগবানের চরণতাড়নায় দশ বার পবিত্রীকৃত, যে মাটি গঙ্গাজলে সদা সিক্ত, যে মাটির স্তরে স্তরে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত—লও, লও, সাধের মাটি, সোহাগের মাটি, আদরের মাটি, স্নেহের মাটি—লও, লও। মা-টির কোলে যাইলে, মাটিকে কোলে রাখিলে সকল পাপ-তাপ শীতল হইয়া যায়, সকল জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইয়া যায়, সকল অভাবের বিমোচন হয়। এমন কোমল মাটিকে ভুলিও না।

মাটি নিবি গো—সাবান-পমেটম ভুলিয়া—মাটি নিবি গো। বিদেশের প্রসাধন-উপাদানসকলকে মাটিতে ফেলিয়া মাটি নিবি গো। ইয়োরোপের পাউডার-ভস্ম ফুৎকারে উড়াইয়া—মাটি নিবি গো! এক বার দাঁড়াও, কোঠা-বালাখানা ত্যাগ করিয়া, মর্ম্মরকুটীরকে বর্জ্জন করিয়া, নগরের সৌধশুষ্কতাকে পরিহার করিয়া, নিত্য স্নিগ্ধ, নিত্য শ্যামল বাঙ্গালার মাটির উপর দাঁড়াও। মাটির উপর দাঁড়াইলেই মাটির আদর করিতে শিখিবে, তখন আমার মাটি-বেচা সার্থক হইবে। সর্ব্বস্বান্ত বাঙ্গালী, তোমার কেবল মাটিই ত আছে। মাটি আছে বলিয়াই তুমি এখনও বাঁচিয়া আছ; মাটি আছে বলিয়াই তোমার সোহাগের স্মৃতি আছে; মাটি

আছে বলিয়াই মা-টির ক্রোড়ের প্রচ্ছন্ন নিধি খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এমন দিনে মাটি গ্রহণ কর, সে মাটিতে আবার শিব গড়িয়া পূজা কর, তোমার অশেষ কল্যাণ হইবে।

—মাটি নিবি গো।—

('প্রবাহিনী,' ১৮ মাঘ ১৩২১)

সম্মেলনের সখ

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর হইতে, ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশে বহু জাতি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মেলনের একটা সখের ঢেউ উঠিয়াছে। সখ বলিলাম, কেন না, কংগ্রেসের নকলে নানা প্রকারের মহাসভার প্রতিষ্ঠা, প্রকৃত পক্ষে, কোন অভাবের প্রেরণায়, কোন সমবেদনার প্রণোদনে, হয় নাই, হইতেছেও না। তাই এই সকল মহাসভায় কেবল অর্থব্যয় হইতেছে, নানা দেশের ও জাতির সৌখিন পুরুষ একত্র হইতেছেন, নানা ঢঙের কথা কহিতেছেন, এবং ত্রিরাত্রি পরের অন্ন ধ্বংস করিয়া, যে যাহার নিজ নিজ নিকেতনে আবার ফিরিয়া যাইতেছেন। জাতির হিসাবে, সংহতি গঠনের হিসাবে, কোন কাজের মতন কাজ হইতেছে না। না হইবার বিশেষ হেতুও আছে। আগে সেই কথাটা খুলিয়া বলিব।

ইংরেজ-শাসনের মহিমা এই যে, ইংরেজ কোন সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করেন না; কোন ধর্ম্মের বা ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে কোন প্রকারের কঠোর ব্যবহার করেন না। ইংরেজের আমলে যাহা কিছু উৎপীড়ন হয়, তাহা ব্যক্তিগত হিসাবে। একটা পদস্থ কর্ম্মচারীর ভুলভ্রান্তিতে একটা লোকবিশেষের স্বার্থে আঘাত লাগিতে পারে। সে প্রকার উৎপীড়নের প্রতিষেধক ব্যবস্থাও অনেক রকমের আছে। যাহার সামর্থ্যে কুলায়, সে স্বীয় স্বার্থহানির জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। ফলে, এমন ব্যক্তিগত উৎপীড়নে সাক্ষাৎভাবে সমাজশরীরে কোন প্রকারের বেদনার অনুভূতি হয় না। সমাজশরীরে বেদনার বোধ না হইলে, সমাজের ব্যষ্টিসকল সে বেদনা দূর করিবার জন্য সম্মিলিত হইতে চাহেন না;—হইলেও তেমন সম্মেলনে কোন ফলোদয়

হয় না। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। যে জাতি পরাধীন ও পরাজিত হইয়াছে, সে জাতির সংহতি-শক্তির অপচয় ঘটিয়াছেই, সে জাতির ব্যষ্টি বা ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের চিন্তায় উন্মত্ত আছেই; নহিলে পরাধীনতা ও পরাজয় সে জাতির ভাগ্যে ঘটিত না। আমরা পরাজিত পরাধীন, আমাদের সংহতি-শক্তি বিপর্য্যস্ত, আমাদের সমাজের বহু ব্যক্তিই ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় নিজের নিজের মঙ্গল চিন্তায় ব্যস্ত। আমরা ইচ্ছা করিয়া কখনই সম্মিলিত হইতে চাহিব না—পারিবও না। তবে যে শিখ, মারহাট্টা প্রভৃতি জাতির উদ্ভব আমাদের মধ্যে হইয়াছে, তাহার কারণ মুসলমান বা মোগল বাদশাহগণ সাম্প্রদায়িকভাবে আমাদের উপর দীর্ঘকাল ধরিয়া উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। সেই উৎপীড়নের প্রতিবাদ-স্বরূপ দেশবিশেষে এক-একটা সংহতি-শক্তির বিকাশ হইয়াছে আর এক-একটা নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এ সংহতির বিকাশ ক্ষণিক এবং তৎকাল-উপযোগী। যাহা নিবারণের জন্য উহার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা কালপ্রভাবে অপসারিত হওয়ায় সে শক্তিও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; এখন আর শিখ-মারহাট্টার সে প্রভাব নাই।

তবুও কেন আমরা সম্মিলিত হইতে চাই? ইহা ইংরেজী-শিক্ষা জাত, এবং ইয়োরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ জন্য সখের গুণ। আমরা ইংরেজী লেখাপড়া আয়ত্ত করিয়া তিনটি নূতন কথা শিখিয়াছি—(ক) পেট্রিয়টিজম বা দেশাত্মবোধ, (খ) একতা বা সর্ব্বজাতিক সমন্বয়, (গ) নেশন বা জাতির সৃষ্টি। কথাগুলি শিখিয়াছি বটে, তোতা পাখীর মতন তাহার আবৃত্তি করি বটে, কিন্তু ইহার মর্ম্ম এবং মহিমা বুঝি নাই। দেশাত্মবোধের কথাটা যাহারা ঘন-ঘন বলিয়া থাকে, তাহাদের প্রায় ষোল আনা পুরুষই ইয়োরোপীয় সভ্যতার অনুচিকীর্ষু, ইয়োরোপীয় সমাজপদ্ধতির অনুরাগী। তাহাদের আকার-প্রকার দেখিয়া মনে হয় না যে, তাহারা দেশের কোন কিছু ভালবাসে, বা কোন কিছুর অনুরাগী। তাহাদের ভাষা ইংরেজী, ভাব ইংরেজী,—চলন-বলন, বসন-ভূষণ, আহার-ব্যবহার, হাবভাব, ঠাট-ঠমক সবই তাহাদের ইয়োরোপীয় ভাবে মাখা। অথচ তাহারা পেট্রিয়ট্, অথচ তাহারাই দেশোদ্ধারের জন্য সদা ব্যস্ত! এই বিপরীত ভাব সমাবেশের বিশ্লেষণ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, কোন বেদনা জন্য, কোন অসহ্য উৎপীড়ন অপসারণ উদ্দেশ্যে তাহারা পেট্রিয়ট্ সাজে নাই।

কেবল বিলাতী সখের পরিতুষ্টিই ইহার মূল; এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজার জাতি ইংরেজের প্রতি একটু চাপা বিদ্বেষের দুর্গন্ধও ইহার তলে পাওয়া যায়। মুসলমানের মতন ইংরেজ যদি বিলাতীবিলাসী, স্বেচ্ছাচারী ভারতবাসীকে রাজার জাতির দলভুক্ত করিয়া লইতেন, এবং উহাদিগকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে এই পেট্রিয়টিজম্ এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিত কি না সন্দেহ। ইংরেজ যে প্রজার শত চেষ্টা সত্বেও প্রজার জাতিকে রাজার সহিত সমান অধিকারে অধিকারী করিয়া সম্মিলিত হইতে দেন না, এই সামান্য সম্প্রদায়গত বিরোধের প্রতিবাদস্বরূপ কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র ব্রণ-সকলের অভ্যুদয় হইয়াছে। বাকী দুইটা কথা—Nation building বা জাতিসৃষ্টি এবং একতা,—ইহা সাফ তোতা পাখীর কথা; শুনিতে ভাল বলিতে ভাল বলিয়াই আমরা উহার আবৃত্তি করিয়া থাকি। উহার মহিমা বুঝি না এবং উহার জন্য সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির কতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহার পরিমাণও জানি না। অতএব বলিতে হয়, এই সকল কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্স, সভা-সম্মেলন, এ সকলই খোশখেয়ালের এবং সখের কাণ্ড; ইহাদের সহায়তায় সমাজের কোন বড় কাজ হইবার নহে। দেশীয় রুচি যখন প্রবল ছিল, তখন আমরা বারোইয়ারী পূজা করিতাম, মেলা বসাইতাম, মহোৎসব বা মোচ্ছব করিতাম; একালে ইংরেজী শিখিয়া, ইয়োরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ করিয়া আমরা কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্স করিতেছি, বৈদ্য-সম্মেলন, ব্রাহ্মণ-মহাসভা, সাহিত্য-সম্মেলন ঘটাইতেছি, এবং প্রদর্শনীর জাঁক বাড়াইতেছি। কালভেদে রুচির প্রভেদে ঘটিয়াছে মাত্র, আসলে ব্যাপারটা একই রকমের আছে।

সখের ব্যাপার বলিয়াই এ সকল কাণ্ডে যাহারা সৌখিন পাণ্ডা, তাহাদেরই কিছু কালের জন্য নামডাক হয়। যাহারা জোগাড়ে, অথবা একটা কোন বিলাতী গুণবিশিষ্ট, বা ধনশালী, তাহারাই এই সম্মেলনে সখের নেতা বা পরিচালক হইয়া উঠে। সখের কাণ্ড বলিয়াই উহাদের বাহ্য চাক্‌চিক্য খুব, ধুমধাম খুব, বাহার খুব। আর যাহারা সৌখিন, হুজুগ চাহে, বাজে প্রশংসার সোহাগ চাহে, অথবা এই হুজুগে নাড়ু নাড়িলেই গুঁড়া পড়িবে জানিয়া গুঁড়া সঞ্চয় করিতে চাহে, তাহারাই এই ব্যাপারে আসিয়া সম্মিলিত হয়। আর আসে তাহারা, যাহারা মুগ্ধ

যা বিমূঢ়, যাহারা সত্যই ভাবে যে, এই সব বারোইয়ারির কাণ্ড হইতেই সমাজের কল্যাণ সম্ভাবনা আছে। যত দিন মোহটা থাকে তত দিন ইহারা দলভুক্ত থাকে; পরে সংসারের কটাহে পড়িয়া পেটের এবং বিলাসের দায়ে ইহারা যখন দশ দিক্ অন্ধকারময় দেখিতে থাকে, তখন হা টাকা হা টাকা করিতে করিতে ইহারা দল ছাড়িয়া স্বতন্ত্র হয়। কেবল আটার মতন তাঁহারাই ল্যাপ্‌টাইয়া থাকেন, যাঁহারা ইহা হইতে লাভবান হন,—ইহাই যাঁহাদের ব্যবসায়—উপজীবিকা।

কিন্তু সাহিত্য সখের সামগ্রী; কাব্যামোদ সাধের বিষয়। প্রাণে সখ না থাকিলে, হৃদয়ে আবেগ না থাকিলে, প্রতিভার উন্মেষ না হইলে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। কাজেই খাঁটি সাহিত্যের উন্নতি ঘটাইতে হইলে সখের সম্মেলন করিলে অনেকটা উপকার হইতে পারে। পরন্তু এ সখ ধাতুগত হওয়া প্রয়োজন; এ সখের জন্য একটু প্রমত্ত—একটু পাগল হইতে হইবে, তবে সাহিত্যের পাগলের মেলা হইতে সুফল লাভ হইতে পারে। আর একটা কথা, যে সাহিত্য রচিবে, সে সাহিত্য দেশের রুচি, প্রকৃতি এবং ধাতুর অনুকূল হওয়া প্রয়োজন, তবে সে সাহিত্যের আলোচনায় দেশের লোকে মাতিয়া উঠিতে পারে। আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্য সখের সামগ্রী হইলেও, অনেকটা ইংরেজী সখ হইতেই উহা উৎপন্ন। অনুচিকীর্ষার বশে আমরা যেমন বাহ্যিক আকার-প্রকারে ইংরেজ সাজিয়াছি, তেমনই কাব্যগাথা রচনাতেও আমরা ইংরেজী অনুকরণ করিয়াছি। আমাদের মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গালার মিল্টন, আমাদের হেমচন্দ্র বাঙ্গালার পিণ্ডার, নবীনচন্দ্র বাঙ্গালার বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ শেলী, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার স্যর ওয়াল্টার স্কট। আমরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার সম্যক্ রসাস্বাদন একটু ইংরেজীনবীস না হইলে সম্ভবপর নহে। ইংরেজী শিক্ষার অতি-প্রচারের প্রভাবে, ইংরেজী ভাব সমাজে অনেকটা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাই এখন কিছু অধিক-সংখ্যক বাঙ্গালী বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্যের কতকটা রসাস্বাদন করিতে পারিতেছেন। কিন্তু সে রসাস্বাদন উচ্চাঙ্গের নহে; ডিটেক্‌টিভ গল্প, আদিরসপ্রধান উপন্যাস এবং চুটকি গল্পের উপভোগেই সে আস্বাদনের পর্য্যাবসান হয়। ফলে, আমাদের প্রত্নতত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতন অনেকের রুচিকর হয় না, আমাদের কাব্যগুচ্ছ দুর্ব্বোধ্যহেতু অনেকের

পাঠ্য নহে; আমাদের সন্দর্ভ-নিবন্ধসকলও তদ্বৎ পরিহার্য্য। খবরের কাগজে চটকদার লেখা না হইলে তাহা বিকায় না, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না; মাসিক পত্রে চুটকি গল্পের এবং বিচিত্র চিত্রাঙ্কনে আদিরস গড়াইয়া না পড়িলে তাহা তেমন রোচক হয় না। সুতরাং বলিতে হয় যে, আমাদের এ সখের সাহিত্য আপাততঃ দেশের হীন সখের পুষ্টি করিতেছে। তবুও বলিব যে, এ হেন বারমুখী সাহিত্যের মঙ্গল কামনা করিয়া সখের সম্মেলনেও কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে। কারণ, সাহিত্য-সম্মেলনে দেশের গোটাকয়েক খাঁটি লোককে পাওয়া যায়; তাহারা মনের কথা ব্যক্ত করিতে দেশের খাঁটি ভাষার ব্যবহার করে; তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিলে আমাদের ইংরেজী গিল্টি করা প্রাণেও দেশীয় ভাব জাগিয়া উঠে।

এই সঙ্গে আরও একটা কথা বলিব। কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্স যে উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে, সে উদ্দেশ্য ক্ষণস্থায়ী, সে উদ্দেশ্য অন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ পক্ষে অন্যের কৃপার আবশ্যক হয়। আমাদের বর্ত্তমান কালের সাহিত্য ইংরেজী ছাঁচে ঢালা হইলেও, তাহা দেশের সামগ্রী, দেশে থাকিবে, এ দেশ হইতে কেহ কাড়িয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। সে সাহিত্যের উন্নতি অবনতি অন্যের কৃপার অপেক্ষা করে না; আমরা ইচ্ছা করিলে সে সাহিত্য উন্নত হইতে পারে, আমরা হীন হইলে সে সাহিত্য হীন হইতে পারে। এ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কাহারও দ্বারে ভিখারী সাজিয়া যাইতে হইবে না। আমাদের ঘরে ক্ষুদ-কুঁড়া লইয়া আমরা উহাকে সাজাইতে পারি। কাজেই সখের হিসাবে বল, খোশখেয়ালের হিসাবেই বল, বারোইয়ারির ভঙ্গী অনুকরণের হিসাবেই বল,—যে হিসাবে সাহিত্য-সম্মেলন হউক না কেন, উহার দ্বারা একটু না একটু উপকার সাধিত হইবেই। রাজনীতির দৃষ্টিতে সংহতি-সাধনের উদ্দেশ্যে আমরা ত এ সম্মেলন ঘটাই না, একটা কোন গৌণ উদ্দেশ্য সাধন জন্য আমরা এ সম্মেলনে যাই না। আমরা যাই কেবল আমাদের জন্য, দশ জনে দশ রকম মালা গাঁথিয়া দশ জনকে দেখাইবার জন্য। ইহাতে সুখ আছে, তৃপ্তি আছে, তুষ্টি আছে; ইহাতে উৎসব আছে, উল্লাস আছে, রঙ্গ আছে, ইহাতে মেলামেশা আছে, হাসিতামাশা আছে, আমোদ-প্রমোদ আছে।

অতএব আমরা উত্তরবঙ্গের সাহিত্য সম্মেলনের কথাটা সানন্দে প্রচার করিতেছি। আমাদের প্রিয়সুহৃদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী যে সম্মেলনের সভাপতি হইবেন, তজ্জন্য আমরা আরও সুখী। দোলের সময়ে সাহিত্যের হিন্দোলে প্রমথনাথকে বসাইয়া ভাগ্যে থাকে যদি, আমরা আমোদ করিব; তাঁহাকে অনুরাগের আবীর মাখাইয়া আমরা মজা দেখিব। কবিমিত্রগণ কাব্যের পিচ্‌কারি চালাইয়া তাঁহাকে লালে লাল করিয়া দিবেন। আমরা পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-সম্মেলনের দিন আজ হইতে গণিতে থাকিব। ('প্রবাহিণী,' ১৮ মাঘ ১৩২১)

শুকদেব

পুরাণে শুকদেবের আসন অতি উচ্চে রক্ষিত হইয়াছে। শুকদেবকে বেদব্যাসের অপেক্ষা উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ কি? শুকদেব আজন্ম ব্রহ্মচারী, সিদ্ধ সাধক, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ। কিন্তু এমন ব্রহ্মচর্য্য, এমন সাধনা, এমন সর্ব্বজ্ঞতা অন্যান্য ঋষি মুনিতেও আরোপ করা হইয়াছে। তবে শুকদেবের প্রাধান্য কিসে? শুকদেব সর্ব্বজ্ঞ এবং চিরযুবক; যৌবনের সঙ্গে জ্ঞান, যৌবনের সঙ্গে সর্ব্বজ্ঞতা, যৌবনের সঙ্গে অভিজ্ঞতা—এমন অঘটন ঘটনা কখনও কোন মনুষ্যে হয় না, হইতে পারে না। যাহা হয় না, হইতে পারে না, তাহাই শুকদেবে ঘটিয়াছিল; এই জন্যই শুকদেবের এতটা মহিমা; তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের অবতার বলিয়া মান্য করা হইয়াছে। শুকদেব জ্ঞানী যুবক, শুকদেব স্বয়ংসিদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, অথচ তিনি সদাই নবযৌবনের আগ্রহ সমন্বিত। সর্ব্ব সিদ্ধির সহিত যৌবনের উল্লাস প্রায়ই দেখা যায় না।

এখন বুঝিতে হইবে যৌবনটা কি? যখন দেহের সকল শক্তি নবভাবে প্রস্ফুরিত, যখন সকল আসক্তি জীবনের নবীনতার আস্বাদনে উন্মত্ত, যখন অনুভূতি অনাস্বাদিত বিষয়ের আস্বাদনে প্রমত্ত, তখনই জীবদেহে যৌবনের লেখা পরিস্ফুট হয়। কেবল ইহাই নহে। যৌবন দেহের সেই অবস্থা, যখন জীব এক হইতে বহুতে বিসর্পিত হইতে চাহে; নিজেকে নিত্য নূতন ভাবে সৃষ্ট করিয়া সৃষ্টির নবীনতায় আত্মাকে বিলাইয়া দিবার

চেষ্টাই যৌবন। যৌবনে দেহের সকল শক্তিই অক্ষুণ্ণ;—অনপচিত। এই অক্ষুণ্ণ, অনপচিত শক্তি কিন্তু অন্ধ। তাহার পক্ষে জগতের সর্ব্বস্ব নূতন, সকল রকমের বিকাশ নবীন। ভাল মন্দের বিচার না করিয়া, উপযোগী-অনুপযোগীর বিশ্লেষণ না করিয়া যৌবন নূতন কিছু পাইলেই তাহাকে আলিঙ্গন করিতে চাহে। তাই যৌবনশক্তি অন্ধ, সদা নবভাব-মুগ্ধ বলিয়া অন্ধ, ফলাফলের বিচারহীন বলিয়া অন্ধ। কোন্ কার্য্যের কি পরিণাম, কোন্ কার্য্য করিলে কেমন ফল হইবে, ইহা যিনি বুঝিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত চক্ষুষ্মান্। যৌবন কাহাকেও ফলাফলের বিচার করিবার অবসর দেয় না, যাহা নূতন, যাহা অপরিজ্ঞাত বা অনাস্বাদিত তাহাতেই যাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে। শেষে ঠেকিয়া-ঠকিয়া, দুঃখ পাইয়া তবে জ্ঞানোদয় হয়। যখন জ্ঞানোদয় হয় তখন যৌবন থাকে না। ভূয়োদর্শন না হইলে জ্ঞানোদয় হয় না; ভূয়োদর্শন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করিতে করিতে যৌবনের প্রবাহও শুকাইয়া যায়, সে বেগ মন্থর হইয়া যায়। এই হেতু চক্ষুষ্মান্ হইতে হইলে যৌবনকে অপচয় করিতেই হয়। আমাদের সকলেরই প্রৌঢ়তার গোড়ায় বা বার্দ্ধক্যের সূচনাকালে মনে হয়, ক্ষোভ এবং পশ্চাত্তাপের সহিত মনে হয়, হায় রে, এই জ্ঞান, এই অভিজ্ঞতা যদি যৌবনকালে থাকিত, তাহা হইলে জীবনটা অন্য রকমের হইতে পারিত। বাস্তবিক প্রৌঢ়ের বিচারশীলতা এবং যৌবনের শক্তি সামর্থ্য সম্মিলিত হইলে একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিয়া যায়। শুকদেবে এই অপূর্ব্ব ভাবের সম্মেলন হইয়াছিল। শুকদেব ব্যাস বশিষ্ঠ, পরাশর দুর্ব্বাসার মত সিদ্ধ সাধক, সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, ত্রিকালজ্ঞ, অথচ শুকদেব নবীন যুবক, সদাই ষোল বছরের ছেলেটি হইয়া আছেন। এই হেতু তিনি ব্যাস বশিষ্ঠ অপেক্ষা উচ্চ পদবীর পুরুষ—শ্রীভগবানের অবতার, সাক্ষাৎ নারায়ণ-স্বরূপ।

শুকদেবের চরিত্র অপূর্ব্ব। তাঁহার অক্ষয় যৌবন, অক্ষয় যৌবনের অক্ষয় সৌন্দর্য্য;—দেহ সদা রসে ঢল-ঢল করিতেছে, অন্ধ যৌবনশক্তি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে সুষমা ঢালিয়া দিয়াছে। অথচ তিনি মহা জ্ঞানী পুরুষ, ঠেকিয়া-ঠকিয়া যৌবনের সুখদুঃখ না বুঝিয়া তিনি সংযমী, ব্রহ্মচারী। সৌন্দর্য্য উপভোগের সামর্থ্য তাঁহাতে অপর্য্যাপ্ত আছে, বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্যের অনুভূতি তিনি পলে পলে করিতেছেন; তথাপি তিনি সংযমী।

সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অসংযমী, সিদ্ধসাধক বলিয়া সংযমী। এই বিশিষ্টতাটুকু শুকদেবে আছে বলিয়া তিনি আমাদের পুরাণ সাহিত্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সভ্য জগতের অন্য কোন দেশের সাহিত্যে এমন আদর্শ-চরিত্রের পরিকল্পনা হয় নাই, হইবার নহে। এমন সজ্ঞান এবং অজ্ঞান শক্তির সমাবেশ একই সময়ে এক দেহেতে সম্ভবপর নহে বলিয়াই শুকদেবের এত আদর! ব্যষ্টির ধর্ম্ম জাতিতে প্রকট হয়। ব্যষ্টির যৌবনের যেমন লক্ষণ, জাতির যৌবনের তেমনই লক্ষণ। আমরা পতিত পরাধীন বৃদ্ধ হিন্দু জাতি, আমরা বুঝিতেছি কি করিলে কি হইত—কেন এমন হইল। কিন্তু আমাদের যৌবনকালে এ বোধটা হয় নাই। পুরাণ ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে-জাতির আদর্শ শুকদেবের মতন হইবে, সে জাতিকে জরা এবং মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইতে হইবে না। আমরা শুকদেবের পূজা করিলে, শুকদেবের আদর্শে জাতির জীবনকে প্রণালীকৃত রাখিতে পারিলে, আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ থাকিবেই।

শুকদেবের জন্মকথাও অপূর্ব্ব। সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন, সর্ব্বসিদ্ধিসমন্বিত বেদব্যাস তাঁহার জনক। পিতার সকল শক্তি, সকল বিশিষ্টতা তাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাতৃগর্ভে ষোড়শ বৎসরকাল থাকিয়া, মাতৃস্নেহের পীযূষধারায় ষোড়শ বৎসরকাল পরিপুষ্ট হইয়া তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হন। মাতার কোমলতার প্রভাবে তিনি স্থিরযৌবন এবং অপাপবিদ্ধ পুরুষ। জননীর ক্রোড়ে তিনি দীর্ঘকাল সুরক্ষিত ছিলেন বলিয়া শুকদেব ভক্তিধর্ম্মের প্রচারক—ভাগবতের ব্যাখ্যাতা। জল অতি কোমল; কিন্তু সলিল দুর্দ্দমনীয়; উহাকে চাপিয়া কেহ ছোট করিতে পারে না। তরল পদার্থকে কঠিন করিলে উহার পরিসর সঙ্কুচিত হইয়া যায়; এক কড়া দুগ্ধ মারিয়া একটা ডেলা ক্ষীরে পরিণত হয়। কিন্তু জল জমিলে—বরফ হইলে উহার প্রসার বর্দ্ধিত হয়, অগ্নিতাপে উহার বিস্তার আরও বাড়িয়া যায়। জননীর ক্রোড় হইতে নির্গত শুকদেব ভাবের সাগর—ভক্তির পবিত্র জলবিস্তার। তাই যৌবনের শক্তি তাঁহাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই, জ্ঞানের স্থবিরতায় তিনি ক্ষুদ্রায়তন হন নাই, পুরুষকারের উত্তাপে তিনি ক্ষীরের ডেলার মতন ছোট্ট হইয়া যান নাই। তিনি যে ভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অক্ষয়-অমর-অজর-অচ্যুত রূপে সেই ভাবেই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। জ্ঞান ও স্নেহের, ভাব ও

বিভূতির, রসের ও কর্ম্মের এমন অপূর্ব্ব সম্মেলন জন্যই শুকদেবের অসাধারণতা। শুকদেব জীবদেহ ধারণ করিয়াও দেববিজয়ী, শরীরী হইয়াও অশরীরী, জ্ঞানী হইয়াও যুবক। পুরাণভরা বৃদ্ধ ঋষিমুনির দলের মধ্যে একা শুকদেবই যুবক। শুকদেব অনুশীলনের প্রতিমূর্ত্তি, শিক্ষা বা cultureএর সাকার দেবতা; শুকদেব আদর্শ মনুষ্য—মানবতার প্রতিমা। শুকদেব দেশ-কাল-পাত্রের অতীত, প্রতিবেশ-প্রভাবের অপর পারে অবস্থিত। উহাতে জন্ম-জরা-মৃত্যু নাই, নিত্য নূতন জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নব নব ভাবের বিকাশ নাই, উহাতে পরিবর্ত্তন নাই, পরিত্যাগ নাই; তিনি নিত্য পূর্ণ, নিত্য সিদ্ধ। রাজর্ষি জনকের কাছে যাইয়া তিনি স্বীয় নিত্যত্বের এবং লব্ধ সিদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজর্ষি জনক বুঝিয়াছিলেন যে, এমন মহাপুরুষকে শিখাইবার কিছু নাই, একটু বিক্ষুব্ধ করিয়া উহার ভাব ফুটাইয়া দিলেই কাজ হইবে। শুকদেব স্থিরযৌবন পুরুষ হইলেও, তাঁহাতে বহির্মুখী শক্তির প্রভাব ছিল না, তিনি আত্মস্থ এবং স্বতন্ত্র। তবে যৌবনের ঢলঢল ভাব ত যাইবার নহে, সেই ভাবের উপর একটা বিরোধী ভাবের কাজ হইলেও তরঙ্গ উঠিবেই। রাজর্ষি জনকের মুখে পুরাণকার শুকদেব-চরিত্রের কেবল এইটুকু বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

বহু স্থানে বলিয়াছি; এবং আবার বলিতেছি, আমাদের পুরাণসকলকে কেবল আষাঢ়ে গল্পের ঝুড়ি বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। উহার মধ্যে বড় বড় গজমুক্তার ন্যায় বড় বড় চরিত্র ফুটিয়া আছে; তেমন পৃথিবী খুঁজিয়াও আর কোথাও পাইবে না। পুরাণকে ভাবের দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। পুরাণের কোন উক্তিই ব্যর্থ নহে; সকল উক্তি, উপাখ্যান এবং আখ্যায়িকার মধ্যে এক একটা অপূর্ব্ব ভাব লুকান আছে। সে লুকান নিধি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়, হৃদয় ভাবরসে ভরিয়া উঠে। যে পদ্ধতিতে শুকদেব-চরিত্র বুঝিতে হইবে, ইঙ্গিতে তাহার একটু বলিয়া রাখিলাম। যাঁহারা পুরাণ পাঠ করেন, তাঁহারা পদে পদে উদাহরণ পাইলে ভাবটাকে ষোল আনা ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন। শুকদেব পুরাণের মধ্যচিত্র—অতুলনীয়, অনুপম এবং অদ্বিতীয়। পুত্র শুকদেবের জন্য ব্যাসের মহিমা কোটি গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। যেমন ভগবান্ রামকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য স্বামী বিবেকানন্দে প্রকট,

তেমনি দ্বৈপায়ন ব্যাসের মাহাত্ম্য ও দেবত্ব শুকদেবে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। শুকদেব-চরিত্র ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে পুরাণের অর্দ্ধেকটা বুঝা হইবে। শুকদেব বৈষ্ণব পুরাণসকলের মহাপ্রাণ—শক্তি, প্রতিভা এবং রূপ। শুকদেব-চরিত্রের পূর্ণ বিশ্লেষণের এখনও সময় হয় নাই। সিদ্ধ সাধকের ইঙ্গিত পাঠকগণকে উপঢৌকন দিলাম, যাঁহার সুকৃতি থাকিবে, তিনি এই পথে চলিলে পরমানন্দধামে উপনীত হইতে পারিবেন। ('প্রবাহিণী,' ২৫ মাঘ ১৩২১)

শিবরাত্রি

"ধরাপোঽগ্নিমরুদ্ব্যোমমখেশেন্দ্বর্কমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বভূতান্তরস্থায় শঙ্করায় নমো নমঃ॥
শ্রুত্যন্তঃ কৃতবাসায় শ্রুতয়ে শ্রুতজাত্মনে।
অতীন্দ্রিয়ায় মহসে শাশ্বতায় নমো নমঃ॥
স্থূলসূক্ষ্মবিভাগাভ্যামনির্দ্দেশায় শম্ভবে।
ভবায় ভবভূতায় দুঃখহন্ত্রে নমোঽস্তুতে॥
তর্কমার্গাদিভূতায় তপসাং ফলদায়িনে।
চতুর্ব্বর্গবদান্যায় সর্ব্বজ্ঞায় নমো নমঃ॥
আদিমধ্যান্ত-শূন্যায় নিরস্তাশেষভীতয়ে।
যোগিধ্যেয়ায় মহতে নির্গুণায় নমো নমঃ॥
বিশ্বাত্মনেঽবিচিন্ত্যায় বিলসচ্চন্দ্রমৌলয়ে।
কন্দর্প-দর্পনাশায় কালহন্ত্রে নমোঽস্তুতে॥
বিষাশনায় বিহরদ্বৃষস্কন্ধমুপেয়ুষে।
সরিদ্ধামসমাবদ্ধকপর্দ্দায় নমো নমঃ॥
তুষ্টায় নিজভক্তানাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে।
বিবাসসে নিবাসায় বিশ্বশাস্ত্রে নমো নমঃ॥
ত্রিমূর্ত্তের্ম্মূলভূতায় ত্রিনেত্রায়াদিসম্ভবে।
ত্রিধাম্নাং ধামরূপায় জন্মঘ্নায় নমো নমঃ॥

"যিনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যজ্ঞ, ঈশান, চন্দ্র ও সূর্য্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূত; যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অন্তরাত্মস্বরূপ বিরাজমান, সেই শঙ্কর দেবকে নমস্কার। যিনি শ্রুতিপ্রতিপাদ্য, যিনি শ্রুতিস্বরূপ, যাঁহার নানা মূর্ত্তিতে আবির্ভাব কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, যিনি ইন্দ্রিয়ের অগম্য বস্তু, যিনি প্রকাশস্বরূপ, সেই নিত্য শঙ্কর দেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যাঁহাকে স্থূল বা সূক্ষ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, যিনি জগতের মঙ্গলকারী, যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দুঃখহারী শঙ্কর দেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যিনি তর্কশাস্ত্রের আদি প্রবর্ত্তক, যিনি তপস্যার ফল প্রদান করিয়া থাকেন, যিনি চতুর্ব্বর্গ প্রদানে সমর্থ, সেই সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর দেবকে নমস্কার। যাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, যাঁহার শরণ লইলে অশেষ ভীতি নিবারিত হয়, যোগিগণ যাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই মহান্ নির্গুণ শিবকে প্রণাম। যিনি বিশ্বাত্মা, যাঁহার কোন প্রকার চিন্তা নাই, যাঁহার মৌলিদেশে চন্দ্র বিরাজমান, যিনি কন্দর্পের দর্প বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি কালভয়নিবারক, সেই শিবকে নমস্কার। যিনি বিষ পান করিয়াছিলেন, যিনি বৃষস্কন্ধাধিরূঢ়, যাঁহার জটাকলাপে গঙ্গা বাস করেন, সেই শঙ্কর দেবকে নমস্কার। যিনি মায়াতীত, যিনি বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির অন্তরাত্মরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, যিনি ত্রিপুরান্তক এবং পরিপূর্ণ মূর্ত্তি, সেই পবিত্রনামা শঙ্করকে নমস্কার। যিনি নিজ ভক্তগণের প্রতি সর্ব্বদা পরিতুষ্ট, এবং তাহাদিগের ভোগ-মোক্ষপ্রদ, যিনি দিগম্বর, যিনি বিশ্বস্বরূপ ভবনে বসতি করেন, সেই শিবকে নমস্কার। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই ত্রিমূর্ত্তির মূল কারণ, যিনি ত্রিনয়ন এবং আদিভূত, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোক অবস্থিত, যিনি সাধকের জন্মনিবারক, সেই শঙ্করকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।"

আবার শিবচতুর্দ্দশী আসিল এবং গেল। এই বসন্তে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে শিবের পূজা করিতে হয়। দিনের বেলায় পূজা নহে, পুরা রকমের নৈশ পূজা। রাত্রিকালের চারি প্রহরে চারিটা শিব গড়াইয়া পূজা করিতে হয়; সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত পূজা করিতে হয়। পূজার প্রধান অঙ্গ নিরম্বু উপবাস এবং রাত্রিজাগরণ। যখন নৈশ পূজা এবং কৃষ্ণপক্ষের পূজা তখন বলিতেই হইবে ইহা তান্ত্রিকী পূজা। যখন সর্ব্ব জাতির, নরনারীনির্ব্বিশেষে, পূজার ব্যবস্থা আছে, তখন বলিতেই

হইবে ইহা তান্ত্রিকী পূজা। শিবপূজায় কেহই অনধিকারী নাই; আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সর্ব্বজাতির এবং সর্ব্ববর্ণের এ পূজায় সমান অধিকার আছে। শিবের প্রতীক, শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিবার সকলেরই সমান অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল পাশাপাশি বসিয়া শিবপূজা করিতে পারেন; ধনী দরিদ্র সম্রাট্ এবং পথের ভিখারী পাশাপাশি বসিয়া শিবপূজা করিবে। শিবমন্দিরে লজ্জা করিতে নাই; অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া কুললক্ষ্মী শিবপূজা করিবেন। সাধারণতঃ শিবপূজায় মন্ত্র নাই, পদ্ধতি নাই; ব্যোম্ ব্যোম্ বম্ বম্ মহাদেব বলিয়া শিবের মাথায় গঙ্গাজল ঢালিলেই, সচন্দন বিল্বপত্র অর্পণ করিলেই শিবের পূজা করা হইবে। অর্থাৎ শিবের পূজায় কোন একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে নিজের তৃপ্তির জন্য একটা পদ্ধতিক্রমে শিবপূজা করিতে পারেন, ভূতশুদ্ধি আসনশুদ্ধি করিয়া মন্ত্রের সাহায্যে শিবপূজা করিতে পারেন, আর মূর্খ অন্ত্যজ জাতির কেহ বিনা মন্ত্রে, কেবল বম্ মহাদেব বলিয়া সেই শিবের মাথায় জল ঢালিলে তাহার পূজার ফল ঠিক তেমনই হইবে। শিবপূজায় পুরোহিত নাই, গুরু নাই, মন্ত্র নাই, মন্ত্রজপ নাই; আছে কেবল পূজকের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা। এমন উদার, সর্ব্বজনীন পূজা কোন দেশের কোন ধর্ম্মে নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

কেন এমন হইল? শিবপূজায় এত উদারতা শাস্ত্র দেখাইলেন কেন? উত্তরে বলিতে হইবে যে, শিব যে আমি—আমিই যে শিব। যত জীব তত শিব। আমি পণ্ডিত হই, মূর্খ হই, ব্রাহ্মণ হই, চণ্ডাল হই, হিন্দু হই, মুসলমান হই—আমি যাহাই এবং যেমনই হই না কেন, আমার তিনি আমারই মতন হইবেন। শিবপূজায় শিবের ধ্যান করিবার সময়ে নিজের মাথায় ফুল দিয়া নিজেকে নিজে দেখিতে হয়। আরও একটা কথা আছে। শিব প্রধানতঃ সংহারমূর্ত্তি; তাঁহাতে বিশ্বসৃষ্টি সংহৃত হয়, তাঁহাতে সর্ব্বস্ব সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বস্বের পরিণাম। পরিণতির স্থান সকলের পক্ষে সমান। শ্মশানে বা গোরস্থানে রাজাপ্রজা, পণ্ডিতমূর্খ, ব্রাহ্মণশূদ্র সবাই সমান। কেন না, দেহী মাত্রেরই পক্ষে একই রকমের পরিণতি; পরিণাম সম্বন্ধে দেহের বাছবিচার নাই; রাজার দেহের যেমন পরিণাম হইবে, প্রজার দেহের তেমনই পরিণাম হইবে। সুতরাং পরিণতির দেবতা, শ্মশানের ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সবই সমান; তাঁহার কাছে

জাতিবিচার নাই, উচ্চনীচ নাই, নরনারী নাই, ধনীদরিদ্র নাই। যেমন শ্মশানে সব এক, তেমনই শ্মশানের ঈশ্বরের কাছেও সব এক। পক্ষান্তরে নারায়ণ পালনকর্ত্তা—রক্ষাকর্ত্তা; তাঁহাকে সমাজ রক্ষা করিতে হইবে, বর্ণবিভাগ বজায় রাখিতে হইবে, অধিকার অনুসারে যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহাই দিতে হইবে; তাই নারায়ণের—বিষ্ণুর পূজায় কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার আছে, সে পূজায় একটি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি আছে; নারায়ণের বিগ্রহ স্পর্শ করিবার অধিকার সকল জাতির নাই। আরও একটা মজার কথা আছে। শিবের পূজায় শিবের প্রসাদ খাইবার ব্যবস্থা নাই; শিবকে ভোগ দিতে নাই; পঞ্চাশ ব্যঞ্জনসহ অন্নভোগ দিতে নাই, দিলেও তাহা কাহাকেও খাইতে নাই। যিনি শ্মশানের দেবতা, তাঁহার ত ভুক্তাবশিষ্ট কিছু থাকিবার কথা নহে, কেন না, তাঁহাতে যে সর্ব্বস্ব যাইয়া সংহৃত হইতেছে, তাঁহা ছাড়া কিছু নাই, তাঁহার অতীত কিছু থাকিতে পারে না। যিনি সংহারের দেবতা, তাঁহার আবার প্রসাদ কি? যিনি রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, তাঁহারই ভোগরাগ প্রসাদ সম্ভবপর; কারণ তিনি যে সকলকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। আর শিব সকলকে আত্মসাৎ করিবেন; শিবোঽহম্ বলিতে পারিলেই শিবপূজা সার্থক হইল।

আমাদের কোন দেবতারই, কোন ধ্যানগম্য ইষ্ট দেবতারই একটা স্বতন্ত্র রূপ নাই। যে দেবতা যে গুণোপেত, যাহা হইতে যে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিতে চাহি, তাঁহার রূপও সেই গুণ বা ঐশ্বর্য্যের অনুকূল হইবে। শিব যখন 'আমি আছি' এই জ্ঞানের দ্যোতক, অখণ্ড দণ্ডায়মান কালস্বরূপ, তখন তাঁহার প্রতীক শিবলিঙ্গ; রূপ নাই, দেহ নাই, নেত্রবক্ত্র নাই, ভাব ভঙ্গী নাই, প্রবৃত্তি প্রকৃতি নাই—আছে কেবল অস্তিত্বের জ্ঞাপক একটা প্রতীক—একটা চিহ্ন। সে চিহ্ন কিসের? সৃষ্টির গূঢ় রহস্যের; এই গূঢ় রহস্য যাঁহাতে সম্পুটিত তিনিই অনাদিলিঙ্গ মহাদেব। শিব যখন সংহারমূর্ত্তি রুদ্র, তখন তাঁহাতে কেবল সংহৃতিরই বিকাশ দেখান হইয়া থাকে। আমাদের মূর্ত্তিপূজা ভাবের মানচিত্রের পূজা মাত্র। শিবের ধ্যান আর কিছুই নহে, হৃদয়পটে শিবভাবের মানচিত্র লেখা মাত্র। সেই মানচিত্র যাহার হৃদয়ে যত ক্ষণ অঙ্কিত থাকে, তাহার জীবন তত ক্ষণ ধন্য হয়। প্রথমে স্তবস্তুতি, অর্থাৎ Word painting, শব্দের সাহায্যে ভাবের আলেখ্য নিরূপণ চেষ্টা মাত্র; তাহার পরে ধ্যান, অর্থাৎ শব্দ-

আলেখ্য অনুসারে মানসপটে ভাবগত রূপের নিরূপণ। সেই রূপ স্থির হইলে, মনে গাঁথিয়া গেলে তাহারই প্রতিমা গড়িয়া বাহিরের দশ জনকে দেখাইতে হয়। সাধারণ লোকে সেই রূপ দেখিয়া উহাকে মনে মনে গাঁথিবার চেষ্টা করে; বাহিরের পট মনে গাঁথিয়া বসিলে, তখন স্তবস্তুতির নিকষে সেই ধ্যানগম্য মূর্ত্তিকে কষিয়া লইতে হয়। এই চেষ্টার ফলে, সাধারণ সাধকের মনে ভাবোদয় হইতে পারে,—হইয়াও থাকে। এই ভাবোদয়ের সহায়তা করিবার জন্যই প্রতিমা-পূজা প্রবর্ত্তিত। গত বর্ষে এই শিবরাত্রি উপলক্ষে শিবধ্যানের ভাবার্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; এবার আর তাহার পুনরুক্তি করিব না। কেবল এইটুকু মনে রাখিলেই হইবে যে, সাধনপদ্ধতি নির্দ্দেশ বিষয়ে শাস্ত্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কোনটাই বাজে নহে—নিরর্থক নহে। আমাদের সাধনশাস্ত্র ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা পূরণের পদ্ধতি অনুসারে লিখিত; গোড়ায় আবৃত্তি—সিদ্ধান্তের আবৃত্তি, পরে সেই সিদ্ধান্ত বুঝাইবার জন্য রেখাঙ্কিত চিত্রের লিখন, শেষে সেই চিত্র দেখাইয়া সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যান ও উন্মেষ। সাধন-জ্যামিতি বুঝিতে এবং বুঝাইতে জানি না, সে বিদ্যা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই এত গোল ঠেকে এবং শাস্ত্র লইয়া এত বিতণ্ডা, এমন অসংখ্য মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

বসন্তকালে শিবচতুর্দ্দশী কেন? সৃষ্টির স্ফুরণকালে, যখন দ্বৈতভাবের প্রবল প্রকাশ আরব্ধ হইয়াছে, তখন অদ্বৈততত্ত্বামৃত বুঝাইবার জন্য, ঘোরনিশায় চৌকি হাঁকার মতন, গৃহস্থকে সজাগ রাখিবার উদ্দেশ্যেই শিবচতুর্দ্দশী ব্রতের ব্যবস্থা। বসন্তে জীব আত্মহারা হয়, নিজেকে বিলাইয়া দিতে চাহে; নিজেকে বিলাইয়া দিবার জন্য সৃষ্টির সর্ব্বস্বে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়; যেখানে যেটি মধুর, সুন্দর, মনোহর, সেইখানেই নিজের মধুময়, সুখময় আমাকে হরির লুট করিয়া ছড়াইয়া দিতে চাহে। এই আত্মবিসর্পণের সংরোধ ঘটাইবার জন্য শিবরাত্রির উপবাস। ঘোর নিশাকালে যখন আমি ছাড়া আর কিছুরই অনুভূতি হয় না, যখন আমি আছি এই জ্ঞানটাই প্রবল থাকে, যখন আমার অস্তিত্বে আমার সৃষ্ট সংসার যেন সংক্ষুব্ধ থাকে, তখন আমার অস্তিত্বকে শিবরূপ জ্ঞান করিয়া, আমার স্বর্ব্বস্ব তাঁহাতেই অর্পণ করিতে হয়। আমার জৈব আসক্তি ব্যাধরূপে আমার মেরুদণ্ডরূপী বিল্ববৃক্ষের প্রবৃত্তির ডালে বসিয়া আছে;

সেই ব্যাধ সারা দিন হিংসা করিয়া, শিকার করিয়া নিজ পুষ্টির জন্য মাংস সঞ্চয় করিয়াছে। তাহা প্রবৃত্তির ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। মেরুদণ্ডরূপ বিল্বমূলে অহমস্মি এই জ্ঞানরূপী অনাদিলিঙ্গ শিব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, তাঁহার চারি দিকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সর্পাকারে বেষ্টিত হইয়া বিল্ববৃক্ষের উপর জড়াইয়া উঠিয়াছেন। ত্রিগুণাত্মক ত্রিপত্র বিল্ববৃক্ষকে শোভিত করিয়া আছে। বাহিরে ভীষণ ঝড়—ষড়্‌রিপুর তুফান-তরঙ্গে সৃষ্টি যেন বিক্ষুব্ধ, সঞ্চালিত, সমান্দোলিত। সে ঝড় দেখিয়া আসক্তিরূপী ব্যাধ ভয়ে সঙ্কুচিত; এতটাই ভীত যে, আত্মরক্ষার জন্য বিব্রত। আমি না থাকিলে, আমার ত কিছুই থাকে না,—আমার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, আমার দয়া মায়া, স্নেহ মমতা, আমার সুখ দুঃখ, আমার ষড়্‌রিপু, আমার মানবতা—আমার সব যায় যে! ভয়ে আসক্তি এতটাই সঙ্কুচিত যে, প্রায় আত্মস্থ। তখন ত্রিগুণাত্মক বিল্বপত্রের সঙ্গে হিংসার পরিণতি, সেই সঞ্চিত মাংসের রস, ভিতরে—নীচে—মূলে আত্মারাম শিবের মাথায় পড়িল। অমনি আত্মস্বরূপ শিবের প্রকাশ। সে শিব বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি নাশভয়ে ভীত হইয়াছ, এই যে আমিই নাশের দেবতা, আমাতে তুমি সম্মিলিত হও, তোমার নাশভয় থাকিবে না। আমিই শেষ, আমি ছাড়া আর কিছু নাই, আর কিছু থাকিতে পারে না। তাই শেষ নাগসকল আমার সর্ব্বাঙ্গে বিজড়িত। সংসারের বিপরিণামের ফলে যাহা বাকী থাকে, যাহার আর অন্য পরিণতি নাই, তাহাকেই শেষ বা essence বলে। এই শেষ নাগ—যাহার অন্যত্র যাইবার উপায় নাই, এমন সামগ্রী হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ সৃষ্টির পর্ব্বে পর্ব্বে, মর্ম্মে মর্ম্মে, মজ্জায় মজ্জায় এই শেষ নাগ বিরাজিত। সংহারের এক মাত্র উপাদান বিষ, দেহ বিষাক্ত না হইলে দেহপাত হয় না। সেই বিষ, সেই নাগের আধার আমার কণ্ঠে নিত্য বর্ত্তমান, তাই আমি নীলকণ্ঠ। হিংসাই তোমার জীবনের অবলম্বন, সেই হিংসা হইতে উৎপন্ন সিংহ শার্দ্দূল আমার কাছে মৃত—শব; আমি তাহাদের চর্ম্ম লইয়া আসন পাতিয়া বসিয়া আছি। আমি সর্ব্ববর্ণের সমন্বয়ে রজতগিরিবৎ, কিন্তু যেখানে অজ্ঞেয়তার আধার, সেইখানেই আমি নীললোহিত। ব্যোমমার্গ আমার কেশ, সে কেশের জটাভারে ত্রিপথগা গঙ্গা—সৃষ্টির অনুরাগরূপিণী তরলতরঙ্গিণী কুল কুল ধ্বনিতে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; ব্যোমপথের সীমা নাই, আমার

২১

জটাভারেরও সীমা নাই। সৃষ্টিশক্তি-বিলাসিনী মহামায়া বামারূপে আমার বামাঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। আমাতেই সব, আমিই সকলের সমাপ্তি; তাই আমার শ্মশানবাস। আমি সেই শ্মশানে শবরূপে ছিলাম; তোমার ভয়ভীত আত্মার কাতর আহ্বানে, তোমার অনুরাগের প্রবল সঞ্চালনে আমি শক্তিময় হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছি। এস, এস, ক্রোড়ে এস—আমাতে আসিয়া সম্মিলিত হও।”

ইহাই শিবচতুর্দ্দশী। ভয়ের সাহায্যে আত্মার অন্বেষণ; আর্ত্তের চেষ্টায় সহসা আত্মদর্শন। ভয় কিসের? প্রবল বসন্তে সৃষ্টির ঘূর্ণাবর্ত্ত দেখিয়া, সেই আবর্ত্তবেগে সৃষ্টির সাগরে ফেনোর্ম্মির বিকট বিকাশ দেখিয়া আত্মার সঙ্ক্ষোভ। এই সঙ্ক্ষোভ হইতেই আত্মবিকাশ—শিবত্বের উন্মেষ। কথায় আছে—জীবনে মরণ, মরণে জীবন। জন্মিলেই মৃত্যু, মরিলেই নবজীবন। বসন্ত জনমের ঋতু, তাই সঙ্গে সঙ্গে মরণের ইঙ্গিতও করিতে হয়। শিবচতুর্দ্দশী সেই মরণের—সৃষ্টির বিপরিণামের ইঙ্গিত মাত্র। এক দিকে নারায়ণ দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তিতে বসন্তের অনুরাগরক্তিম হইয়া মদনোৎসব করিতেছেন; এক হইতে দুই, দুই হইতে বহুতে পরিণত হইতেছেন; হ্লাদিনীর বিমল বিকাশে রাধা সতী অনুরাগ-ভরে সৃষ্টির হিন্দোলে দুলিতেছেন; মদনপূজার ধুম লাগিয়া গিয়াছে। অন্য দিকে মদনান্তক মহাদেব সংহারমূর্ত্তির বিকাশ করিয়া, সর্ব্বস্বে আত্মবিস্তার করিয়া সর্ব্বস্বকে আত্মস্থ করিতেছেন। দিনের বেলায় মদনমোহনের লীলা, নিশাকালে মদনমথনের মহাদেবের লীলা। এক দিকে বিকাশ, অন্য দিকে সঙ্কোচ। এক দিকে দ্যুতি, রতি, বিস্তৃতি; অন্য দিকে তমিস্রা, সংহৃতি, সুপ্তি। সৃষ্টির ও বিনাশের এই প্রহেলিকা বুঝাইবার জন্যই শিবচতুর্দ্দশীর ব্রত। ইহা অনন্ত সাগর; যত ডুব দিবে, ততই ইহার মহিমা বুঝিতে পারিবে।

“নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥
তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ॥”

(‘প্রবাহিণী,’ ৩ ফাল্গুন ১৩২১)

জয় রাধে কৃষ্ণ

"জয় রাধে কৃষ্ণ,—মা গো, দুটি ভিক্ষা দাও"—এ রব বাঙ্গালার সনাতন রব, খাঁটি বাঙ্গালীত্বের পরিচায়ক, খাঁটি বাঙ্গালীর রব। কত পরিবর্ত্তনের ঢেউ বাঙ্গালার উপর দিয়া চলিয়া গেল, কত চিরপরিচিত চিহ্ন বাঙ্গালার বক্ষ হইতে মুছিয়া গেল, গ্রাম পল্লী নগর সমাজে কত ওলট পালট হইয়া গেল, কিন্তু এ ডাক—এ রব সমভাবে সকল অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে। সেই তেলচুকচুকে কাল নধর দেহ, সেই নাসিকার উপর হরিমন্দিরের শোভা, সেই বাহুযুগলে তিলকমাটির ছাপ, সেই কাচের চুড়ির বিরল নিক্বণ, সেই মন্দিরার ঝঙ্কার, সেই মোটা এবং মিহি সুরে কণ্ঠসঙ্গীত,—সেই নেড়া-নেড়ীর ভিক্ষা আজ চারি শত বৎসরকাল একই ভাবে, একই রকমে রহিয়া গেল। তুমি উহাদের সমাজে স্থান দাও না, তাহাতে উহাদের কোন ক্ষোভ নাই; তুমি উহাদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাক, উহারা তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না; তুমি উহাদের বিবাহপদ্ধতিকে আইনসঙ্গত মনে কর না, তাহাতে উহাদের লজ্জা নাই। তুমি যেমন ভাবে, যেমন সাজে থাক না কেন, উহারা নিজেদের সনাতন ভাবে তোমার দ্বারে আসিয়া, সেই সনাতন শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করিবেই। জানি না, তোমার দয়া মায়ার উপর উহাদের কিসের দাবী; বোধ হয় তুমি হিন্দু বলিয়া, তুমি এই দেশের মানুষ বলিয়া বোধ হয় উহারা তোমার বাঙ্গালীত্বের বিষ্ণুপঞ্জর রক্ষা করিতেছে বলিয়া, তোমার অনুকম্পার উপর এতটা দাবী করে। সে দাবীতে কিন্তু পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসী ফকীরের মতন জোরজবরদস্তি নাই। তুমি এক মুষ্টি দেও ভাল—না দাও ভাল। ভিক্ষা পাইলেও যে গান গায়িতেছিল, না পাইলেও সেই গান করিতে করিতে অন্য দ্বারে চলিয়া যাইবে। ভিক্ষা করিয়া খায় বটে, পরন্তু উহারা কখনই দুর্ভিক্ষে কষ্ট পায় না, অনাহারে মরে না; লজ্জানিবারণের বস্ত্র পাইতে উহাদের বিলম্ব ঘটে না। উহাদের মুখে কখনই দুঃখের কথা শুনিবে না, নিজের বর্ত্তমান অবস্থাকে ধিক্কার দিয়া উহারা কখনই ক্ষোভ প্রকাশ করে না। উহারা ভিক্ষা ছাড়িয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করে না; উহারা আত্মগ্লানি

করে না। পাপ হউক পুণ্য হউক, উহারা যাহা করিবার তাহাই করে; কখনও কিছু গোপন করিয়া করে না।

“জয় রাধে কৃষ্ণ—ভিক্ষা দাও মা।”—দেও, দেও, ভিক্ষা দেও! এমন ভিখারী আর পাইবে না; উহারা নিত্য সনাতন, মরে না, মরিতে জানে না, মরণকে ভয় করে না। উহাদের ভিক্ষা দাও। উহাদের ভিক্ষা দিলে যে পুণ্য অর্জ্জন করিবে, তাহার প্রভাবে তুমি অমর হইতে পার। পাঠানদের রাজ্যকালে যখন মোগলদের আসিবার দূর সম্ভাবনা হইয়াছিল, যখন অত্যাচারে উৎপীড়নে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে একটা বিরাট্ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, যখন বৌদ্ধদিগের মন্থনকার্য্য শেষ হইয়া আসিতেছিল, তখন পতিতপাবন অবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় উহারা ভারতের সনাতন মন্ত্র—কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিয়া সনাতনপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহারা আর কিছু চাহে না, কেবল তুইটি ভিক্ষা চাহে। উহারা মান চাহে না, ধন চাহে না, ঐশ্বর্য্য চাহে না, বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য কিছুই চাহে না;—চাহে বাঁচিবার জন্য এক মুষ্টি ভিক্ষা। এই মুষ্টিভিক্ষার প্রভাবে উহারা যুগে যুগে বাঁচিয়া আছে—সমান ভাবে, একই আকারে বাঁচিয়া আছে। উহাদের বাঁচাইয়া রাখিতে চাও কি? চাও আর নাই চাও—উহারা বাঁচিয়া থাকিবেই, চিরকাল বাঁচিয়া আছেও। এই ভীষণ ইংরেজী সভ্যতার প্লাবনতরঙ্গে উহাদের ডুবাইতে পরিয়াছ কি? একটু সাহেবীয়ানা, একটু বিলাতী ঢং উহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে পারিয়াছ কি? উহারা যখন মুসলমানী প্রভাব গ্রহণ করে নাই, তখন ইংরেজী প্রভাবেও টলিবে না। উহারা যেমন আছে, তেমনি থাকিবে। উহাদের এক মুষ্টি ভিক্ষা দাও। উহাদের ভিক্ষা দিলে তোমার বাঙ্গালীত্বের পুষ্টি হইবে, তোমার জাতির বিষ্ণুপঞ্জর রক্ষা পাইবে।

বিষ্ণুপঞ্জর সামগ্রীটা কি জান? কিম্বদন্তী আছে যে, কালাপাহাড় যখন জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তিকে চিল্‌কা হ্রদের তীরে চিতা সাজাইয়া পোড়ায়, তখন সেই চিতার দগ্ধ কাষ্ঠসকল চিল্‌কার জলে ভাসিয়া গিয়াছিল। পাণ্ডারা লুকাইয়া, অন্ধকারে সাঁতার দিয়া সেই সব দগ্ধ কাষ্ঠ সংগ্রহ করে। পরে না কি স্বপ্নাদেশ হয় যে, জগন্নাথ মিশ্র নামক যে ব্রাহ্মণ একখানা পোড়া কাঠ পাইয়াছে, তাহাই পুরুষোত্তমের পঞ্জরাংশ। যখন নিম্বকাষ্ঠে শ্রীমূর্ত্তি আবার নির্ম্মিত হইবে, তখন বিগ্রহের ভিতরে ঐ

কাষ্ঠটি লুকাইয়া রাখিতে পারিলে নবীন মূর্ত্তিতে আবার দেবভাগ জাগিয়া উঠিবে। প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর শ্রীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তন হয়; নিম-কাঠের নূতন বিগ্রহ গড়ান হয়। স্নানযাত্রার পূর্ব্বে জগন্নাথ মিশ্রের বংশধর সেই কাঠটি পুরাতন প্রতিমা হইতে বাহির করিয়া নূতন বিগ্রহে পরাইয়া দেয়। ইহাকেই বলে বিষ্ণুপঞ্জর; ইহা অক্ষয়, অমর; ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, কীটদষ্ট হয় না, জলে পচে না, বায়ুতে শুষ্ক হয় না, কালে ক্ষয় হয় না। ইহাই পুরাতন মূর্ত্তির সহিত বর্ত্তমান মূর্ত্তির পরম্পরা রক্ষা করে। ইহারই ভিতর দিয়া পারম্পর্য্যের অব্যাহত ধারা মন্দাকিনীপ্রবাহের ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। "জয় রাধে কৃষ্ণ" বলিলেই এই বিষ্ণুপঞ্জরের কথা আমার মনে পড়ে। মনে পড়ে—উহারাই আমাদের বিষ্ণুপঞ্জর। বাঙ্গালার পুরুষোত্তম অনন্ত কালরূপী চিল্‌কা হ্রদের তীরে ধ্বংসনামা কালাপাহাড়ের চেষ্টায় ভস্মীভূত হইয়াছিল। পুরুষোত্তমের সব নষ্ট হইয়াছিল, কেবল বিষ্ণুপঞ্জর পোড়ে নাই। তাহা ছিল, তাহা আছে বলিয়াই এখনও "জয় রাধে কৃষ্ণ" বুলি শুনিতে পাইতেছি; তাহা ছিল, তাহা আছে বলিয়াই এখনও আমরা ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায় নানা ভাবে, নানা বেশে বিভ্রান্তের ন্যায় বিচরণ করিয়াও, কি জানি কাহার ইঙ্গিতে শেষ জীবনে আবার ফিরিয়া ঘুরিয়া নিজনিকেতনের শীতল ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করি; তাহা ছিল, তাহা আছে বলিয়াই এই বিশ্বব্যাপী টাকা টাকা রবের প্রতিধ্বনির মধ্যেও "জয় রাধে কৃষ্ণ" মধুর বুলি এখনও শুনিতে পাইতেছি। ঐ ঝুঁটিশোভিত, দাড়িদোলায়িত, তুলসীমালার ত্রিলহরে কণ্ঠবলয়িত, ধুকড়িশোভিত, কৌপীন-বহির্ব্বাস-পরিহিত বৈষ্ণব বৈরাগীর মধ্যে—ঐ কোঁদা কষ্টিপাথরের প্রতিমা বৈষ্ণবী নেড়ীর মধ্যে সেই বিষ্ণুপঞ্জরের কতক অংশ লুকান আছে। দেখিতে জান ত সে বিষ্ণুপঞ্জর উহাদের মধ্যেই দেখিতে পাইবে।

গঙ্গার তীরে, ঘাটের পার্শ্বে বৃষকাষ্ঠ পুঁতিয়া রাখিতে দেখিয়াছ কি? যে মরিয়া যায়, যাহার পুত্র পৌত্র কেহ থাকে, যাহার আদ্যশ্রাদ্ধ হয়, যাহার স্মৃতিরক্ষার জন্য তিলাঞ্জলি দিবার মানুষ থাকে, তাহারই ভাগ্যে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হয়। তাহারই যূপকাষ্ঠ, নিত্যসনাতনী, পতিতপাবনী, দুকূল-প্লাবনী গঙ্গার তীরে কিছু কালের জন্য বিরাজ করে। ঐ নাড়া, ঐ নেড়ী—ঐ জয় রাধে কৃষ্ণ রব,—ও সকলই আমাদের জাতির বিশিষ্টতার

বৃষকাষ্ঠ। জাতিত্ব নাই, কিন্তু জাতির ধারা আছে: এক বার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে জাতিত্বের মহাশ্মশানে তিলাঞ্জলি দিবার মানুষ আছে; তাই বৃষকাষ্ঠ এখনও বজায় আছে—অতীতের স্মারকস্বরূপ গত গৌরবের চিহ্নস্বরূপ, জাতীয় বিশিষ্টতার নিদর্শনস্বরূপ, মৃত্যুর ইঙ্গিত-স্বরূপ এখনও বৈষ্ণবতার বৃষকাষ্ঠ খাড়া আছে। এক বার তাকাইয়া দেখ—নয়নময় হইয়া এক বার উহাদিগকে ভাল করিয়া দেখ! যখন তোমার দেশে এত চাকুরী ছিল না, এত নগদ টাকার আদান প্রদান ছিল না, যখন তোমরা এমন কাপুড়ে বাবু হও নাই, এত বিলাসে তোমরা মজ নাই, যখন পল্লীবাস ছিল, পুকুরভরা জল, মরাইভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু ছিল,—যখন ক্ষুধা ছিল না, তৃষ্ণা ছিল না, শঙ্কা ছিল না, সংশয় ছিল না, যখন রোগ ছিল না, ব্যামোহ ছিল না, উৎকণ্ঠা ছিল না, উদ্বেগ ছিল না, যখন পল্লীর বটচ্ছায়ায় বসিয়া তোমরা শ্যাম শ্যামার কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহন করিতে, যখন গ্রামের গণ্ডী কাটিয়া তোমরা বাহিরে যাইতে না, বারো মাসে তের পার্ব্বণ করিয়া সুখে কাল কাটাইতে, তখন উহারা যেমন ছিল, এখন উহারা তেমনই আছে। তবে তখন উহারা তোমার চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে নাচিয়া নাচিয়া যেমন ভাবে গান করিত, একখানা ছেঁড়া কাপড় পাইলেই তুষ্ট হইত, এখন তেমন ভাবে গান করিতে পারে না; কারণ, তোমার বাড়ীতে ত আর চণ্ডীমণ্ডপ নাই, দেবতার অঙ্গন নাই। তুমি নগরে আসিয়া খাঁচার পাখী হইয়াছ। তোমার গান শুনিবার অবসর নাই, ভিক্ষা দিবার তেমন সামর্থ্য নাই। তুমি ভিক্ষা দেও না বটে, অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া উহাদের দরজার সম্মুখ হইতে তাড়াইয়া দেও বটে, কিন্তু উহারা না খাইতে পাইয়া মরে নাই। উহারা যে তোমার পিতৃপুরুষের পূর্ব্বগামিগণের শ্রাদ্ধের বৃষকাষ্ঠ! উহারা যে তোমার তুমিত্বের স্মারক, তোমার অতীতের সহিত বর্ত্তমানের ভাবের ধারা রক্ষা করিবার উহারা যে হেমবেষ্টনী! উহারা ত মরিবে না—উহাদের যে মরিতে নাই!

জয় রাধে কৃষ্ণ! দেও মা দেও, ভিক্ষা দেও! কিন্তু তুমি দিবে কি? তোমার ঘরে ত অন্ন নাই—লক্ষ্মী নাই। তুমি নিত্য আন, নিত্য খাও—লক্ষ্মীকে কিনিয়া খাও। অন্নদান ত তোমার সামর্থ্যে কুলাইবে না। দশ টাকা মণ চাল খাও মা, তোমার এক মুষ্টিরও যে মূল্য অনেক, তোমার এক

বেলার ক্ষুধার অন্ন। তুমি না দিলে ভিখারী ভিখারিণী মরিবে না। কিন্তু তোমার দশা কি হইবে? তুমি যাহার এবং যাহাদের, ঐ বৈরাগীর দল যে তাহারাই। তোমার তুমিত্ব অক্ষুণ্ণ এবং অব্যাহত রাখিবার জন্য উহারা যে সব ছাড়িয়াছে—ধন, মান, যশঃ, গৌরব, কোঠাবালাখানা, সুখ ঐশ্বর্য্য, সব যে ছাড়িয়াছে! উহাদের রক্ষা করিতে পারিলে তোমার তুমিত্ব বজায় থাকিবে; মা, তোমার পিতৃপরিচয় বজায় থাকিবে। সিমিজ-সেলুকা, জ্যাকেট-বডিসের আড়ালে মা, তুমি আত্মগোপন করিয়া আছ, বাহিরের ঠাট দেখিলে তুমি কাহাদের মেয়ে, তাহা ত ঠাওর করিতে পারি না। কিন্তু ইহারা যখন তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান ধরে—"দেখে এলাম শ্যাম, তোমার বৃন্দাবনধাম, নাম মাত্র রয়েছে"—তখন তোমার নয়নকোণে দুই বিন্দু জল আসিয়া দাঁড়ায়। সেই অশ্রুকণা দেখিয়া ঠিক করিতে পারি, তুমি কাদের মেয়ে। যাহারা তোমার পিতৃপরিচয় জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদের ভিক্ষা দিবে না কি? দেও মা, এক মুষ্টি ভিক্ষা দেও। আজ যদি সহসা বিদেশের আমদানি রপ্তানি বন্ধ হয়, বন্দরে জাহাজ ছয় মাস কাল না আইসে, তাহা হইলে বাঙ্গালার প্রায় ছয় কোটি নরনারী ডাঙ্গায়-তোলা মাছের মত ছট্‌ফটাইয়া মরিবে; কেবল ইহারাই মরিবে না। উহাদের জুতা চাহি না, ছাতা চাহি না, জামা কাপড় চাহি না, মোটর ট্রাম চাহি না, কাচপাত্র চাহি না, শার্সি-খড়খড়িওয়ালা ঘরবাড়ী চাহি না। উহাদের জুতা নাই, ছাতা নাই, বস্ত্র নাই, গৃহ নাই, অন্ন নাই, অন্নের সংস্থান নাই। আছে দেহ এবং আছে কৃষ্ণ রাধার নাম। উহারা নেকড়া কুড়াইয়া ধুকড়ি বানাইবে, কলার বাসনায় কৌপীন করিবে, পুষ্করিণীর শাক সিদ্ধ করিয়া উদরজ্বালার নিবৃত্তি করিবে। উহারা মরিবে না—মরে না। উহাদিগকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিলে, তোমার বাঙ্গালীত্বের মহিমা বাড়িবে, তোমার পিতৃপিতামহের নিদর্শন অক্ষয় হইয়া থাকিবে। "জয় রাধে কৃষ্ণ"—এ নাম বাঙ্গালার জলে স্থলে এবং অন্তরীক্ষে গাঁথা রহিয়াছে, গাঙ্গেয় ভূমির স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে,—এই নামের মহিমা স্মরণ করিয়া দেও মা, বঙ্গলক্ষ্মি, আমার অঙ্গনের অন্নপূর্ণা, উহাকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দেও। তোমার জাতির বিষ্ণুপঞ্জর, তোমার অতীতের যূপকাষ্ঠ তোমার বাঙ্গালীত্বের বটচ্ছায়া, মধুর রসের মন্দাকিনী, তোমার তুমিত্বের মানচিত্র—দেও মা, দেও—উহাদের ভিক্ষা দেও। ('প্রবাহিনী,' ১০ ফাল্গুন ১৩২১)

আশা-পথে

এ কি কুয়াসা! সম্মুখে যে কিছু দেখিতে পাই না! যে বিহঙ্গকুলের কলকাকলী শুনিয়া, প্রভাত বোধে শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহারাও যে নীরব—স্তব্ধ! ঐ দূরে বৃক্ষবাটিকার প্রত্যেক বৃক্ষের নবকিশলয়বল্লী প্রথম উষার আভায় স্বর্ণাভ হইয়া উঠিয়াছিল, সে প্রভাও যে আর দেখিতে পাই না! প্রত্যেক বৃক্ষ যেন এক একটি ধূম্রস্তূপ বলিয়া বোধ হইতেছে! ঐ আরও দূরে গঙ্গার জলবিস্তারের উপর বীচিবল্লরীসকল নাচিয়া নাচিয়া খেলিয়া উঠিতেছিল, অরুণ-দ্যুতি লইয়া লোফালুফি করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদেরও যে আর দেখিতে পাই না! উষার সে হাসি কৈ! নব জাগরণের সে উল্লাস কৈ! এ যে সব অন্ধকার! এ অন্ধকার যে দেখা যায়, স্পর্শ করিলে অনুভব করা যায়! সে অনুভূতিতে একটা শীতের জাড্য যেন ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছে! সম্মুখে কি আছে জানি না, কিন্তু সম্মুখের পরিসরবোধটা ত বেশ আছে! এ কি কুয়াসা? ইহাই কি নব বসন্তের কুহক? ইহাই বসন্তের আহ্লাদের উপর গমনোন্মুখ শীতের অবসাদের কৃষ্ণাঞ্চলবিস্তার?

এখন যাই কোন্ পথে? কেবলই ত যাইতেছি; এ গমনের ত বিরাম বিশ্রাম নাই। যে দিন হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, জগতের গতির আবর্ত্তে পড়িয়াছি, সেই দিন হইতেই চলিতেছি। আজ পর্য্যন্ত কোথায়ও জিরাইবার, ভ্রান্তি দূর করিবার স্থান পাইলাম না। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত—কত আসিল, কত গেল; কত গণিলাম, কত হিসাব রাখিলাম; শেষে হিসাবেও আর কুলাইয়া উঠিল না—কল্প, মন্বন্তর, যুগ, বর্ষ—আর পারিলাম না, গণনাও পরাজয় স্বীকার করিল,—তবুও চলিয়াছি! বল প্রভু, আর কত কাল এমন ভাবে চলিবে? ঐ দূর নীল আকাশের কোলে, বালকের হস্তস্রস্ত এক বাটি দুধ ছড়ানর মত ছায়াপথ বিরাজ করিতেছে; যেন শ্বেত কুয়াসার পুঞ্জ; যেন নীল সাগরের বেলাভূমে ফেনপুঞ্জের লেখা! উহাও যেমন, আমাদের জীবনের এই আশাপথও তেমনি। দূর হইতে মনে হয় বেশ নির্দ্দিষ্ট, বেশ

পরিমিত; কিন্তু ভাল করিয়া দেখিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে উহা আর শেষ হয় না। জ্যোতিষীদিগের মুখে শুনিয়াছি, ঐ ছায়াপথ অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি-স্বরূপ; সেই অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রেখার ন্যায় নীল আকাশের ক্রোড়ে লিখিত! আর আমাদের জীবনের আশাপথও এমনি কত কোটি আশারূপী বিশ্বের সমবায়ে সৃষ্ট। তাই বুঝি কুয়াসা! এ কুয়াসা কি কু-আশার ঘোর?

আহা—কত সাধ! সমুদ্রের বেলাভূমে এক একটা ঢেউ আসিয়া যেমন আছাড় খাইয়া পড়ে, আর কোটি বুদ্‌বুদ বজ্‌বজ্ করিয়া যেমন ফুটিয়া উঠে, তেমনি জীবনের এক একটা ঘটনার ঢেউ আসিয়া সুখের বালুকা-বিস্তারের উপর আছাড় খাইয়া পড়ে, আর কত সাধ, কত বাসনা বুদ্‌বুদের মতন ফুটিয়া উঠে। ফুটিয়া উঠে বটে, কিন্তু টিকে না ত! স্বয়ং ভগবানের সাধ কি টিকিয়াছে? ধর্ম্ম-সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ হইল, অধর্ম্মের পরাজয় হইল, প্রতিষ্ঠাপিত ধর্ম্ম টিকিল কি? টিকিলে হূণ, শবর, শক, যবন আসিত না, মোগল পাঠানের প্রতিষ্ঠা হইত না। জগতের নিয়মে ভগবানের কার্য্যও নিয়ন্ত্রিত। এ ভীষণ বেলাভূমিতে কোন সাধ, কোন বাসনা টিকে না, জলবুদ্‌বুদের প্রায় উঠে আবার মিলাইয়া যায়। ঐ উত্থান এবং পতন, ঐ জীবন ও মরণই এ জগতের ধর্ম্ম। জানি সব, বুঝি সব, কিন্তু তবু চলিতে ইচ্ছা করে, তবু অগ্রসর হইতে সাধ যায়। সৃষ্টিচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া কেবল ঘুরিতেছি বটে; কিন্তু মনে হইতেছে, বুঝি বা আগে চলিতেছি, বুঝি বা এ কুয়াসা ভেদ করিয়া যাইতে পারিলে পুরুষোত্তমের মন্দিরসম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইব, অনন্ত কালসাগরের হাহাধ্বনি শুনিতে পাইব, সে নীল, অজ্ঞেয় বিস্তার আবার দেখিতে পাইব।

চক্রের আবর্ত্ত যখন, তখন যাহা হারাইয়াছি, তাহা আবার পাইব কি? দাঁত থাকিতে যেমন দাঁতের আদর করি না, দাঁত পড়িলে যেমন দাঁতের শ্লাঘা বাড়ে, তেমনি সে সব যখন ছিল, তখন তাহার আদর করি নাই। তখন তাহা লইয়া গৌরব করি নাই; এখন হারাইয়াছি, তাই ক্ষণে ক্ষণে তাহার গৌরব করিতেছি, তাহা ছিল বলিয়া দর্পদন্তের প্রকাশ করিতেছি;—সেই হারানিধি আবার পাইব কি? যদি নষ্ট ধন আবার পাওয়া যায়, তাহা হইলে এ কুয়াসায়, এই অনবরত গতিতে দুঃখ নাই।

সে দুঃখ সুখেরই অনুপান। কিন্তু এ জগতে পুরাতন কিছু ফিরিয়া আইসে না; যাহা আইসে, তাহা নূতন ভাবে, নূতন আকারে ফিরিয়া আইসে। মানুষ মরে আর জন্মায়; যখন মরে, তখন প্রাচীন ভাবে মরে, একটু দেখিয়া শুনিয়া মরে; যখন জন্মায়, তখন নবীন ভাবেই জন্মায়; নূতন খোকার নবীন দৃষ্টি, নূতন গতি, নিত্য নূতন বচনকাকলি! যখন নূতন-রূপে আইসে, তখন পুরাতনকে চিনিব কেমন করিয়া! ব্যাসদেবের নিদর্শন শুকদেবে থাকে না; ব্যাসদেব প্রাচীন, সনাতন পুরুষ; শুকদেব নবীন, নবীনতার সনাতন পুরুষ। ব্যাসদেবকে কেহ যুবকরূপে দেখিয়াছ? পুরাণ সে ইতিহাস লেখে নাই। শুকদেবকে কেহ প্রাচীন ভাবে দেখিয়াছ? পুরাণে সে ইতিহাসও নাই। যাহা পুরাতন, তাহা ব্যাসদেব, স্মৃতির পটে আঁকা আছে, বেদবিভাগের মতন স্মৃতির পটে চারি ভাগে বিভক্ত আছে। যাহা আসিতেছে, তাহা শুকদেব—নিতুই নূতন, চিরনবীন। একটা পিতা, অন্যটা পুত্র; যাহা গিয়াছে তাহা, যাহা আসিতেছে তাহার জনক। কেবল চিনিবার দোষেই ভ্রান্তি ঘটে। ভ্রান্তি ঘটে বলিয়াই কেবল কুয়াসা দেখিতে পাই।

যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া, যে দিক্ দিয়াই এ বিশ্ব-প্রহেলিকা দেখিবার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের গতির ত নিবৃত্তি নাই। এক বার দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে—নির্নিমেষ নয়নে, স্পন্দহীন দেহে, শ্রুতি স্মৃতিকে স্তম্ভিত করিয়া এক বার দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু দেহী যখন, তখন স্থৈর্য্য পাইব কোথা হইতে! দেহের মধ্যে কোটিপ্রকারের গতির—শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, দেহের প্রত্যেক অণু পরমাণু কেবল ঘুরিতেছে, কেবল ছুটিয়া বাহির হইতেছে, প্রতি পলে দেহের একটা না একটা কিছুর পরিবর্ত্তন হইতেছে;—এই আমি এই আছি, এই নাই। এমন দেহ লইয়া স্থিরভাবে কিছু কি দেখা চলে! কখনও কেহ কি দেখিতে পাইয়াছে? এই নিত্যপরিবর্ত্তনশীল দেহের মধ্যে কেবল একটা অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞান আছে;—আমি আছি—এই জ্ঞান। এই অহমস্মি জ্ঞানটা আমাকে অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যাহা ছিল তাহা আমার, যাহা আছে তাহা আমার, যাহা আসিবে তাহা আমার—এই মমত্ববুদ্ধিই জগতে আমার জন্য একটু স্থান করিয়া রাখিয়াছে। যত গোল সেই স্থানটুকু লইয়া—সেই চৌদ্দ পোয়া জমিটুকু

লইয়া। বেদ বেদান্ত হইতে জয়দেব পর্য্যন্ত সবটাই আমি এবং আমার; রমাই পণ্ডিত হইতে নবীনচন্দ্র পর্য্যন্ত সবটাই আমি এবং আমার; আমার ব্যাস, বশিষ্ঠ, সনক, সনাতন, ভীষ্মার্জ্জুন, আমার রাম রাঘব, কৃষ্ণ বুদ্ধ, আমার নন্দিবর্দ্ধন হর্ষবর্দ্ধন, আমার বাল্মীকি, কালিদাস, অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, আমার পুত্ত, চণ্ড, প্রতাপ, মান, যশোবন্ত;—এই আসমুদ্র-হিমালয়বেষ্টিত ভূভাগের মধ্যে যাহা ছিল, যাহা আছে, যাহা হইবে, তাহা আমার। আমার জনন, জীবন, মরণ সবই আমার জন্য—আমার সাধ মিটাইবার জন্য। সেই, আমার আমারই জন্য আমি কু-আশায় কুয়াসা ঠেলিয়া কোথায় যাইতেছি, কোন্ পথে চলিতেছি!

কোথায় যাই মা! অন্ধের মতন কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছি? বিদ্যুল্লতার কিরণলেখার মতন এক বার অঙ্গুলি হেলাইয়া এই অন্ধকারে পথ দেখাইয়া দেও! আমি স্থির হই, নির্ব্বাক্ হইয়া কেবল দেখিতে থাকি। কত বকিতেছি, কত কথা কহিতেছি, কত অতীতের আলোচনা করিতেছি। শোকাতুরা জননী পুত্রের শব কোলে করিয়া যেমন বিনাইয়া বিনাইয়া নানা ছাঁদে কাঁদে, তেমনি অতীত স্মৃতির শব ক্রোড়ে করিয়া কত শোকগাথা গান করিলাম। শোকেরও নিবৃত্তি হইল না, গাথারও পরিসমাপ্তি হইল না। আমি যাহা চাই, তাহা পাইলাম না; যাহা ছিল, তাহা দেখিলাম না। কে জানে কি ছিল? কিন্তু প্রাণ জানে—কেমন থাকিলে কত সুখ হইত। প্রাণ যাহা জানে, তাহা বাহিরে ফুটাইয়া দেখিতে পারে না। তাই কুয়াসার ঘোর কেবল ঘিরিয়া আইসে, চাপ-চাপ অন্ধকার যেন জড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করে,—নব জীবনের নব উন্মেষকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া, সুখের বিহঙ্গ-গীতিকে স্তব্ধ করিয়া, স্মৃতির বনস্পতিকে ধূম্রাকারে পরিণত করিয়া, জীবনের হ্লাদিনী গতি গঙ্গা-তরঙ্গিণীর বীচিবিলাসকে আবৃত করিয়া, আশার অরুণকিরণ-কনকরেখাকে তমিস্রালেপে লিপ্ত করিয়া চাপ চাপ অন্ধকার যেন চারি দিক্ হইতে বেড়িয়া আইসে। বায়স্কোপের ছবি দেখানর মতন মনের ভাব, সাধের ছবি ফুটাইয়া দেখাইতে পারি না বলিয়াই এত দুঃখ! "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল"—আমার নয়নের তৃপ্তি হইল না, তোমাদিগকে আমার সাধ মিটাইয়া দেখাইতেও পারিলাম না। তবে কি এই দুঃখই সুখ, এই দদ্রু-কণ্ডূতিই সুখের নামান্তর।

জন্মে জন্মে দেখিলাম, বেদ পুরাণ হইতে চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস পর্য্যন্ত নানারূপে দেখিলাম,—দেখা আর হইল না, সাধ আর মিটিল না। দেখাও না মা,—ক্লীব আয়ান ঘোষকে শ্যাম শ্যামা এক করিয়া যেরূপে দেখাইয়াছিলে, কাত্যায়নীপূজা করিয়া ব্রজগোপীগণ যেরূপে দেখিয়াছিল—দেখাও না মা, সেইরূপে এক বার আমাকে দেখাও! সাধক ভক্ত বলিয়াছেন যে, চোখে দেখা হয় না, সে কেবল চোখের দেখাই হয়,—দেখিতে হইলে, নির্ব্বিবাদে, নিনিমেষে দেখিতে হইলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, চোখ বুজিয়া দেখিতে হয়। চোখ বুজিয়া দেখার অভ্যাস ত নাই। "শ্যামা আমার নয়নে নিবস গো"—নয়নের উপর না রাখিলে দেখিব কেমন করিয়া! সে নয়ন কি হৃদয়ের নয়ন? সে নয়ন কি অন্তর্দ্দৃষ্টির নয়ন? "কেন মীন না হইলাম"—মাছ হইলে পলকশূন্য নয়ন হইত, বিনা বাধা-বিপত্তিতে কেবল দেখিতে পাইতাম; যমুনার বা সাগরের মীন হইলে কেবল দশ দিক্ কৃষ্ণময় দেখিতে পাইতাম। দেখিলে কি সাধ মিটিত? বোধ হয় না; দেখার মতন দেখিতে পাইলে হয়ত পাগল হইয়া উঠিতাম—হয়ত ধূলাকাদা মাখিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তাই বুঝি, এত কুয়াসা আমার আশাপথে, তাই বুঝি, আমাকে রক্ষা করিবার জন্য কুজ্ঝটিকা ঘিরিয়া রহিয়াছে!

ইহাই কি মায়ের করুণা? আমার বুকভরা আশা, জগৎজোড়া সাধ। আমার জীবনভরা আকাঙ্ক্ষা, মরণ-জোড়া বাসনা। আমি মরিতে বসিলেও বাসনাকে ছাড়ি না, আমার সর্ব্বনাশ হইলেও আকাঙ্ক্ষা করিতে ভুলি না। উঃ! কত ছোট ছোট আশা, কেমন বুদ্বুদের মতন বাসনা! ইহা ত মিটিবার নহে, কখনও কাহারও ভাগ্যে মিটে নাই। আমি কি এমন ভাগ্যবান্ যে, আমার আশা পূর্ণ হইবে! মরুক্ষেত্রের পথের মতন পথ নাই, অথচ পথ শেষ হয় না; পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়, কিন্তু তাহা টিকে না। অথচ চলিয়াছি, অনবরত—অবিশ্রান্ত চলিয়াছি, আশা-মরীচিকার আহ্বানে কেবল চলিয়াছি; দেহ ক্রমে ক্রমে শীর্ণ জীর্ণ হইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি দীর্ণপ্রায় হইতেছে, তথাপি চলিয়াছি! কোথায় যাইতেছি, তাহাও জানি না, কাহার অন্বেষণে ঘুরিতেছি, তাহাও বুঝি না, তবুও চলিয়াছি। কিসে সুখ তাহাও জানি না, কিসে দুঃখ তাহাও বুঝি না,—বুঝি কেবল ভোগ, অনুভূতির ভোগ, প্রবৃত্তি-পিপাসার

ভোগ। ভোগী যত দিন, তত দিন এ ভোগ থাকিবে, এ ভোগের বিরাম হইবে না। কণ্টকীলতা চিবাইয়া নিজের শোণিতে উষ্ট্র যেমন মুগ্ধ ভাবে পিপাসার নিবৃত্তি করে, তেমনি নিজের শোণিতে নিজের পিপাসার নিবৃত্তি করিতেছি। যুগে যুগে এমনই ভাবে তৃষ্ণার নিবৃত্তি করিয়াছি, যুগে যুগে কি এই ভাবেই জীবন যাইবে? বল মা, ইহাই কি তোমার আশাপথ? ইহাই কি তোমার গগনক্রোড়ে লেখা ছায়াপথ? এ পথে ঘুরিলে কি শ্রান্তি হয় না? এ পথে হাঁটিলে কি অরুচি হয় না? যাহারা তোমার ভক্ত, কেবল তাহারাই কি শ্রান্তিসুখের ভাগী হয়? রামপ্রসাদ বলিয়াছিল—মা গো, বোঝা নামাও, একটু জিরাই। আমরা কি তাহাও বলিতে পারিব না?

শাস্ত্র বলেন, আশা নদীপ্রায়, কেবল বহিয়াই চলিয়াছে, কিন্তু সাগরসঙ্গমে যাইয়া মিশে না; মিশিলে আশা আর থাকে না, ইহার বিশিষ্টতা নষ্ট হইয়া যায়। যে আশা-নদীকে সাগরে লইয়া যাইয়া মিশাইতে পারিয়াছে, তাহারই আশা পূর্ণ হইয়াছে, তাহারই আশার নিবৃত্তি হইয়াছে। কিন্তু সে যে বহু দূর! পর্ব্বত হইতে নদী বাহির হয়; পর্ব্বে পর্ব্বে উৎপন্ন, পর্ব্বে পর্ব্বে সমষ্টিসম্পন্ন পর্ব্বতস্বরূপ সজীব মনুষ্যদেহ হইতে আশা-নদী বাহির হয়। কিন্তু যায় কোথায়? দেহ নষ্ট হইলে উহার নাশ হয় কি? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে পরকালের ভাবনা ভাবিতাম না, মরণের পরপারের সুখের আশায় এ জীবনটা কষ্টে কাটাইতাম না। সাগরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য, সাগর দেখিতে পাই না বলিয়াই কেবল ঘুরিয়া বেড়াই, কেবল যাই আর আসি। সাগরের তীরেই, অনন্তের তটেই পুরুষোত্তম বিরাজ করিতেছেন। সে পুরুষোত্তমের কাম-মন্দির। দেহ-মন্দিরও ত কাম-মন্দির! তাই শ্রুতি কামস্তুতি করিয়াছেন। সেই কাম-মন্দিরের অভ্যন্তরে, রত্নবেদীর উপরে পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের ভিতরে সাগরের হা হা শব্দ শুনা যায় না, পুরীর মধ্যে অনন্তের কোলাহল শুনা যায় না। আশার মহানদী এই পুরীর বাহির দিয়া সমুদ্রে যাইয়া ফেলিতে পারিলে আশা পূর্ণ হয়। আশা মহানদীই বটে, যখন যৌবনের বর্ষার বান ডাকে, ঢল নামে, তখন দুই কূল উপচাইয়া নদী বহিয়া যায়। প্রৌঢ়তার শরৎ ও হেমন্তে আশার সলিলরাশি টানিয়া বাহির হইতে থাকে, নিরাশার

বালুকাবিস্তার বাহির হইয়া পড়ে। শেষে শীতে বার্দ্ধক্যের জাড্য আসিলে নদীর প্রায় সবটাই নিরাশায় বালুকাপূর্ণ হয়। কিন্তু যত ক্ষণ শ্বাস, তত ক্ষণ আশ, তাই সে বালুকাবিস্তারের ভিতর দিয়া ক্ষীণকায়া নদী সূক্ষ্ম সূত্রের মত বহিয়া যায়। সে সলিল-সূত্রের সাগরের সহিত সম্বন্ধ থাকে বটে, কিন্তু পূর্ণ আশার তরল তরঙ্গে কল্লোল কোলাহলে উহার সমুদ্রে গিয়া মিশিতে পারে না। তাই জীবনে এত দুঃখ! কিন্তু মিশি কেমন করিয়া—অনন্ত, অব্যয় সাগরের সঙ্গে মিশি কেমন করিয়া? পুরীর মধ্যে যাইলে পথ ভুলিয়া যাই, সাগরের কথা মনে থাকে না, সাগরদর্শনে সাহসে কুলায় না। সে সাগরে মিশিব কেমন করিয়া? বাঙ্গালীর মধ্যে এক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাগরে যাইয়া মিশিয়াছিলেন, আর কেহ পারে নাই! কিন্তু তিনি সাগরকে নদী ভাবিয়াই—কালিন্দী-কল্লোলে বিভ্রান্ত হইয়াই সে নীল বিস্তারে ঝম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন। উহাই কি একমাত্র উপায়? কে জানে?

আমার আশাপথ—জীবনের জীবন-তটিনী! কেন এমন ভাবে শুকাইয়া যাইতেছে! সাগরসঙ্গমে যাইবার পূর্ব্বে নিরাশার মরুক্ষেত্রে উহা কি আত্মগোপন করিবে? যুগে যুগে এ তটিনী বহিয়া আসিয়াছে, এত দিন ত শুকায় নাই! এখন কি শুকাইবে? উঃ! সে কত আশা—সুখের আশা, সোহাগের আশা, কালো রূপের আশা, কলঙ্কের আশা, কলঙ্কের গৌরবের আশা! সে আশা-শুষ্কতোয়া নদীর মতন কেবল বালুকাবিস্তারে পরিণত হইবে? উঃ! সে যে বুকভরা আশা! শ্যামা মায়ের আশা, মায়ের আদরের আশা, মায়ের কাছে কত আবদারের আশা! সে আশার ঊর্ম্মিমালা নিরাশার বন্ধুর পর্ব্বতগাত্রে আসিয়া কেবল আছাড় খাইবে? সে আশার নদীতে আমার কত বাসনার রুই কাৎলা, শাল শোল, খোরশোলা, চেলা মাছসকল রূপার মাছের মত খেলিয়া বেড়াইত। ষড় রিপুর কত হাঙ্গর কুম্ভীর, শরট কমঠ উজান বহিয়া চলিয়া যাইত। আমার ভরা গাঙ্গের আশার নদীও শুকাইবে? কথাটা মনে করিতেও পাঁজর ভাঙ্গিয়া যায়, হৃৎপিণ্ড শুষ্ক হইয়া আইসে! আমার আশা সাহিত্যের, ভাবের, ধর্ম্মের, কর্ম্মের, বিলাসের, বৈভবের আশা—বৈদিক যুগ হইতে ইংরেজের যুগ পর্য্যন্ত আমার বুকভরা আশা—আমার সে সনাতনী আশা শুকাইবে? জন্মে জন্মে, যুগে যুগে আমি ত আশার তীর ছাড়ি নাই।

কখনও বা তাহার স্নিগ্ধ শীকরসংস্পর্শে সকল জ্বালা জুড়াইয়াছি, কখনও বা জঠরজ্বালায় অধীর হইয়া কেবল তাহার জল পান করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছি। আশাই আমার সর্ব্বস্ব। ছিল সব, গিয়াছে সব, এখন এই শবদেহে আছে কেবল আশা; আশার নাভিশ্বাসে আমার জীবনের ইঙ্গিত বুঝা যাইতেছে। সে আশাও নির্ম্মূল হইবে? তাও কি হয়, তাও কি কখনও হইয়াছে। নাঃ—আশাপথ ছাড়িব না, আশার আহ্বান অবহেলা করিব না,—আশার তীরভূমি ধরিয়া, তীর্থে তীর্থে বিচরণ করিয়া আরও অগ্রসর হইব। দেখি, কোন্ পথে যাই, কোথায় যাইয়া দাঁড়াই! যাহা ছিল তাহা জানি, যাহা হইয়াছে তাহা দেখিতেছি, যাহা হইবে তাহা দেখিব না কেন? যে আশাপথ ধরিয়া যাহা ছিল তাহা হারাইয়াছি, যে আশাপথে থাকিয়া যাহা আছে তাহা পাইয়াছি, সেই আশাপথ বাহিয়া যাইলে যাহা হইবার তাহাই দেখিব—তাহাই হইব। লজ্জা কিসের! এমন যখন হইয়াছি, তখন তেমন কেন হইব না? হায় মা! কি ফেরেই ফেলিয়াছ, কি পাকই খাওয়াইতেছ! কি বলিব মা, বলিবার ত কিছুই নাই, বলিতেও ত সব পারি না! সব যে বলা যায় না,—বলিতে নাই। দুঃখ সুখ, সুখ দুঃখ—বলিব কি? ভুগিতেছি, ভুগিতে আসিয়াছি, ভুগিয়া যাইব। কিন্তু মা, এক বার তাকাও—করুণানয়নে এক বার তাকাও! তাহা হইলে আশা পূর্ণ হইবে, আশাপথের শেষ হইবে, অনন্ত সাগর দেখিতে পাইব। শতচাঁদ-নিঙ্ড়ান সুধামাখান নীল নয়ন তিনটি বিস্ফারিত করিয়া এক বার তাকাও—আমার সাধ মিটুক, আশা পূর্ণ হউক, জীবনযাত্রা শেষ হউক। না না, তাহা ত হইবার নহে। যুগে যুগে এমনই ভাবে চলিয়াছে, এমনই ভাবে চলিবে। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই। আকাশের ছায়াপথ আর জাতির জীবনের আশাপথ—দুই এক—একই দুই। উহাদের তুলনা উহারাই। অতএব ও কথা আর তুলো না। ('প্রবাহিণী,' ১৭ ফাল্গুন ১৩২১)

গোড়ার কথা (২)

বাঙ্গালী জাতির তিনটি গোড়ার কথা আমরা কতক কতক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। তিনটি গোড়ার বা মোড় ফিরিবার কালে বাঙ্গালীর দশা কেমন ছিল, তাহাই স্থূল ভাবে বলিব। প্রথম গোড়া—পাঠান-দিগের আক্রমণ। দ্বিতীয় গোড়া—মোগলের আগমন এবং মোগল পাঠানের যুদ্ধ। তৃতীয় গোড়া—মোগল রাজ্যের অধঃপতন এবং ইংরেজের আগমন।

প্রথম গোড়ায় বা পাঠানদিগের আক্রমণকালে বাঙ্গালায় বৌদ্ধের সংখ্যা বড় কম ছিল না। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই বৌদ্ধ বিহার ও আশ্রম ছিল। এ সময়ে বাঙ্গালার বৌদ্ধ মত তন্ত্রমতের সহিত জড়াইয়া গিয়াছিল। মহাযানী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বজ্রযানী আদি সম্প্রদায় কুৎসিত তন্ত্রমতের পোষণই করিতেন। লাম্পট্য ধর্ম্মমতের আধার হওয়াতে জাতি শিথিল হইয়া গিয়াছিল। বল্লালসেনের পূর্ব্ব হইতে স্মার্ত্ত ও শ্রৌত ধর্ম্মের প্রচলনচেষ্টা হইলেও সমাজে তাহার প্রভাব তেমন বিস্তীর্ণ হয় নাই। তাই পাঠানগণ অল্পায়াসেই বাঙ্গালা দখল করিতে পারিয়াছিল। পাঠান মুসলমান ধ্বংসের অবতারস্বরূপ ছিলেন। পাঠান মুসলমান বাঙ্গালা দখল করিয়াই পঞ্জাবের মতন বৌদ্ধদিগের পুরাতন কীর্ত্তিসকল নষ্ট করিতে আরম্ভ করেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে উত্তরভারতে কেবল নাশের লীলাই চলিয়াছিল। তখন হিন্দু জাতি মুহ্যমান, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং উদ্‌ভ্রান্ত। এই ভীষণ নিপীড়নের কালে হিন্দু ও বৌদ্ধ কতকটা সম্মিলিত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। মুসলমান জেতৃগণ এক হিন্দু বা কাফের নামেই, মুসলমান ছাড়া ভারতবর্ষের সকল জাতিকে নির্দ্দেশ করিতেন। এই নামের গুণে মুসলমান ছাড়া ভারতবর্ষের সকল কাফের জাতি এক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। পাঠান জেতৃগণ ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই ঠিকমত রাজত্ব করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, মন্দির মঠ ভাঙ্গিয়া মস্‌জেদ গড়িয়াছেন এবং কাড়িয়া কুড়িয়া যাহা পাইয়াছেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়া বিলাসসুখে দিনপাত করিয়াছেন। প্রজার হিতের জন্য রাজ্যশাসনচেষ্টা তোগলক এবং লোদী

বাদশাহগণ একটু করিয়াছিলেন। শূরবংশের শের শাহ সে পক্ষে উদাসীন ছিলেন না। তবে পাঠানদের সময়ে ভারতবর্ষ পুরা রকমে বিজিত হয় নাই। তাই পাঠানগণ সমরপ্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেশ দখল করিয়া বসিয়া ছিলেন। সে সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ বাঙ্গালায় অতি ভীষণ অরাজকতা এবং বিপ্লববাদ প্রচলিত ছিল। সে অরাজকতার ফলে বাঙ্গালী জাতি জীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু "জোর যাহার, মুল্লুক তাহার" এই নীতির প্রচলন থাকাতে বাঙ্গালীকে আত্মরক্ষা করিবার জন্য শক্তিসাধনা করিতে হইয়াছিল। পাঠান যুগের বাঙ্গালী ভৌমিকগণ এক একজন প্রবল যোদ্ধা এবং রাষ্ট্রপতি হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন ছিল তান্ত্রিক বীরাচার এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের—নাড়া নাড়ীদের সহজ পন্থা। তখন বল্লালী কৌলীন্য প্রথাও বিগড়াইয়া গিয়াছিল, শ্রৌত ধর্ম্মও মলিন হইয়াছিল। তখন দেশে সুন্দরী কন্যা, ভগিনী, স্ত্রী প্রভৃতি লইয়া সংসার করা কঠিন ছিল। ভৈরব ভৈরবীর দল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইত। পাষণ্ড পাষণ্ডীদের ব্যাপার, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগ্রন্থ চরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি ভাল করিয়া পড়িলে বেশ বুঝা যায়।

দ্বিতীয় গোড়া মোগলদের আগমন। তখন বাঙ্গালী অনেকটা সামলাইয়াছে। দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধন, আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসংস্কার, রঘুনন্দনের স্মৃতিরচনা প্রভৃতি সামাজিক বড় বড় কার্য্য শেষ হইয়াছে। সে সময়ে মিথিলা হইতে কাণা ভট্ট শিরোমণি ন্যায় আমদানি করিয়া শিক্ষার বিস্তার ঘটাইয়াছিলেন। লেখাপড়ার হিসাবে তখন বাঙ্গালায় সারস্বত যুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সকলের অপেক্ষা বড় ব্যাপার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার। ইহার প্রভাবে বাঙ্গালা-দেশ ষোল আনা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই; বাঙ্গালায় হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। আকবর শাহ এই সময়ে বাঙ্গালায় মহারাজ মানসিংহকে পাঠাইয়া দিয়া শাসনকর্তৃত্বের পরাকাষ্ঠা করিয়াছিলেন। মুনিম খাঁ, খাঁ জমান প্রভৃতি কোন মুসলমান যখন হিন্দু ও পাঠান বাঙ্গালাকে মোগলের অধীন করিতে পারিল না, তখন আকবর বাদশাহ মহারাজ মানসিংহকে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই এক চালেই কিস্তি মাৎ হইয়াছিল। মানসিংহের গুণে বাঙ্গালায় হিন্দুপ্রাধান্য বজায়

রহিল, হিন্দুত্বের পরম্পরা অব্যাহত রহিল। বাঙ্গালার জমিদার ও জাগীরদারগণ বাঙ্গালীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া রহিলেন। দিল্লীর বাদশাহ কিস্তি কিস্তি কর পাইলেই এবং সুবেদার পাঠাইবার অবসর পাইলেই তুষ্ট থাকিতেন। বিশেষতঃ শা সুজা বা সুলতান সুজা বহু কাল বাঙ্গালার সুবেদার থাকাতে বাঙ্গালী সে সময়ে অনেকটা স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছিলেন। মোগল শাসনের দুই শত বৎসরকাল বাঙ্গালার আধুনিক অভ্যুদয়ের কাল বলিতে হইবে। এই সময়ে নব্য ন্যায়ের রচনা, এই সময়ে স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চ্চা, এই সময়ে নবদ্বীপের প্রাধান্য, এই সময়ে চরিতামৃত-প্রমুখ বৈষ্ণব মহাকাব্যসকলের সৃষ্টি, এই সময়ে ভক্তি এবং প্রেমের আলোচনা—মধুর রসের মহাজনী পদের উৎপত্তি। বাঙ্গালার বিশিষ্টতা এই সময়ে ফুটিয়া উঠে—কীর্ত্তন, কবি, কথকতা, ব্যাখ্যা, এই সময়ে বাঙ্গালায় ছাইয়া যায়। বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা এই সময়ে ফুটিয়া উঠে। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা এবং সাহিত্যের বনিয়াদ এই সময়ে গড়িয়া তোলা হয়। কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণ হইতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর মহাকবিগণ এই সময়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে টোল চতুষ্পাঠী ছিল, আচণ্ডাল সবাই লেখাপড়া শিখিত। এই সময়ে ঔদার্য্যেরও সময়; দরাব খাঁর রচিত গঙ্গাস্তোত্র এই সময়ে বাঙ্গালী গ্রহণ করেন। বড় বড় মুসলমান কবি বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর সহিত সম্মিলিত হইবার চেষ্টা করেন। মুসলমানের—মোগলের আমলে হিন্দু মুসলমানে যতটা সদ্ভাব হইয়াছিল, তেমন সদ্ভাব এখন ইংরেজের আমলে নাই।

তৃতীয় গোড়া,—ইংরেজের আগমন, কোম্পানীর রাজ্য। গোড়ায় ইংরেজ এ দেশে রাজ্য করিতে আসেন নাই, ব্যবসায় করিতে আসিয়াছিলেন। তাই প্রথমে দেশের ভাল লোকের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয় নাই। যত মুন্সী, সরকার, যাচনদার, ওজনদার, বাজারের দারোগা ও মোসাহেবের দলের সহিত তাঁহাদের প্রথম পরিচয় হয়। তাহার ফলে ইংরেজ শাসনের গোড়ায় যত বিশ্বাসঘাতকতা, পরস্বাপহরণ, জাল জুয়াচুরি, মিথ্যা কপটতা ঘটিয়াছিল, এত পূর্ব্বে কখনও হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। লড়াই করিয়া যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লওয়া

এক কথা, আর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পরস্বাপহরণ আর এক কথা। ইংরেজের আমলের গোড়ায় যে সকল বড়লোকের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের গোড়ার ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, এক দল কপট বিশ্বাসঘাতকের হাতে পড়িয়া ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সয়তানের পথে হাঁটিতে হইয়াছিল। লর্ড মেকলে কলিকাতায় বসিয়া যেমন বাঙ্গালীর পরিচয় পাইয়াছিলেন, তেমন বাঙ্গালীচরিত্রের আলেখ্য তিনি অপূর্ব্ব ভাষায় রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, তিনি তিল মাত্র অত্যুক্তি করেন নাই। আমরা পুরাতন কাগজ ঘাঁটিয়া, মহারাজ যতীন্দ্রমোহনপ্রমুখ বৃদ্ধ বাঙ্গালীপ্রধানগণের মুখে শুনিয়া, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙ্গালীচরিত্রের যে লক্ষণসকল জানিতে পারিয়াছি, পাঠকগণকে তাহাই উপহার দিব।

(১) চরিত্র বলিয়া একটা কিছু বাঙ্গালায় বড়লোকের মধ্যে প্রায়ই ছিল না। ধনী মাত্রেরই কামপত্নী থাকিত, না রাখিলে নিন্দা হইত। রাজা রামমোহন রায়ের রক্ষিতা ছিল।

(২) ধনীদের বেতনভোগী হইয়া দুই তিন জন পাকা জালিয়াৎ থাকিত। তাহারা কর্ত্তার হুকুমে চিঠি জাল করিত, দলিল দস্তাবেজ জাল করিত।

(৩) ধনী জমিদার প্রায় ডাকাতের সর্দ্দার হইতেন। চোরাই মাল রাখা পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত না। সে সময়ের কলিকাতার বড়-বাজারের সোনার দোকান লুঠ একটা বড়লোকের বড় কীর্ত্তি বলিয়া পরিচিত হইত। ডুমুরদহের রামশরণ বাবু, নাকাশিপাড়ার কেশব বাবু প্রকাশ্যে ডাকাতি করিতেন।

(৪) গরীব ভদ্রগৃহের সুন্দরী স্ত্রী বাহির করিয়া আনা বাবুয়ানির একটা শ্লাঘা ছিল। এই ব্যাপার লইয়া বড়লোকে বড়লোকে আড়াআড়ি চলিত। বাবুদের মধ্যে আবার পত্নীর অদলবদল হইত। ভারতচন্দ্রের কল্পিত হীরা মালিনীর মতন এক দল কুটনী পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। জুটাইয়া দেওয়া ইহাদের ব্যবসায় ছিল, এবং ইহারা বেশ দু'পয়সা রোজগার করিত।

(৫) ঘুষ লওয়া দোষের ছিল না; যে না লইত, তাহাকে লোকে বোকা বলিত। সমাজের এ চিত্র দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার নাটকে আঁকিয়া

রাখিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় এক লাখ টাকা ঘুষ লইয়াছিলেন; তখন তিনি ভাগলপুরের সেরেস্তাদার—দাওয়ান ছিলেন।

(৬) দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অসহ্য অত্যাচার ছিল। গরীব দুঃখীর গচ্ছিত ধন বড়লোকে আত্মসাৎ করিতেন। ঘরে রাখিলে ডাকাতে লুণ্ঠিত, বড়লোকের কাছে রাখিলে তাঁহারা বেমালুম হজম করিতেন। এমন গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করার গল্প কলিকাতায় এখনও অনেক প্রচলিত আছে।

(৭) মদ্যপানে দোষ ছিল না। গাঁজা, সিদ্ধি, আফিম, মদ, চরস—আবকারীর দেবতা তখন বাঙ্গালায় ষোড়শোপচারে পূজা পাইতেন। তাহার চিত্র 'সধবার একাদশী'তে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে।

ইংরেজী শিক্ষার, ইংরেজী আইনের প্রভাবে ধীরে ধীরে এই সকল দোষ ঢাকা পড়িয়াছে বটে, পরন্তু একেবারে যায় নাই। এখন আইন বাঁচাইয়া জুয়াচুরি—বিশ্বাসঘাতকতা চলে, পরস্বাপহরণও চলে। ইহার হেতু এই যে, ইংরেজের আমলে ধর্ম্মভাবের তেমন উন্মেষ ঘটে নাই। পাঠানদের শেষে এবং মোগলদের গোড়ায় যেমন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে, রঘুনন্দনের চেষ্টায় বাঙ্গালী সাম্‌লাইতে পারিয়াছিল, ইংরেজের আমলের গোড়ায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্ভব হইলেও, তাহা জাতির মজ্জাগত হইতে পারে নাই। দীনবন্ধু মিত্রের নাটক কয়খানার বিশ্লেষণ করিলে ইংরেজ আমলের গোড়ায় বাঙ্গালী সমাজের পূর্ণাবয়ব চিত্র পাওয়া যায়। সে দিন—আর এই দিন! সেই দিনের শেষাংশটা আমরা দেখিয়াছি, এ দিনের গোড়াটা আমরা দেখিতেছি। সে দিনের দানধর্ম্মে অনেক দোষ ঢাকিত, সে দিনে সমাজ আরও সজীব ছিল, পল্লীবাসের উচ্ছেদ ঘটে নাই; এ দিনে দানধর্ম্ম নাই, লৌকিকতা নাই, পল্লীবাস উচ্ছন্নে গিয়াছে, বাঙ্গালী কাপুড়ে বাবু—হা-ঘরে, হাভাতে হইয়াছে। তখন সমাজের নাভিশ্বাস হইয়াছিল, এখন সমাজ মরিয়াছে। তখন সংস্কার করিলে চলিত, এখন নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। তখন কেবল অর্থ উপার্জ্জনে ও সঞ্চয়ে মিথ্যা, জাল জুয়াচুরি চলিত, এখন জীবনের সর্ব্বস্ব কপটতা। তখন ধনীর সহিত দরিদ্রের একটা সম্বন্ধ ছিল, এখন সে সম্বন্ধ চ্যুত হইয়াছে। ইহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহা বিধাতাই

জানেন। এত নকলনবিসি, এত কপটতা স্থায়ী হইলে জাতির জীবন থাকিবে না। সাধু সাবধান !! ('প্রবাহিণী,' ১৭ ফাল্গুন ১৩২১)

সাহিত্য-সম্মিলন

আপনি আর কপনি আর ভাল লাগে না! ইংরেজী লেখাপড়া শিখিলাম, এম-এ, বি-এ, পাস করিলাম, উকীল ব্যারিষ্টার হইলাম, রাজদরবারে মান পাইলাম, যে ধনৈশ্বর্য্যের মুখ ঊর্দ্ধতন ছাপ্পান্ন পুরুষের মধ্যে কেহ কখনও দেখেন নাই, তাহা দেখিলাম, গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া রাজা রায়বাহাদুর হইলাম, শেষে ডিস্‌পেপসিয়া ডায়াবিটিজপ্রমুখ রোগে মানবলীলা সংবরণ করিলাম। এই একঘেয়ে ভোগের জীবন, এই কেবল নিজের দেহের তুষ্টি-পুষ্টির পান্‌সে মানবতা আর ভাল লাগে না। ভাল লাগে না বলিয়াই সর্ব্বাগ্রে রাজনীতির মহাপঙ্কে গিয়া পড়িয়াছিলাম। কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, গোটা ভারতবর্ষকে এক করিয়া অটোনমি, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি রাজনীতির নানা বোলওয়ারি কপচাইয়া দেখিলাম—সবই বিদেশের, কোনটাই আমার নিজের নহে; সাধ মিটিল না, তৃপ্তিবোধ হইল না, বরং ব্যথা পাইলাম, মর্ম্মে মর্ম্মে বেদনা অনুভব করিলাম। কোন এক অ-জানা যুগের বিস্মৃত সুখস্বপ্নের ঘোর প্রথম বসন্তের কুয়াসার মতন আমার মুকুলিত মানবতাকে যেন ঝলসাইয়া দিয়া গেল। জ্বালায় অস্থির হইলাম; সে জ্বালা নিবারণের জন্য দশ দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ভাবিলাম—সমাজের ক্রোড়ে যাই, কিন্তু সমাজে ত সমাজপতি নাই, কে আশ্রয় দিবে? কে স্নেহের হস্তাবমর্ষণে আমার সর্ব্বাঙ্গের জ্বালা জুড়াইবে? ভাবিলাম—ধর্ম্মের আশ্রয় লই; কিন্তু সভয়ে দেখিলাম—ধর্ম্মের গিরিগুহার গুরুর আসন শূন্য। ত্রাসে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম। দশ দিক্ এমনই ভাবে অন্ধকারময় দেখিয়া কাতরকণ্ঠে 'মা' বলিয়া ডাকিলাম। তখন মনে হইল—বটেই ত, আমার ভাষা-জননী আছেন, তিনি আমায় রক্ষা করিবেন, আমার বিশিষ্টতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। ইহাই বাঙ্গালীর সাহিত্য-সেবার, সাহিত্য-সম্মেলনের মূল কারণ।

ইংরেজের শাসনের শীতল বটচ্ছায়া প্রথমে বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল। শতবর্ষব্যাপী অরাজকতার পর, চোর-ডাকাতের উৎপাত উপদ্রবের পর সে স্নিগ্ধ শীতল ছায়ার নিশ্চিন্ত আশ্রম বড়ই মধুর লাগিয়াছিল। তাই নিজের দেহ লইয়া, নিজের আত্মীয় স্বজনের সুখস্বচ্ছন্দতার চিন্তা লইয়া প্রথম কিছু কাল বড়ই সুখে কাটিয়াছিল। সে সুখের মোহে একেবারেই সব ভুলিয়াছিলাম; বাঙ্গালার বাঙ্গালীত্ব, বাঙ্গালার শ্যাম শ্যামা, বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জ, বাঙ্গালার সর্ব্বস্ব ভুলিয়াছিলাম। প্রথমে গ্রীস্, রোম, ইংলণ্ড, ফ্রান্স লইয়া ব্যস্ত ছিলাম, পরে দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই 'হা চিতোর' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলাম, তাহার পর রাজস্থান, পাঞ্জাব, মালব, মথুরা, উজ্জয়িনী, প্রয়াগ লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিলাম। সে তীব্র ব্যস্ততার মধ্যে ইংলণ্ড ফ্রান্সের পেট্রিয়টিজমের তীক্ষ্ণ রেখা মর্ম্মে মর্ম্মে কাটিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। সর্ব্বশেষে বঙ্গভঙ্গের ঝনৎকারে যখন মোহ ভাঙ্গিল, তখন যশোরের প্রতাপকে সম্মুখে করিয়া বাঙ্গালীত্বের অন্বেষণে ব্যস্ত হইলাম। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি সে অনুসন্ধানে সহায়তা করিল; গৌড়-রাজমালার এক খণ্ড পাঠ করিয়া বুঝিলাম, আমি বাঙ্গালী, আর্য্যাবর্ত্তের অঞ্চলস্রস্ত ছিন্নসূত্র গুচ্ছের মতন নহি, কাশী গয়া, মথুরা মায়া ছাড়া আমার বাঙ্গালীত্বের বিশিষ্টতাঘোষক আরও কিছু আছে; সে কিছু সামান্য কিছু নহে, সে কিছু কেবল প্রাদেশিকতার পরিচায়ক নহে; সে কিছু আর্য্যাবর্ত্তের সার্ব্বভৌম কিছু। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম, কলা প্রভৃতি সকল বিষয়ে গৌড়ীয় রীতির বিশিষ্টতা সুস্পষ্ট, সর্ব্বদেশ এবং সর্ব্বজনমান্য। তখন বুঝিলাম, আমার বাঙ্গালীত্বের মূল্য আছে। তখন বুঝিলাম—আমি ছিলাম, আমি এখনও আছি, সুতরাং আমি থাকিব। জননী কখনই পুত্রকে 'মর' বলিয়া গালাগালি দেন না—দিলেও তাহা আশীর্ব্বাদ হয়, সে অভিসম্পাত ফলে না। আমি মা বলিয়া ডাকিলাম; মা বলিলেন—চিরঞ্জীব। সে কি মা! এই অবস্থায় চিরঞ্জীবী হইব কিসের ভরসায়? তখন কে যেন কানের ভিতরে চুপি চুপি বলিয়া গেল—বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস হইতে বঙ্কিম রবীন্দ্র পর্য্যন্ত সবাই বাঁচিয়া আছে, কেহ মরিতে আইসে নাই, মরিবেও না।

বটে? এত বড় কথা?—ভাবিলাম—সত্যই ত; এই পরাধীন পরাজিত অবস্থায়, অধিকতর কষ্টে, অধিকতর উদ্বেগে জীবনযাপন করিয়া

বৈষ্ণব কবিগণ অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, শাক্ত ভক্তগণ ভক্তিরসের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। মনে পড়িল, মোগল পাঠানের ঘোরতর দ্বন্দ্বের সময়ে যখন দেশের সর্ব্বত্র বিভীষিকা, সর্ব্বত্র অরাজকতা, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের সাজির উপর পারিজাত কুসুম সংগৃহীত হইয়াছিল। মনে পড়িল, যখন দেশে সমাজ ছিল না, ধর্ম্ম ছিল না, যখন ধর্ম্মের নামে পঞ্চ ম-কারের উপদ্রবে গ্রাম পল্লী পিশাচ-তাণ্ডবে মথিত হইত, তখনই শ্রীচৈতন্যের শ্রীমুখ হইতে হরিনাম বাহির হইল। ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব; ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে এমন কীর্ত্তন নাই, এমন পদাবলী নাই। তাই আমার যাহা, আমার আমিত্বের যাহা, আমার জাতিগত বৈশিষ্ট্য যাহা, তাহারই আহরণ উদ্দেশ্যে আমি সাহিত্য-সম্মিলনের পবিত্র অঙ্গনে গড়াগড়ি দিতেছি। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বিভব, বাণিজ্য, স্বতন্ত্রতা, যাগ যজ্ঞ, বেদ বেদাঙ্গ, সব ভুলিয়া, সব ছাড়িয়া আমি শ্যাম শ্যামার অমৃত-ভাণ্ডের উপরে মক্ষিকারূপে বসিয়া আছি। দিনকতক বিলাতী সভ্যতার মোহে আত্মহারা হইয়া এক বার এ ভাণ্ড ছাড়িয়া উড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বৈষ্ণবতার পদ্মের মধুর মোটা রসের টানে আমার পাখা জড়াইয়া গিয়াছে; এখন বুঝিয়াছি—মধুর রস এবং ভক্তি আমার বাঙ্গালীত্বের সার হইয়াছে। আমার ভাষার ভাণ্ড এই রসমাধুর্য্য, এই ভক্তি-বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে। এই ভাণ্ডের উপর আর কাহারও দাবী দাওয়া নাই;—বিজেতা ইহাকে অধিকার করিতে পারেন নাই, পারিবেনও না; বিদেশী ইহাকে বিগড়াইতে পারে নাই, কখনও পারিবেও না। ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব, বাঙ্গালার খাসদখল, বাঙ্গালীত্বের খাস তালুক—খাস মহল। যে মা বলিয়া ডাকিতে জানে ও পারে, যে শ্যামা বঙ্গভূমির ক্রোড়ে শুইয়াছে, সে এণ্টনী খ্রীষ্টানই হউক, দরাব খাঁই হউক, পরাগল খাঁই হউক, মাইকেল মধুসূদন হউক, আর রবীন্দ্রনাথই হউক—সে বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর। এখানে জাতি নাই, ধর্ম্ম নাই, সমাজ নাই—সবাই মায়ের সন্তান, সবাই ভাই। কথায় আছে, মা বাঁচিয়া থাকিলে ছেলে মরে না—ছেলের মরিতে নাই। ভাষা-জননী যত দিন বাঁচিয়া আছেন, তত দিন বাঙ্গালীর ছেলে মরিবে না—তাহাকে মরিতে নাই। অতএব বুঝিলাম, মায়ের 'চিরঞ্জীব' আশীর্ব্বচনের মূল্য কত।

সুতরাং বুঝিলাম—সাহিত্য-সম্মিলনে মরণভয় নাই। এখানে আসিলে কাহাকেও মরিতে হয় না। যদি মরণই নাই, মরণই হইবার নহে, তখন জীবনের পরিমাণটা করিব না কেন! শুনিয়াছি—বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির কৃপায় শুনিয়াছি—গোপালদেবের সময়ে আমি বাঙ্গালী ছিলাম; মাৎস্য ন্যায় করিয়া গোপালকে সম্রাট্ করিয়াছিলেন। কালিদাসের সময়ে ছিলাম—প্রবলরূপেই ছিলাম, বাল্মীকির সময়েও ছিলাম, মহাভারতের যুগেও ছিলাম, অতীতের তিন হাজার বৎসর কাল এই সুহ্মে, এই বরেন্দ্রে, এই রাঢ়ে, এই প্রাগ্‌জ্যোতিষে নিশ্চয় ছিলাম। তাহার পর হইতেই আছি—বৌদ্ধের বিহারে আছি; জগদ্দলায় আছি, তিব্বতে আছি, মহাযানের সাহায্যে নানারূপে আছি, নানা ভাবে আছি; তাহার পর শ্যামের বংশীরবের আকুলতায় আছি, শ্রীচৈতন্যের প্রমত্ত ভক্তিতে আছি, বৈষ্ণবের সাহিত্যে আছি, মুকুন্দরাম ঘনরাম রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রে আছি, শেষে ঈশ্বরচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ভাষার উত্তাল উর্ম্মিলায় নাচিয়া নাচিয়া বাঁচিয়া আছি। যত জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে, ততই মাতা ধরিত্রী দেবী তাঁহার কুক্ষিগত অতীতের অসংখ্য প্রহেলিকা আমাদের নয়নগোচর করিবেন, ততই আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব, কেমন ছিলাম, কি ছিলাম—কি হইয়াছি এবং কেমন থাকিব। আমার ভূত ভবিষ্যতের ঈক্ষণযন্ত্র সাহিত্য-সম্মিলন, আমার ত্রিকালব্যাপী অবস্থার পরিচায়ক সাহিত্য-সম্মিলন,—ইহার মত আমার আর ত কোন নিধি নাই। রাখ, রাখ, এ নিধি অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখ।

আমার সাহিত্য-সম্মিলন! এখানে আমার অনুমতি ছাড়া আর কেহ আসিতে পারে না। আমার দুঃখের, দারিদ্র্যের, পাতিত্যের, সজীবতার সম্বল, আমার যুগে যুগের উত্থান পতনের চিত্রগুপ্তের দপ্তর, আমার ভাব অভাবের, সরসতার এবং নীরসতার, সংযমের এবং বিলাসের আশ্রয়স্থল—আমার সাহিত্য আমারই। উহার কলঙ্ক আমার, উহার গৌরব আমার, উহার মাধুরী আমার, উহার উৎকটতা আমার, উহার সহিত আমার আমিত্ব ওতপ্রোত ভাবে বিরাজিত। মমত্বের এমন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আমি এবং আমার ছাড়া আর ত কেহ বিরাজ করিতে পারে না। তাই উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম, বাঙ্গালার যে স্থানেই বাঙ্গালীর সাহিত্য-সম্মিলনের বৈঠক বসিবে, তাহাই আমার, আমিই সেখানে। পূর্ব্বের ডবাক হইতে

পশ্চিমের কৌশিকী নদী পর্য্যন্ত, উত্তরে হিমগিরির তুষার-মুকুট হইতে দক্ষিণে সাগরোর্ম্মির নীল জলবিস্তার পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে আমার আমিত্ব বৃক্ষগাত্রে, পুষ্পপত্রে, নদী-সৈকতে, জলতরঙ্গে, নগরে গ্রামে, কেদারে কান্তারে, পর্ব্বতচূড়ায়, উপত্যকায়,—সর্ব্বত্রে এবং সর্ব্বস্বে যেন খচিত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই আমিত্বের লেখা ভাষার ঝঙ্কারে ফুটিয়া উঠিয়াছে—নিত্য মুখর হইয়া আছে। এই বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্মিলনে "আমি দেখি আর তুমি দেখ মন, আর যেন কেউ না দেখে" এই দ্বৈত ভাবই নিত্য বিরাজিত। এইখানে আবেদন নাই, প্রবেদন আছে, অভাব নাই, নিবেদন আছে। দেবতার পূজা কি না, নৈবেদ্য থাকিবে বৈ কি!

ইহাই আমি,—ইহাই আমার। হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ—আমি যাহা কিছু হই না কেন, আমি বাঙ্গালার যখন, বাঙ্গালী যখন, তখন আমার সব। আমার বলিয়া সোহাগ করিবার এমন সামগ্রী আর ত পাইব না। এই ভাষায়, এই সাহিত্যে সাড়ে আঠার আনা আমারই অধিকার। এই আমিত্বটাকে, আমার অধিকারকে আমি বড় করিয়া লইব না কেন! রাজার ছেলে একটা ছোট্ট বাগানে আশৈশব যৌবন পর্য্যন্ত জীবনের অর্দ্ধেকটা কাটাইয়াছিল। পরে সে যখন রাজ্য পাইল, তখন সে রাজ্য দেখিতে যাইয়া বুঝিল—সে কত বড়, সে কেবল বাগানের মালী নহে। আমাদেরও কতকটা সেই দশা ঘটিয়াছিল; আমরা যে যেখানে ছিলাম, সে সেইখানকার লোক বলিয়া তুষ্ট ছিলাম;—এখন চট্টগ্রাম হইতে মালদহ, জলপাইগুড়ি হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত দেখিতেছি এবং বুঝিতেছি যে, আমি কেবল রাঢ়ীয় নহি, বারেন্দ্র নহি—আমি বাঙ্গালার বাঙ্গালী। আমার ভাষা, আমার সাহিত্য, আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি; জাতির ন্যস্ত ধন। সাহিত্য-সম্মিলন এই ভাবের উদ্বোধন আমাদের মনের মধ্যে করিয়া দিতেছে। আগে আমি বাঙ্গালার বাঙ্গালী হই, তাহার পর ভারতবর্ষের ভারতবাসী হইব। বলিয়াছি ত—কত বারে কত কাগজে লিখিয়াছি, ভারতবর্ষ বিরাট্ সৌরমণ্ডলসদৃশ, উহার এক একটি প্রদেশ উহার এক একটি গ্রহ উপগ্রহ; সংস্কৃত সাহিত্য, বিশাল পৌরাণিক ধর্ম্ম বা ভারতীয়তা উহার মাধ্যাকর্ষণ, এই দুই শক্তির প্রভাবে ভারতবর্ষ এক হইয়া আছে। উহার গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী,

নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, সপ্ত নদ নদী, সপ্ত বন্ধনীসদৃশ ; উহার কাশী, কাঞ্চী, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, প্রভাস, পুষ্কর, গয়া, জগন্নাথ, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি তীর্থসকল উহার এক একটি স্নায়ুমণ্ডলী (ganglion), অনুভূতির কেন্দ্র। এই ভারতবর্ষের এক একটা অঙ্গ আমরা বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী সৌরাষ্ট্রীয় ; আমরা প্রত্যেকে পুষ্ট এবং সবল হইলে সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট এবং সবল হইবে, ভারতবর্ষের বিরাট্ সমাজ-শরীরে শক্তি এবং বল সঞ্চারিত হইবে। তাই এস বাঙ্গালী, আগে আমরা ভাষার ও সাহিত্যের সাহায্যে খাঁটি বাঙ্গালী হই, তাহার পর খাঁটি ভারতবাসী হইবার চেষ্টা করিব। সাহিত্য-সম্মিলন আমাদিগকে বাঙ্গালীত্বের উপাদান যোগাইয়া দিতেছে ; সাহিত্য-সম্মিলন আমাদিগকে ভারতবাসী হইবার প্রশস্ত পথ দেখাইয়া দিতেছে। সাহিত্য-সম্মিলনের জয় হউক।

নাঃ—একা আর থাকিব না, একা আর থাকা যায় না। আমি চিরকালই দশ জন লইয়া ঘর করিয়াছি, আমি আর কি একা থাকিতে পারি? কিন্তু দিনকয়েক একা থাকিয়া আমার দশ জনকে আমি হারাইয়াছিলাম। আবার তাহাদিগকে খুঁজিয়া লইতে হইবে। সে অন্বেষণের চেষ্টায় সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্ভব ; সে অন্বেষণের চেষ্টায় ভগবান্ রামকৃষ্ণের শিষ্যদিগের মধ্যে দরিদ্র-নারায়ণের প্রতিষ্ঠা, সেবাব্রতের উদ্বোধন ; সে অন্বেষণের চেষ্টায় বাঙ্গালার বাগিচায় কত অমৃতময় ফল যে ফলিতেছে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। আর একা থাকিব না, আর একা থাকা যায় না। কে আমায় ডাকিতেছে, শ্যামের বাঁশীর রবে, মনোমাঝে এবং বনমাঝে উদাস গীতির ঝঙ্কার তুলিয়া কে আমায় ডাকিতেছে! বলিতেছে,—এস এস, আমার কাছে এস, আমার কোলে বস। শুন শুন আমার বাঁশী কি বলিয়া ডাকে, সেই ডাক শুনিয়া, সেই পথের পথিক হইয়া আমার কাছে এস। আমার বাঁশী বলে—জয় রাধে, শ্রীরাধে—আরাধনার জয় হউক, সাধনা শ্রীসম্পন্না হউন। আমি সর্ব্বব্যাপী ; সর্ব্বজীবে, সর্ব্বপ্রাণীতে আমি, আমার আরাধনা করিতে হইলে সর্ব্বজীবের আরাধনা করিতে হইবে, সর্ব্বপ্রাণীর সেবা করিতে হইবে। আমি বেদ, আমি ভাষ্য, আমি বাণী, আমি বিদ্যা, এই সকলই আমার। আমার কাছে আসিতে হইলে এই বাণীর শ্রীসম্পৎখচিত পথে আসিতে পার। আমার কাছে আসিতে হইলে প্রেম চাই—একনিষ্ঠা কলঙ্ককে গৌরবের আভরণ

করিয়া লইবে, কৃষ্ণকলঙ্ককে শ্লাঘায় চন্দনলেপে পরিণত করিয়া লইবে। সে প্রেমে কেবল মধুর রসের স্ফুরণ হইবে, যে রূপে আমায় দেখিবে, সেই রূপকে মাধুরীমণ্ডিত করিয়া লইবে। রোগের আবরণেই থাকি, দারিদ্র্যের আবরণেই থাকি, কৌৎসিত্যের অবগুণ্ঠনেই থাকি বা পাতিত্যের মসীলেপেই আত্মগোপন করিয়া থাকি, আমাকে যে আবরণের মধ্যে দেখিয়া চিনিবে, সেই আবরণকেই সপ্রেমে আলিঙ্গন করিয়া বুকে তুলিতে হইবে। আমি করুণা, আমি অনুকম্পা, করুণার পথেই আমাকে ধরিতে হইবে। তোমার ভাষার স্তরে স্তরে আমার করুণার ফল্‌গুধারা অন্তঃসলিলে বহিয়া যাইতেছে, মহাজনব্যবহৃত সেই ভাষার ভেলা অবলম্বনে সংসারের এই তীব্র লবণসাগর পার হইয়া আমার কাছে এস। শুন শুন, আবার বাঁশী ডাকে—জয় রাধে, শ্রীরাধে, গৌড়ের নিত্য শ্যামায়মান কেদার-কান্তারে, প্রতি লতাকুঞ্জে গৌড়সারঙ্গ সুরে ঐ বাঁশী ডাকে—জয় রাধে, শ্রীরাধে! দোলপূর্ণিমার মদনোৎসবের অনুরাগরক্তিম আভায় প্রফুল্ল হইয়া নিসর্গসুন্দরীর কর্ণবলয়কে ঝঙ্কৃত করিয়া ঐ বাঁশী ডাকে—জয় রাধে, শ্রীরাধে! বসন্তের নব জীবনের নবোন্মাদে প্রমত্ত হইয়া, বৃক্ষ লতা পাতার নবীন কিশলয়গুচ্ছকে কম্পিত করিয়া, ঐ বংশীরব ছুটিয়া বলিয়া যায়—জয় রাধে, শ্রীরাধে। রাঢ় ও বরেন্দ্রের অতীত এবং বিস্মৃত স্মৃতির স্তূপ-সকলের উপর দিয়া মধ্যাহ্নের বায়ু ধূলি উড়াইয়া কাঁদিয়া বলিয়া গেল—জয় রাধে, শ্রীরাধে! বাঙ্গালার ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত গ্রাম পল্লীর শ্মশান-স্তব্ধতাকে যেন দীর্ণ করিয়া, ফেরুপাল হাহা রব করিয়া যেন ইঙ্গিত করিতেছে,—বল, জয় রাধে, শ্রীরাধে! আরাধনাই সার, সাধনাই জীবন, শ্রীরাধাই জীবের ইষ্টদেবী। এই রাধানামের সাধা বাঁশী বাজাইয়া জয়দেব হইতে ব্রজাঙ্গনার মধুসূদন পর্য্যন্ত ভাষার মধ্যে ভাবময় বৃন্দাবনের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই রাধানামের সাধা বাঁশীর আবার প্রতিধ্বনি করিতে পারিলে, বঙ্গের শ্মশান আবার শ্যাম কুঞ্জে পরিণত হইবে। এ নাম একা করিতে নাই,—সখা সখী মিলিয়া, বন্ধু বান্ধব এক হইয়া, বঙ্গব্রজের ভাব-বল্লবী-বল্লবগণকে সম্মিলিত করিয়া, রাখাল বালক-পরিবৃত হইয়া এ নাম করিতে হয়। যখন মনোমাঝের এবং বনমাঝের বংশীরব আমাদের কাতর কণ্ঠের উদ্গিরিত ধ্বনির সহিত এক সুরে ধ্বনিত হইবে, তখন যুগলমিলন হইবে।

আর ত একা থাকিতে পারি না, আর ত অমন ভাবে আপনি মুগ্ধ থাকিতে পারি না, আর ত দেহ লইয়া এবং ব্যর্থ উপার্জ্জন লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারি না। ঐ—

"একলা এসে কদমতলায়,
ডাকছে রে ভাই—শুন না!"

এক বার শুন বাঙ্গালী, শ্রমণময় হইয়া পাগলের প্রাণ লইয়া এক বার শুন! শুনিলে আর থাকিতে পারিবে না, ছুটিয়া যাইয়া শ্রীচরণে গড়াগড়ি দিতেই হইবে। ভাষার ডাক, ভাবের ডাক, রসের ডাক,—এক বার শুন! তোমার সাধ-সোহাগের স্বপ্নের রতন, তোমার ভাবরসের সুখের পুত্তলি,—যাহার আকষর্ণে তুমি সব ভুলিয়াছিলে;—মোগল পাঠানের উপদ্রব, কালাপাহাড়ের ধ্বংসলীলা, যাহার দুলালে তুমি সকল ব্যথা পাসরিয়াছিলে,—সেই ভাষা, সেই সাহিত্য, তোমার মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণরূপে, তোমার মানবতার কদম্বমূলে দাঁড়াইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন। আর কি একা থাকা যায়! একা থাকা যায় না বলিয়াই জয় রাধে শ্রীরাধে বলিয়া যাত্রা করিলাম। আমার আরাধনা আমার ইষ্টের পার্শ্বে শোভা পাইলে, যুগল-মিলন হইলে আমার জীবন সার্থক হইবে, আমার বাঙ্গালীত্ব ফুটিয়া উঠিবে—বঙ্গ-শ্মশান বৃন্দারণ্যের শোভা ধারণ করিবে। জয় জয় রাধে—শ্রীরাধে! ('প্রবাহিণী,' ১৭ ফাল্গুন ১৩২১)

না এ-দিক্, না ও-দিক্

কথায় আছে—"খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল কল্লে এঁড়ে গরু কিনে।" আমরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়া পল্লীবাসে সুখে দিনাতিপাত করিতেছিলাম; মোটা ভাত, মোটা কাপড়, গাড়ু, গামছা, খড়ম, খড়ের ঘর, বটের ছায়া এবং পুকুরপাড়, কবি, পাঁচালী, কীর্ত্তন লইয়া অতি সুখেই দিনাতিপাত করিতেছিলাম। দীর্ঘ জীবন, নীরোগ দেহ, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, পান ভোজন, উপবাস, পূজা পাঠ উৎসব লইয়াই আমরা সুখে ছিলাম। জোলার কাপড় এবং জোলার গামছা আমাদের লজ্জা নিবারণ করিতে পারিত, এক আধখানা চন্দ্রকোণা

ধুতি বা এক আধখানা গরদ কাহারও কাহারও বেতের পেটরায় লুকান থাকিত, কাজে ভজে তাহাকে বাহির করা হইত; একখানা বনাতে তিন পুরুষ বাবুয়ানি করিয়া শীতের ত্রাণ হইত; কদাচিৎ এক আধখানি কাপড় ও চাদর এবং একটা অঙ্গরক্ষা ধোপদস্ত করিয়া রাখা হইত, যাহারা কাজী মুফতীর সহিত সাক্ষাৎ করিত, তাহারাই এক আধ বার উহার ব্যবহার করিত। লোকে বেশ খাইতে পারিত, খাওয়াইতেও পারিত। পুঁটিয়ার জনার্দ্দন শর্ম্মাকে কক্‌রেল সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"ব্রাহ্মণ, তোমার পেশা কি?" ব্রাহ্মণ মাথা চুলকাইয়া উত্তর করিয়াছিল,—"হুজুর, ভোজন। কেবল নিমন্ত্রণ খাইয়াই আমার দিন কাটে, সুতরাং ইহাই পেশা।" তখন ম্যালেরিয়া ছিল না, উপবাস করিয়াই রোগ সারিত, একটু বাড়াবাড়ি হইলে ঠাকুরমার ন্যাতা ক্যাতার হাঁড়ি খুঁজিতে হইত, বড় জোর গ্রামের হাতুড়ে কবিরাজ ডাকিলেই পর্য্যাপ্ত হইত। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, শাকান্ন খাইয়া গ্রামে থাকিত, কখনও বিদেশে চাকরী করিতে যাইবার চিন্তাও স্বপ্নে করিত না; তবে ব্যবসায় বাণিজ্যে বাঙ্গালী পাটনা কাশী পর্য্যন্ত ছুটিত, সকল কষ্ট স্বীকার করিত, চাকরির ভাবনা জীবনে ভাবিত না। এই অবস্থাটা মন্দ ছিল, তাহা বলিতে পারি না; তবে সুখের, সন্তোষের, তৃপ্তির, স্থিতির অবস্থা যে ছিল, তাহা বলিব। উহাকে উন্নতির অবস্থা না বলিতে পার, পরন্তু উহা স্থিতির অবস্থা, পরাধীন জাতির আত্মরক্ষার, জাতির বিশিষ্টতা রক্ষার প্রকৃষ্ট অবস্থা, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। ঐ ভাবে আমরা সাত শত বৎসর মুসলমানের পরাধীনতা অম্লান মুখে সহিয়া ছিলাম।

ইংরেজের আমলে প্রথম সর্ব্বনাশ হইল—নগদ টাকার অতি-প্রচলনে; যে দেশের হাটে বাজারে কড়ি চলিত, সে দেশের হাটে বাজারে সোনার ও রূপার টাকা চলিতে আরম্ভ হইল। দ্বিতীয় সর্ব্বনাশ হইল—চাকরি সস্তা হইয়া; একটু আধটু ইংরেজী শিখিলে যে-সে বাঙ্গালীর মাসিক কুড়ি হইতে পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরি জুটিতে লাগিল। মুসলমানের আমলে চাকরি ছিল বটে, কিন্তু সে চাকরির বেতন ছিল দুই দশ বিঘা জমি জায়গীর আর হদ্দমুদ্দ মাসিক পাঁচ তঙ্কা সেলামি। তাহার পরিবর্ত্তে ইংরেজ বাঙ্গালীকে শতাবধি টাকা বেতনের চাকরি দিতে লাগিলেন। তখন টাকা মহার্ঘ, জিনিস সস্তা; তখন টাকায় এক মণ চাউল, দেড় সের

ঘৃত, চারি সের সর্ষপতৈল এই কলিকাতার বাজারেই পাওয়া যাইত। ফলে, চাকরির মোহটা বাঙ্গালীর পক্ষে বেজায় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর তৃতীয় সর্ব্বনাশ হইল—দেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের বিষম প্রাদুর্ভাব হওয়াতে। প্রথমে ম্যালেরিয়া প্লেগের মতন দেখা দিয়াছিল। উলা, গুপ্তিপাড়া, হালিশহর প্রভৃতি নগরসদৃশ গণ্ডগ্রামসকল মনুষ্যশূন্য হইয়া গেল। যাহারা বাঁচিল, তাহারা দেশ ছাড়িয়া পলাইল, পশ্চিমে চাকুরির চেষ্টায় গেল; বাঙ্গালীর হাজার বৎসরের পল্লীবাস এবং পল্লীসমাজ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। বাঙ্গালী ভদ্রলোকের চাষ-বাস গেল, গ্রাম পল্লী গেল, পুরাতন জীবন গেল,—রহিল দেহ এবং মেধা। এই দেহ এবং মেধা লইয়া বাঙ্গালী যত দিন পারিল বিহার, উড়িষ্যা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি দূরদূরান্তর স্থানে যাইয়া চাকরি ওকালতি প্রভৃতির সাহায্যে অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিল এবং ব্রহ্মডাঙ্গায় বাস করিতে লাগিল। বাঙ্গালী কখনই অন্ন কিনিয়া খায় নাই; সেই বাঙ্গালী কেবল চাকুরিনবীস হইয়া অন্ন কিনিয়া খাইতে লাগিল; ইংরেজী শিখিয়া ইংরেজের অনুকরণে কাপুড়ে বাবু হইয়া উঠিল। উত্তরভারতে বাঙ্গালীই ইংরেজী সভ্যতার প্রথম প্রচারক। বাঙ্গালীই প্রথমে ইংরেজী ঔষধ পথ্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে, বাঙ্গালীর দেখাদেখি ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশের লোকেরা এখন ইংরেজ সাজিতেছে, বিলাতী ঔষধ পথ্য ব্যবহার করিতেছে, সোডা লেমনেড বরফ সমাজে চালাইতেছে। এখন আমাদের নিজের কিছুই নাই; সাধারণ ব্যবহারের সকল সামগ্রী, নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল জিনিস এখন ইউরোপ হইতে আমদানি হইতেছে। ইউরোপ হইতে সামগ্রী না আসিলে রোগীর পথ্য জুটে না, ঔষধের ব্যবস্থা হয় না, লজ্জানিবারণ হয় না; ছুঁচটি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। এখন আমরা টাটের শালগ্রাম, মোমের রাধা হইয়াছি; ইউরোপ সাজাইলে সাজি, খাওয়াইলে খাই, রোগের চিকিৎসা করিলে চিকিৎসিত হই। এখন আমরা দাঁড়ের পাখী; নড়িতে পারি না, উড়িতে পারি না, নিজের আহার নিজে সংগ্রহ করিতে পারি না, প্রদীপ জ্বালিতে পারি না, নিজের হাতে পাখার বাতাস খাইতে পারি না। এখন আমাদের অন্নপানের বিচার নাই, সাজ পরিচ্ছদের বিচার নাই; ইউরোপ যাহা খাওয়ায়, তাহাই খাই, যাহা পরায়, তাহাই পরিধান করি।

সেই ইউরোপে এখন ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। যে ভাবে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে মনে স্থির ধারণা হয় যে, এ যুদ্ধের পরিণামে ইউরোপের শিল্প বাণিজ্য নষ্ট হইবে, সভ্যতা ভব্যতা চূর্ণ হইবে। ইউরোপের পর্য্যাপ্ত পুরুষ থাকিবে কি না, তাহাই সংশয়ের বিষয়। জর্ম্মন জাতি ব্রিটিশ, রুষ ও ফরাসী জাতিকে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইংরেজ জর্ম্মন জাতিকে অনাহারে মারিবার আয়োজন করিতেছেন। এই ছয় সাত মাস কাল যুদ্ধ চলিতেছে, ইহারই মধ্যে অনেকের অনুমান—প্রায় কুড়ি লক্ষ যোদ্ধা প্রাণ হারাইয়াছে; অথচ উভয় পক্ষের যোদ্ধাবর্গ এখন বলিতেছেন যে, যুদ্ধের মতন যুদ্ধ এখনও হয় নাই, এইবার আসল যুদ্ধ হইবে। জর্ম্মনী ত কেবল মানুষ মারিবার চেষ্টায় আছেন, বীরধর্ম্ম রক্ষা, বীরত্বের প্রকাশ—এ সকল ক্ষাত্র ধর্ম্মের প্রতি জর্ম্মন জাতির দৃষ্টি নাই। সকল পক্ষই কেবল মানুষ মারিবার কলকব্জাই তৈয়ার করিতেছেন—জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে কেবল নির্দ্দয় নির্ম্মম ভাবে মানুষ মারাই চলিতেছে। জর্ম্মনী বলিতেছেন—ব্রিটিশ, ফরাসী ও শ্লাভ জাতি ইউরোপে থাকিতে আমার জগৎজোড়া প্রাধান্য হইবে না। মিত্রপক্ষের লেখকগণ বলিতেছেন যে, জর্ম্মন জাতি প্রবল থাকিতে ইউরোপের সভ্যতা রক্ষা পাইবে না। অতএব War to the finish অর্থাৎ অপর পক্ষকে নির্ম্মূল করিবার উদ্দেশ্যেই এ যুদ্ধ চালাইতে হইবে। যুদ্ধ চলিতেছে যে সকল অস্ত্রের সাহায্যে, সে সকল অস্ত্রের চক্ষুলজ্জা নাই—কোন পক্ষই কোন পক্ষকে দেখিতে পায় না; আট দশ মাইল দূর হইতে গোলা আসিতেছে, আর যেখানে সে গোলা পড়িতেছে, সেই স্থানটাই শ্মশান করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং এ যুদ্ধে দয়া মায়া নাই, মনুষ্যত্বের সঙ্কোচ নাই। ইহা যন্ত্রের লড়াই—নির্ম্মম, কঠোর, নির্দ্দয়। এ লড়াইয়ের ফলে ইউরোপ প্রায় জনশূন্য হইয়া উঠিবে।

এ লড়াইতে যেমন লোকক্ষয় হইতেছে, তেমনই অর্থব্যয় হইতেছে। সকল পক্ষের এখনই প্রত্যহ সাড়ে সাত হইতে আট কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। সাত মাস কাল এই ভাবে অর্থব্যয় হইয়া গিয়াছে, পরে আঁরও অর্থব্যয় হইবে। এমন ভাবে অর্থব্যয় চলিতে থাকিলে জাতির মূলধন যে একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। তখন কি দিয়া শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার ঘটাইবে? কল কারখানায় মজুর ও শিল্পী থাকিবে না,

কলওয়ালাদের হাতে মূলধন থাকিবে না। শিল্প বাণিজ্য চালাইবে কে? চলিবেই বা কিসে? ইহারই মধ্যে চিন্তা উঠিয়াছে যে, আগামী বৎসরে ভারতবর্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিলাতী কাপড় আমদানি হইবে কি না। যদি না হয়, যদি ঘোরতর যুদ্ধে বিলাতের শিল্পিসকল ব্যস্ত থাকে, তাহা হইলে ভারতবাসীকে প্রায় নগ্ন থাকিতে হইবে। জাপান ও আমেরিকা যদি ভারতবর্ষে মাল আমদানি করেন, তবেই ভারতবাসীর লজ্জানিবারণ সম্ভবপর হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের কাঁচা মাল না বিকাইলে ভারতবাসী কাপড় কিনিবে কি দিয়া? পাটের বাজার ত মাটি। একা জর্ম্মনী প্রতি বৎসর বিশ কোটি টাকার পাট কিনিত। ভারতের অন্য কাঁচা মাল অর্দ্ধেকের উপর জর্ম্মনী ও অষ্ট্রীয়া কিনিত। সে পক্ষে ত মাল কাট্‌তির কোন সম্ভাবনা নাই। নূতন খরিদ্দার জুটিতে বিলম্ব হইবে। বিশেষতঃ যাহারা নূতন খরিদ্দার হইবে, তাহারাও যদি এই যুদ্ধের আবর্ত্তে আসিয়া পড়িয়া যায়! যদি জাপান, মার্কিন, ইতালী, গ্রীস—পৃথিবীর সকল সভ্য জাতিই এই মহারণের ভীষণ আবর্ত্তে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের তুলা, গম, পাট, নীল, ধান, চাউল, মসিনা প্রভৃতি খরিদ করিবে কে? ভারতবাসীর এত কলকব্জা নাই যে, এত সামগ্রীর ব্যবহার করিতে পারে। ভারতবাসীর এত টাকাও নাই যে, ভারতজাত সকল কাঁচা মাল খরিদ করিতে পারে। এই ছয় মাস যুদ্ধের ফলে, জর্ম্মনী হইতে যে সব রসায়ন পদার্থ আসিত, ঔষধ, পথ্য, রং প্রভৃতি আসিত, তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য অনেকের বিশেষ কষ্ট হইতেছে, ঔষধ পথ্য বেজায় দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। আরও ছয় মাস লড়াই চলিলে দশ দিক্ অন্ধকারময় দেখিতে হইবে।

আসল কথাটা কি জান? ইউরোপের সভ্যতা ধ্বংসমুখে যাইতেছে। ভগবান্ ইউরোপের সভ্য জাতিসকলকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী করিয়াছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা ইউরোপ যতটা পাইয়াছিল, এত আর কেহ পায় নাই। কিন্তু ইউরোপের কোন জাতি এই বৈভবের সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই। প্রথমে হিস্পানী জাতি বড় হইল, কিন্তু উচ্চ পদে স্থির থাকিতে পারিল না। এই জাতি আমেরিকার অসভ্য বর্ব্বর জাতিদের সহিত যে প্রকার আসুরিক ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার ফলে হিস্পানী

জাতির অধঃপতন হইল। তাহার পর ফরাসী বড় হইল বটে, কিন্তু স্বীয় প্রাধান্য বজায় রাখিতে পারিল না। শেষে টিউটন জাতি বড় হইল; কিন্তু সে প্রাধান্য কেবল অর্থপিপাসা নিবৃত্তির জন্য পর্য্যবসিত হইল। তাহার প্রায়শ্চিত্ত এখন ঘোরতর ভাবে চলিতেছে। পরে বোধ হয় শ্লাভ জাতি বড় হইতে পারে। কে জানে কি হইবে? তবে উনবিংশ শতাব্দীতে যে অপূর্ব্ব সভ্যতা ইউরোপ গড়িয়া তুলিয়াছিল, যে জ্ঞান বিজ্ঞান ও সায়েন্সের চর্চ্চায় ইউরোপ জগজ্জয়ী হইয়াছিল, তাহা এত দিনে এইবার নষ্ট হইবে। উহার চিহ্ন মাত্র আর থাকিবে না। তবে যাহা গড়িতে হাজার বৎসর কাটিয়াছে, তাহা ভাঙ্গিতে শত বৎসরও লাগিবে। এই বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপের খ্রীষ্টানী সভ্যতা একরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে। ইহার স্থানে আর একটা নূতন কিছু হইবে; সে নূতন সামগ্রীতে বা সভ্যতায় পুরাতনের অনেকটা থাকিবে বটে, কিন্তু নূতন নামে, নূতন ভাবে থাকিবে। ভগবানের রোষের ফলে এ যুদ্ধ বাধিয়াছে, বিলাসের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে এ যুদ্ধ বাধিয়াছে, নাস্তিকতার উচ্ছেদহেতুই এ যুদ্ধ চলিতেছে। যত দিন বিলাস, পাপ ও নাস্তিকতা প্রবল থাকিবে, তত দিন এ যুদ্ধ-বহ্নি তুষানলের আগুনের মত জ্বলিতেই থাকিবে। দর্পহারী মধুসূদন ইউরোপের দর্প খর্ব্ব করিতেছেন। কোন পক্ষে দর্পের লেশ মাত্র থাকিতে এ যুদ্ধ চলিবে—লোকক্ষয় হইবে, সোনার সংসার শ্মশানে পরিণত হইবে।

মোসলেম সভ্যতার প্রাধান্যের আমলে আমরা বাঙ্গালী সংযম ও ত্যাগের গণ্ডি দিয়া সেই গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া কীর্ত্তন আনন্দে, ভক্তির চর্চ্চায় বিভোর থাকিতাম। তাই আমরা তখন জাতীয় বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া স্বতন্ত্রভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিয়াছিলাম। লোদী, খিলজি, গোলাম, তোগলক্, শূর ও মোগলদের উত্থান পতনে আমাদের পতন ঘটে নাই। আমাদের রাজসিংহাসনে যে পারিত, সেই বসিত, আমরা সিংহাসনের অধিকারীর জাতিবিচার করিতাম না। যে রাজা হইত, তাহাকেই কর দিতাম ও সেলাম করিতাম। আর গ্রামে বসিয়া 'কে বা শুনাইল শ্যামনাম' বলিয়া কীর্ত্তন আনন্দে বিভোর থাকিতাম। মুমূর্ষু রোগীকে যেমন এখন ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখে, আমাদেরও তেমনি কীর্ত্তনের ব্রাণ্ডি বা মদিরা পান করাইয়া সজীব অথচ বিভোর

করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা তখন কৌপীন বহির্ব্বাসে তুষ্ট ছিলাম, চিঁড়ে-দই পাইলেই সানন্দে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম। আমাদের লোভ ছিল না, ক্ষোভ ছিল না, আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আমরা সানন্দে একই ভাবে চারি পাঁচ শত বৎসরকাল কাটাইয়া দিয়াছিলাম। এখন ইউরোপের পরামর্শে আমরা গণ্ডি কাটিয়া বাহিরে আসিয়াছি, কাচমূল্যে কাঞ্চন বেচিয়াছি, তৃপ্তি ছাড়িয়া বিলাসকে জীবনের অবলম্বন করিয়াছি; এখন ইউরোপের অধঃপতনে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবেই। তাই গোড়ায় বলিয়াছি—'খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল কল্লে এঁড়ে গরু কিনে।' এই বিলাসের এঁড়ে গরুটি আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। সে দেহ নাই, সে স্বাস্থ্য নাই যে, গাড়ু গামছা লইয়া আবার পল্লীর শীতল আশ্রয় গ্রহণ করি। চাষ বাস করিবার সামর্থ্য হারাইয়াছি, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে তৃপ্ত থাকিবার প্রবৃত্তি হারাইয়াছি; তাহার উপর ম্যালেরিয়া আছেন;—বাঁচিতে জানি না বলিয়াই, আত্মীয় স্বজনকে বাঁচাইতে পারি না বলিয়াই ম্যালেরিয়া আছেন। যদি পুরুষকার থাকিত, সমাজের সংহতিশক্তি থাকিত, তাহা হইলে ম্যালেরিয়াকেও পরাজয় করিতে পারিতাম। আমরা সহরের দাঁড়ের পাখী হইয়াছি; গৃহস্থ ছোলা জল দেয় ত খাই, না দেয় ত ক্যাঁ ক্যাঁ করিয়া চেঁচাইতে থাকি; বিড়াল সাড়া পাইলেই আসিয়া টপ্ করিয়া গিলিয়া খাইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এত কাল এত পরাধীনতার মধ্যে এমন ভাবে বাঁচিয়া রহিলাম, কত কলঙ্ক ও গ্লানি সহিয়া বাঁচিয়া রহিলাম—শেষে কি বাবু সাজিয়া মরিবার জন্য? মুসলমান আমাদের কাফের বলিয়া গালি দিয়াছে, সে গালাগালি গায়ে মাখিয়া দিন কাটাইয়াছি। খ্রীষ্টান, হিন্দু মুসলমান সকলকে নেটিভ বলিয়াছে, পেগান বলিয়াছে, পৌত্তলিক বলিয়াছে, সব সহিয়াছি; কেবল উহার বিলাসের কামড় সহিতে পারি নাই। সেই জন্যই কি খ্রীষ্টান-সভ্যতার বিলয়প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকেও কর্পূরের মতন উপিয়া যাইতে হইবে? এ সন্দর্ভে আমার ইহাই জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসাটি করিব বলিয়াই "মাটি নিবি গো" হাঁকিয়াছি, "জয় রাধে কৃষ্ণ" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছি, সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশে মনের কথা কহিয়াছি,—এবং এইবার বাকী কথা খুলিয়া বলিলাম। যাহাদের ছাঁচতলায় দাঁড়াইয়া সভ্য সাজিয়াছিলে, তাহাদের ত মট্‌কায় আগুন ধরিয়াছে, এখন সে সভ্যতার

শ্লাঘা করিবে কাহার কাছে? ইউরোপের সভ্যতার উচ্ছিষ্ট খাইয়া আমরা বাবু এবং সভ্য। ইউরোপের ভাতের থালে ছাই পড়িতেছে, প্রসাদ খাইবে কোথা হইতে? এই এক যুদ্ধে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, অবাধ বাণিজ্য, ইকনমিক্স, দয়া মায়া, সভ্যতা ভব্যতা সব উড়িয়া গেল। তুমি কি লইয়া থাকিবে? বেলজিয়ম ও ফ্রান্সে জর্ম্মনীর সভ্যতার যে পরিচয় পাইয়াছ, সে পরিচয়ে পরিচিত হইয়া সভ্য সাজিতে ত আর সাধ হয় না। যদি ঐ পরিচয় মিথ্যা হয়, তাহা হইলে যাহারা এমন মিথ্যা রটাইতে পারে, তাহাদিগকেই বা জীবনের আদর্শ কর কেমন করিয়া?

কাজেই বলিতে হয়, আমাদের এখন না এ-দিক্, না ও-দিক্—না ইউরোপ, না ভারতবর্ষ। এখন আমরা দাঁড়াই কোথায়? বাঙ্গালী গোড়ায়—সর্ব্বাগ্রে ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিল, হাটে মামা হারাইয়াছিল। এখন বাঙ্গালীকেই সর্ব্বাগ্রে সামলাইতে হইবে। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের লোক ত নেশায় ভরপুর আছে; জোরে একটা ধাক্কা না পাইলে তাহাদের হুঁস হইবে না। বাঙ্গালী পথ দেখাইলে তাহারা ধাক্কা খাইয়া পরে টলিতে টলিতে আসল পথে আসিয়া দাঁড়াইবে। একটা ওলট-পালট হইতেছে। আমরা গত পঞ্চাশ বৎসরকাল যাহা শিখিয়াছি, যাহা মক্স করিয়াছি, তাহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। হয় অতি পুরাতনের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, নহে ত একেবারে একটা নূতন পথ ধরিতে হইবে। অতিপুরাতন পথ পরিচিত পথ, নূতন পথ অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। ইউরোপ সে পথ এই যুদ্ধের পরে ধরিতে পারে, আমরা বিভ্রান্ত হইয়া নূতন অজানা পথে অগ্রসর হইব কেন? আবার যদি ইউরোপ আমাদেরই সনাতন পথ অবলম্বন করে, তখন কি হইবে? অতএব পূর্ব্বাহ্ণে নিজের ঘর সামলানই আমাদের কর্ত্তব্য। যদি বাঁচিতে চাও, তবে পিতামহীর ক্রোড়ে আবার ফিরিয়া যাও। পিতামহীর আদরে বংশরক্ষা হইবে, জাতির বিশিষ্টতা বজায় থাকিবে। এইটুকু বুঝি বলিয়াই বারে বারে এত কথা কহিতে হয়। ('প্রবাহিণী,' ৮ চৈত্র ১৩২১)

অবতারবাদ

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে অবতার-তত্ত্বের আলোচনা আছে। অবতার অসংখ্য ; কারণ, ভাগবত বলিতেছেন যে, "দেবানাং বিশেষতো বিষ্ণোর্মূর্ত্ত্যন্তরেণ পূর্ণাংশাবেশরূপেণ পৃথিব্যামবতরণং"— দেবতা-সকলের, বিশেষতঃ বিষ্ণুর পূর্ণ বা অংশবিশেষে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতরণের নামই অবতারগ্রহণ। প্রত্যেক দেবতার যখন অবতার হয়, তখন তেত্রিশ কোটি দেবতার অবতার অসংখ্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তিন জনেরই অবতার আছে ; পুরাণে ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব ও শৈব অবতারের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে ; তবে বিষ্ণুর অবতারই অধিক প্রখ্যাতিসম্পন্ন। বিষ্ণুর দশাবতার লোকসমাজে অধিক প্রচলিত হইলেও শ্রীমদ্ভাগবত বাইশটি অবতারের হিসাব দিতেছেন। যথা :—(১) ব্রহ্মা, (২) বরাহ, (৩) নারদ, (৪) নরনারায়ণ, (৫) কপিল, (৬) দত্তাত্রেয়, (৭) যজ্ঞ, (৮) ঋষভদেব, (৯) পৃথু, (১০) মৎস্য, (১১) কূর্ম্ম, (১২) ধন্বন্তরি, (১৩) মোহিনী, (১৪) নৃসিংহ, (১৫) বামন, (১৬) পরশুরাম, (১৭) বেদব্যাস, (১৮) রাম, (১৯) বলরাম, (২০) কৃষ্ণ, (২১) বুদ্ধ, (২২) কল্কী। ইহার মধ্যে জয়দেব-প্রণীত দশাবতার আছেন, তাহা ছাড়া আরও দ্বাদশ জন অবতারের উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া ধরা হয় না ; 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্, পূর্ণস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম।

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যা সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥
ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, অবতার অসংখ্য —ঋষি, মুনি, ভক্ত, ভাবুক, কবি, ব্যাখ্যাতা, সাধক, চক্রবর্ত্তী সম্রাট্, মহাবীর, মহাজ্ঞানী, মহাযন্ত্রী—সবাই এক এক অবতার। যত জীব, তত শিব, প্রত্যেক জীবের মধ্যেই শ্রীভগবান্ বিরাজ করিতেছেন। শ্রীভগবানের অস্তিত্ব ব্যতীত বিশ্বসৃষ্টিই সম্ভবপর নহে। যে জীবদেহে ভগবান্ একটু প্রকটভাবে থাকেন—মেধা, মনীষা, প্রতিভা বা রস যে

জীবদেহে মাত্রাধিক্যে বর্ত্তমান, সেই জীবই ভগবানের অংশাবতার। ভগবান্ই শক্তির আধার, ভাবের আধার, রসের আধার, জ্ঞানের আধার। যে জীবদেহে শক্তি, ভাব, রস বা জ্ঞান অধিক মাত্রায় থাকে, সেই জীবকেই বিশেষভাবে ভগবানের অবতার বলিতে হইবে। সিদ্ধ সাধক মাত্রেই ভগবানের অবতার; পরাক্রমশালী স্বাধীন রাজা মাত্রেই ভগবানের অবতার; কারণ, মনুসংহিতায় স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, রাজা—'মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি'—মহতী দেবতা নরাকারে বিরাজ করিয়া থাকেন। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, জ্ঞান, ভক্তি, শক্তি যেখানেই অধিক মাত্রায় আছে, সেইখানেই ভগবানের অবতার হইয়াছে বুঝিতে হইবে। গীতায় ভগবান্ এই তত্ত্বটি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বেদসকলের মধ্যে আমি সামবেদ, মৎস্যের মধ্যে আমি রোহিত। যথা:—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহং আদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ॥
আদিত্যানাং অহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতাং অস্মি নক্ষত্রাণাং অহং শশী॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥
পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥

এই সকল শ্লোকে ভগবান্ পার্থকে স্পষ্টই বুঝাইয়া দিতেছেন—যেখানে রূপ, গুণ, রসভাব, শক্তি, ঐশ্বর্য্য অধিক মাত্রায় দেখিতে পাবে, জানিও—তাহাই আমি—আমি সেইখানেই বিদ্যমান। যেখানে বিভূতি, যেখানে ঐশ্বর্য্য, সেইখানেই ভগবান্ আছেন বুঝিতে হইবে।

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবং॥

ইহাই হইল সার কথা—ঐশ্বর্য্যসমন্বিত, শ্রীযুক্ত ও প্রভাববিশিষ্ট যে কোন বস্তু দেখিবে, সে সকলই আমার তেজোংশসম্ভব বলিয়া জানিবে। অতএব বুঝা গেল যে, শ্রীভগবানের অবতারের সংখ্যা নাই। কিন্তু বৈষ্ণব পুরাণসকলে ভগবানের দশাবতার প্রশস্ত; শ্রীমদ্ভাগবত বাইশটি অবতারের হিসাব দিয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই তিন দেবতার অবতার আছে বটে, কেবল বিষ্ণুর অবতারই পূজার্হ কেন? ব্রহ্মা সৃষ্টি-শক্তি, বিষ্ণু পালনী শক্তি, শিব সংহারশক্তির আশ্রয়। ইহাঁদের অবতারও উহাঁদের শক্তিসমন্বিত হইবেই। ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, তিনি সৃষ্টি করিবার দেবতা;—নূতন তত্ত্ব, নূতন জ্ঞান, নূতন বিদ্যা, নূতন শিল্প-বিদ্যার, চতুঃষষ্টি কলার যে কলাতে যিনি নূতন কিছু বাহির করিয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মার অবতার। আয়ুর্ব্বেদ, রেখাগণিত, বীজগণিত, চিত্রকলা প্রভৃতির আবিষ্কারক মাত্রেই ব্রহ্মার অবতার। শিবের অবতার সংহারমূর্ত্তি; ধনুর্ব্বেদ, আয়ুধশাস্ত্র, মানুষ মারিবার অসংখ্য কল, বিষঘটিত রসায়ন শাস্ত্র, ধাতব রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্র যাঁহারা বাহির করিয়াছেন, তাঁহারা সবাই শিবের অবতার। পুরাণে পরশুরাম ও কল্কী লইয়া ঝগড়া আছে। শৈব পুরাণে লেখা আছে যে, এই দুইটি শিবের অবতার; বামনও শিবের অবতার। যেখানে কেবল ধ্বংস, কেবল দুষ্টের দমন, সেখানে শিবশক্তির প্রকাশ আছেই। শিব নিত্য ব্রাহ্মণ, কখনই ক্ষত্রদেহে প্রবেশ করেন না। অতএব বামন, পরশুরাম এবং কল্কী তিন জনে ব্রাহ্মণ, তাই শিবের অবতার। তন্ত্র বলেন যে, দাশরথি রাম, যাদব বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ, এই চারি জনই বিষ্ণুর অবতার। নৃসিংহকে তন্ত্র শিবের অবতার বলিয়া ধরিয়াছেন। কারণ, কোন কোন পুরাণের মতে নৃসিংহ জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং তিনি দুষ্টের দমন করিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। যাউক পুরাণ ও তন্ত্রের বিতণ্ডা, এইবার অবতারতত্ত্বটা আরও একটু পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইবে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অর্থাৎ যে যে সময়ে ধর্মের গ্লানি ঘটে এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, হে ভারত, সেই সেই সময়ে আমি লোকসমাজে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। সাধুদিগের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে, দুষ্কৃত পাপী অত্যাচারীদিগের বিনাশসাধন উদ্দেশ্যে এবং সমাজে ধর্ম্ম-সংস্থাপন মানসেই আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। ইহাই হইল অবতারবাদের মূল কথা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীমাহাত্ম্যে সকল দেবতার শক্তি সংহরণ করিয়া মহাদেবী ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নারীরূপেও যে ভগবান্ অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতও স্বীকার করিয়াছিলেন, তাই মোহিনীকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্র বলেন,—নারী যখন জগন্মাতার অংশরূপিণী, তখন জগন্মাতাই নারীরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; পুরুষ দেবতারা নারীদেহ ধারণ করিতে পারেন না। গীতায় আত্মবিভূতির পরিচয় দিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে নারী বলিয়া পরিচিত করেন নাই। অথচ শ্রীমদ্ভাগবত মনোমোহিনীকে শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই সংশয়ের সমাধান আজ পর্য্যন্ত কোন আচার্য্যই ভাল করিয়া করেন নাই। তন্ত্রের পক্ষ হইতে শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ গিরি বলিয়া রাখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আধা কৃষ্ণ আধা কালী হইয়াছিলেন, পুরাদস্তুর নারীরূপ ধারণ করিতে পারেন নাই। ব্রজের লীলায় যখন এমন অঘটন ঘটে নাই, তখন পুরুষোত্তম প্রকৃতির আকার পূর্ণাঙ্গে ধারণ করিতে পারেন না। যেখানেই প্রকৃতি, সেইখানেই মহামায়া, মহীয়সী মাতৃশক্তি; সেইখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি পুরুষোত্তমদিগের স্থান নাই। যখন তন্ত্রের কথার প্রতিবাদ হয় নাই, তখন তন্ত্রের সিদ্ধান্তই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য।

এইবার বুঝিতে চেষ্টা করিব—ধর্ম্মের গ্লানি কাহাকে বলে। কোন ব্যক্তিবিশেষের, সম্প্রদায়বিশেষের, জাতিবিশেষের ব্যবহারে যদি মানব-সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, তাহা হইলেই ধর্ম্মের গ্লানি ঘটিয়া থাকে। যাহা ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম্ম; শক্তির সামঞ্জস্য অবস্থাতেই ধারণার উদ্ভব হয়। গৃহ, বস্ত্র, সামগ্রী, সবই শক্তি-সামঞ্জস্যের সাহায্যে সৃষ্ট। বিরোধী শক্তির সামঞ্জস্য যে শক্তি ঘটাইতে পারে, তাহাকেই ধারণী শক্তি বা ধর্ম্মশক্তি বলে। এই সামঞ্জস্যের অভাবের নামই ধর্ম্মের গ্লানি। রোগসকল দেহধর্ম্মের গ্লানি। পাপ সমাজধর্ম্মের গ্লানি। সাম্যাবস্থার নাশ যাহা

হইতে হয়, তাহাই ধর্ম্মের গ্লানি। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে সাধুর হৃদয় কাতর হইয়া উঠে, সেই কাতর আহ্বানে ভগবান্ স্থির থাকিতে পারেন না, দুষ্কৃতের নাশ ও সাধুর পরিত্রাণের জন্য তাঁহাকে অবতার গ্রহণ করিতেই হয়। সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্—অতিবৃদ্ধি ঘটিলেই সমাজে সাম্য নষ্ট হয়। আর তখনই ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন। বলির অতিদানে সমাজ ভ্রষ্টের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাই ভগবান্‌কে বামন অবতার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই জন্য ভগবান্‌কে দর্পহারী মধুসূদন বলা হয়। হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু আধুনিক "মরালিটির" হিসাবেও দুষ্ট লোক ছিল না, কিন্তু তাহারা অত্যন্ত বৈষ্ণববিদ্বেষী ছিল, তাহাদের বিদ্বেষ সমাজে গ্লানির উদ্ভব করিয়াছিল। কাজেই ভগবান্ নৃসিংহ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাসনকর্ত্তার হিসাবে আওরঙ্গজেব মন্দ লোক ছিলেন না, কিন্তু তিনি হিন্দুর ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন, তাই শিবের অবতার শিবাজীর উদ্ভব। মহারাষ্ট্রের কবিগণ শিবাজীর জন্মকথা গীত করিতে যাইয়া অবতারবাদের এই সিদ্ধান্তটা প্রাঞ্জল করিয়া দিয়াছেন। অবতার পাইতে হইলে দুইটা অবস্থার প্রয়োজন—(১) ধর্ম্মের গ্লানি, (২) সাধু সজ্জনের কাতর আহ্বান। বাল্মীকির আহ্বানে, বিশ্বামিত্রের তপস্যায় শ্রীরাম অবতার; বেদব্যাসের আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণের উদ্ভব, অদ্বৈতাচার্য্যের কাতর ক্রন্দনে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। যে ডাকিবে, তাহাকেও তৎসম এবং তদ্ভাবভাবুক হইতে হইবে। যে ডাকিবে, সেও অবতার; অবতার না হইলে অবতারকে ডাকিয়া নামাইতে পারে না; কেবল যিনি ডাকেন, তিনি বিশেষ শক্তিসম্পন্ন নহেন বলিয়া শক্তিধর পুরুষকে ডাকিয়া থাকেন।
('প্রবাহিনী,' ১৫ চৈত্র ১৩২১)

মানস পূজা

তন্ত্রে বাহ্য পূজা অপেক্ষা মানস পূজার গৌরব অধিক করা হইয়াছে। তন্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মানস পূজাই সার পূজা, বাহ্য পূজা মানস পূজার অবলম্বনস্বরূপ। তন্ত্রের ভূতশুদ্ধি প্রকরণে লিখিত আছে—

"সর্ব্বাসু বাহ্যপূজাসু অন্তঃপূজা বিধীয়তে।
অন্তঃপূজা মহেশানি বাহ্যকোটিফলং লভেৎ॥

সকৃৎ পূজা মহেশানি বাহ্যকোটিফলং লভেৎ।
কিং তস্য বাহ্যপূজায়াং সর্ব্বং ব্যর্থং কদর্থনম্ ॥"

অর্থাৎ সর্ব্ববিধ বাহ্যপূজাতেই অন্তঃপূজার বিধান আছে, অর্থাৎ বাহ্যপূজা করিতে হইলেই অন্তঃপূজাও করিতে হইবে। হে মহেশ্বরি! এক বার কৃত অন্তঃপূজা কোটি বাহ্যপূজার ফল প্রদান করে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে,—

"মনসাপি মহাদেব্যৈ নৈবেদ্যং দীয়তে যদি।
যো নরো ভক্তিসংযুক্তো দীর্ঘায়ুঃ স সুখী ভবেৎ ॥"

যে মনুষ্য ভক্তিযুক্ত হইয়া মহাদেবীকে মনঃকল্পিত নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করে, সে দীর্ঘায়ু এবং সুখী হয়। এই তত্ত্বটা বুঝাইতে যাইয়া তন্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, মনুষ্যের দেহগত আত্মশক্তিই মহাদেবী পরমেশ্বরী। জীবনরূপ যে প্রহেলিকা, ইহা তাঁহারই লীলা; তিনি দেহে বিদ্যমান আছেন বলিয়া জীবদেহ সজীব ও সচল আছে; তাঁহার শক্তিপ্রভাবেই দেহের অনুভূতি, আসক্তি, স্মৃতি, ধৃতি প্রভৃতি গুণসমূহ পরিস্ফুট এবং ক্রিয়াশীল থাকে। দেহগত পরমাত্মা ছাড়া বাহিরে আর কোন দেবতা নাই; দেহের পরমাত্মাই আমাদের উপাস্য দেবতা, হৃদয়নাথ, জীবনসর্ব্বস্ব।

"আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দ্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া।
প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে বহিঃস্থাং পূজয়েচ্ছিবাং ॥"

অর্থাৎ আত্মস্থ বা স্বশরীরস্থ দেবতা পরিত্যাগ করিয়া বহিঃস্থ দেবতার অনুসন্ধান করা যেন করস্থ কৌস্তুভ মণি ত্যাগ করিয়া কাচখণ্ডের প্রাপ্তি ইচ্ছার তুল্য; অতএব হৃদয়ে ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া পরে বহিঃস্থ দেবতার পূজা করিবে। কেন না, বহিঃস্থ দেবতা হৃদয়ের ইষ্ট দেবতার আলম্বনস্বরূপ; হৃদয়ে দেবতাকে স্থির রাখিতে পারি না বলিয়াই বাহিরে একটা দেবপ্রতিমার পরিকল্পনা করিয়া লইতে হয়। এই কথাটি বলিয়া তন্ত্র অন্তর্যাগের ব্যবস্থা বলিয়াছেন। স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন যে, অসংখ্য তন্ত্রগ্রন্থে যে পূজাপদ্ধতি লিখিত বা বর্ণিত হইয়াছে, সে সকলই অন্তর্যাগের অনুকল্পস্বরূপ। যে সাধক অন্তর্যাগ করিতে পারে, তাহার পক্ষে বাহ্যপূজার কোন প্রয়োজন নাই। অন্তর্যাগ শব্দের অর্থ

মনে মনে পূজা। এই মানস পূজায় সিদ্ধ হইলে তবে সাধক ষট্‌চক্র ভেদ করিবে, হৃদয়ে ভৈরবীচক্র বসাইবে এবং সিদ্ধ হইবে। প্রথমে জপ ও পুরশ্চরণ, পরে মানস পূজা, তাহার পর সাধনা এবং ষট্‌চক্রভেদ, শেষে মাতৃদর্শন ও সিদ্ধি। এই মানস পূজাটি কি ও কেমন, তাহাই প্রথমে বলিতে হইবে। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে অন্তর্যাগের পদ্ধতি নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত আছে।

"শুভ আসনে পূর্ব্বাস্য কিংবা উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া স্বীয় হৃদয়ে সুধাসমুদ্রের ধ্যান করিবে। সেই সমুদ্রের মধ্যভাগে সুবর্ণবালুকাময় বেলাভূমি বলয়িত, বিকসিত কুসুমান্বিত, মন্দার ও পারিজাতাদি পুষ্পবৃক্ষ-পরিবৃত এবং পুষ্প ও ফলসমন্বিত বৃক্ষে পূর্ণ রত্নদ্বীপ বিরাজ করিতেছে। এই রত্নদ্বীপের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ কুসুমগন্ধে আমোদিত, ভ্রমরকুল যেখানে বিকসিত কুসুমামোদে প্রহৃষ্ট, সুমধুর কোকিলগানে প্রতিধ্বনিত, বিকসিত সুবর্ণপঙ্কজসকল যাহার অসংখ্য সরোবরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে এবং যে রত্নদ্বীপের চারি দিগে চারিটি তোরণে মৌক্তিকমালা ও কুসুমমালায় শোভিত। এই রত্নদ্বীপের মধ্যস্থানে চতুর্ব্বেদরূপ চতুঃশাখাবিশিষ্ট, সত্ত্বাদি গুণত্রয়সমন্বিত, পীত কৃষ্ণ শ্বেত রক্ত হরিত এবং বিচিত্রবর্ণের পুষ্প বিরাজিত, কোকিলভ্রমরাদিবিমণ্ডিত কল্পপাদপের ধ্যান করিবে। এই কল্পবৃক্ষের তলে রত্নবেদিকার ধ্যান করিবে। অনন্তর তদুপরিভাগে বালারুণের ন্যায় রক্তবর্ণ, রত্ননির্ম্মিত সোপানাবলীসংযুক্ত, ধ্বজযুক্ত চতুর্দ্বারান্বিত, নানারত্নালঙ্কারশোভিত রত্ননির্ম্মিত প্রাকারবেষ্টিত, স্বস্বস্থানস্থিত লোকপাল-গণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, ক্রীড়াশীল সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর মহোরগ কিন্নর এবং অপ্সরোগণ পরিব্যাপ্ত, নৃত্য এবং বাদ্যনিরত সুরসুন্দরীগণযুক্ত, কিঙ্কিণী-জালযুক্ত; পতাকা অলঙ্কৃত, মহামাণিক্য বৈদূর্য্য ও রত্নময় চামরভূষিত, লম্বমান স্থূলমুক্তাফলালঙ্কৃত, চন্দন, অগুরু ও কস্তূরী দ্বারা বিলিপ্ত সুমহৎ রত্নমণ্ডপের ধ্যান করিয়া তন্মধ্যে মহামাণিক্যবেদিকার ধ্যান করিবে এবং এই বেদিকার অভ্যন্তরে প্রাতঃসূর্য্যকিরণারুণপ্রভ, চতুষ্কোণশোভিত, ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মক সিংহাসনের ধ্যান করিবে। তৎপরে ন্যাস করিয়া, পীঠপূজা করিয়া সেই আসনে ইষ্টদেবতার অধিষ্ঠান ধ্যান করিবে। তৎপরে মনে মনে ভগবতীকে রত্নপাদুকা দান করিয়া তাঁহাকে স্নান-মন্দিরে আনয়ন করিবে এবং কর্পূর, অগুরু, কস্তূরী, মৃগমদ, রোচনা ও

কুঙ্কুমাদি নানা গন্ধদ্রব্যসুবাসিত জল দ্বারা দেবীর সর্ব্বশরীরোদ্বর্ত্তন করিয়া তাহাতে তৈল লেপন করিতেছি, ইহা মনে করিবে। তাহার পর নিজের ছোট মেয়েটিকে যে ভাবে তাহার গাত্রমার্জ্জন করিয়া স্নান করাইয়া থাক, সেই ভাবে স্নান করাইবে। পরে গাত্রমার্জ্জনপূর্ব্বক বস্ত্রযুগল পরিধান করাইবে। ইত্যাদি প্রকারে দেবীর স্নানাদিকার্য্য সমাপন করিয়া, তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করাইয়া রত্নবেদীর উপর আনিয়া বসাইবে। তাহার পর পূজা। বাহ্যপূজায় যে সকল বস্তুর ও উপচারের প্রয়োজন, মানস পূজাতেও সেই সকলেরই ব্যবহার করিতে হয়। মানস নেত্রে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে, পঞ্চ প্রদীপ লইয়া যথাবিধি মায়ের আরতি করিতেছি, বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইতেছি ; ধ্যান এতই প্রগাঢ় হইবে যে, সে বাদ্যভাণ্ডের শব্দ যেন কানে শুনিতে পাইব ; সে ধূপধুনার গন্ধ যেন নাসিকায় আঘ্রাণ করিতে পারিব, আর দেখিতে পাইব, যেন ইষ্টদেবী আমার আরতির ভঙ্গী দেখিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছেন এবং আমার পূজা ও সেবা গ্রহণ করিতেছেন।” ধ্যানে সিদ্ধ না হইলে এমন মানস পূজা ঠিকমত হয় না। বাহ্য জগৎকে ভুলিয়া, বাহ্য জগতের শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি অনুভূতিসকলকে ভিতরে টানিয়া কেন্দ্রীকৃত রাখিয়া তবে মানস পূজা করিতে হয়। যে মানস পূজায় ব্রতী হয়, যত ক্ষণ পূজা চলে, তত ক্ষণ তাহার বাহ্য জ্ঞান থাকে না, সে পূজার আনন্দেই আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে। রামপ্রসাদ যখন “মন, তোমার ভ্রম গেল না, কালী কেমন তা কি জেনেও জান্‌লে না” রচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি মানস পূজাতেই রত ছিলেন ; কারণ, ঐ গানের শেষের কয়টা চরণেই তিনি মানস পূজার কথা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। আধুনিক নিরাকারবাদী ব্রাহ্মগণ তন্ত্রের সাধনপদ্ধতি জানেন না বলিয়া, কোন্ অবস্থায়—সাধনার কোন্ স্তরে দাঁড়াইয়া সাধকগণ কোন্ কথা বলেন, তাহা বুঝেন না বলিয়া, রামপ্রসাদের এই গানটি তুলিয়া নিজেদের নিরাকারবাদের সমর্থন করিয়া থাকেন।

এই মানস পূজা কেবলই যে তান্ত্রিকগণ করিয়া থাকেন, তাহা নহে ; শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের সাধক মাত্রেই মানস পূজা করিতে বাধ্য, নহিলে সিদ্ধিলাভ হয় না, ইষ্টদর্শন সম্ভবপর হয় না। তান্ত্রিক শাস্ত্রের ইষ্টদেবী ভগবতী, বৈষ্ণব সাধকের ইষ্টদেবতা শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণ ;

কেবল ইষ্টদেবতার পার্থক্য আছে, তাহা ছাড়া পূজাপদ্ধতির পার্থক্য বড়ই কম। শাক্ত বলিদান করে, অন্য সাধকে কোন বলিই দেয় না, কোষাকুষি তাম্রপাত্র ব্যবহার করে না; কিন্তু মোটের উপর পূজার ক্রম এবং পদ্ধতি সকল সম্প্রদায়ের সাধকগণের একই রকমের; ষোড়শোপচার আছে, কেবল উপচারের নির্দ্দেশবৈষম্য ঘটিতে পারে। যাউক সে কথা, এই ভাবে মানস পূজা করিতেই হইবে। কারণ, তন্ত্রের মহাবাক্য এই যে—"বিনা চোপাসনং দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাং"—হে দেবি, উপাসনা না করিলে মনুষ্য কোন ফলই লাভ করিতে পারে না—সকল উপাসনার সার মানস পূজা, হৃদয়ের উপাসনা; সুতরাং মানস পূজা প্রত্যেক সাধকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

উপাসনা কি ও কেমন? উপাসনার অর্থ সেবা, শুশ্রূষা, পরিচর্য্যা। যাহা আমি ভালবাসি, অন্যে আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলে আমি পরিতুষ্ট হই, তাহা এবং সেই ব্যবহারের দ্বারা অন্যের পরিচর্য্যার নামই উপাসনা। ইষ্টদেবতার উপাসনাও সেই প্রকারের। যে ফল মূল, গন্ধদ্রব্য, পোষাক পরিচ্ছদ, রত্নালঙ্কার আমি ভালবাসি, সেই সকল আভরণ ভূষণ দিয়া, ইষ্টদেবতার বেশবিন্যাস করিয়া, ভোগরাগের ব্যবস্থা করিয়া যে পূজা-পদ্ধতি, তাহাই উপাসনা। মানস পূজায় আরও একটু মজা আছে। যাহা আমি পাইলে আমার সাধ মিটে, যেমনটি হইলে আমার আশা পূর্ণ হয়, তেমন সামগ্রী আহঁরণ করিয়া এবং তেমন অবস্থার উপকল্পনা করিয়া মানস পূজা করিতে হয়। মানস পূজায় কোন সাধ অপূর্ণ রাখিতে নাই। বাহ্যপূজকই হউক বা মানস পূজকই হউক, সাধক মাত্রেই প্রসাদভোজী, ইষ্টদেবতার দাসানুদাস। তাই রামপ্রসাদ পদে পদে বলিয়াছেন—"আমি তুয়া দাস-দাসদাসীপুত্র হই।" ইষ্টদেবতাকে সর্ব্বস্ব নিবেদন—আত্মনিবেদন করিয়া তবে তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। আমার ঘর সংসার, পুত্র পরিবার, ধন জন, অর্থ সম্পত্তি, ইহ সংসারে যাহা কিছু আমার, সে সবই আমার ইষ্টদেবতার। আমি তাঁহার প্রসাদভোজী, কৃপার পাত্র, ভৃত্য মাত্র। হিন্দু সাধক দর্প দম্ভ করিতে হইলে দেবতার নামে করিয়া থাকে, আমোদ প্রমোদ করিতে হইলে দেবতার উদ্দেশে করিয়া থাকে। হিন্দু সাধক কখনই বলিবে না যে, আমার সংসার, আমার ঘরবাড়ী, আমার ধন দৌলত। যাহার গৃহে যে দেবতার অধিষ্ঠান আছে,

সে সেই দেবতার দোহাই দিয়া কথা কহিয়া থাকে। যাহার গৃহে দামোদর আছেন, সে দামোদরের নাম করিয়া বলে—দেখা যাউক, দামোদর কি করেন ; যাহার লক্ষ্মী জনার্দ্দন, সে তাহারই দোহাই দেয়। হিন্দু সাধক কখনই বলে না যে, আমার অমুক সামগ্রীর প্রয়োজন বা অমুক সামগ্রী খাইব। সে প্রসাদ পায়, ইষ্টদেবতাকে স্বীয় ঈপ্সিত ফল নিবেদন করিয়া, স্বীয় সখের পোষাক পরাইয়া সে প্রসাদস্বরূপ তাহা গ্রহণ করে। সাধক যখন এই ভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারে, নিজেকে মুছিয়া ফেলিয়া ইষ্টদেবতার সংসার গড়িয়া তুলিতে পারে, তখনই সে মানস পূজার অধিকারী হয়। মানস পূজক হইলেও বাহ্যপূজা বজায় রাখিতে হয় ; কারণ, তাহা না করিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। সমাজ ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তবে সাধক যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। যত দিন সমাজে থাকিবে, তত দিন সমাজধর্ম্ম মানিয়া তাহাকে চলিতেই হইবে।

তন্ত্রসকল পাঠ করিলে মনে হয়, উহার যেন তিনটা স্তর আছে। প্রথম বাহ্যপূজার স্তর, দ্বিতীয় মানস পূজার স্তর, তৃতীয় শক্তিসাধনার স্তর। বাহ্য ও মানস পূজার ক্রম এবং পদ্ধতি আমরা কতকটা বুঝিতে পারি, পরন্তু সাধনার স্তর একেবারেই বুঝিতে পারি না। মনে হয় উহা গুরুমুখ না করিয়া বুঝিলে, সিদ্ধ সাধকগণের অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ না দেখিলে সাধনার স্তর একেবারেই বুঝা যায় না। বাহ্যপূজা যে মানস পূজার রোচক, তাহা তন্ত্র বার বার বলিয়াছেন। কিন্তু ষট্‌চক্রভেদ, শবসাধনা, ভৈরবীচক্র প্রভৃতি যে কি ও কেমন, তাহা সোজাসুজি গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় না। কারণ, বাহ্যপূজার জন্য যেমন ষট্‌চক্রভেদ ও প্রাণায়াম নির্দ্দিষ্ট আছে, মানস পূজাতেও তেমনি ষট্‌চক্রভেদ এবং প্রাণায়ামের নির্দ্দেশ আছে, হোমেরও ব্যবস্থা আছে। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সকল বুঝিয়া উঠা কঠিন বলিয়া বোধ হয়। মানস হোমের একটা দৃষ্টান্ত দিব। তন্ত্র বলিতেছেন যে,

> "অথাধারময়ে কুম্ভে চিদগ্নৌ হোময়েত্ততঃ।
> অন্তরাত্মা পরমাত্মা জ্ঞানাত্মা পরিকীর্ত্তিতঃ॥
> এতদ্রূপস্ত চিৎকুম্ভং চতুরস্রং বিভাবয়েৎ।
> আনন্দমেখলারম্যং বিন্দুত্রিবলয়াঙ্কিতং॥
> অর্দ্ধমাত্রা যোনিরূপং ব্রহ্মানন্দময়ো ভবেৎ।

বাম ভাগে নাড়ীমীড়াং দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ।
সুষুম্নামধ্যতো ধ্যাত্বা কুর্য্যাদ্ধোমং যথাবিধি ॥"

ইহার সোজাসুজি অর্থ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না।

"নাভৌ চৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা শ্রুচা।
জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তিং জুহোম্যহম্ ॥

* * *

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ হবির্দ্দীপ্তমাত্মাগ্নৌ মনসা শ্রুচা।
সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যং ব্রহ্মবৃত্তিং জুহোম্যহম্ ॥"

সোজাসুজি এই সকল এবং পূর্ব্বেকার শ্লোকের বাঙ্গালা এই হইবে,—আধারপদ্মে চিদগ্নিতে হোম করিবে। অন্তরাত্মা, পরমাত্মা, জ্ঞানাত্মা, এতদাত্মত্রিতয়াত্মক চতুষ্কোণ আনন্দরূপ মেখলা ও বিন্দুরূপ ত্রিবলয়যুক্ত, নাদবিন্দুরূপ যোনিযুক্ত চিৎকুণ্ডের চিন্তা করিবে। তাহার পর এই কুণ্ডের দক্ষিণে পিঙ্গলা, বামভাগে ঈড়া এবং মধ্যে সুষুম্না নাড়ীর ধ্যান করিয়া ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মরূপ কল্পিত হবির্দ্বারা যথাবিধি হোম করিবে। ইহার সোজাসুজি অর্থ করা যায় না, অথচ এই মানস পূজাকে লক্ষ্য করিয়া রামপ্রসাদ গান করিয়া গিয়াছেন যে, "ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি।" বুঝা যায় না বটে, পরন্তু গুরূপদিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকিলে সদ্য সদ্য ফল পাওয়া যায়। কথাটা এই,—আমরা পুরাণ তন্ত্রের ভাষা ঠিকমত বুঝিবার অধিকার হারাইয়াছি। সে সমাজ নাই, সমাজের সে পুরাতন আচার ব্যবহার নাই, রীতি পদ্ধতি নাই; যে সকল কথা সবাই জানিত, সবাই বুঝিত, সে সকল কথা আমরা এখন বুঝিতে পারি না, ধরিতে পারি না। আজ যদি সহসা একটা বিষম বিপ্লব বাঙ্গালায় ঘটে, ইংরেজী-জানা মানুষ মাত্রেই যদি মরিয়া যায় বা অবহেলায় ও অবজ্ঞায় সমাজ হইতে বহিস্কৃত হয়, তাহা হইলে পরে যেমন বাঙ্গালার আজকালকার সর্ব্বজনবোধ্য কথা অনেকেই বুঝিতে পারিবে না, তেমনি তন্ত্রের সাহিত্যের দশা ঘটিয়াছে। উহা বুঝিবার বা বুঝাইবার লোক প্রকট নাই। তবে জগদম্বার কৃপায় মান্যবর বিচারপতি উডরফ সাহেব তন্ত্রের আলোচনা করিতেছেন, অনেকগুলি তন্ত্রের গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাই সভ্যসমাজে তন্ত্রের উল্লেখ আবার করিতে

পারিতেছি। প্রত্যেক তান্ত্রিকেরই দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, মায়ের কৃপা হইলেই তন্ত্র প্রকট হন, মায়ের বিরাগ জন্মিলেই উহা সংহৃত হইয়া যায়। তান্ত্রিক, জীবনের সকল ব্যাপারে মায়ের তর্জ্জনীহেলন দেখিতে পায়, তাই তান্ত্রিক সর্ব্বাবস্থায় পরিতুষ্ট। একটা ইতিহাসের কথা এইখানে বলিয়া রাখিব:—রাজা রামমোহন রায় তান্ত্রিক সাধক ছিলেন, তিনি শৈব বিবাহ করিয়াছিলেন অর্থাৎ শক্তিসাধনা করিতেন। তিনি তন্ত্রের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া নিরাকার উপাসনার পদ্ধতি প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের গোড়ার কয়টা উল্লাসে, অনেকের বিশ্বাস—তিনি তাঁহার মনোমত অনেক কথা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। পরে কিন্তু খ্রীষ্টানী শিক্ষায় ও ভাবের বন্যায় তন্ত্র ভাসিয়া গিয়াছিল। আবার ভাবের গতি ফিরিতেছে, তাই তন্ত্রের কথা অনেকে কহিতেছেন। এখনও একটু হিসাব করিয়া পাঠ করিলে তন্ত্রে অনেক প্রগাঢ় তত্ত্বের কথা জানা যায়। বিশেষতঃ পুরাতন বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালী জাতিকে বুঝিতে হইলে তন্ত্রের অনেক কথা বুঝিতেই হইবে। এই মানস পূজা বুঝিতে না পারিলে রামপ্রসাদ, দাওয়ান মহাশয়, নীলাম্বরপ্রমুখ সাধকগণের গানের কোন অর্থই ঠিকমত বুঝা যাইবে না। তাই মানস পূজার গোড়ার গোটাকয়েক মোটা কথার উল্লেখ করিয়া রাখিলাম। তন্ত্র যে কেবল বাহ্যিক পূজাপদ্ধতি নহে, ভক্তির আকর, তাহা মানস পূজার আলোচনা করিলেই বেশ জানা যায়। উহা লম্পটের ধর্ম্ম নহে, মূর্খেরও ধর্ম্ম নহে। উহা জ্ঞানী পণ্ডিতের সাধনাপদ্ধতি। ('প্রবাহিণী,' ২২ চৈত্র ১৩২১)

কিসের লক্ষণ

এ সব কিসের লক্ষণ? এই যে কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স, সাহিত্য-সম্মিলন, সাহিত্য-সভা, ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির সভা, শিল্পসভা সমাজসংস্কারের সভা—এই ঘন ঘন সভা করা, বক্তৃতা করা, সঙ্কল্প স্থির করা—এ সব কিসের লক্ষণ? কেন এমন হইতেছে? কথাটা লইয়া একটু আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। জাতির এই চাঞ্চল্য কিসের লক্ষণ, তাহা

ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। ইহা আসল, কি নকল, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

বিলাতের মনীষী রাজনীতিক লর্ড ব্রাইস্ আজ দুই বৎসর হইতে বলিয়া আসিতেছেন যে, জাতির প্রতি আত্মবুদ্ধি,—আমার স্বজাতি বলিয়া শ্লাঘাবোধ সনাতন কাল হইতেই আছে। স্বজাতৌ পরমা প্রীতি—ইহা মনুষ্যের মজ্জাগত ভাব, যত দিন হইতে মনুষ্য জাতির উদ্ভব হইয়াছে, তত দিন হইতে মনুষ্যহৃদয়ে এই ভাব জাগরূক আছে। পরন্ত দেশগত আত্মবোধ, এক দেশে বাস বলিয়া মানুষের মানুষের প্রতি টান, আমার মানুষ বলিয়া একটা মমত্ববুদ্ধি নিতান্তই আধুনিক। ইউরোপের সকল জাতির জাতীয় সঙ্গীত—দেশাত্মবোধমূলক, জাতির স্পর্দ্ধাজ্ঞাপক সঙ্গীতসকলের উৎপত্তি দেড় শত বৎসরের অধিক হয় নাই। এক জাপানের জাতীয় সঙ্গীত সাত শত বৎসরের পুরাতন। সুতরাং খাঁটি পেটরিয়টিজম্ বা দেশহিতৈষণা অতি আধুনিক। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে ইহার তেমন প্রভাব ছিল না। কিন্তু ইংলণ্ডে প্রটেষ্ট ধর্ম্মের অভ্যুত্থান স্পানিস বা হিস্পানী রণতরী বহরের আক্রমণ, ব্রিটিশ জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা হইতেই পেটরিয়টিজম্ বা দেশাত্মবোধটা দ্বীপবাসী, স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী ব্রিটিশ জাতির মনেই সর্ব্বাগ্রে পরিস্ফুট হয়। শেষে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে উহা একটা স্পষ্ট আকার ধারণ করে।

আমাদের দেশে যে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—এই কথাটা প্রচলিত আছে, ইহা ঠিক পেটরিয়টিজম্ নহে; যে যেখানে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহার সেই ক্ষেত্রই জন্মভূমি; সেই জন্মভূমি বা শৈশবের লীলানিকেতনের প্রতি একটা প্রাণের টান সকলেরই থাকে; এই টানের উল্লেখ করিয়াই কবি ঐটুকু লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দেশমাতৃকার পূজার কথা তন্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহার ভাব স্বতন্ত্র। এক ভাষা, এক বর্ণ, এক ধর্ম্ম যে জাতির আছে, সেই জাতি; যে দেশেই বাস করুক না, সেই দেশের দেশমাতৃকার পূজা করিবে। এমন পূজা না করিলে বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হন না, গ্রাম পল্লী রোগশূন্য থাকে না, পুত্র কলত্র সুখে কাল যাপন করিতে পায় না। আমরা বাঙ্গালী আজ বঙ্গভূমির দেশমাতৃকার পূজা করিতেছি, কাল যদি সদলবলে ব্রহ্মদেশে বা দক্ষিণ আমেরিকায় যাইয়া বাস করি, তবে সেই

দেশের দেশমাতৃকার পূজা করিতে আমরা বাধ্য। তন্ত্র বলেন, বিশ্বসৃষ্টির সর্ব্বথে আদ্যা শক্তি বিরাজ করিতেছেন,—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, নদ নদী গহনে, স্থাবর জঙ্গমে মা আমার নানারূপে বিরাজ করিতেছেন। "মা বিরাজেন সর্ব্বঘটে"—ভক্ত বাঙ্গালী কবি বার বার এই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই মা, ধরিত্রীবক্ষে আছেন—তাঁহারই নাম দেশমাতৃকা। এই দেশমাতৃকার কৃপা না হইলে ক্ষেত্রে শস্যোৎপন্ন হয় না, বৃক্ষ ফলভারাবনত হয় না, নদীতে জলস্রোত চলে না, কূপে তড়াগে সলিলরাশি সঞ্চিত থাকে না। মানুষ স্বীয় ভরণ পোষণ জন্য যে চেষ্টাই করুন না কেন, সে চেষ্টার সহিত মায়ের কৃপার আনুকূল্য না থাকিলে তেমন চেষ্টা ফলবতী হয় না। তাই তন্ত্র হলকর্ষণের পূর্ব্বে, খনি খননের পূর্ব্বে, বাস্তু প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে দেশমাতৃকার পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইহাকে ঠিক পেটরিয়টিজম্ বলিতে পারি না। পুরাতন আর্য্যদিগের মধ্যে জাতিগত পেটরিয়টিজম্ থাকিলেও আজকাল যাহাকে Nationalism বলে, তাহা ছিল না। আমাদের ভারতবর্ষেও এই Nationalism ছিল না। এখনও সমগ্র ভারতবর্ষের সকল অধিবাসীকে জড়াইয়া একটা জাতিবোধ, একত্বের ভাব আমাদের মনে জাগিয়া উঠে না। পূর্ব্বে ত ছিলই না; তাই মারহাট্টা বীরগণ মহারাষ্ট্র দেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশকে লুটিয়া বেড়াইয়াছিলেন; এখনও বোম্বাই প্রদেশের লোকেরা ভারতের অন্য প্রদেশের মানুষ দেখিলে তাহাকে "পরদেশী" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন;—এখনও ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসী অন্য প্রদেশবাসীকে কতকটা বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। Nationalism জাতি, ধর্ম্ম, ভাষার কোন অপেক্ষা করে না, কেবল এক দেশ ও এক শাসন হইলেই ন্যাশনালিজম্ ফুটিতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ইউরোপের সকল জাতিই যাইয়া বাস করিতেছে; যাঁহারা সে দেশে যাইতেছে, তাহারা নিজেদের ভাষা ও ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, রীতি-পদ্ধতি কিছুই ছাড়িতেছে না, কিন্তু তথাপি মার্কিন দেশের প্রজা বলিয়া, মার্কিন দেশে তাহারা স্থায়ী ভাবে বাস করিতেছে বলিয়া, তাহাদের মার্কিনের প্রতি একটা মমত্ববোধ হইয়াছে। এই মমত্ববোধের জন্য তাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। ইহাই ন্যাশনালিজম্। ইহা পুরাতন কাব্য-সাহিত্যে ছিল না, মধ্যযুগে ইহা

তেমন ফোটে নাই, ফরাসী বিপ্লবের পর হইতেই ইহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই ন্যাশনালিজমের প্রতিপ্রাবল্যে আজ জর্ম্মন জাতি ইউরোপের সকল প্রবল জাতির সহিত মহারণে প্রমত্ত। এই মহারণের ফলাফল অনুসারে ন্যাশনালিজমের পরিণাম নির্দ্দিষ্ট হইবে।

আজ ইংরেজ যে ভাবে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, ঠিক এই ভাবে কোন যুগে, কোন কালে ভারতবর্ষ শাসিত হয় নাই। এই অপূর্ব্ব শাসনের ফলে গোটা ভারতবর্ষটাকে আমরা স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেছি; ইউরোপের এই অভিনব ন্যাশনালিজমের ভাবটা ধরিবার চেষ্টা করিতেছি। এই চেষ্টার ফলে আমরা কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স করিয়া থাকি; দেশের উন্নতি, ভাষার উন্নতি, সমাজের উন্নতি করিবার দুরাশায় আমরা অনেক রকমের বকাবকি করিয়া থাকি। দুরাশা বলিলাম এই জন্য যে, টান, প্রীতি, ভালবাসা দেখাদেখি হয় না; প্রেমের রাজ্যে নকলনবিসি নাই; দেশই বল, আর যুবতী বা কিশোরীই বল, দেখাদেখি কাহারও প্রতি কাহারও প্রেম বা টান হয় না। যাহা হয়, তাহা মেকী বা ক্ষণস্থায়ী। আমাদের পেটরিয়টিজম্ দেখাদেখি, আমাদের ন্যাশনালিজম্ ইংরেজী সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া তোতাপাখীর বোল মাত্র। ইংরেজ রাজা, আমরা প্রজা; ইউরোপ প্রধান, আমরা অধীন; অথচ আমাদের অতীত ইতিহাস আছে, সে ইতিহাসের প্রতি মমত্ববুদ্ধি, গৌরববুদ্ধি আছে, তাই রাজার জাতির প্রতি একটু সমকক্ষতার ভাব ফুটাইবার জন্য আমরা রাজার জাতির আচার ব্যবহারের অনেক নকল করিতেছি। এই অনুচিকীর্ষা হইতেই আর্য্যামি, নব্য হিন্দুয়ানি, স্বদেশী, রাজনীতিচর্চ্চা, বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলন এবং অবৈধ আন্দোলন, সাহিত্যচর্চ্চা, প্রত্নতত্ত্ব—আধুনিক সকল রকমের সখ সাধ, আলোচনা আন্দোলন উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের কেবল চেষ্টা, কিসে ইংরেজ বুঝিবে, ইউরোপ জানিবে যে, আমরা ভারতবাসী, পরাজিত হইলেও সভ্যতায় ভব্যতায়, সাহিত্যে সায়ান্সে ইউরোপের সমান—তুল্য। তবে যে একটু খাটো আছি, সে কেবল পরাধীন জীবনের জন্য। জাপান স্বাধীন, তাই মোট পঞ্চাশ বৎসরের চেষ্টায় ইউরোপের সমকক্ষ হইয়াছে। আমরা পরাধীন, তাই শতাধিক বৎসর চেষ্টা করিতে হইবে। যত দিনই লাগুক, আমাদের পক্ষে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না—হইতেছে না। সে চেষ্টা কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স, সাহিত্য-সম্মিলন, সমাজসংস্কার, সে চেষ্টা

সায়ান্স কলেজ, স্বদেশী চর্চ্চা, কলকব্জার প্রতিষ্ঠা আদি ব্যাপারে ফুটিয়া উঠিতেছে। যে ইংরেজীনবিসের সহিত দেখা কর না কেন, সে যদি বিলাত গিয়া থাকে ত কথাই নাই, বিলাত বা ইউরোপে না যাইলেও সে যদি পাকা ইংরেজীনবিস হয়, তাহা হইলে সে তোমাকে বলিবে যে, বিলাতে অমুক আছে, এমন সব কলকব্জা আছে, এমন উদ্‌যোগ, এমন আয়োজন; কিন্তু আমাদের দেশে সে সব নাই। আমাদের দেশে নাই, এই ক্ষোভেই আমরা যেন ঈর্ষায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিলাম। যখন দেখি, আমাদের দেশে যাহা নাই, হইবার সহসা কোন উপায় নাই, অথচ ইউরোপে তাহা আছে, তখন আমাদের দেশে যাহা আছে বা ছিল, এবং ইউরোপে নাই বা হইতে পারে না, তাহারই উল্লেখ করিয়া ক্ষতিপূরণ করিতে চেষ্টা করি, ইউরোপের সমকক্ষতা করিবার প্রয়াস পাই।

মুসলমানদের যখন এ দেশে রাজ্য ছিল, তখন আমরা দুই উপায়ে মুসলমানদের সহিত সমকক্ষতা করিতাম। মুসলমান আদৌ ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশ্যে এ দেশ আক্রমণ করে নাই। মুসলমান দেশ জয় করিতে এবং ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে এ দেশে আসিয়াছিল। মুসলমান এ দেশ জয় করিয়া এ দেশে বাস করিয়াছিল। তাই যে হিন্দু মুসলমান হইত, সে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রাজার জাতির অঙ্গে অঙ্গীভূত হইয়া যাইত। যে হিন্দুর পক্ষে পরাজিতের জীবন দুর্ব্বিষহ হইত, সেই ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জ্বালা জুড়াইত। যে মুসলমান হইতে পারিত না, সে মুসলমানের ছায়া মাড়াইত না; মুসলমানকে স্পর্শ করিলে সে স্নান করিত, মুসলমানের ভোজ্যের গন্ধ পাইলে তাহার জাতি যাইত। মুসলমান এ দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ে বড় কিছু হস্তক্ষেপ করিত না। কিস্তি কিস্তি মালগুজারির টাকা নবাবসরকারে পঁহুছাইয়া দিতে পারিলে জায়গিরদার বা জমিদারগণ নিজের প্রজাদের অনেকটা স্বাধীনভাবে, স্বেচ্ছামত শাসন করিতে পারিতেন। তাই হিন্দু জায়গিরদার ও জমিদারদের শাসনাধীন থাকিতে পারিলে হিন্দু প্রজার কোন কষ্টবোধ হইত না। বিশেষতঃ সভ্যতার হিসাবে মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। হিন্দুর নাচ গান, যন্ত্রসঙ্গীত, সভ্যতা ভব্যতা মুসলমান প্রায় ষোল আনাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেবল একটু পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, হিন্দু পদ্ধতি একটু বদলাইয়া মুসলমান পোষাক পরিচ্ছদে স্বীয়

বিশিষ্টতা রক্ষা করিতেন। সুতরাং তেমন অবস্থায় সভ্যতা, জ্ঞান, বিদ্যা লইয়া মুসলমানের সহিত হিন্দুর তেমন আড়াআড়ি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। কেবল ধর্ম্মের জন্য মুসলমান হিন্দুকে কাফের বলিত, সভ্যতার হিসাবে হিন্দুকে কখনই ছোট বলিয়া মোগল পাঠান ভাবে নাই। তথাপি রাজা প্রজায় যে একটু আড়াআড়ির ভাব ছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না। সেই আড়াআড়ি হইতে নানক, কবীর, দাদু, গৌরাঙ্গ প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল।

ইংরেজের আমলে অবস্থার ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রেল, ষ্টীমার, জাহাজ প্রভৃতি দ্রুতগামী অপূর্ব্ব যানসকলের প্রভাবে, ইংরেজ আর এ দেশে স্থায়িভাবে বাস করিতে চাহে না—পারেও না। ইংরেজ দেশ শাসন করিতে আসে, দেশ শাসনের চাকরি শেষ করিয়া চলিয়া যায়। ইংরেজ এ দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে আসে, ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইয়া, অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক হইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। সায়ান্স বা পদার্থতত্ত্বের চর্চ্চায়, সংহতিশক্তির বিকাশে, অন্য মানবোচিত গুণে ইংরেজ আমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। আমরা পদে পদে বুঝিতে পারি—ইংরেজ কিসে বড়; বুঝিতে পারি—ইংরেজের মহত্ত্ব কোথায় এবং কিসে? বুঝিয়া সুজিয়া ইংরেজের সমান হইবার চেষ্টা করি, সাহেব সাজি, ইংরেজের মত থাকিতে চাই, বিলাত যাই, বিলাতী আচার গ্রহণ করি। কিন্তু তথাপি ইংরেজ আমাদের দলে গ্রহণ করে না। খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও ষোল আনা বিলাতী রঙ্গের মানুষ হইলেও প্রজার জাতি ভারতবাসী প্রজাই থাকিয়া যায়, কখনও রাজার জাতির অধিকারে অধিকারী হয় না। এ কথাটা বাঙ্গালীই সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে পারে। 'বেঙ্গলী'তে জজ নরিসের অবমাননা অজুহাতে যখন সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মান নাশের মামলা হয়, তখন ব্যারিষ্টারপ্রধান ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি সাহেব সুরেন্দ্রনাথের পক্ষাবলম্বন করেন। তিনি সুরেন্দ্রবাবুকে দিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করাইলেন, সাহেবের মন যোগাইবার সকল চেষ্টাই করিলেন; তথাপি সুরেন্দ্রনাথের জেল হইল। ব্যানার্জ্জি সাহেব বুঝিলেন যে, নিখুঁৎ ইংরেজ সাজিবার চেষ্টা করিলেও, জাতি ধর্ম্ম, কুল মান, বাঙ্গালার সর্ব্বস্ব পরিহার করিলেও, কালা আদমী কালা আদমীই থাকিয়া যায়, তাহার এক বিন্দুও খাতির ইংরেজ জাতি রাখে না। এইটুকু বুঝিয়াই ব্যানার্জ্জি সাহেব কংগ্রেসে যোগ দিলেন,

পেটরিয়ট সাজিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে যে যত বড় সাহেব, যত ঘোর বিলাতফের্ত্তা, সে তত বড় পেটরিয়ট, তেমনই তীব্র ন্যাশনালিষ্ট।

আমাদের এই সকল মহাসভার মূলে কংগ্রেস; কংগ্রেসের মূলে ইলবার্ট বিল এবং তাৎকালিক ইংরেজদের কালা আদমীর প্রতি, বিশেষতঃ ইংরেজীনবিস কালা আদমীর প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব। সেই তুচ্ছ করার ভঙ্গী দেখিয়া কালা আদমীর মনে রাজার জাতির সহিত সমকক্ষতা করিবার ভাব জাগিয়া উঠে। হিন্দু বড় হইতে চাহে—সাধনার পথে সিদ্ধি লাভ করিয়া। সে সাধনার বিজ্ঞাপন নাই, ঈর্ষা নাই, অনুচিকীর্ষা নাই। কিন্তু এই সকল সভা সমিতি, সম্মিলন সমারোহ, ইহা সাফ অনুচিকীর্ষাজাত, সমকক্ষতার ভাব হইতে সঞ্জাত। পুরাতন রকমের মিলন-সমারোহ আমাদের ত আছে, আমাদের বড় বড় কুম্ভমেলা, তীর্থক্ষেত্র, পর্ব্বাহ উৎসব, সামাজিক ও ধার্ম্মিক সম্মিলনের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট। কিন্তু সে ভাবে কাজ করিলে ত ইউরোপীয় ঢঙ্গে কাজ করা হইবে না, সে কাজের প্রতি ইংরেজ খবরের কাগজের সম্পাদক ও বিলাতের বড় বড় সমাচারপত্র-লেখকগণের দৃষ্টি ভারতবাসীর প্রতি আকৃষ্ট হইবে না। তাই পুরাতনকে পরিহার করিয়া নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। ইহা কোন উৎকট রোগের দুর্লক্ষণ নহে, বিপ্লববাদের পরিচায়ক নহে; ইহা অনুচিকীর্ষু জাতির সমকক্ষতার আব্দার মাত্র। সখ মিটিলেই এ আন্দোলন বন্ধ হইবে। তবে ইংরেজ শাসকসম্প্রদায় যদি না বুঝিয়া এই ছেলেখেলাকে খোঁচাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে স্বদেশী আন্দোলনের মত উহা বিষম হইয়া দাঁড়াইবে। আব্দারের মুখে বাধা দিলে আব্দার প্রতিজ্ঞার সঙ্কল্পে পরিণত হইবেই, খেলা সাধনায় আকারান্তরিত হইবেই। আবার বলি, ইহা জাতির উদ্বোধনের লক্ষণ নহে, জাগরণের নহে, ইহা সাফ নকলনবিসি—সাফ ছেলেখেলা। তাই ইহা টিকিবে না—টিকিতে পারে না। ('প্রবাহিণী,' ২৯ চৈত্র ১৩২১)

হায় রে!

১

মধ্য-বাঙ্গালার বহু পল্লীগ্রাম হইতে খবর পাইয়াছি যে, সে সকল গ্রামে ওলাউঠা রোগ সংক্রামকভাবে হইতেছে। দূষিত জল পান করিলেই, অতিভোজন করিলেই এই রোগ হয়। আমরা ইংরেজী শিখিয়া বক্তৃতায় প্রবন্ধে বেজায় আর্য্যামি করিতে খুব মজবুত। আমাদের ব্যাস বশিষ্ঠ ছিল, বেদ বেদান্ত ছিল,—হেন ছিল, তেন ছিল বলিয়া কতই বড়াই করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা আমাদের পিতৃপিতামহের পল্লীকীর্ত্তি জলাশয় পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে পারি না। যে পুষ্করিণীতে নিত্য স্নান করিব, বাসন মাজিব, রোগীর কাপড় ও বিছানা কাচিব, সেই পুষ্করিণীর জল পান করিব। এমন অবস্থায় রোগ হইবে না ত কি হইবে? আমরা যে সবংশে একেবারে নির্ব্বংশ হইয়া যাই নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। যাহারা বাঁচিতে জানে না, বাঁচিতে পারে না, তাহারা মরিবে না ত কাহারা মরিবে? স্ত্রী-পরিবারের সোনার গহনা গড়াইতে পার, ছেলেদের কাপুড়ে বাবু করিয়া তুলিতে পার, আর বাঁচিবার জন্য, সুখের জন্য, পানীয়ের জন্য পুরাতন পুষ্করিণী খোঁড়াইতে পার না, একটা গভীর কূপ খনন করাইতে পার না। এমন অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যে যাহারা অবহেলা প্রদর্শন করে, তাহাদের পক্ষে মরণই শ্রেয়। প্রজারা পয়সার লোভে গ্রামের সকল জলাশয়ে পাট পচাইবে, সেই পাট-পচানি জল খাইবে, এমন প্রজা মরিবে না ত কোন্ দেশের প্রজা মরিবে! ইহার জন্য গবর্ণমেণ্টের দোষ দেওয়া বৃথা। তোমরা বাঁচিতে জানিলে, বাঁচিবার জন্য চেষ্টা করিলে যদি গবর্ণমেণ্ট তোমাদের চেষ্টার সহায়তা না করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের দোষ দিতে পার। কিন্তু তোমরা বাঁচিতে জান না, বাঁচিবার জন্য কোন চেষ্টাই কর না, স্বাস্থ্যরক্ষার সামান্য সাধারণ নিয়মগুলি পালন কর না, তজ্জন্য তোমরা মরিতেছ; এমন মরণের জন্য দেশের শাসন-কর্ত্তাদের দায়ী করা যায় না। দেশোদ্ধারের জন্য কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স করিতেছ, কত রকম-বেরকমের চাঁদা তুলিতেছ, সেই টাকা রীতিমত খরচ করিলে আজ বাঙ্গালার জলাভাব দূর হইত, এমন পোকা-মাকড়ের মতন

বাঙ্গালী নানা রোগে মরিত না। হুজুগ ছাড়া আত্মরক্ষার চেষ্টা তোমাদের আদৌ নাই; ফলে তোমাদের হুজুগ জমে ভাল, কেবল বংশরক্ষা হয় না।

২

একটি মিত্র বলিতেছিলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের বহু গ্রামে হিন্দু ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস করা কঠিন হইয়া উঠিতেছে। হু হু করিয়া মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। যাহারা পুরুষানুক্রমে মুসলমান, তাহাদের ব্যবহার বরং ভাল; যাহারা নূতন মুসলমান, তাহারা বেজায় উদ্ধত এবং হিন্দুদ্বেষী। উত্তরে আমরা বলিলাম—ঠিকই হইতেছে। বাঙ্গালায় এখন যদি কোন সজীব ধর্ম্ম থাকে, তবে সে ইসলাম ধর্ম্ম। মুসলমান মৌলবীসকল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, মোসলেম সমাজকে দৃঢ় এবং পবিত্র করিবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, দলে দলে মুসলমান হজ করিবার জন্য দেশান্তরে যাইতেছে। মুসলমান সমাজের সজীবতা ও দৃঢ়তা আছে, মুসলমানদের সংহতিশক্তি হিন্দুর অপেক্ষা সহস্রগুণে প্রবল আছে। পক্ষান্তরে হিন্দু সমাজ একেবারেই শিথিল এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আর বৈষ্ণব গোস্বামিগণ গ্রামে গ্রামে যাইয়া শূদ্র জাতিসকলকে ধর্ম্মশিক্ষা দেন না; আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে গ্রামের চাষাভুষার সহিত মিশেন না, গ্রাম্য পুরোহিতদের শাসনে রাখেন না। অনেক গ্রামে ভাল পুরোহিতই নাই। ইহার উপর ইংরেজী লেখাপড়ার অতিবিস্তারে ধর্ম্মভাব একেবারে লোপ পাইতেছে, লোকে স্বেচ্ছাচারী, দেহসর্ব্বস্ব হইতেছে। সেকালের বামনাই বাঙ্গালীর পক্ষে হাজারগুণে ছিল ভাল; কারণ, সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে সমাজের সকল স্তরের লোকের সহিত মিলিতে মিশিতে জানিতেন এবং পারিতেন। একালের ইংরেজীনবিস, ধোপদস্ত কাপড়-পরা, সুসভ্য স্বেচ্ছাচারী বাবু আর চাষাভুষার সহিত মিশিতে চাহেন না, তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া অতিথি হন না, তাহাদের সুখদুঃখের সমাচার রাখেন না। ফলে, সমাজের নিম্ন স্তরের জাতি-সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থের, গুরু পুরোহিতের সংস্পর্শশূন্য হইয়াছে। এই সংস্পর্শশূন্যতা হেতুই তাহারা মুসলমান হইতেছে। মুসলমান হইলে

অনেক লাভ; তাহারা বাবুদের সহিত সমান খুঁটে মিলিতে মিশিতে পারে, একটা সজীব ও প্রবল সমাজের অঙ্গীভূত হইতে পারে। লর্ড কার্জ্জন বঙ্গভঙ্গ ঘটাইয়া পূর্ব্ববঙ্গে ইসলাম ধর্ম্মের প্রসার বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন; pan-Islamismএর পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। বল্‌কান-যুদ্ধে, তুর্কীর ব্যাপারে সে ভাবটা দিনে দিনে প্রবলতর হইতেছে। হিন্দু যদি নিজের ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা করিতে না পারে বা সমাজের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করে, তাহা হইলে হিন্দুত্বের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান ধর্ম্ম বাড়িয়া যাইবেই। এ জন্য যাহারা দুঃখ করে, ক্ষোভ প্রকাশ করে, তাহারা মূর্খ। পূর্ব্ববাঙ্গালা যদি ষোল আনা মুসলমান হয় ত মন্দ হয় না। কিন্তু আমাদের ভাবনা এই যে, ইসলাম ধর্ম্ম বাঙ্গালায় প্রবল হইলে বাঙ্গালীত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে।

আর এক বন্ধু দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে,—"সর্ব্বনাশ হইল, শ্রীবৃন্দাবনে কসাইখানা খোলা হইয়াছে, মদের দোকান হইয়াছে, মৎস্য-বিক্রয় চলিতেছে, মুসলমান বাস করিবার স্থান পাইতেছে।" আমরা জানি, শ্রীবৃন্দাবনের সূচ্যগ্র ভূমিও গবর্ণমেণ্টের খাস দখলে নহে। শ্রীবৃন্দাবন শহরের সকল ভূমিখণ্ডই দেবোত্তর—গোস্বামী এবং সেবায়তদিগের অধিকারভুক্ত। গোস্বামী প্রভুরা জমি ভাড়া না দিলে, কাহার সাধ্য শ্রীবৃন্দাবনে মাংসের দোকান খোলে? সেবায়ত ও পাণ্ডারা মুসলমান প্রজা না বসাইলে, কোন মুসলমানের সাধ্য নাই যে, শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া বাস করে। আমরা জানি, কোন্ কোন্ গোঁসাই শ্রীবৃন্দাবনে মদের দোকান খুলিবার জন্য, মাংসের হাট বসাইবার জন্য মুসলমান প্রজাকে উচ্চ হারে জমি ভাড়া দিয়াছেন। আমরা জানি, শ্রীবৃন্দাবনের এক বড় মাতব্বর গোঁসাই ময়দার কল, তৈলের কল, সোডা লেমনেডের কল বসাইয়াছেন। বেশ দুই পয়সা রোজগার করিতেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের রক্ষক গোস্বামী প্রভুপাদগণ। তাঁহারা যদি টাকার লোভে অধর্ম্ম করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে বাহিরের লোকে করিবে কি! গবর্ণমেণ্টেরই বা ইহাতে দোষ কতটুকু? কোন্ তীর্থই বা ভাল আছে? কোন্ তীর্থেই বা ধর্ম্মসম্মত কাজ হইতেছে? চন্দ্রনাথের এবং তারকেশ্বরের মহান্তদের কীর্ত্তি ত বাঙ্গালী সমাচারপত্রপাঠক মাত্রেই জানেন। তোমরা নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবে না, নিজেরা ঠিকমত ধার্ম্মিক হইবে না; খবরের

কাগজে বাজে বকুনি বকিলে লাভ কতটুকু? যাহারা ভিতরের খবর রাখে না বা জানে না, তাহারা এই সব বাজে আন্দোলনে অসন্তুষ্ট হইয়াই উঠে, বিদ্বেষের ভাব তাহাদের প্রবল হইয়া উঠে। এমন বাজে আন্দোলন না করাই ভাল।

৩

পূর্ব্ববঙ্গের—বিশেষতঃ বিক্রমপুর পরগণার অনেক গ্রামে কিশোরী-ভজার, সহজিয়ার ধর্ম্ম প্রসার লাভ করিতেছে। বরিশাল, মৈমনসিংহ প্রভৃতি জেলার অনেক গ্রামে ভাল দশকর্ম্মান্বিত পুরোহিতের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। পুরোহিতের অভাবেই অনেক ছোট জাতির গৃহস্থ ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। এ কথাটা খুব সত্য। কিন্তু ইহার প্রতিবিধান করিবে কে? ব্রাহ্মণ-সভা দলাদলি লইয়া ব্যস্ত, পোপ পঞ্চাননের বড়াই লইয়া ব্যস্ত; কায়স্থ-সভা গলায় দড়ি দিতে ব্যস্ত, ক্ষত্রিয় সাজিতে উদ্যত; —সমাজের ভাবনা ভাবিবে কে? মানুষের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বড়ই প্রবল। বাঙ্গালী ধর্ম্ম ছাড়া থাকিতে পারে না। স্মৃতিসম্মত ধর্ম্মের আশ্রয় না পাইলে বাঙ্গালী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবেই। কিশোরীভজন এবং সহজিয়ার ধর্ম্ম প্রচার করিবার মানুষ আছে, সে সব মানুষ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর অল্প আয়াসে নিজেদের দলপুষ্টি করিতেছে। আর বাঙ্গালার শিরোমণি ব্রাহ্মণ বাজে কাজে প্রমত্ত আছেন। ব্রাহ্মণ-সভায় এত পয়সা ভূতভোজনে খরচ হইতেছে, পরন্তু পুরোহিত গড়িবার, দশকর্ম্ম-পদ্ধতি শিখাইবার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। সমাজের অবস্থার দিকে দৃষ্টি কাহারও নাই, সকলের দৃষ্টি নিজের দিকে। আমি বড় হইব, আমি দেশোদ্ধার করিব—এই চিন্তাই সকলের মনে অহরহঃ জাগিতেছে। আর সমাজ দিনে দিনে অধঃপাতে যাইতেছে।

তাই বলিতেছিলাম—যায় যে সব; তোমার যাহা বা তুমি যাহার জন্য বাঙ্গালী, সে সব যে আর থাকে না। এখনও সময় আছে, সাবধান হইলে সামলাইতে পারে; আর কিছু দিন পরে কিন্তু সব যাইবে, তখন মাথা কুটিলেও হারানিধি আর পাইবে না। কিন্তু বলিই বা কাহাকে, শুনিবেই বা কে! সব যে অহমিকার নেশায় ভরপুর। ('প্রবাহিণী, ২৯ চৈত্র ১৩২১)

বাঙ্গালার তন্ত্র

ইংরেজী শিক্ষার অতিপ্রচারে, ইউরোপীয় সভ্যতার মোহে আমরা আর যতই বিস্মৃত হই না কেন, দেশের এবং সমাজের দিকে দেশীয় দৃষ্টি লইয়া তাকাইতে ভুলিয়াছিলাম। ইউরোপীয় সভ্যতার মোহে আমরা এতই আত্মহারা হইয়াছিলাম যে, দেশের পুরাতন আচার ব্যবহার, রীতি পদ্ধতি কিছুই ভাল বলিয়া বোধ হইত না; বিদেশের, বিশেষতঃ ইউরোপের সকল আচার ব্যবহার উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইত। আর এই বোধের সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতাম যে, ইউরোপের সামাজিক আচার ব্যবহার আমাদের দেশে প্রচলিত করিতে পারিলে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সামাজিক ভাবে আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। এই মোহের ভার এতই অধিক হইয়াছিল যে, আমাদের মধ্যে অনেকে এমন হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা দেশকে এবং বাঙ্গালী সমাজকে সাহেবী ঢঙ্গে পরিণত করিতে পারুন আর নাই পারুন, সমাজের দশ জনকে উন্নত উদাহরণ দেখাইবার উদ্দেশ্যে নিজেরাই কোরা সাহেব সাজিয়া বসিলেন। দেশের যাহা, দেশীয় যাহা তাহা কিছু কালের জন্য অবজ্ঞাত—উপেক্ষিত হইয়া রহিল। বঙ্গভঙ্গের পর, স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশের সকল লোকের দৃষ্টি বাঙ্গালার পুরাতন সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইল, ইংরেজীনবীস বাবু খাঁটি বাঙ্গালীকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে কাহারও এদিকে দৃষ্টি পড়ে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। দেশপূজ্য ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণায়, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী পরিচালনায়, ইন্দ্রনাথের শ্লেষ বিদ্রূপে, অক্ষয়চন্দ্রের সন্দর্ভে অনেকের দৃষ্টি এই দিকে নিপতিত হইয়াছিল বটে; পরন্তু তাঁহারা সাধারণ ইংরেজীনবীসের দল হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে কেহ বা নব্য হিন্দু বলিয়া ঠাট্টা করিত, কেহ বা গোঁড়া বলিয়া গালি দিত, কেহ বা আর্য্যামি বলিয়া বিদ্রূপ করিত। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে এ ভাবটা অনেক কমিয়াছে—নাই বলিলেও চলে। এখন লোকে বুঝিয়াছে যে, রাজা রামমোহন রায় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এই দুই জনই বাঙ্গালার খাঁটি এবং স্বদেশী সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে পুরাদস্তুর দেশীয়তার বেদীর উপর

সমাজসংস্কারপদ্ধতি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাকী সব,—কেশবচন্দ্র হইতে সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ইউরোপের নকলনবীস সমাজসংস্কারক এবং ধর্ম্মপ্রচারক। তোমাদের দেশে, তোমাদের বাঙ্গালী সমাজে, খাঁটি বাঙ্গালী নাই কি? স্ত্রীস্বাধীনতা আছে, যুবতীবিবাহ আছে, বিধবাবিবাহ আছে, ছত্রিশ জাতি এক করিয়া পান ভোজনে একাকার আছে, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাও আছে। তবে সে সব বাঙ্গালীর গাড়ু গামছার সঙ্গে, কাপড় চাদরের সঙ্গে, বেজায় ভার্ণাকুলার ভাবের সঙ্গে জড়ান মাখান আছে। সেখানে সেমিজ সেলুকা নাই। হ্যাট কোট নাই; রোষ্ট টোষ্ট নাই, কারি কট্‌লেট নাই, রুটি বিস্কুট নাই। আছে মালপোয়া, মালসাভোগ, মুদ্রা, মহাপ্রসাদ, খোল করতাল। সে সব খাঁটি বাঙ্গালার জিনিস যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে চাও, তবে বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম্ম, সহজিয়া ধর্ম্ম এবং বাঙ্গালার তন্ত্র ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম বুঝিবার এবং জানিবার চেষ্টা কর। গৌড়ীয় তন্ত্র ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সকল খবর পাইলে বুঝিবে, কেশবচন্দ্র হইতে শিবনাথ সুরেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সবাই পণ্ড শ্রম করিয়াছেন; যাহা দেশে ছিল, তাহাই বিলাতী মোড়কে মুড়িয়া এ দেশে আবার আমদানি করা হইয়াছে।

আসল কথা কি জান, যে ধর্ম্মের—যে সমাজবিন্যাসের উপর তোমাদের এতটা রাগ, এমন জাতক্রোধ, সে ধর্ম্ম ও সমাজশাসন বাঙ্গালার সিকি অংশ লোকে মানিয়া চলে না। স্মৃতির আচারধর্ম্ম এবং বর্ণাশ্রমপ্রতিষ্ঠা বাঙ্গালায় কেবল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য, এই তিন জাতির মধ্যে কতকটা নিবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ বাহ্যিক হিসাবে, কয়েকটা বহিরাবরণের হিসাবে স্মার্ত্ত ধর্ম্ম এ দেশে প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। কারণ, যাঁহারা আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক বা দীক্ষিত বৈষ্ণব হইতেন, তাঁহারা স্মৃতির সকল হুকুম মানিতেন না। আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক, পূর্ণাভিষিক্ত তান্ত্রিক চক্রে বসিতেন, সুরা পান করিতেন। স্মৃতির হিসাবে তাঁহার জাতি ধর্ম্ম থাকে কি? দীক্ষিত বৈষ্ণব মহোৎসবে প্রসাদ পাইলে, কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইলে তাহার জাতি কুল স্মৃতির হিসাবে বজায় থাকে কি? বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থ মাত্রেই হয় বৈষ্ণব, নহে ত ঘোর তান্ত্রিক। মনুর হিসাবে, এমন কি, রঘুনন্দনের হিসাবেও বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, কাহারও ঠিকমত জাতি নাই। এখন ইংরেজের আমলে ইংরেজী

লেখাপড়া শিখিয়া আমরা সর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জিত হইয়াছি; আমাদের চক্রে বসিয়া সুরা পান করা নাই, মহাপ্রসাদ বলিয়া মহামাংস ভোজন নাই, পক্ষান্তরে মহোৎসবে প্রসাদ ভোজন নাই, সহজিয়ার সাধনাও নাই। সে স্বেচ্ছাচারের স্থান এখন বিলাতী স্বেচ্ছাচার অধিকার করিয়াছে। চক্রের পরিবর্ত্তে টেবিল হইয়াছে, অপরের পরিবর্ত্তে ডিক্যাণ্টার ও ওয়াইন-গ্লাস হইয়াছে, মুদ্রার স্থানে রোষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে মালপোয়ার পরিবর্ত্তে কেক খাই, পায়েস প্রসাদের পরিবর্ত্তে পরিজ্ঞ পান করিয়া থাকি। হেরিডিটি মানিতে হইলে বলিতে হইবে, বর্ত্তমান স্বেচ্ছাচার আকাশ হইতে পড়ে নাই; খাঁটি দেশীয় স্বেচ্ছাচার ও একাকারের পরিবর্ত্তে বিলাতী বা ইউরোপীয় স্বেচ্ছাচার স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাঙ্গালার প্রায় পনের আনা নর নারী কখনই খাঁটি বৈদিক—বর্ণাশ্রমী হিন্দু ছিল না, এখনও নাই। কি জানি কেন, বাঙ্গালার মোলায়েম পলি মাটিতে বৈদিক হিন্দুয়ানি কখনই গজায় নাই, বোধ হয় কখনই ঠিকমত গজাইবে না। তাই মাঝে মাঝে বাঙ্গালায় হিন্দুয়ানির চাষ করিতে হইয়াছে; কান্যকুব্জ, মিথিলা, কর্ণাট, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ হইতে গোঁড়া হিন্দু আনিয়া হিন্দুয়ানির কলমের চারা সাজাইতে হইয়াছে; কিন্তু এমনই মাটির গুণ যে সেই গোঁড়া দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে পাতিতে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালার হিন্দুও পাতি, মুসলমানও পাতি। বাঙ্গালার দেশীয়তার প্রভাব অপরিহার্য্য—অনিবার্য্য।

বাঙ্গালার বাঙ্গালীকে ঠিকমত বুঝিতে হইলে, এই দেশের বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং তন্ত্রের ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। কারণ, বাঙ্গালী অর্দ্ধেক বৈষ্ণব, অর্দ্ধেক তান্ত্রিক। তন্ত্র-সাহিত্য পড়িয়া যত দূর বুঝা যায়, তাহাতে ইহা মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তন্ত্রধর্ম্মই বাঙ্গালার আদিম ধর্ম্ম। বৌদ্ধ যুগে বাঙ্গালার ও তীরভুক্তির (আধুনিক ত্রিহুত ও মিথিলার) বৌদ্ধগণ মহাযান বৌদ্ধের প্রাবল্য ঘটান এবং সেই মহাযানী বৌদ্ধদের প্রভাবে বজ্রযানী, কালচক্রযানী প্রভৃতি নানাবিধ তান্ত্রিক বৌদ্ধ মত প্রচলিত হয়। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম্ম বাঙ্গালা হইতে তিব্বতে, চীনে, ব্রহ্মে, শ্যামে, আনাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দূরদূরান্তর দেশে প্রচারিত হয়। পরে তিব্বত ও চীনের তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বাঙ্গালায় আসিতেন এবং তন্ত্রমত শিক্ষা করিতেন। এখন কথা এই যে, বৌদ্ধ তন্ত্রধর্ম্ম অতিপুরাতন

কোন মূল তান্ত্রিক ধর্ম্মের বৌদ্ধ সমন্বয়, কি একেবারেই একটা নূতন ধর্ম্ম, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। আমার মনে হয়, একটা অতিপুরাতন তন্ত্রধর্ম্ম এ দেশে খুব প্রচলিত ছিল; বৌদ্ধ ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া প্রবলতর আকার ধারণ করিয়াছিল। তন্ত্রের অধিকতর আলোচনা হইলে এ প্রশ্নের মীমাংসা পরে হইবে। যাহা হউক, ইহা ঠিক যে, গত দুই হাজার বৎসরকাল বাঙ্গালায় তন্ত্রধর্ম্মই প্রবল আছে। এখন আমরা ধর্ম্মকর্ম্মশূন্য হইলেও তন্ত্রের আচার ছাড়ি নাই। বাঙ্গালার সকল বড় ভৌমিক ও জমিদারের ঘর তান্ত্রিক ছিল; পরে তাঁহাদের অনেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হয় যে, তান্ত্রিক ধর্ম্মই বাঙ্গালার ধর্ম্ম, তন্ত্র-সাহিত্যই বাঙ্গালার মূল সাহিত্য। বাঙ্গালার তন্ত্রধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধ তন্ত্রের আচার এবং সিদ্ধান্ত যে অনেকটা মিলান এবং মিশান আছে, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। এমন কি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলে তন্ত্রের পদ্ধতি অনেক পরিলক্ষিত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত আপোষ, তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার Modern Buddhism গ্রন্থে এ কথাটা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। সহজিয়া ধর্ম্মে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের গন্ধ বেজায় আছে, তাহা তিনিই জানেন, যিনি সহজিয়া এবং কর্ত্তাভজাদিগের কর্ম্মপদ্ধতি দেখিয়াছেন। বাঙ্গালার বাঙ্গালী চিরকালই নামে হিন্দু, কিন্তু কর্ম্মে অর্দ্ধেক বৌদ্ধ, অর্দ্ধেক তান্ত্রিক। এই হিন্দু নাম বাঙ্গালীকে পাঠানগণ সর্ব্বপ্রথমে দিয়াছিলেন, সেই হিন্দু নামের বন্ধনে বৌদ্ধ, তান্ত্রিক এবং বর্ণাশ্রমাচারী হিন্দু সম্পিণ্ডিত হইয়া এক জাতি এবং ধর্ম্মাবলম্বীতে পরিণত হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালায় এই তিন ধর্ম্মের ফল্গু প্রবাহ চিরকালই বহিতেছে, বোধ হয় ভবিষ্যতে চিরকালই বহিবে। এইবার বুঝিতে হইবে, তান্ত্রিক ধর্ম্মের মূল সিদ্ধান্ত কি? যে সকল সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত, সকল তন্ত্রগ্রন্থে গ্রাহ্য, আমি তাহারই কেবল উল্লেখ করিব।

তন্ত্র সাধনার ধর্ম্ম, সমাজ-সংহতির ধর্ম্ম নহে। প্রত্যেক সাধকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা বুঝিয়া, তাহার জন্মকোষ্ঠী ও বংশগত ধাতু বুঝিয়া তাহার অধিকার নির্ণীত হয় এবং সেই অধিকার অনুসারে তাহার উপযোগী সাধন-পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেক সাধকের পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম এবং স্বতন্ত্র ব্যবস্থা স্থির করা হয়।

তান্ত্রিক সাধনার কাল দিনের বেলা নির্দ্দিষ্ট নহে। তান্ত্রিক পূজা পাঠ, ভজন সাধন, সবই রাত্রিকালে করিতে হয়। রাত্রির প্রথম প্রহরের পরে এবং অর্দ্ধোদয় কাল পর্য্যন্ত তান্ত্রিক সাধনার প্রশস্ত সময়। দিনের বেলায় স্নান, দান ও নিত্যকর্ম্ম ছাড়া সাধনাসম্পর্কিত কোন কাজ করিতে নাই। তবে সূর্য্যগ্রহণের সময়ে, বিশেষ কোন যোগ থাকিলে পুরশ্চরণ ও জপ করার বিধি আছে।

সাধক একা তন্ত্রসাধনা করিবে। তবে গোড়ায় গুরুকে সম্মুখে রাখিয়া সাধনার পদ্ধতি বিহিত আছে। কেবল চক্রে বসিলে, এক অবস্থার বা একরকম যোগ্যতার ও এক গুরুর শিষ্যসকল এক সঙ্গে ক্রিয়া করিতে পারে। একান্ত নির্জ্জন স্থান ছাড়া অন্য কোথাও তন্ত্র-সাধনা করা চলে না। তন্ত্র-সাধনা গোপনে করিতে হইবে; যত গোপনে করিতে পারিবে, ততই ভাল। তন্ত্রের স্পষ্ট উপদেশই আছে যে, গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ।

তন্ত্রের সাধনক্ষেত্রে জাতিবিচার বর্ণবিচার নাই। সিদ্ধির ন্যূনাধিক্য অনুসারে উচ্চ নীচ নির্ণীত হইয়া থাকে। তবে ব্রহ্মানন্দ গিরির ব্যবস্থা এই যে, গৃহী মাত্রেই ব্রাহ্মণ গুরু করিবে; গৃহস্থ, সাধক সন্ন্যাসী বা বিরক্ত পুরুষকে গুরুপদে বরণ করিবে না। কিন্তু এক গুরুর শিষ্যগণের মধ্যে জাতিবিচার নাই; সকল শিষ্যই সমানভাবে গুরুর প্রসাদে অধিকারী। মোটের উপর সাধন ব্যাপারে তন্ত্র জাতিবিচার করেন না।

তন্ত্র-বিধান-মতে শৈব বিবাহপদ্ধতি সকল জাতিই অবলম্বন করিতে পারে। এই শৈব বিবাহপদ্ধতি বশিষ্ঠ-সমন্বয়ের ফল। তন্ত্রে আছে যে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব কামরূপে তারা আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন; তাহার পর তিনি চীনে ও মহাচীনে পরিভ্রমণ করিতে যান। সে দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রচার করেন যে, নারী মাত্রই যখন আদ্যা শক্তির অংশরূপিণী, তখন নারীতে জাতিবিচার ও বর্ণবিচার করিতে নাই। যে নারীতে শক্তি যতটা স্ফুরিত, তিনি ততটা শ্রেষ্ঠ ও বরেণ্য। সুতরাং তান্ত্রিক সাধক, সকল জাতির এবং সকল দেশের নারী হইতে নিজ নিজ শক্তি (বা পত্নী) বাছিয়া লইতে পারেন। বিবাহের পূর্ব্বে সে নারীকে পূর্ণাভিষিক্ত করিলে তাহার বীজগত সকল দোষ দূর হয়। পক্ষান্তরে চীন ও মহাচীনের তান্ত্রিকগণ ভারতবর্ষের আর্য্যনারীদিগকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাকেই তান্ত্রিক পরিভাষায় বলে

বাশিষ্ঠ সমন্বয়। ইহা বহু পুরাতন সমন্বয় ; কারণ, বৌদ্ধ মহাযানীদের গোড়ার পুঁথিতে এই সমন্বয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ মহাযানী সম্প্রদায় ইহার পূর্ণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সমন্বয় অনুসারে বাঙ্গালা দেশে রাজা রামমোহন রায়ের কাল পর্য্যন্ত শৈব বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই শৈব বিবাহপদ্ধতির প্রভাবে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র অসবর্ণবিবাহ-রীতি প্রচলিত ছিল। ভেকধারী বৈষ্ণবদের মধ্যে যেমন অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল, তান্ত্রিকদের মধ্যে তেমনই ইহার প্রাবল্য ছিল। তান্ত্রিকগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উপর এক চাল চালিয়াছিলেন। মোগল, পাঠান, ইরানী, ইউনানী, চীনা, তিব্বতী, তাতারী,—যে-কোন দেশের যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বী নারী হউক না, তন্ত্রের নির্দ্দেশমত তাহাতে গোটাকয়েক লক্ষণ পরিস্ফুট থাকিলেই, তান্ত্রিক সাধক তেমন নারীর সহিত শৈব বিবাহ করিতে পারিতেন।

তন্ত্র, সামাজিক ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী—সকল দেশের সকল ধর্ম্মাবলম্বীই তান্ত্রিক সাধক হইতে পারেন। সমাজে ও সভায় মুসলমান মুসলমানই থাকিবে, খ্রীষ্টান খ্রীষ্টানই থাকিবে, নিজ নিজ সমাজধর্ম্মের কোন ব্যত্যয় ঘটাইবে না ; অথচ সে অধিকারী হইলে, সদ্‌গুরু পাইলে তান্ত্রিক সাধনায় দীক্ষিত হইতে পারিবে। আমরা দুই চারিটি খুব উচ্চাঙ্গের মুসলমান তান্ত্রিক সাধককে দেখিয়াছি ; এখনও দুই তিনটি শিক্ষিত ও পদস্থ মুসলমান তান্ত্রিকের খবর জানি। দরাব খাঁ, যাঁহার রচিত গঙ্গাস্তোত্র বাঙ্গালার বহু ব্রাহ্মণই নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। বড় বড় মুসলমান তান্ত্রিক শ্যামাবিষয়ক ভাল ভাল গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। এক আধ জন খ্রীষ্টান তান্ত্রিকের খবরও আমরা পাইয়া থাকি।

তন্ত্রের দৃষ্টিতে কোন সামগ্রী অপবিত্র বা হেয় নাই। যাহার পক্ষে যাহা উপযোগী, তাহা তাহার পক্ষে পবিত্র ও গ্রাহ্য। যে যাহা ভোজন করে বা ভোজন করিতে ভালবাসে, সে তাহাই তাহার ইষ্টদেবতাকে ভোগ দিতে পারে। মহাহোম বা যাগে পঞ্চ মহামাংসের মধ্যে গোমাংসও বৃহৎতন্ত্রসারে নির্দ্দিষ্ট আছে। কোল, ভিল, সাঁওতাল মায়ের সম্মুখে মুর্গী এবং শূকর বলি দিয়া থাকে। তন্ত্র বলেন—সাধকের আত্মাই ইষ্ট ; যিনি

যে দেশের মানুষ, যাহার যেমন আচার-পদ্ধতি, তাহার ইষ্টদেবতারও সেই রকমের ভোগ যাগ হইবে। তন্ত্র বলেন,—যে দেশের যেমন আচার, যেমন পান ভোজন প্রচলিত, সে দেশে যাইলে তেমনই আচার ও তেমনই পান ভোজন অবলম্বন করিলে কোন দোষ ঘটিবে না। বশিষ্ঠদেব মহাচীনে যাইয়া শূকরমাংস ভোজন করিয়াছিলেন।

"মন চঙ্গা ত কঠৌতী মে গঙ্গা"—হিন্দীর এই প্রবচনটা তন্ত্রেরই অনুবাদ মাত্র। তন্ত্র বলেন, তোমার যেখানে প্রবৃত্তি হইবে, সেইখানেই ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। শুইতে খাইতে, উঠিতে বসিতে, বলিতে ফিরিতে সদাসর্ব্বদাই যখন হাতে কোন কাজ থাকিবে না, তখনই জপ করিবে। তবে বিশেষ বিশেষ সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়; দেশভেদে সে পদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তনও ঘটে। কিন্তু তান্ত্রিক উপাসনা, জপ ও মানস পূজা সর্ব্বত্র, সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় চলিতে পারে। কেবল বিধিমত জপ করিতে হইলে নিশাকালেই করিতে হইবে; কারণ, নিশাকালই তন্ত্রসাধনার প্রশস্ত কাল।

ইহাই হইল তন্ত্রের মূল কয়টা কথা। ইহার পর উপাসনাতত্ত্বের কথা। সে কথার অনেক ইঙ্গিত পূর্ব্বে বহু সন্দর্ভে করিয়াছি। পরে তাহার পুনরুল্লেখ করিব। ('প্রবাহিনী,' ২৭ বৈশাখ ১৩২২)

কেদারনাথ

(ভ্রমণ-কাহিনী)

কেদারনাথ ভ্রমণের কথা যদি গোড়া হইতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে সে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, তাই পথের মাঝখান হইতেই যাত্রা আরম্ভ করিতে হইল, নতুবা কথা যে ফুরাইতে চাহিবে না। গত পূর্ব্ব-বৎসর ৩রা আষাঢ় অতি প্রত্যূষে রামভরা চটি হইতে কেদারনাথজীর মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কাল রামভরা চটিতেই রাত্রি কাটাইলাম। এখন এই রামভরা চটি কোথায়, সে কথা বলিতে গেলে এক মস্ত বড় ভূবৃত্তান্ত লইয়া বসিতে হয়। এক কথায় বলিয়া দিই—রামভরা হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত কেদারনাথের পথের একটি ক্ষুদ্র চটি। তাহার অধিক কোন

পরিচয় দেওয়া বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অসম্ভব। আজ আকাশ অনেকটা পরিষ্কার, কয়েক দিন হইতে ক্রমাগত খুব ঝড় বৃষ্টি হইতেছিল। বলিতে হইবে না যে, ঝড় বৃষ্টির সময়ে এই দুর্গম পথে যাতায়াত বড়ই বিপজ্জনক। একে ত পথ অতি ভীষণ, কোনরূপে একজন লোক হাঁটিয়া চলিতে পারে, তার পর যখন 'ঝর ঝর বরখে জলদ ঘন নীর,' তখন যে পথের কি অবস্থা হয়, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নহে; কেহ যদি সে সুখ সম্ভোগ করিতে চান, একবার সে পথে যাইতে পারেন। ঝড়ের সময় মেঘ ও বজ্রের প্রলয়-নির্ঘোষে যখন বিরাট্ পর্ব্বতদেহ কম্পিত হইতে থাকে, আর বনরাজি ঘন আন্দোলিত হইতে থাকে এবং তাণ্ডবে মাতিয়া বাতাস দৌড়ায়, তখন প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হয়, বুঝি এইখানেই—এই বিজন পর্ব্বতবক্ষেই জীবনের চিরসমাধি হইবে।

আমরা যে পথে চলিয়াছি, উহা ঠিক পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উর্দ্ধদিকে অগ্রসর হইয়াছে। এক পাশে খুব উঁচু পাহাড়, বড় বড় শিলার স্তূপ। কোন কোন শিলাখণ্ড এইরূপ ভাবে অবস্থিত যে, সামান্য স্পর্শেই উহা আমাদের মস্তকোপরি পতিত হইয়া আমাদের কেদার-দর্শন তখনই শেষ করিয়া দিবে বলিয়া ভয় হইতেছিল। সময়ে সময়ে ঐরূপ শিলাপতনে দুর্ঘটনাও ঘটিয়া থাকে। অপর দিকে অতলস্পর্শ খাদ। পথ বড়ই ভীষণ। যদি ঝাম্পানওয়ালাদের এক জনেরও একটু পা পিছলিয়া যায়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। শত সহস্র ফিট নীচে পড়িয়া হাড় কয়খানার অস্তিত্বও তখন থাকিবে কি না সন্দেহ।

খানিকটা পথ চলিয়া আসিয়া একটা অতি ভয়ানক স্থানে পৌছিলাম। পথের ঠিক মাঝ দিয়া একটা সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গী বা ফাটল চলিয়া গিয়াছে, উহার উপর এক হাত চওড়া একখানা কাঠ ফেলা, ঐ কাঠখানার উপর দিয়া আমাদের পার হইতে হইবে। কাঠখানা যে খুব মজবুত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবু দূর হইতে উহা দেখিয়া আমার শরীর ভয়ে জড়সড় হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি, আমি রীতিমত কাঁপিতেছিলাম, আর মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছিলাম। সঙ্গের লোকজনেরা আমার মুখের ভাব দেখিয়াই ভয়ের কথা বেশ বুঝিতে পারিল। এখানে নানা জল্পনা কল্পনায় খানিক সময় কাটিয়া গেল। কিন্তু কল্পনা ত ঐ স্থানে আমার জন্য সুপ্রশস্ত লৌহসেতু বাঁধিয়া দিতে

পারে না, আর এত পুণ্যও করি নাই যে, স্বর্গ হইতে কোন দূত আসিয়া আমাকে কোলে করিয়া এই স্থান পার করিয়া দিবে। ঐ কাষ্ঠখণ্ডের উপর দিয়াই আমাকে এই খাদের অপর পারে যাইতে হইবে। আমি তখন চক্ষু বুজিয়া ঝাম্পানের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ঝাম্পানওয়ালারা বোধ হয় আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া এমন সন্তর্পণে ঐ কাষ্ঠখণ্ডের উপর দিয়া আমাকে লইয়া গেল যে, কখন্ যে ঐ খাদ পার হইয়া গেলাম, তাহা জানিতেও পারিলাম না। সহসা লোকজনের আনন্দধ্বনিতে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, খাদ পার হইয়া আসিয়াছি। দূরে কেদারনাথজীর মন্দির তুষারমণ্ডিত অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গে শোভা পাইতেছে। এত দিনে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-জগৎ উন্মুক্ত হইল। আজ আকাশে মেঘ নাই—গাঢ় নীল গগনে সূর্য্যদেব সোনার কিরণ ঢালিয়া দিতেছেন। সাদা বরফে ঢাকা পাহাড়গুলি তপন-কিরণে ঝলমল করিতেছে। সত্য সত্যই উহার সহিত 'কাঞ্চনকিরণ নহে সমতুল।' বদরীনাথের পাহাড় হইতেও কেদারনাথের পাহাড়ের উচ্চতা অধিক। প্রায় এগার হাজার ছয় শত ফিট হইবে।

কেদারনাথ হিন্দুর পবিত্র মহাতীর্থ, শৈবের পরম সাধনার স্থান। এখানে খুব বেশী শীত। আষাঢ় মাস,—কিন্তু আমাদের দেশের মাঘ মাসের তীব্র কনকনে শীতের অপেক্ষা এখানকার শীত ভয়ানক। গায়ে প্রচুর পরিমাণে কাপড়চোপড় জড়াইয়াও শীতের হাত হইতে রক্ষা পাই নাই। পাহাড়ের পথে খানিক ক্ষণ যাইতে যাইতে শুনিলাম, কে যেন অদূরে গাহিতেছে,—

জয় প্রভু! কেদারনাথ উদয় চরণ তেরা (অতি দরশন তেরা।)

কণ্ঠস্বর রমণীকণ্ঠের ন্যায় বোধ হইতেছিল। এই বিজন পথে রাগিণী বড়ই মধুর লাগিতেছিল। পথের বাঁকটুকু ফিরিয়া দেখিলাম, একটি ক্ষুদ্র চটির পাশে গাছের ছায়ায় বসিয়া একটি বাঙ্গালী যুবতী গান গাহিতেছে, একজন সন্ন্যাসী যুবক গানের সঙ্গে সঙ্গে ডমরু বাজাইতেছে, আর মাঝে মাঝে যুবতীর কণ্ঠে স্বীয় রাসভনিন্দিত কণ্ঠ মিলাইয়া গানের মাধুর্য্য নষ্ট করিতেছে। তাহারা গাহিতেছিল,—

জয়ী প্রভু! কেদারনাথ উদয় চরণ তেরা (অতি দরশন তেরা।)
রঞ্চনা তোমার রঞ্চিয়ে প্রভু! রঞ্চিলে যুগ চার॥

বর্মা তোম্, বিষ্ণু তোম্, রাজ্য সৃষ্টিকে আধার।
জল খান মুখ বাস কিয়ে, ভয়ে নিরঙ্কার॥
জাঁগোঁ আগুয়ানী বৈকুণ্ঠক্ষেত্রপালা।
মাথে মস্তিক্ প্রভু! রুদ্রায়া হিমালা॥
পাদুকা চরণ তেরি শক্তি পাতালা।
ডিমি ডিমি তেরা ডমুরু বাজে, ধ্বজা ত্রিশূল সাজে॥
বড় দয়াল প্রভু! হো! হো! মৃদঙ্গতাল বাজে!—প্রভৃতি।

যথোপযুক্ত সুর লয়ে গানটি গীত না হইলেও তখন উহা আমার নিকট বড়ই সুন্দর লাগিতেছিল। যাত্রিগণ সকলেই উৎকর্ণ হইয়া ঐ সঙ্গীত-সুধাধারা পান করিতেছিল। আমরাও ঝাম্পান হইতে নামিয়া বিশ্রাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে গান শুনিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম—এই সুন্দরী বাঙ্গালী যুবতী কেমন করিয়া এই কাঠখোট্টা হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর সহিত মিশিল! তীর্থের পথে কত কলঙ্ক-কাহিনী শুনিয়াছি—কত কি দেখিয়াছি, তাই এ দৃশ্য আমার কাছে বড় একটা নূতন লাগিল না। গান শেষ হইলে সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া বলিল,—'মশাই, চিন্‌তে পাচ্ছেন কি? সেই যে কাশীতে দেখা হয়েছিল? কেদারনাথ যাচ্ছেন ত? বেশ, একত্র যাওয়া যাবে, ভালই হ'লো।' সন্ন্যাসীর কথায় আমার একে একে সব কথা মনে হইল; তাই ত, এত ক্ষণ এই ঠাকুরকে চিনিতে পারি নাই। আমি হাসিয়া বলিলাম,—'স্বামীজী, বিলক্ষণ চিনেছি,—কিন্তু যে সাজে সেজেছেন, কে বল্‌বে—আপনি বাঙ্গালী।' ঠাকুর গর্ব্বিতভাবে হো! হো! করিয়া হাসিয়া উঠিল। এখানে সন্ন্যাসী ঠাকুর ও এই যুবতীর ইতিহাস একটু না বলিয়া পারিলাম না। এই যুবতীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে। যুবতী ব্রাহ্মণ, কুলীনকন্যা। শ্বশুরবাড়ী কলিকাতার অতি নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে। দেখিতে অতি সুন্দরী। আজানুলম্বিত কেশপাশ—দিব্যি ফুট্‌ফুটে গৌরবর্ণ, গড়ন পিটন গোলগাল। ভাসা ভাসা কাল ডাগর চোখ—বয়স সতের আঠারোর বেশী হইবে না। এক কথায় সে সুন্দরী—সে সৌন্দর্য্যে মাদকতাও যথেষ্ট আছে। ষোল বছর বয়সের সময় এক অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত তাহার বিবাহ হয়, বিবাহের এক বছর পরেই তাহার কপাল পুড়িল, সে বিধবা হইল। ঘরে সতীনের ছেলে, ছেলের বৌ, ছেলেরা বিমাতাকে আদর

যত্নের ত্রুটি করে নাই, কিন্তু সেখানে তাহার মন টিকিল না, সতীনের ছেলের বৌরা নাকি তাহাকে গঞ্জনা দিত। তাহারই ফলে সে বাপের বাড়ী চলিয়া যায়—সেখানে এই সন্ন্যাসী ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ। তখন ইনি সন্ন্যাসী ছিলেন না,—থিয়েটার করিয়া, যাত্রায় গাহিয়া, ইয়ারকি দিয়া কাল কাটাইতেন, সংসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল অভিভাবক, তাহার শাসন মানা দায় হইয়া উঠিল। সহসা এক দিন পাড়ার এই বিধবা যুবতীকে লইয়া প্রস্থান। এখন ইনি হইয়াছেন কাশীর এক আশ্রমের কর্ত্তা, আর যুবতী তাহার সেবাদাসীই বলুন—বা শক্তি। আশ্রমের কর্ত্তা হইতেও ইনি যেরূপ চতুরতা খেলিয়াছিলেন, তাহাতেও ইহার বুদ্ধি ও বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যুবতীটি এহেন সাধুসংসর্গে থাকিয়া থাকিয়া কারণ এবং গঞ্জিকা সেবনেও বিশেষ অভ্যস্তা হইয়াছেন। সৌন্দর্য্যেও অনেকটা কালিমা পড়িয়াছে। বাঙ্গালীসুলভ সাজসজ্জাও আর নাই। পরিধানে লালপেড়ে গৈরিকবস্ত্র, ললাটে মস্ত বড় সিন্দূরের ফোঁটা, হাতে ত্রিশূল, সে এক অপূর্ব্ব বেশ। লজ্জাও আর তাহার নাই, কতকটা পুরুষোচিত দৃঢ়তা আসিয়া পড়িয়াছে, তবে এখনও একটু সামান্য সঙ্কোচ আছে—সেটুকুও যে আর বেশী দিন থাকিবে, তাহা ত মনে হয় না। তাহা হইলে এমন করিয়া সে পথে বাহির হইতে পারিত না! আমাদের সমাজের কঠোর বিধানে কত যে অশান্তি ঘুরিতেছে, সে কথা কেহই ভাবেন না। সমাজসংস্কারের দিকে ছোট বড় সকলের লক্ষ্য রাখা উচিত। মানুষ—মানুষ, দেবতা নহে। বাসনা-নিবৃত্তির বক্তৃতা দেওয়া সহজ, কিন্তু কার্য্যতঃ পারা বড় কঠিন। ঠাকুরদাদার আমলের শাস্ত্রের শাসন বর্ত্তমান যুগে চলে না। যাক্, আসল কথাই বলি।

আমরা প্রায় বেলা দশটার সময় কেদারনাথধামে পঁহুছিলাম। হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। তাড়াতাড়ি ঝাম্পান হইতে অবতীর্ণ হইয়া সমবেত যাত্রিমণ্ডলীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিলাম,—"জয় কেদারনাথজীকি জয়।"

কেদারনাথের মন্দিরটি দক্ষিণদ্বারী। সম্মুখে বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত মণ্ডপগৃহ। সর্ব্বাগ্রে কেদারনাথজীকে দর্শন করিলাম। কেদারনাথ হস্তপদবিশিষ্ট মূর্ত্তি নহেন—লিঙ্গমূর্ত্তি। প্রায় পাঁচ ফিট উচ্চ এবং চারি ফিট বেড় হইবে। দেবাদিদেবকে প্রণাম করিয়া মন্দিরের এক ধারে বসিয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। স্থানমাহাত্ম্য কথাটা বড় মিথ্যা নহে।

এখানে সংসারের কথা মনে হয় না, আত্মীয় স্বজনের কথাও মনে আসে না। এত উচ্চে, মধুর সৌন্দর্য্যমধ্যে আপনাকে লইয়া যেন ডুবিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। সংসারের হিংসা দ্বেষ—ক্ষুদ্র দেনা পাওনার গোলযোগ—সে যেন কত নীচ, কত হেয় বলিয়া মনে হয়; মনে হয়, তাহারা বুঝি এত উচ্চে এই দেবস্থানে পৌঁছিতে পারে না।

কেদারনাথের মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিবার সম্মুখস্থ তোরণদ্বারে একটি বৃহৎ ঘণ্টা দোদুল্যমান। এই ঘণ্টাটি নেপালরাজকর্তৃক প্রদত্ত। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার সময় যাত্রিগণ একে একে প্রায় সকলেই ঘণ্টা-ধ্বনি করিয়া থাকে। তোরণের দুই ধারে নানাবিধ মূর্ত্তি। দক্ষিণ দিকে নন্দী, বৃষ, গরুড়, পঞ্চ পাণ্ডব, পরশুরাম প্রভৃতির মূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের ভিতর দিকেও কয়েকটি মূর্ত্তি, সেগুলি পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি বলিয়া পাণ্ডা ঠাকুর ব্যাখ্যা করিলেন। প্রকৃতপক্ষে এ সকল মূর্ত্তির সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তির কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, ঠাহর করিতে পারিলাম না। সমুদয় মূর্ত্তি বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান হইল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নহি, কাজেই আমাদের এই সিদ্ধান্ত অলীক হওয়াও অসম্ভব নহে।

তোরণ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে একটা ছোট বারান্দা। বারান্দার পরেই সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত মণ্ডপগৃহ। মণ্ডপের সম্মুখেই কেদারনাথদেবের মন্দির। উহার অর্দ্ধভাগ তাম্রমণ্ডিত। মন্দির, তোরণ ইত্যাদি সমুদয়ই প্রস্তরনির্ম্মিত,—তেমন কারুকার্য্যমণ্ডিত নহে। মন্দিরটি যে অতি প্রাচীন, তাহা একটু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি করা যায়। মন্দিরের এক পাশে বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ডসকল পড়িয়া আছে। মন্দিরের উচ্চতা ১২৫ ফিট বলিয়াই মনে হইল, খুব বেশী হইলে ১৫০ ফিটের অধিক হইবে না, ইহা ঠিক। কেদারনাথের মন্দিরের উপরিভাগ হইতে স্ফটিকস্বচ্ছ শীতল সলিলধারা দিবা রাত্র ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতেছে। এ সম্বন্ধে বিবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। মন্দিরের ঠিক মধ্যভাগে দেবাদিদেব অবস্থিত।

এইবার পূজার কথা বলিব। প্রথমে কেদারনাথজীর শীর্ষদেশে গঙ্গাজল চড়াইতে হয়। তার পর পুষ্প চন্দন অর্পণ ও ধূপ দীপ প্রদান। এইরূপ **ব** আকারের মণ্ডল চন্দন দ্বারা অঙ্কিত করিয়া মহাদেবের পূজা অর্চ্চনা করিয়া প্রণামী দিতে হয়। সন্দেশ ভোগ দেওয়াই প্রচলিত

পদ্ধতি। পাণ্ডাঠাকুর ঐ ব মণ্ডলে নিজ হস্তদ্বারা যাত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া ও ঐ মণ্ডল লেপন করিয়া কহিতে থাকেন,—"কেদারনাথ তোমারা (যাত্রীর নামোল্লেখ করিয়া) মাতাকে, পিতাকে, গুরুকে, বন্ধুকে যাত্রা সুফল হয়। পাঁচ কি পঁচিশ, শোভন কি জড়ি, মতিকে ফল উর স্বর্গলোক লাভ হয়।" তার পর দক্ষিণার কথা। যাঁহার যেমন শক্তি, তিনি তাহাই দিয়া বলিয়া কহিয়া রেহাই পান। পূজোপযোগী কতকগুলি উপকরণের মূল্যও যাত্রীদিগকে দিতে হয়। পাণ্ডা ঠাকুর এই স্থানে যাত্রীর নামে দেবতার অর্চ্চনা করেন, বেদ পাঠ করেন ও হোম করিয়া থাকেন।

মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় বাম দিকে চারিটি মূর্ত্তি দেখিলাম। উহার তিনটি শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত, অপরটি কৃষ্ণপ্রস্তরে গঠিত। উহার মধ্যে কেদারের ভোগমূর্ত্তিও বিরাজিত। এখানে দ্রৌপদী, কুন্তী, গরুড়, নারায়ণ প্রভৃতির মূর্ত্তিও দেখিলাম। মন্দিরটি প্রাচীন, কিন্তু সম্মুখস্থ মণ্ডপগৃহটি আধুনিক। উহা বড় জোর পঞ্চাশ বছরের পুরাতন। এখানে দেবার্চ্চনার শেষ কার্য্য 'গোত্রহত্যা।' 'গোত্রহত্যা' কথাটা একটু বুঝাইয়া বলি। মহাদেবের শীর্ষদেশে ঘৃত বিলেপন করিয়া যাত্রিগণ কেদারনাথদেবকে যে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, তাহাই 'গোত্রহত্যা' নামে অভিহিত। কথাটার অর্থ কি, তাহা কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না। আমরা 'গোত্রহত্যা' প্রভৃতি কার্য্য শেষ করিয়া অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দর্শন করিবার জন্য মন্দিরের বাহিরে আসিলাম। গভর্ণমেণ্টের আদেশে এখানকার রাউল বা রাহুল সাহেবই কেদারনাথজীর ম্যানেজার বা সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহার কথা পরে বলিব।

মন্দিরের পশ্চাতে ও এ-দিকে ও-দিকে অমৃতকুণ্ড, ব্রহ্মাকুণ্ড, সুফল-কুণ্ড, হংসকুণ্ড, রেতককুণ্ড, উদককুণ্ড প্রভৃতি বিরাজমান। অমৃতকুণ্ডটি মন্দিরের নিকটে অবস্থিত, খুব ছোট। একটি ছোট পাহাড়িয়া নদী পার হইয়া হংসকুণ্ডে যাইয়া মৃত পরিজনের অস্থি ও পিণ্ড দান করিতে হয়। নদীটির নাম 'জয়শান্তি'। হংসকুণ্ডের বেড় ছয় হাত হইবে। মন্দিরের নিকটেই রেতককুণ্ড। এই কুণ্ডের নিকট দাঁড়াইয়া বম্ বম্ শব্দ করিলে বুদ্বুদ উঠিতে থাকে। ইহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই কুণ্ডের জল পারদ-মিশ্রিত বলিয়া পান করায় নিষেধ, তবে তিন বার গণ্ডুষ জল লইয়া

আচমন করার বিধি আছে। উদককুণ্ডের জল পান করিতে হয়। উহার জলে গন্ধকের গন্ধ পাইলাম। উহারও আকার হংসকুণ্ডের ন্যায়। কুণ্ড ইত্যাদি দর্শন করিয়া আমরা মন্দিরের পশ্চাৎভাগে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এখানকার দৃশ্যের তুলনা নাই। এই বিশাল গিরিশ্রেণী উন্নতমস্তকে কত দূরে কোথায় যাইয়া মিশিয়াছে, কে বলিবে? স্থানটি অতি বিজন। সে বিজনতায় এমন একটা স্তব্ধ ভাব বিরাজমান, যাহাতে আপনাকে মায়াপুরীর পাষাণ-প্রাচীরে আবদ্ধ অসহায় এবং বড় নিঃসম্বল বলিয়া মনে হয়। এই বিরাট্ বিশাল গগনচুম্বী দিগন্তবিসারী পর্ব্বতশ্রেণী কত বৃহৎ, ইহার নিকট আমরা কত ক্ষুদ্র! দূর পর্ব্বতের মাথার উপরে চিরতুষার-মুকুটধারী অত্যুচ্চ শৃঙ্গরাজি। এখানকার গিরিশ্রেণীর এই মহিমময় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমার মনে হইতেছিল—এই দৃশ্য শুধু অন্তরের উপভোগ্য নহে—আহা! বাক্যে বলিবার!

কেদারনাথমন্দিরের ঠিক উত্তর দিকে একটি খুব বড় পাহাড় দেখা যায়; ঐ পাহাড়টির নাম 'স্বর্গারোহণ'। উহার গাত্র বহিয়া একটি নির্ম্মল স্রোতধারা নিম্নাভিমুখে নামিয়া আসিয়াছে। ঐ ধারার নাম 'স্বর্গদ্বারী' গঙ্গা। গঙ্গার ঠিক পাশ দিয়াই একটি ক্ষুদ্র শিলাকীর্ণ বন্ধুর পথ বহিয়া চলিয়াছে, মন্দিরের পশ্চাৎ হইতে পথের বক্রতা কতক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পথের নাম 'মহাপথ'। পঞ্চ পাণ্ডব এই মহাপথেই স্বর্গের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। এখান হইতেই স্বর্গারোহণের প্রকৃত পথ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া পাণ্ডা ঠাকুরেরা বলিলেন। যে পাহাড়ের উপর কেদারনাথদেবের মন্দির অবস্থিত, তাহার নাম 'কৈলাস পর্ব্বত'। 'স্বর্গারোহণ' পাহাড় কৈলাস পর্ব্বত হইতে অনেক উচ্চ। 'কেদারনাথে'র দারুণ শীতেই আমরা অস্থির, কাজেই 'স্বর্গারোহণে'র ন্যায় দারুণ দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত-পথে অগ্রসর হওয়ার আশা তখনই ত্যাগ করিলাম। স্বর্গে যাওয়ার পথই দেখিলাম। ইহাও কম সৌভাগ্যের কথা নহে। মহাপথের অপর নাম 'ভৃগুপত্তন'। ভৃগু-পত্তনের পথে এ পর্য্যন্ত কেহ অগ্রসর হইয়া সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। স্বর্গারোহণ পর্ব্বত ও তাহার দূরবর্ত্তী অপর একটি পর্ব্বত হইতে পাঁচটি নদী বা ঝরণা নামিয়া আসিয়া কেদার-মন্দিরের নিম্নভাগে মিলিত হইয়াছে। ঐ পঞ্চ ধারার নাম পঞ্চ গঙ্গা।

ঐগুলি সরস্বতী, মন্দাকিনী, ক্ষীরগঙ্গা, মহাদধি, স্বর্গদ্বারী, এই পঞ্চ নামে প্রখ্যাত। সরস্বতীর ধারা অতি ক্ষীণ। কেদারনাথের অল্প দক্ষিণ দিকে এই পঞ্চ ধারার সঙ্গম হইয়াছে। মন্দিরের অনতিদূরে যে স্থানে মন্দাকিনীর সহিত ক্ষীরধারার সম্মিলন হইয়াছে, উহাকে ব্রহ্মতীর্থ কহে। ব্রহ্মতীর্থের অদূরে মন্দাকিনীর উপর একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু বিরাজমান। এই সেতুর উপরে দণ্ডায়মান হইয়া চারি দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করা বস্তুতই পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল। পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ পর্ব্বতের নাম ছিল পুরন্দর পর্ব্বত; কথিত আছে, পুরন্দর নিজ অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত ঐ পর্ব্বতে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া কেদারনাথের আরাধনা করিয়াছিলেন; তজ্জন্যই উহার নাম হয় পুরন্দর পর্ব্বত। কিন্তু পঞ্চ পাণ্ডবেরা এই পথে স্বর্গারোহণ করিবার পর হইতেই উহা স্বর্গদ্বার বা স্বর্গারোহণ পর্ব্বত নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

কেদারনাথধামে একটি বিদ্যালয় আছে। আমরা যখন দেখিয়াছিলাম, তখন উহার ছাত্রসংখ্যা মাত্র পনের জন ছিল। 'অমর-কোষ,' বেদপাঠ, শিবস্তুতি ও অঙ্কের মধ্যে মিশ্র চারি নিয়ম পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রেরা সকলেই ব্রাহ্মণ। শিক্ষকের নাম বালকরাম। বয়স একুশ বৎসর। নিবাস গুপ্তকাশী—শোণিতপুর। বেতন মাসিক বারো টাকা। পাণ্ডাগণ চাঁদা করিয়া শিক্ষকের বেতন দেন। প্রত্যেক ছাত্র মাসিক এক টাকা হারে বেতন দেয়। পনের জনের অধিক ছাত্র হইলেও শিক্ষক মহাশয় এই বারো টাকার অধিক বেতন পাইবেন না। বিদ্যালয়ের নাম "কেদারনাথকি পাঠশালা"। প্রাতে নয়টা হইতে বারোটা এবং অপরাহ্নে দুইটা হইতে সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত স্কুল বসিবার নিয়ম। রবিবার, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী তিথি, এ কয় দিন স্কুলে পাঠ বন্ধ থাকে। শিক্ষক মহাশয় পৃথগাসনে বসিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন।

কেদারনাথের মোহান্ত সেবায়েত পূজনীয় শ্রীমান্ রাউল বা রাহুল সাহেব উষা (উখা) মঠে থাকেন। এই উষামঠের সহিত স্বর্ণকুমারী উষার বহু স্মৃতি বিরাজিত। উষামঠ কেদারনাথ হইতে তিন দিনের রাস্তা, প্রায় ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। শীতের ছয় মাস উষামঠেই কেদারনাথের পূজা হইয়া থাকে। কারণ, ছয় মাস বরফে সমাচ্ছন্ন থাকে।

ছয় মাস বরফের নীচে থাকে বলিয়াই প্রথম দৃষ্টিতে এই মন্দিরটি তেমন প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। আমরা কেদারনাথ হইতে ফিরিয়া বদ্রিনারায়ণ যাইবার পথে রাউল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। যাত্রিগণ ইঁহাকে নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী দক্ষিণা দিয়া থাকে। আমরা এক পয়সা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত দক্ষিণা দিতে দেখিয়াছিলাম,—সে জন্য ইঁহার ব্যবহারের কোনও তারতম্য দেখিলাম না।

কেদারনাথের মাটির একটা বিশেষত্ব এই যে, উহা প্রতি পাদবিক্ষেপেই থস্ থস্ করিয়া কাঁপিতে থাকে; মনে হয় বুঝি পা বসিয়া যাইবে, কিন্তু দ্রুত হাঁটিলেও পা বসিয়া যায় না। কেহ কেহ এ স্থানে গন্ধকের খনি আছে বলিয়া অনুমান করেন। সে অনুমান একেবারে অলীক বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এখানকার অনেক কুণ্ডের জলে গন্ধকের গন্ধ স্পষ্ট অনুভূত হয়।

নানা স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় শেষ হইয়া গেল। সন্ধ্যাকালে অবসন্নদেহে চটিতে ফিরিয়া আসিলাম। ভাবিয়াছিলাম, বাসায় যাইয়াই আহার্য্য প্রস্তুত দেখিব, কিন্তু কার্য্যে তাহার কিছুই হয় নাই। শুনিলাম, বেলা দুইটার সময় ডাল তুলিয়া দিয়া বেলা ছয়টায় নামান হইয়াছে, তথাপি ডাল অর্দ্ধসিদ্ধ অবস্থাতেই রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ বেচারা আর কি করিবে? পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, শীতাধিক্যই ইহার কারণ।

পরদিন অতি প্রত্যূষে কেদারনাথ ত্যাগ করিলাম। আমাদিগকে পুনরায় গুপ্তকাশী হইয়া বদরিকাশ্রম যাইতে হইবে। কাজেই এখন ক্রমাগত তিন দিন 'উতরাই'। কেদারনাথ সম্বন্ধে বিস্তারিত পৌরাণিক আখ্যান আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক "স্কন্দপুরাণের" কেদারখণ্ড পাঠ করিলে অনেক কথা জানিতে পারিবেন। আমরা যখন কেদারনাথ হইতে রামবাণ চটির দিকে অগ্রসর হইলাম, তখন খুব সূর্য্যোদয় হয় নাই। শুধু পূর্ব্বদিকে উষা সুন্দরীর অলক্তকরাগলাঞ্ছিত চরণদ্বয়ের ক্ষীণাভা তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণীর পশ্চাৎভাগে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার চরণ-মঞ্জীরের রুনু রুনু ধ্বনির অনুকরণ করিয়া মন্দাকিনীধারা মৃদু কলনাদে বহিয়া চলিয়াছে। কেদারনাথের মন্দিরদ্বার তখনও উন্মুক্ত হয় নাই। আমরা করজোড়ে চিরজীবনের জন্য দেবাদিদেবকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইতে

লাগিলাম। একটু অগ্রসর হইতেই আমাদের সহযাত্রী ডাক্তারবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "জয় কেদারনাথজীকি জয়।" পর্ব্বতবক্ষ হইতেও কে যেন গুরুগম্ভীর নাদে 'জয় কেদানাথজীকি জয়' রবে আমাদিগকে বিদায় অভিনন্দন দান করিল। ('প্রবাহিণী,' ২৭ বৈশাখ ১৩২২)

কাম ও মদন

১

কি বৈষ্ণব, কি তান্ত্রিক, সকলকেই হিন্দুর সাধনতত্ত্ব বুঝিতে হইলে কাম ও মদন, এই দুইটির মূল অর্থ ও তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। ইংরেজী পড়িয়া, খ্রীষ্টানি সিদ্ধান্তে বিভোর হইয়া কাম ও মদন বলিলেই আমরা এখন রিরংসার ভাবটাই বুঝিয়া লই। উহাতে যে রিরংসা নাই, এমন কথা বলি না; কিন্তু রিরংসা ছাড়া উহাতে আরও অনেক ভাব, অনেক ব্যাপার আছে। সেই সকল বিষয়ের পূর্ণ উপলব্ধি না হইলে তান্ত্রিকী উপাসনা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মধুর রসের সাধনা এবং প্রেমতত্ত্ব, কিছুই বুঝা যাইবে না। কেবল তাহাই নহে, কাম ও মদনতত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না হইলে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃত রসাস্বাদে আমরা বঞ্চিত থাকিব। তাই কাম ও মদনতত্ত্বের আমি যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহারই একটু পরিচয় পাঠকগণকে দিব। বলিয়া রাখা ভাল যে, শাস্ত্রের গণ্ডীর বাহিরের কোন সিদ্ধান্তের উল্লেখই আমি করিব না; কেবল বাহুল্যভয়ে পদে পদে শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিতে পারিব না।

এক আমি বহু হইব, এই কামনা হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি। 'সোঽকাময়ত একোঽহং বহু স্যাম্'—ইহাই শ্রুতিবাক্য। এই কামনা বা ইচ্ছা তাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান; কখন বা উহা ফুটিয়া উঠে, কখন বা উহা সম্মূঢ় অবস্থায় থাকে। এই কামনা আছে বলিয়াই তাঁহাকে রসময় বলা হয়। 'রসো বৈ সঃ'—তিনিই রসস্বরূপ। রস বলিতে আমরা এখন বুঝি খেজুররস, ইক্ষুর রস,—একটা জলীয় ক্বাথ মাত্র। কিন্তু রসের

কেবল সে অর্থ নহে। রস তাহাই, যাহার সাহায্যে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। রস, বিপরিণামের সহায়ক শক্তি মাত্র। তাই কেমিষ্ট্রীকে রসায়নবিদ্যা বলা হয়; পারদকে রসপ্রধান বলা হয়; কারণ, পারদের সাহায্যে বহু ধাতুর অবস্থান্তর ঘটান যায়। তিনি রসময়; কেন না, তিনি ইচ্ছা করিলে সকল আকার ধারণ করিতে পারেন, অসংখ্য অবস্থান্তর লাভ করিতে পারেন। তিনি রসময়,—কেন না, বিশ্বসৃষ্টির এই অনন্ত বৈচিত্র্য তাঁহারই ইচ্ছাসঞ্জাত; তিনি সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকিয়া সে বিচিত্রতার বাহার ফুটাইতেছেন বলিয়া তিনি রসময়। তিনি রসময়; কেন না, তিনি এক হইতে দুই, দুই হইতে অনন্ত কোটিতে নিজেকে ছড়াইয়া বিলাইয়া দিতে পারেন। তিনি রসময়; কেন না, তিনি এই বিশ্বসৃষ্টির বিচিত্রতাকে নিজের মধ্যে সংহৃত করিয়া রাখিতে পারেন। তিনি এক হইতে বহু এবং বহু হইতে একে বিপরিণতির কর্ত্তা বলিয়া তিনি রসময়। রসের এই মূল অর্থ ধরিয়া, পরে পদার্থ মাত্রেরই নির্য্যাসক রস বলিয়া সাধারণ্যে গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছে। মূলে কিন্তু বিবর্ত্তনের শক্তিকেই রস বলা হইয়াছে।

যে শক্তির দ্বারা সৃষ্টির বিস্তার ঘটে, তাহাকেই আদি রস বলে। এক আমি বহু হইব, ইহাই আদি রসের মূল সূত্র। তেমনই আমাদের রসায়নশাস্ত্রে যে পদার্থের সাহায্যে অন্য একটা পদার্থের বিবর্ত্তন সম্ভবপর হয়, তাহাই তাহার আদি রস বলিয়া পরিচিত। যেমন তাম্রের সহিত দস্তা মিশাইলে পিত্তল হয়, পিত্তলের আদি রস দস্তা। কারণ, তামার সহিত সোনা বা চাঁদি, লোহা বা পারা মিশাইলে পিত্তল হয় না; সুতরাং পিত্তলরূপে বিপরিণতির পক্ষে দস্তাই উহার আদি রস।

মনুষ্যদেহে বিপরিণতিসাধক অনেক প্রকারের শক্তি বা আসক্তি আছে। সে সকল শক্তির মধ্যে যে শক্তির সাহায্যে মনুষ্য এক হইতে বহু হইতে পারে, তাহাই দেহজাত আদি রস। প্রথমে শিশু বিভোর বিভ্রান্ত ভাবে ভূমিষ্ঠ হয়; ভূমিষ্ঠ হইবার দিন হইতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত যে যে শক্তির প্রভাবে তাহার শৈশব, পৌগণ্ড, বাল্য, কিশোর, যৌবন, প্রৌঢ়তা, বার্দ্ধক্য, জরা প্রভৃতি নানা পরিবর্ত্তনের প্রকাশ হয়, সেই সেই শক্তি তাহার দেহগত নানা রস বলিয়া পরিচিত। তন্ত্র, দেহের এই সকল পরিবর্ত্তনকে ঠিক chemical changes বা রাসায়ন বিবর্ত্তন বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়াছেন ; রসায়নশাস্ত্রের পরিভাষায় দেহগত রসায়নের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিশ্বব্যাপী আত্মা, যেমন রসের প্রভাবে বিশ্বসৃষ্টির বিচিত্র লীলা প্রকট করিতেছেন,—নাটের গুরু নটবর তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্বে যেমন পরিব্যাপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের বিকাশ করিতেছেন, তেমনি দেহগত আত্মা শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য আদির উন্মেষ ঘটাইয়া দেহমন্দিরে বসিয়া অপূর্ব্ব লীলা বিস্তার করিতেছেন। যে কেমিষ্ট্রী বা রসায়ন বিশ্বসংসারে নিত্য বিদ্যমান, সেই কেমিষ্ট্রী বা রসায়ন দেহভাণ্ডে নিত্য বিদ্যমান ; উভয়ের ক্রিয়া এক রকমের, উভয়ের প্রভাব এক প্রকারের। তাই তন্ত্র বলিয়াছেন—যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহাই আছে দেহভাণ্ডে। বিশ্বাত্মা রসময়, দেহগত আত্মাও রসময়। বিশ্বব্যাপী আত্মা যেমন এক হইতে বহুতে পরিণত হইতে চাহেন, দেহগত আত্মাও তেমনি এক হইতে বহুতে বিস্তৃত হইতে চাহেন। বাহিরের আদি রস এবং ভিতরের আদি রস, দুই এক ও অভিন্ন, কেবল উহাদের অভিব্যঞ্জনা কিছু স্বতন্ত্র রকমের।

কঠোর সংযমী তপস্বীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তন্ত্র বলিতেছেন যে,—দেখ দেখ, সৃষ্টির উন্মেষ-ভঙ্গীটা এক বার দেখ। প্রথমে একটা রক্তের ডেলা ত ভূমিষ্ঠ হইল, তাহার পর তাহাকে স্তন্য পান করাইয়া, আহার যোগাইয়া সে পূর্ণ মনুষ্যে পরিণত হয়, তাহা হইতে আবার নূতন নূতন মনুষ্যের সৃষ্টি হয় কেঁন হয়—কে জানে? কিন্তু তথাপি হয়। কেবলই কি হয়? পিতামহ ও মাতামহকুলের উর্দ্ধতন উনপঞ্চাশ পুরুষে পরিলক্ষিত নানা বৈশিষ্ট্যসমেত হইয়া উৎপন্ন হয়। একটা অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে বিশাল বনস্পতি গগন ভেদ করিয়া উচ্চে উঠে ; তাহাতে কত ফুল, কত ফল জন্মায়, কত শোভা, কত মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে, তাহার পর অমনই কত অগণিত নূতন বৃক্ষের বীজ তাহা হইতে সঞ্চয় করা যায়। এক আমি বহু হইবার কামনা নিসর্গসুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গে যেন নিত্য সর্ব্বক্ষণ ফুটিয়া রহিয়াছে। সৃষ্টিমাধুরীর এই বিচিত্র শোভা, এই অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত কর্ম্মপরম্পরা তোমার সংযম তপস্যার অন্ধতমসাবৃত পথে পাওয়া যাইবে না। চোখ চাহিয়া না দেখিলে ইহার মহিমা কতকটা বুঝা যাইবে না। যখন মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হই, তখন বেদনা পাইয়া কাঁদিয়া উঠি, তখন একটা জীব

দুই ঠাঁই হয়, বোধ হয় তখনই আমার অস্তিত্বের জ্ঞান বিদ্যুদ্বিকাশবৎ ক্ষণেকের জন্য ফুটিয়া উঠে। তাহার পর গর্ভজাত যন্ত্রণা পাসরিবার কালে, তিন মাস পর্য্যন্ত যেন মহাঘোরে বিভোর থাকি। শেষে মায়ের মুখ দেখিতে দেখিতে, মায়ের স্তন ধরিয়া পীযুষধারা পান করিতে করিতে, হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে আমার আমিত্বের অধ্যাসটা ধীরে ধীরে দৃঢ় হইয়া যায়। তখন বুঝি—আমি এক জন। সেই এক জন হামা দেয়, খেলা করে, কাঁদে, পরে চলিতে ফিরিতে, উঠিতে বসিতে শিখে, বস্তুর পার্থক্য ও দূরত্ব অনুভব করিতে শিখে এবং ধীরে ধীরে মানুষ হইয়া উঠে। এই মানুষ যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তাহার দেহের কত শোভাই ফুটিয়া উঠে। সেই শোভার আকর্ষণে, চিত্তবৃত্তির মোহের প্রেরণায় সে অপর সকলকে নিজের দিকে টানিয়া আনে এবং আরও কত নূতন সৃষ্টির সূচনা করে। অহরহঃ সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ববিষয়ে এই এক আমি বহু হইবার ক্রিয়া চলিতেছে। জীবদেহ হইতে যাহা নির্গত হয়, তাহা হইতেই জীবের সৃষ্টি হয়,—কীট পতঙ্গ, অণু পরমাণুর মত জীবাণু যে কত অসংখ্য ফুটিয়া উঠে,—দেহের ভিতরে বিচরণ করে এবং দেহের বাহিরে উড়িয়া বেড়ায়, তাহার আর হিসাব করা যায় না। ইহাই সৃষ্টিপ্রহেলিকা, লীলাপ্রহেলিকা; এ প্রহেলিকা বুঝিবার নামই সাধনা, আরাধনা, উপাসনা—এই প্রহেলিকা বুঝিবার চেষ্টাতেই পদার্থ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণকে পরীক্ষা, সমীক্ষা, প্রতীক্ষা, অন্বীক্ষা প্রভৃতির প্রয়োগ করিতে হয়। কেবল চোখ বুজিয়া থাকিলে সাধনা হয় না। এক বার নয়নময় হইয়া দেখ,—দেখার মতন দেখ।

তন্ত্র এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত নহেন। তন্ত্র বলেন যে,—যে রসের প্রভাবে রূপের বিকাশ, মোহের বিকাশ, শেষে এক হইতে বহুর বিস্তৃতি, সেই রসই আদি রস, এবং সেই রসের সাহায্যে যে সাধনা, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই আদি রসের বহিরঙ্গের সাধনার ফলে রসায়ন, জ্যোতিষ, শিল্পকলা, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের ও বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। এই আদি রসের অন্তরঙ্গের সাধনার ফলে তন্ত্রের প্রায় সকল আরাধনার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবের মধুর রসের সাধনা এবং প্রেমের পথের আরাধনা এই আদি রসের অন্তরঙ্গ সাধনার একটা প্রকারান্তর মাত্র। তন্ত্র বলেন যে, এই আদি রস হইতে রিরংসার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া উহার নিন্দা

করিও না। বিশ্বসৃষ্টিতে নিন্দার বা পরিহারের কিছুই নাই। যাহা তোমার উপযোগী নহে, তাহা তোমার পরিহারযোগ্য হইলেও, অন্য কোটি জীবের নহে। রিরংসা না হইলে যখন সৃষ্টি সম্ভবপর নহে; স্থাবর, জঙ্গম—বিশ্বসৃষ্টির সর্ব্বস্বে যখন রিরংসা দেদীপ্যমান, তখন উহাকে পরিহার করিতে নাই, উহার নিন্দাও করিতে নাই। উহার মধ্যে কি গুপ্ত তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা কর, কোন্ কোন্ শক্তির প্রেরণায় উহার বিকাশ হয়, তাহা বুঝ; তবে ত সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে না পারিলে নিজেকে—দেহগত আত্মাকে ঠিক বুঝিতে পারিবে না। আত্মপরিচয়ই সাধনার শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য। প্রথমে আত্মার বাহিরের বিকাশ বুঝ, তবে ভিতরের লীলা বুঝিবে; প্রথমে ব্যাহৃতি দেখ, তবে সংহৃতি বুঝিবে। শিশু যাহা দেখে, তাহাই শিখে; বালক ও কন্যা দুই জনই মাকে দেখে, মায়ের আঁচল ধরিয়া বেড়ায়; কন্যা চারি বৎসর বয়সের হইতে না হইতে জননী হইতে চাহে; পুতুল না পাইলে একখানা ইট কোলে করিয়া ছেলের আদর করিতে শিখে। বালক পুত্র কিন্তু মা হইতে—জননী সাজিতে চাহে না; সে পিতার দেখাদেখি গাড়ী চড়িতে, ঘোড়ায় চড়িতে চাহে; স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যে উৎপাত উপদ্রব করিতে থাকে। শিশু কন্যা ও পুত্রে এ পার্থক্য, এমন বৈষম্য কেন? এই মাতৃত্ব জীবের হৃদয়ে কে গাঁথিয়া দিল? বাবা মা হইবার এত সাধ কেন? উত্তরে বলিব—'একোঽহং বহু স্যাম্' এই মহাবাক্যের ইহাই প্রাকৃত বা নৈসর্গিক অভিব্যঞ্জনা মাত্র। সুতরাং এই অভিব্যঞ্জনার বিশ্লেষণ করিতে পারিলে, ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে, যাঁহার এই অভিলাষ, তাঁহাকে কতকটা চিনিতে পারা যাইবে।

তন্ত্র বলিতেছেন যে—চাও ত আত্মসাক্ষাৎকার। অতএব আত্মবিকাশপদ্ধতি এই বিশ্বসৃষ্টিতে যে ভাবে হইতেছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। কাম ও মদনের দ্বারা এই বিশ্বসংসারে আত্মার অগণ্য ও অগণিত বিকাশ হইতেছে; সুতরাং কাম ও মদনতত্ত্ব না বুঝিলে আত্মপরিচয় ঠিকমত হইবে না। আদি চ্যুতি হইতেই মদনের বিকাশ, তাই সর্ব্বজীবে, সৃষ্টির সর্ব্বব্যাপারে মদন যেন জড়ান মাখান রহিয়াছে। আদি চ্যুতি কি? পূর্ণ ব্রহ্ম যখন বা যে ক্ষণে 'এক আমি বহু হইব' বলিয়া বাসনা প্রকাশ করিলেন, তখনই যেন লীলার হিসাবে সেই এক বিশ্বব্যাপী আত্মা হইতে

সোপাধিক অগণ্য আত্মা খণ্ড খণ্ড হইয়া বিচ্যুত হইল। বিশ্বব্যাপী আত্মা অনন্ত ও অক্ষয়, চ্যুত আত্মা সকলও অনন্ত অক্ষয়; কিন্তু উপাধিবশাৎ স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্র আত্মা বিশ্বব্যাপী আত্মার সহিত মিলিতে মিশিতে চাহে। যেমন সম্প্রসারণ, তেমনই সংহরণ হইবার চেষ্টা হয়। এই সংহরণ-চেষ্টাকেই বৈষ্ণব, জীবের নিত্য-বিরহ বলিয়া থাকেন। তন্ত্র এই মিলনাকাঙ্ক্ষাকে মদন বলেন। তোমাকে আমার মতন করিয়া লইব, তোমাকে আমাতে পূর্ণভাবে ডুবাইয়া লইব, ইহাই হইল মদন। মদ্ভাবভাবন ইতি মদনঃ—আমার মত ভাবিত করিয়া লওয়া—আমাময় করিয়া লওয়াকেই মদন বলে। হং সঃ—অহং সঃ—আমিই যে তুমি, ইহার সার্থকতা সম্পাদন যাহার দ্বারা হয়, তাহাই মদন। চ্যুত জীব অচ্যুত পরমাত্মায় যাহার সাহায্যে মিশিতে চাহে, তাহাই মদন। যত দিন অচ্যুত পরমাত্মাকে খুঁজিয়া না পায়, তত দিন চ্যুত জীব অন্য চ্যুত জীবের সহিত মিশিবার চেষ্টা করে। ইহাই হইল সৃষ্টিবিষয়ক মদন। এই সৃষ্টিজন্য মদনের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহার সাহায্যে সংসারে আত্মবিকাশ হইয়া থাকে। অতএব সৃষ্টিজন্য মদনকে জানিতে ও বুঝিতে পারিলে বিশ্বসৃষ্টিতে আত্মবিকাশের পরিচয় কতকটা পাওয়া যাইতে পারে। ইহাই হইল মদন আরাধনার প্রথম স্তর। রসায়ন, চিকিৎসা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি পদার্থতত্ত্বজাত বিদ্যাসকল মদন আরাধনার প্রথম স্তরভুক্ত।

ইহার পরে তন্ত্র বলিতেছেন যে, তুমি মানুষ—তোমার মধ্যেই স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব, দুই নিত্য বিদ্যমান। এই দুই শক্তির সাহায্যে তোমারই মধ্যে অনবরত সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের কার্য্য চলিতেছে। এক বার দেহের ভিতরকার ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা কর না। আমি তোমাকে পথ দেখাইতেছি। ইহাই হইল দেহতত্ত্বের বা অন্তরঙ্গের সাধনা। এই সাধনার অন্তর্গত ষট্‌চক্রভেদ, কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ, শবসাধন প্রভৃতি সাধনার উল্লেখ আছে। দেহতত্ত্বের আরাধনায় মদনতত্ত্ব আছে, তবে সে মদনতত্ত্বের পরিণতি আত্মারামের প্রাপ্তিতে ঘটিয়া থাকে। বহিরঙ্গের এবং অন্তরঙ্গের উভয়বিধ উপাসনাতেই আত্মারাম লাভ হইয়া থাকে; কেবল উহার প্রকারভেদ ঘটে। তন্ত্র তাহারও বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছেন।

এইবার মোটের উপর সিদ্ধান্তটা কি দাঁড়াইল, তাহাই বুঝিয়া লওয়া যাউক; তাহার পরে কাম ও মদনের পার্থক্য বিচার করা যাইবে। তন্ত্র বলিতেছেন যে, আমি আমাকে চিনি আর নাই চিনি, 'আমি' নামক যে শক্তিসমষ্টি বা যে এক অপূর্ব্ব শক্তি আমার দেহের মধ্যে থাকিয়া আমাকে সব দেখাইতেছে, বুঝাইতেছে, চিনাইতেছে, সেই আমিই আমার জ্ঞানের ও প্রজ্ঞানের একমাত্র অবলম্বন। সেই আমির মধ্যে একটা অতৃপ্তি, একটা পিপাসা অহরহঃ বিরাজ করিতেছে। সেই পিপাসা নিবৃত্তির জন্যই আমি উপাসনা করিতে উপদিষ্ট হইয়া থাকি। অথবা সেই আমার পিপাসাই আমাকে, আমা অপেক্ষা বৃহত্তর শক্তিকে, নিসর্গসুন্দরীর অপূর্ব্ব বিকাশকে উপাসনা করিতে শিখায়। আমি যেন অহরহঃ আমা ছাড়া আর একটা কিছুকে ধরিতে চেষ্টা করিতেছি। আমি ঊষার রক্তিম রাগ দেখিলে বিভ্রান্ত হই, ফুলের শোভা দেখিলে মুগ্ধ হই, সমুদ্র দেখিলে—পর্ব্বত দেখিলে আত্মহারা হই; পক্ষান্তরে মেঘগর্জ্জনে, ঝঞ্ঝাবাতে, সমুদ্রের তুফান তরঙ্গে, ভূমিকম্পে—শক্তির বিরাট্ বিকাশে আমি যেন সঙ্কুচিত হই। তথাপি স্বভাবের এই ভীম বিকাশ দেখিলে প্রাণ যেন চায়—তাহাতে ডুবিয়া যাই—মিশাইয়া থাকি। এই পিপাসা, আকাঙ্ক্ষা, মোহ বা বিভ্রান্তি এক আমি বহু হইবার সাধ হইতে উৎপন্ন। এই কামনা সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরই মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এই কামনা যখন, অন্য নানা উপায়ে পরিতৃপ্ত হইবার চেষ্টা করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না, তখনই জীব এক বার নিজের দিকে তাকাইয়া দেখে, এবং নিজের মধ্যে তৃপ্তির অনুসন্ধান করে। ইহাই উপাসনার মূল তত্ত্ব; এবং ইহাকেই কামোপাসনা বা মদন আরাধনা বলে। ইহা হইতে স্বতন্ত্র উপাসনা কিছুই নাই। আমিই আমার ইষ্ট, আমিই আমার সাধ্য। কিন্তু এই আমি আমা হইতে বিচ্ছুরিত হইতে চাহে বলিয়াই আমার আমিত্বকে আমা হইতে ছাড়িয়া বাহিরে বিলাইয়া দেয়, বাহিরের ব্যাপারে হরির লুঠ করিয়া দিতে চাহে বলিয়াই আমি, আমা ছাড়া একটা স্বতন্ত্র দেবতার পরিকল্পনা করিতে বাধ্য হই। প্রকৃতপক্ষে সে দেবতা আমিই—আমারই আত্মশক্তি, আমারই দেহস্থ কুণ্ডলিনী। কেবলই কি তাই? আমার কুণ্ডলিনী আমার আমিত্বের শিবমূর্ত্তির চারি ধারে যেন জড়াইয়া পাকাইয়া আছে। আমি আছি—এই জ্ঞান আমার শিবজ্ঞান; কুণ্ডলিনী এই জ্ঞানের চারি

ধারে ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাকে জীব আত্মায়, নানা অনুভূতি ও আসক্তির সমষ্টিরূপে পরিণত করিয়াছে। এই লীলাময়ী শক্তির প্রভাবে আমি একটা ব্যক্তিতে, একটা ব্যষ্টিতে পরিণত হইয়াছি। ইনিই আমাকে সোপাধিক এবং স্বতন্ত্র পুরুষে পরিণত করিয়াছেন; ইঁহারই মায়াপ্রভাবে আমি আমাকে চিনিতে পারি না, কস্তুরীমৃগের মতন আত্মশক্তির মৃগমদে বিভ্রান্ত হইয়া পাগলের ন্যায় দশ দিকে ছুটিয়া বেড়াই। এই ছুটাছুটি বন্ধ করাই উপাসনার প্রথম উদ্দেশ্য। যেমন যুবক ভালবাসা পাইলে, সুন্দরী যুবতী পাইলে শান্ত হয়, তেমনই সাধক নিজের দিকে তাকাইতে শিখিলে অনেকটা শান্ত হয়। ইহাই হইল সাধনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

'এক আমি বহু হইব' বলিলেই বুঝিতে হইবে, এক দুই হইয়াছে অথবা একে দ্বিতীয়ের অধ্যাস হইয়াছে। কারণ, যিনি এক ও অদ্বয়, তিনি ত দুই বা বহু হইতে চাহিবেন না। একটা অভাবের অনুভূতি না হইলে সে অভাব পূরণের চেষ্টা হয় না। কাজেই শাস্ত্র অনুমান করিতেছেন যে, সেই অক্ষয়, অব্যয় এক পদার্থে দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব আছেই। এক তিনি—তাঁহাতেই জনক জননী দুই বর্ত্তমান। স্ত্রীত্ব পুংস্ত্ব অথবা মাতৃত্ব পিতৃত্ব তাঁহাতে নিত্য-বর্ত্তমান। এই দুই শক্তি যখন সম্মূঢ় অবস্থায় থাকে, তখন এক তিনি যোগ-নিদ্রায় মগ্ন, আপন ভাবে আপনি ভরপুর, আপনার অনন্ত অস্তিত্বে মহাকাশ ও চিদাকাশ, দুই পরিপূর্ণ। কিন্তু 'একোঽহং বহু স্যাম্' এই ইচ্ছাশক্তির বিকাশে অনন্ত পরিপূর্ণতায় একটু শূন্যতা লক্ষিত হয়। কেন এমন হয়? ইহা তাঁহার লীলা,—বুঝিবার জো নাই, বুঝাইবার উপায় নাই। সৃষ্টির হিসাবে এই ইচ্ছা নিত্য; যত দিন সৃষ্টি, তত দিন এই ইচ্ছা বলবতী থাকিবেই। এই ইচ্ছা আছে বলিয়াই সংসারে রূপ আছে, শোভা আছে, আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে—কাম আছে, মদন আছে। একে দুইয়ের বিদ্যমানতা অনুমিত হয় বলিয়াই এক অন্যকে চাহে; যত ক্ষণ যোগনিদ্রা থাকে, তত ক্ষণ এই আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয় না। ঘুম ভাঙ্গিলেই অপরকে খুঁজিতে ইচ্ছা যায়। সেই ইচ্ছার অভিব্যঞ্জনা—'সোঽকাময়ত একোঽহং বহু স্যাম্।' তন্ত্র বলেন,—যোগনিদ্রাভিভূত, সম্মূঢ়, সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ ব্রহ্মে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি যেমন বাক্য মনের অগোচর আছেন, তেমনই থাকুন। আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব কেবল তাঁহাকে, যিনি বহু হইবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, এই বাসনাই হইল

আদি কাম, এই কামজন্যই জীবসৃষ্টি, বিশ্বসৃষ্টি : আমরা দেহী জীব, আমরা সবাই কামজ। সুতরাং আমাদের বোধি, কামকলানিধির লীলানটনের অতীত কোন কিছু বুঝিতে পারে না। তাই কামী তিনিই আমাদের উপাস্য। তিনি কোথায়? তন্ত্র উত্তর করিলেন,—হং সঃ অর্থাৎ অহং সঃ—আমিই সেই। আমার বাহিরে তিনি আছেন কি না জানি না, তবে আমার ভিতরে যিনি আছেন, তিনিই আমাকে ভিতর বাহির চিনাইতেছেন। তাই আমি বুঝিতেছি যে, আমার ভিতরে যিনি, তিনিই বাহিরের তিনি। আমি ছাড়া বাহিরে কিছু আছে কি না, তাহা ত আমি বলিতে পারি না : আমি ছাড়া বাহির কিছু থাকে কি না, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। আমার ভিতরে যিনি আছেন, যাঁহার কৃপায় আমার সর্ব্বাবয়বে একটা আমিত্বের বিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনিই আমাকে পদে পদে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, আমিই সর্ব্বব্যাপী—আমিই তিনি।

তন্ত্র এইখান হইতে বা উপনিষদ্ হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছেন। তন্ত্র উপনিষদের বা বেদান্তের কোন সিদ্ধান্ত অমান্য বা অগ্রাহ্য করেন না; কেবল বলেন যে, উপনিষদ্ বাহিরের আত্মাকে আগে ধরিয়া, তবে অন্তরের আত্মার পরিচয় লইতে চেষ্টা করেন। তন্ত্র সর্ব্বাগ্রে ভিতরের আত্মার পরিচয় লইয়া, সেই আত্মার কষ্টিপাথরে বাহিরের আত্মার যাচাই করিয়া লন। সোঽহং আসল কথা নহে; অহং সঃ বা হং সঃই আসল কথা। তিনি আমি কি না—কে জানে? আমিই যে তিনি, তাহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। কারণ, আমি তিনি না হইলে আমার আমিত্বজ্ঞান আসিবে কোথা হইতে? আমি দেখিতেছি, বুঝিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি—কারণ, আমিই যে তিনি। সুতরাং চিনিতে হইলে আমিই তাঁহাকে চিনিব। আমি যেমন আমা ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চিনিতেছি, দেখিতেছি, বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি, তেমনই আমিই তাঁহাকে চিনিব, বুঝিব ও ধরিয়া আপনার করিব।

সেই আমি কে? স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্বের সমবায়জাত একটা শক্তিসমষ্টি। আমার মধ্যেই মাতৃত্ব, আমারই মধ্যে পিতৃত্ব বিদ্যমান। আমি যদি নর হই, তবে আমাতে পিতৃত্ব প্রবল, মাতৃত্ব সম্মূঢ়। আমি যদি নারী হই, তবে আমার পিতৃত্ব দুর্ব্বল বা সম্মূঢ়, আমার মাতৃত্বই প্রবল ও প্রকট। তন্ত্র বলেন,—প্রত্যেক জীবের মধ্যে স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি আছে, জনক

জননী সর্ব্বজীবে নিত্য বিদ্যমান। তবে এই দুই শক্তির মধ্যে যে শক্তি যে জীবের মধ্যে প্রবল, সেই জীব সেই শক্তি অনুসারে নর বা নারী বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। বৃক্ষাদি উদ্ভিদ্ জীবে স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব প্রায় সমভাবেই প্রকট। স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ জীবে কেবল স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্বের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কামজ পদার্থ বলিয়াই—'এক আমি বহু হইব' এই কামনা হইতে সঞ্জাত বলিয়াই, বিশ্বসৃষ্টির সর্ব্বস্বে, সর্ব্ব পদার্থে, সর্ব্ব শক্তিতে এই স্ত্রীত্ব পুংস্ত্ব নিত্য বিদ্যমান। ইহাই হইল তন্ত্রের চরম ও প্রধান সিদ্ধান্ত। পুরুষ যখন এক হইতে বহুধা বিভক্ত হইবার কামনা করে, তখনই তাহার অন্তর্গত স্ত্রীত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই স্ত্রীত্ব বা আদ্যা শক্তির ইঙ্গিতেই কামের বিকাশ এবং উহারই পরিতোষের জন্য মদনের উৎপত্তি। কাম ও মদন সৃষ্টিতত্ত্বের দুই জ্ঞাতব্য ও জ্ঞান-যোগ্য ব্যাপার, উহা হইতে অজ্ঞেয়কে বুঝা যাইবে।

বলিয়াছি ত—এই চাঞ্চল্য, এই বহু হইবার আকাঙ্ক্ষা মদনতত্ত্বের অন্তর্গত। এই তত্ত্বের উপর স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করা যায় দুই উপায়ে—এক, মদনকে মোহিত করিয়া, মদনমোহন হইয়া; দ্বিতীয়, মদনকে ভস্ম করিয়া—মদনমথন করিয়া। এই দুই উপায় অনুসারে দুই প্রকারের উপাসনাপদ্ধতি নির্ণীত হইয়াছে; এক শৈব, দ্বিতীয় শাক্ত। শৈব মদনমথনের পদ্ধতি; মাহেশ্বর যোগশাস্ত্র, হঠযোগ, শিবযোগ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। শাক্ত উপাসনা—মদনমথনমনোহারিণীর উপাসনা। এই উপাসনার সাহায্যে মদনকে মুগ্ধ করিয়া, কামের পন্থা অবলম্বন করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। তন্ত্রের এই মদনমোহন সাধনকে মূল করিয়া সহজিয়া বৈষ্ণব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মধুর রসের সাধনার উদ্ভব ঘটাইয়াছেন। তবে সহজিয়া বৈষ্ণবমতের ও তন্ত্রমতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, তন্ত্র আদ্যা শক্তিকে জননী বলেন, সহজিয়া সাধুগণ তাঁহাকে রমণী বলিয়া পূজা করেন। এই বিতণ্ডার কথা ধরিয়া আমি 'মানসী' এবং 'সাহিত্য' নামক দুইখানি মাসিক পত্রিকায় গত পূজার সংখ্যায় একটু আলোচনা করিয়াছিলাম। তন্ত্র বলেন যে, মায়ের গর্ভে পুত্রের জন্ম হয়; কেমন করিয়া হয়, কোন্ পদ্ধতিক্রমে হয়, তাহা এক বার বুঝিবার চেষ্টা কর না—আত্মার একটু পরিচয় পাইবে। ইহাই তান্ত্রিক মদনতত্ত্বের গোড়ার একটা কথা। কাম হইল মদনের শোভা, মদনের রতি।

হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ কাম হইতে হয়। বিশ্বসৃষ্টির যত শোভা, যত মাধুর্য্য, সবই কামজ। মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতীকে তাই কামকলানিধি কমলিনী বলা হইয়া থাকে। বৈষ্ণব সৃষ্টিতত্ত্ব বা আমার বহুধা বিভক্তির রহস্য বুঝিতে চাহেন না; সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে যে অক্ষয় মধুর রসটুকু আছে, তাহারই উপভোগ করিতে পিপাসু। তন্ত্র বলেন, তাও কি হয়—স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্বের তত্ত্বটুকু না বুঝিলে উহাদের সমাহারে যে জীবাত্মার সৃষ্টি, তাহাকে বুঝিব কেমন করিয়া? কেবল মধুর রসের সুধাপানে প্রমত্ত থাকিলে আত্মসাক্ষাৎকার হইবে না। সে রস যাহার বিপরিণাম, যে লীলার পরিণতি, তাহাকে বুঝিতে হইবে। সেই বোধের অবলম্বনস্বরূপ, সেই বোধের সহায়কস্বরূপ তন্ত্র নানা সাধনাপদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। তন্ত্র—পাপ পুণ্য, উচিত অনুচিত, শ্লীল অশ্লীল, শুচি অশুচি, কিছুই মানেন না। তন্ত্র বলেন—আছে কর্ম্ম, কর্ম্মী এবং সাধ্য। যে পন্থা যে সাধনার উপযোগী, তাহাই গ্রাহ্য এবং যোগ্য। এই সাধনার ব্যাপার লইয়া তন্ত্রের মধ্যে যে বিস্তর আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইয়াছে, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। অধঃপতিত, বিক্ষিপ্ত জাতির সকল ব্যাপারেই আবর্জ্জনার সঞ্চয় অবশ্যম্ভাবী। তন্ত্র সে সঞ্চয় হইতে পরিত্রাণ পান নাই। এ জন্য তন্ত্রকে দোষী করিতে পারি না; আসল তন্ত্রশাস্ত্রের নিন্দা করিতে পারি না। দোষ আমাদের,—দোষ আমাদের পূর্ব্বজগণের। কারণ, তাঁহাদের অনেকে মদনতত্ত্বের ফিলজফির দোহাই দিয়া ধর্ম্মের ও সাধনার অন্তরালে কেবল রিরংসার চরিতার্থতা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন,—শাস্ত্রকে বিলাসের পঙ্কে ডুবাইয়াছেন।

চতুর্ব্বর্গ সাধনে কাম একটা বর্গ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে কাম তৃতীয় বর্গ। যাহার দ্বারা সমাজের ব্যষ্টি ও সমষ্টি, দুই রক্ষিত এবং পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্—সর্ব্বাগ্রে দেহ বলিষ্ঠ এবং নীরোগ না হইলে ধর্ম্মসাধন সম্ভবপর হয় না। যিনি শারীর ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহার দ্বারা কোন ধর্ম্মসাধনই হয় না। রোগী সাধক হইতে পারেন না, রোগী সমাজধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং সাধনধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমে শরীর রক্ষার ধর্ম্ম পালন করিতে হয়। তাই সাধারণ ধর্ম্ম প্রথম বর্গ। যে নীরোগ, ধার্ম্মিক ও সংযমী নহে, সে অর্থ উপার্জ্জনে সম্যক্

যোগ্যতা দেখাইতে পারে না। অর্থ কেবল টাকা নহে, যাহা সম্পত্তি, বিভব, সম্বল, তাহাই অর্থ। বিদ্যা, বুদ্ধি, তেজস্বিতা, ভূমি, জলাশয়, মণি মুক্তা, আত্মীয় স্বজন—এ সকলই অর্থ। বুদ্ধিবল, জনবল, ধনবল—এই তিন বলই অর্থের উপাদান। শাস্ত্র বলেন যে, টাকায় মানুষ রোজগার হয় না, মানুষেই টাকা রোজগার করিয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে মানুষ গড়িতে হইবে। যে দেশে মানুষ উৎপন্ন হইবে, সেই দেশে অর্থ আপনি যাইয়া জুটিবে। তাই অর্থ দ্বিতীয় বর্গ। বর্গের তৃতীয় বিষয় কাম। কাম অর্থে কেবল রিরংসা নহে, কেবল নরনারীর সংযোগ নহে। যাহার দ্বারা সমাজের ও গৃহস্থালীর সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বৃদ্ধি পায়, তাহাই কাম। চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, পশুপালন, কৃষিকার্য্য, দেহের প্রসাধন এবং সৎপুত্র উৎপাদন—এই সকলই কামের অন্তর্গত। কামের দুইটি অঙ্গ—শোভা ও মাধুরী। যাহার সাহায্যে শোভা ও মাধুরী বৃদ্ধি পায়, জীবন শোভাময় ও সুখময় হইতে পারে, তাহাই কাম। তন্ত্রও কামের এই সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ঐ সঙ্গে বলেন যে, যে সাধকের ধর্ম্ম এবং অর্থসাধন হয় নাই, সে সাধক কামের অধিকারী নহে। যে কামসিদ্ধ নহে, সে মুমুক্ষু হইতে পারে না। কামের দুই প্রকারের সাধনা আছে; এক বহিরঙ্গের, দ্বিতীয় অন্তরঙ্গের। কামের বহিরঙ্গের সাধনার কথা বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; কামের অন্তরঙ্গের সাধনা তন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে যেমন কেবল রিরংসার বিষয়ের উল্লেখ নাই, উহা ছাড়া আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা আছে, তেমনি তন্ত্রের কামসাধনায় কেবল লতাসাধনার কথাই নাই, উহা ছাড়া অনেক গূঢ় তত্ত্বকথার উল্লেখ আছে। কামতৃপ্তি না হইলে মোক্ষের সাধ প্রবল হয় না, সে মোক্ষের অধিকারী নহে। এই চতুর্ব্বর্গের ব্যাখ্যা করিয়া তন্ত্র বলিতেছেন যে, যাহারা এই চতুর্ব্বর্গের সাধনা করে, তাহাদিগকে চতুর্ব্বর্গী বলা হয়। সপ্তসরিদ্বরা কর্ম্মভূমিতে যাহারা বাস করে, তাহারাই চতুর্ব্বর্গী হইবার অধিকারী; পৃথিবীর অন্য সকল প্রদেশের নরনারীসকল কেহ বা ত্রিবর্গী, কেহ বা দ্বিবর্গী। চতুর্ব্বর্গ-সাধনপরায়ণ মনুষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইউরোপের আধুনিক শ্বেতাঙ্গ খ্রীষ্টান জাতিসকল ত্রিবর্গী। চতুর্ব্বর্গী না হইলে জাতি

স্বীয় বিশিষ্টতা সমেত থাকিয়া চিরজীবী হইতে পারে না। ইহাই শাস্ত্রের অভিমত।

একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিব। পুত্রোৎপাদনে কৃতসঙ্কল্প নরনারীর সঙ্গমকে শাস্ত্র ত নিন্দা করেন না, তন্ত্রও মন্দ বলেন না। যাহার সাহায্যে নূতন জীবের উৎপত্তি হয়, নূতন আত্মার উন্মেষ ঘটে, তাহা শাস্ত্রের বা তন্ত্রের দৃষ্টিতে হেয় বা জঘন্য নহে। শাস্ত্র তাই পুত্রোৎপাদনের একটা সায়ান্স বা বিজ্ঞান লিখিয়া গিয়াছেন। গর্ভাধান হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্র কেবল গর্ভসংস্কারে, ভ্রূণের পুষ্টির জন্যই ব্যস্ত। বাৎস্যায়নের কামসূত্র এই জীবসৃষ্টির সায়ান্স মাত্র। কাম এই জীবসৃষ্টির প্রেরণা, মদন উহার শক্তি মাত্র। যেমন শরীর রক্ষা করিতে হইলে একটা পদ্ধতির অধীন থাকিতে হয়, অনেকগুলি বিধি নিষেধ পালন করিতে হয়, তেমনি পুত্রোৎপাদন করিতে হইলে একটা পদ্ধতির অধীন থাকিতে হয়; গোটাকয়েক বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। শাস্ত্রের দৃষ্টিতে স্বেচ্ছাচারই নিন্দনীয়। সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্—কোন বিষয়ের আত্যন্তিকী বৃদ্ধিই গর্হিত বা অহিতকর। যেমন অতিভোজন দোষের, তেমনি লাম্পট্য দোষের। কোন ব্যবহারের অতিবৃদ্ধিকেই লাম্পট্য বলে। সে কালে ভোজনলম্পট, শয্যা ও ভূষণলম্পট প্রভৃতি অনেক লম্পটই ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কীর্ত্তনলম্পট বলা হইয়াছে। অধুনা কামবিলাসীকেই সোজাসুজি লম্পট বলা হইয়া থাকে। মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে তাই লম্পট বলিলে গালাগালি করা হয় না, কেবল ব্যাজস্তুতি হয় মাত্র। শাস্ত্রের হিসাবে সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে এই লাম্পট্যই দোষের। যাহারা তেজস্বী, সিদ্ধ সাধক, তাহাদের পক্ষে কোন কিছুরই লাম্পট্য দোষের বা নিন্দার নহে। সুতরাং শাস্ত্র যে ভাবে কাম ও মদনের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা ষোল আনা সায়ান্সের হিসাবেই করিয়াছেন বলিতে হইবে। স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তির সম্মেলন, বিশেষতঃ নরনারীর সম্মেলনকে হীনযানী বৌদ্ধগণই সর্ব্বাগ্রে নিন্দার বিষয়ীভূত করেন। বোধ হয় বৌদ্ধদের নিকট হইতেই খ্রীষ্টানধর্ম্মাবলম্বিগণ এই নিন্দা গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া কাম ও মদনের প্রতি এই বাহ্যিক নিন্দার ও সঙ্কোচের ভাব অবলম্বন করিয়াছি; কেন না, আমাদের বসন ভূষণের ভঙ্গী, নয়নের দিঠি, দেহের হাবভাব দেখিলে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, আমাদের

মধ্যে অনেকেই মনে মনে এক এক জন কামকলানিধি। কামচর্চা অবাধে চলিলে সমাজ বিগড়াইতে পারে, ক্ষীণজীবী, অল্পায়ু পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিতে পারে বলিয়াই শাস্ত্র এই ব্যাপারের উপর সংযমের ঘন আবরণ দিয়া রাখিয়াছেন বটে; কিন্তু তাই বলিয়া শাস্ত্র এই বিষয়ের আলোচনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তেমন সঙ্কোচ অনুচিত বলিয়া মনে করেন। তন্ত্রও কামসাধনা অতি গোপনে করিতে বলেন, গুরুকে সম্মুখে না রাখিয়া কামসাধনা করিতে নাই। সে কামসাধনা তৃপ্তি তুষ্টির জন্য নহে, আত্মশক্তির অন্বেষণ উদ্দেশ্যেই করিতে হয়।

ইহাই হইল মদন ও কামতত্ত্বের গোড়ার মোটা কথা—সাধারণ সিদ্ধান্ত—general truths. ইহার আরও গোটাকয়েক সিদ্ধান্ত সাধারণভাবে বুঝিবার ও জানিবার অধিকার সকলের আছে। সে সব সিদ্ধান্তের আলোচনা পরে করিব। ('প্রবাহিনী,' ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)

২

কাম ও মদনতত্ত্বের দার্শনিকতা বা ফিলজফিটুকু গত বারে যথাসম্ভব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এবার কোন্ থিওরি বা সিদ্ধান্তের উপর সাধনাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব। তন্ত্র বলেন যে, তোমার নিজের আত্মাই তোমার ইষ্টদেবতা; তাঁহারই সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা।

"আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবীং শক্তিমাদ্যাস্বরূপিণীম্।"

"অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি মুক্তোঽহং ইতি ভাবয়েৎ।"

"সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বমন্ত্রময়ীং পরাম্।
আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবীং পরমানন্দরূপিণীম্॥"

কেবল ইহাই নহে; স্বীয় আত্মাকে ত ইষ্টদেবতা—বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার স্বরূপ ভাবিতেই হইবে; যিনি এমন চিন্তা না করিয়া, অন্য একটা স্বতন্ত্র শক্তিকে বা পদার্থকে ইষ্ট বা ঈশ্বর বলিয়া ভাবিবেন এবং তাহারই পূজা উপাসনা করিবেন, তিনিই নিয়মগামী হইবেন।

"মন্যন্তে যে তু চাত্মানং বিভিন্নং পরমেশ্বরাৎ।
ন তে পশ্যন্তি তং দেবং বৃথা তেষাং পরিশ্রমঃ॥
আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দ্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥"

অর্থাৎ যাঁহারা আত্মাকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা বাহিরের দেবতাকে দেখিতে পান না, স্বীয় আত্মারও পরিচয় পান না, তাঁহাদের পরিশ্রম বৃথা হয়। অথবা যাঁহারা আত্মস্থ দেবতাকে ছাড়িয়া, বাহিরের দেবতার চিন্তা করেন, তাঁহারা করস্থ কৌস্তুভ মণি ত্যাগ করিয়া কাচের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ান। এই দুইটি শ্লোক যেমন তন্ত্রে পাওয়া যায়, তেমনি কূর্ম্মপুরাণেও পাওয়া যায়। তন্ত্রের এই সিদ্ধান্তকে পুরাণ অমান্য করেন না।

এই দেহের মধ্যে আত্মা আছেন। সে আত্মা দেহের কোথায় বিরাজ করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তন্ত্র দুইটা উত্তর দিতেছেন; প্রথম বলিতেছেন যে, আত্মা সর্ব্বদেহের সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত, তাঁহার শক্তির দ্বারা দেহের সকল অংশ, সকল কণা সঞ্জীবিত। কিন্তু সে আত্মাকে ত ধরিতে পারা যায় না। অতএব ষট্‌চক্রের মধ্যে যেখানে কুণ্ডলিনী শক্তি ক্রিয়া করিতেছেন, সেইখানেই তাঁহাকে পাইবে—অথবা শিবশক্তিসমন্বিত যিনি, তিনিই দেহগত ইষ্টদেবী।

"শূন্যরূপং শিবং সাক্ষাদিন্দুং পরমকুণ্ডলীম্।
সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা কোটিবিদ্যুৎসমপ্রভা॥"

অর্থাৎ শিব শূন্যরূপ—অহমস্মি এই জ্ঞানদ্যোতক। এই শূন্যরূপ শিবকে বেষ্টন করিয়া কুণ্ডলিনী বিরাজ করিতেছেন। শিবকে শব্দব্রহ্মময়বপুও বলা হইয়াছে; আবার শব্দরূপ মহাদেব বলিয়াও সেই মহাদেবের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। দেহের ছয়টা চক্রের প্রত্যেক চক্রে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। আর কুণ্ডলী দেবী চক্রে চক্রে এই মহাদেবকে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই কুণ্ডলিনী সহস্রারে "কামসমুল্লাসবিহারিণী" অথচ তিনি বিশ্বাতীতা, জ্ঞানরূপা, চিন্ময়ী ও অরূপিণী। এই বিষতন্তুময়ী এবং সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপিণী কুণ্ডলী দেবীকে দ্বাদশ বার ষট্‌চক্র ভেদ করাইলে মানুষ জীবন্মুক্ত হয়। সে ষট্‌চক্রভেদ কেমন? প্রত্যেক চক্রে কুণ্ডলী দেবীকে লইয়া যাইয়া, শব্দরূপ নিরাকার শিবের সহিত রমণ করাইতে হইবে, তবে সাধনা সিদ্ধ হইবে।

"সদাশিবেন দেবেশি ক্ষণমাত্রং রমেৎ প্রিয়ে।
অমৃতং জায়তে দেবি তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি॥"

এই অমৃত—এই সুরা, জীবাত্মা চক্রে চক্রে পান করিয়া এক বার ঊর্দ্ধে সহস্রারে উঠিবেন, আবার মূলাধারে আসিয়া পড়িবেন ; আবার উঠিবেন, আবার পড়িবেন। এই প্রকারে দ্বাদশ বার ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া উঠিলে এবং পড়িলে আর জন্ম-জরার ভয় থাকে না। এই তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তন্ত্রের "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিত্বা ধরণীতলে" বচন রচনা করা হইয়াছে। উহাকে মাতালের উঠা পড়া ধরিয়া মোটা অর্থ করিলে সর্ব্বত্র উহার প্রয়োগ সিদ্ধ হয় না। কাজেই বাধ্য হইয়া উহার আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিতেই হইবে। উহা তান্ত্রিক ষট্‌চক্রভেদের একটা ইঙ্গিত মাত্র। এইবার কুণ্ডলিনীর একটু পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সদাশিব বলিয়াছেন ঃ—

"সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীস্তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া॥
মহত্তত্ত্বাদি ভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ।
নিমিত্তমাত্রং তদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্॥
সদ্রূপং সর্ব্বতো ব্যাপি সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ব্ববস্তুসু॥
ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি।
সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তমবাঙ্‌মনসগোচরম্॥
তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্॥"

অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে একমাত্র তুমিই অমর অর্থাৎ প্রকৃতিরূপে বিদ্যমান ছিলে। তোমার সেই রূপ বাক্য ও মনের অগোচর ; পরমব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছার দ্বারাই তোমা হইতে সর্ব্বজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। মহত্তত্ত্ব হইতে মহাভূত পৃথিবী পর্য্যন্ত সর্ব্বজগৎ তোমা হইতে সৃষ্ট। সর্ব্বকারণের কারণ সেই ব্রহ্ম নিমিত্তমাত্র। তিনি সৎস্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী, সমুদায় জগৎকে বেষ্টন করিয়া আছেন ; সর্ব্ববস্তুতে সর্ব্বদা একরূপ, পরিণামরহিত, চিন্মাত্র এবং নির্লিপ্ত। তিনি কোন কার্য্য করেন না, তিনি ভক্ষণ করেন না, গমন করেন না ; কোন বস্তুবিশেষে তাঁহার অবস্থিতি নাই। তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি আদি-অন্তরহিত, তিনি বাক্য মনের অগোচর। তুমি পরাৎপরা মহাযোগিনী। তুমি তাঁহার

ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতেছ, এই জগৎকে পালন করিতেছ এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বজগৎকে সংহার করিতেছ। তন্ত্র বলেন—এই ইচ্ছাই কাম, সেই কামকে অবলম্বন করিয়া যিনি কামনার জগৎপ্রহেলিকা বিস্তার করিয়াছেন, তিনিই মহাকাল-কামিনী কালী। এই কালীই মহাকাল শিবের সহিত সদাই রমণ করেন। সে কালী কেমন?

"কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়সে॥"

সর্ব্বপ্রাণী—সর্ব্বসৃষ্টিকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম কহাকাল—সেই শিবলিঙ্গ মহাকাল। সেই মহাকালকে—শিবলিঙ্গকে তুমি গ্রাস কর, আত্মদেহস্থ করিতে পার বলিয়াই তোমার নাম পরা কালিকা। তুমি কালকে গ্রাস কর—তাই তুমি কালী।

এই সিদ্ধান্তের পর তন্ত্র বলিতেছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।"
শোণিতেষু সুরাঃ প্রোক্তাঃ হ্যাবা সাগর কীর্ত্তিতাঃ॥"

ইহা দ্বারা দেহের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের সমতা সাধন করা হইয়াছে। বাহিরে যে লীলা হইতেছে, দেহাভ্যন্তরেও সেই লীলা চলিতেছে। বাহিরের শিব-কালীর লীলা প্রতি জীবের দেহাভ্যন্তরে চলিতেছে। সুতরাং ভিতরের শিবশক্তির ক্রিয়াটা বুঝিতে পারিলে বাহিরের লীলাও অল্পায়াসে বুঝা যাইবে। এইখানে কর্ম্মবাদী তন্ত্র-পুস্তকসকলে একটা থিওরি বা মতবাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, যুবক-যুবতীর সংসর্গে আর একটা জীবের উৎপত্তি হইতে দেখা যাইতেছে। অতএব যুবক-যুবতীর মিলন ব্যাপারটার বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, স্ত্রীত্ব ও পুংস্তের খেলা বুঝিতে পারিবে। এই খেলার ক্রম, উন্মেষ ও ভঙ্গী প্রভৃতি ব্যাপার হইতেই আত্মবিকাশের পদ্ধতিটা কতকটা বুঝা যাইতে পারে। আত্মা কি ও কেমন, তাহা জানি না, বুঝি না। কিন্তু পুত্রোৎপাদন ক্রিয়ায় আত্মার বিকাশচেষ্টা এবং বিচ্ছুরণভঙ্গী দেখিতে পাই। সেই ক্রিয়ার বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে—কোন্ কোন্ শক্তির প্রয়োগে, দেহস্থ কোন্

কোন্ শক্তির কি ভাবের ক্রিয়ায় রজোবীর্য্যের সাহায্যে নূতন জীবের উৎপত্তি হইতে পারে। যে ক্রিয়ার দ্বারা নূতন জীব উৎপন্ন হয়, সে ক্রিয়ার পরীক্ষায় আত্মশক্তির খোঁজ খবর পাওয়া যাইতে পারে। দেহস্থ আত্মশক্তির ঠিকানা করিতে পারিলে বিশ্বব্যাপী আত্মশক্তির খবরটাও পাওয়া যাইতে পারে। এই থিওরি হইতেই এক শ্রেণীর তন্ত্রে কামজ আরাধনার পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে সাধনা অতি কঠোর, অতি দুরারাধ্য। শিব বলিয়াছেন যে, "হে দেবি, তোমার মত নারী এবং আমার মতন পুরুষ হইলেই এই খেলা খেলিতে পারে। বরং ফণী ধরিয়া বিষ ভক্ষণ করা সহজ, বরং সিংহ শার্দ্দূলের সহিত যুদ্ধ করা সহজ, কিন্তু লতাসাধনা অতি কঠিন, অতি কঠোর। যে পুরুষের নারীরূপ দেখিয়া কামমোহ উৎপন্ন হইতে পারে, যে রতিজন্য সুখাস্বাদে বিভোর হয়, সে যেন এমন কাজ না করে।" এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া শিব আবার বলিতেছেন,—সমস্ত জগৎকে স্ত্রীময় ভাবিতে হইবে। শক্তিই শিব, শিবই শক্তি—এই সমস্ত জগৎই শক্তির স্বরূপ। যিনি এই নিখিল জগৎ শক্তিরূপে দর্শন করিতে না পারেন, তিনি যেন এ সাধনায় প্রবৃত্ত না হন। শ্রীক্রমে, কুলার্ণব প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে শিব বার বার বলিয়াছেন যে, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ কদাপি মদ্য ব্যবহার করিবে না। মদ্যের অনুকল্প হিসাবে ব্রাহ্মণ গোদুগ্ধ, ক্ষত্রিয় মধু, বৈশ্য ইক্ষুর রস বহিরঙ্গের পূজায় দান করিবে। কেবল শবরাদি শূদ্র ও অন্ত্যজজাতীয় সাধকগণ সুরা বা মদ্য ব্যবহার করিবে। আসল কথা, দেহস্থ যে শক্তির উন্মেষ সাধন জন্য সুরা পান করা হয়, তাহা যদি অন্য কোন উপায়ে ঘটাইতে পারা যায়, তাহা হইলে সুরা পান না করাই ভাল। ব্রাহ্মণ সাধকও যদি সুরার সাহায্য ব্যতীত দেহের শক্তিবিশেষের জাগরণ ঘটাইতে না পারেন, তাহা হইলে গুরু আদেশ করিলে, অবস্থা অনুসারে ব্রাহ্মণেও সুরা পান করিবে। কিন্তু দেহতত্ত্বের সাধনায়, ষট্‌চক্রভেদের ব্যাপারে তন্ত্রে দেহস্থ শোণিতকেই সুরা বলা হয়। তন্ত্রে স্পষ্টই বার বার বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, কামবশতঃ, স্ত্রীবিশেষের রূপে মুগ্ধ হইয়া এই সাধনা করিবে, তাহার মহারৌরবে পতন হইবে। তন্ত্র বহু স্থানে বলিয়াছেন যে, মানস পূজাই সকল পূজার সার, ষট্‌চক্রভেদ সকল সাধনার সার। মানস পূজাপদ্ধতিরই ক্রম বাহুল্যভাবে নানা তন্ত্রে

লিখিত ; বাহ্য পূজার উপচার ও পদ্ধতির কথা যে নাই, তাহা নহে। তন্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, গৃহস্থ কৃতদার হইলেও তন্ত্রসাধনা করিবে, পরন্তু তেমন গৃহস্থ বিষয়ী না হয়, অর্থ উপার্জ্জনের জন্য চেষ্টা না করে, সমাজের দশ জনের সহিত বৈষয়িক সম্বন্ধ না রাখে। তাহাদের স্ত্রীপুরুষ সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর মতনই থাকিবে। পক্ষান্তরে জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, শিবশক্তির যোগই প্রধান যোগ। সে শিবশক্তির যোগ ষট্‌চক্রভেদের পদ্ধতি হিসাবে সাধকের দেহের মধ্যে হইতে পারে। যে নিম্নাধিকারী তেমন সাধন করিতে না পারে, সে বাহিরের শক্তি আনিয়া সেই শক্তির সহিত যোগ সাধন করিলেও যোগ হয়। এই যোগসাধন কুলনায়িকার সাহায্যে করিতে হয়। কুলনায়িকা যথা,—নটী, কাপালিকা, বেশ্যা, পুক্কশী, নাপিতাঙ্গনা, রজকী, রঞ্জকী, সৈরিন্ধ্রী, সুবাসিনী, ঘটিকা, খটিকা ও গোপালকন্যা। ললিতাতন্ত্রে লিখিত আছে যে, শক্তির কুলাগারে প্রবাহিণী তিনটি নাড়ী আছে। এই তিন নাড়ীর পূজা করিতে হয় ; কারণ, এই তিন নাড়ী বহিয়া আত্মশক্তি বিস্ফারিত হইয়া অণ্ডাকারে পুরুষের বীজসম্ভব শক্তিকেন্দ্রকে ধারণ করে। এই ধারণা হইতেই জীবোৎপত্তি হয়। এই তিন নাড়ীর আরাধনা কামকলার সাহায্যে করিতে হয়। ষোলটি কামকলা আছে ; যথা,—শ্রদ্ধা, প্রীতি, রতি, ভূতি, কান্তি, মনোভবা, মনোহরা, মনোরমা, মদনোন্মাদিনী, মোহিনী, দীপনী, শোষণী, বশঙ্করী, রজনী, ষোড়শী ও প্রিয়দর্শনা। এই কামকলার এক একটি কলার চর্চ্চা সাহায্যে আত্মার এক একটি শক্তির উন্মেষ ঘটিয়া থাকে, সাধক ঋদ্ধি সিদ্ধি লাভ করে।

তন্ত্রের দুইটি দিক্ আছে। এক, অতি কঠোর সংযমের দিক্ ; আর একটা experimentএর দিক্। সে পরীক্ষার চারি দিকে এত সংযমের বেষ্টন যে, সামান্য মনুষ্য তেমন উপভোগ লাভ করিবার সহিষ্ণুতা সঞ্চয় করিতেই পারে না। এই পঞ্চতত্ত্বসাধনা, লতাসাধনায় এত বাঁধাবাঁধি, এত বিধিনিষেধ, এত মন্ত্রজপ, এত সংযম সাধনা আছে যে, সে সব করিয়া পরে স্ত্রীগমনের ইচ্ছা পর্য্যন্ত যেন শুকাইয়া যায়। অত হাঙ্গামা সহ্য করিয়া এমন সাধনা করিতে আজকালকার তরলবীর্য্য পুরুষে পারেই না। তাই তন্ত্রের বহিরঙ্গের সাধনায় যত কদাচার ও অনাচার প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, এত আর কিছুতেই করে নাই। জাতির অধঃপতন এবং

সর্ব্বনাশ মঞ্জুঘোষের (বৌদ্ধ বজ্রযানী) সাধনায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হইয়াছিল। এই মঞ্জুঘোষের সাধনপদ্ধতির কথা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহার তন্ত্রসারে উহার উল্লেখ আছে। আমাদের তন্ত্রের মধ্যে বৌদ্ধ তন্ত্র যে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে, ইহা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে। তবে পুরাতন হিন্দু তন্ত্রের লেখা এখনও স্পষ্ট দেখা যায়।

অধুনা ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সজ্ঘাতে নর নারীর যৌন সম্বন্ধটা যেমন গোপনের ও লজ্জার বিষয় হইয়াছে, এতটা লজ্জা, এতটা গোপন ভাব পূর্ব্বে এ দেশে ছিল না। পূর্ব্বে এ সকল বিষয়ের প্রকাশ্যে আলোচনা চলিত, কবি ইহারই উপরে স্বীয় কাব্যশক্তির বিকাশ ঘটাইতেন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন একখানি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। কাব্যাংশে উহার স্থান এখন যেখানেই নির্দ্দিষ্ট হউক না কেন, উহা যে দ্ব্যর্থবাচক, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। উহার আগাগোড়া কালী পক্ষে ব্যাখ্যা আছে, তাহাতে তন্ত্রের উপাসনাপদ্ধতি স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে ; পক্ষান্তরে বিদ্যাপক্ষে সাদাসিধা ব্যাখ্যা করাও চলে। এইটুকু বলিবার জন্যই প্রত্যেক পালার শেষে রামপ্রসাদ ভনিতা করিয়াছেন,—

প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাস-দাস-দাসীপুত্র হই॥

শুনিয়াছি, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরেরও এমনই ভাবে কালীপক্ষে অর্থ করা যায়। কেবল পার্থক্য এই যে, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর হইতে যে পদ্ধতির উপাসনার কথা ফুটিয়া উঠে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে সে পদ্ধতির উপাসনাতত্ত্ব জানা যায় না। ভারতচন্দ্র দক্ষিণাবর্ত্তের দক্ষিণা কালীর পূজার কথা কহিয়াছেন, রামপ্রসাদ রামমার্গের সাধনার বিবরণ দিয়াছেন। আমাদের পিতামহ-প্রপিতামহদলের লোকেদের মধ্যে এ তত্ত্বটা বেশ জানা ছিল। কথাটা তুলিবার হেতু এই, ন্যূনাধিক শত বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের সমাজে যাহা প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল, যে সকল সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া লোকে গ্রহণ করিত, এখন আর তাহা নাই। সে সাধনা, সে ধারণা এখন একরকম লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সমাজে সাধারণ ভাবে সাধনা প্রচলিত না থাকিলে কবি দুই জন এমন দুই দিক্ বজায় রাখিয়া বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখিতেন না।

উভয়েরই বিদ্যাসুন্দর উভয়েরই রচিত চণ্ডীর গানের অংশবিশেষ। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অংশ ভারতের বিদ্যাসুন্দর; রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তনের অংশ কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর। সুতরাং উহা যে কেবল ইয়ারকির বহি নহে, এমন অনুমান করা যায়। পূর্ব্বে যাহারা কালী-কীর্ত্তন করিত, তাহারা বিদ্যাসুন্দরের গানও করিত, উম্‌শে ভুলোর যাত্রার হিসাবে নহে, খাঁটি সাধনতন্ত্রের হিসাবে গান করিত। সেই গানের ভঙ্গী দেখিয়া, তাহাতে খাঁটি বাবুয়ানির রসিকতা মিশাইয়া গোপাল উড়ের যাত্রা তৈয়ার করা হইয়াছিল। কাজেই বলিতে হয়, শত বর্ষ পূর্ব্বে তন্ত্র-সাধনা যেন সমাজের স্তরে স্তরে গাঁথা ছিল। সেকালের কর্ত্তাদের প্রায় সকলেরই এক একটি শক্তি—নায়িকা ছিল; যাহার অর্থ-সামর্থ্যে কুলাইত, অথবা সিদ্ধ সাধক বলিয়া যাহারই সমাজে খ্যাতি হইত, তাহারই নায়িকা থাকিত। চণ্ডীদাসের 'রামী রজকিনী' গোপন কথা নহে, বরং শ্লাঘার বিষয় ছিল। রাজা রামমোহন রায় যে শৈব বিবাহ করিয়াছিলেন, সে কথা প্রকাশ করিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন নাই। এই এক শত বৎসরের মধ্যে আমাদের সমাজের এতটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এতটাই শিক্ষা দীক্ষার ওলট পালট হইয়াছে যে, শত বৎসর পূর্ব্বেকার সমাজকে আমরা এখন ঠিকমত চিনিতে বুঝিতে পারি না। এই তন্ত্রসাধনার ফলে যে কেমন সিদ্ধিলাভ হইত, তাহা এখন আমরা অনুমানেও আনিতে পারি না। বামা ক্ষেপাকে এক বার জিজ্ঞাসা করি,—"এই শ্মশানে মশানে ঘুরিয়া, মড়া ঘাটিয়া, সুরাপান ও শক্তিসাধন করিয়া কি সুখ? তোমার ঘর বাড়ী আছে, ভাই ভগিনী আছে, ভূমিসম্পত্তি আছে, তাহা ছাড়িয়া এই অঘোর-পন্থা, এই বামাচার কেন অবলম্বন করিলে?" হাসিয়া পাগলা বলিয়াছিলেন,—"ইহার মধ্যে একটা এমন কিছু আছে, যাহার জন্য ছার সংসারের ঐশ্বর্য্য, সুখবিলাস, স্বর্গের সুখও তুচ্ছ করা যায়। বুঝাইবার নহে ত বাবা, ভাগ্যে না থাকিলে ইহার মহিমা বুঝা যায় না।" বাস্তবিক একটা কিছু দুর্ব্বার আকর্ষণ না থাকিলে লোকে ইহাতে মজিবে কেন? বামাচরণ এবং বক্রেশ্বরের ন্যাংটা বাবা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কালের দুই জন প্রকট তান্ত্রিক ছিলেন। ইহাদের দুই জনের মধ্যে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাও ছিল, তাহার একটু আধটু পরিচয় আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। বলিব কি বিস্ময়ের কথা, কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন।

ইদানীং তন্ত্রপদ্ধতির বাহিরের সাধক দেখি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তন্ত্র হঠযোগের কথা অনেক স্থানে বলিয়াছে, রাজযোগের পদ্ধতি ও ক্রমের উল্লেখ করিয়াছে, ইহা ছাড়া আর একটা যোগশাস্ত্রের কথারও উল্লেখ আছে। সারদাতিলকে আছে, "শিবশক্তি উভয়াত্মক এই শরীর ষট্নবতি আঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ; ইহার মধ্যে গুহ্যদেশে ও ধ্বজের মধ্যস্থলে দুই অঙ্গুলি উন্নত একটি পথ আছে। তাহার বিস্তার ইহার দ্বিগুণ; এই পথ বৃত্তাকার। এই মূলাধার হইতে যে সমস্ত নাড়ী উদ্গতা হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটি নাড়ী প্রধানা। বাম দিকের নাড়ী ইড়া, দক্ষিণের পিঙ্গলা, মধ্যে মেরুদণ্ডাশ্রিতা স্থষুম্না। এই স্থষুম্নার মধ্যে চিত্রার পথেই শিব-সামরস্য ঘটিয়া থাকে। সৌভাগ্যশালী সাধক সেই দেহগত শিব ও শক্তির সামরস্যে জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।" নিম্নাধিকারীর পক্ষে শিব ও শক্তি—নর ও নারী স্বতন্ত্রভাবে যুক্ত করিয়া শিবসামরস্য লাভ করিতে হয়। সেই নিম্নাধিকারীর পক্ষেই পঞ্চ তত্ত্বের বা পঞ্চ ম-কারের সাধনা প্রশস্ত বলিয়া নিগম আগমে উক্ত হইয়াছে। দেহের এক একটি ক্রিয়া এক একটি শক্তিপ্রভাবেই হইয়া থাকে। চর্চ্চা করিলে সে সকল শক্তিকে প্রবলা করা চলে। যে শক্তির প্রভাবে ভুক্ত অন্ন হইতে দুগ্ধের উৎপত্তি হয়, এবং মূত্র পুরীষ পৃথক্ হইয়া যায় এবং এই দুগ্ধ বা পীযূষ হইতে শুক্র ও মেদ মজ্জা নির্ম্মিত হয়, তাহাই হংসঃশক্তি। দেহের মধ্যে এবম্প্রকারের চতুঃষষ্টি শক্তি আছে; ইহারাই চৌষট্টি যোগিনী। বাহিরে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই চৌষট্টি যোগিনীর ক্রিয়া হইতেছে, ভিতরে দেহভাণ্ডেও ঐ চৌষট্টি যোগিনীর ক্রিয়া সমভাবে হইতেছে। বাহিরের ও ভিতরের শক্তির সমঞ্জসীকরণকেই—সমরসতাপ্রাপ্তিকেই আগমনি-গমানুসারে যোগ বলা হয়। তেমন পুরুষার্থ থাকে—নিজের দেহের সাহায্যে নিরালম্ব ভাবে যোগসাধনা কর, নহিলে বাহিরের শক্তির সাহায্য লইয়া স্বদেহস্থ সম্মূঢ় শক্তির উদ্বোধন সাধন করিতে হইবে। তন্ত্র, ভিতরের ও বাহিরের দুই পন্থাই স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। ইহাই নিগমাগমের, যোগসাধনার, আত্মদর্শনের থিওরি।

গুরুমুখ না করিয়া তন্ত্র বুঝা যায় না। উহা সাধনার ধন, Experimental Science, করিয়া কর্ম্মিয়া সম্মুখে দেখাইয়া দিতে হইবে। গুরু দেখাইয়া দেন, শিষ্য সেই experiment দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি

অনুসারে ক্রিয়া করিয়া থাকে। গুরুর সাহায্য ব্যতীত তন্ত্রসাধনা বুঝান যায় না। তাই তন্ত্রে গুরুর এতই আদর। কেবল তন্ত্র কেন, যোগ-শাস্ত্রেও—মাহেশ্বর যোগশাস্ত্র এবং পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র—সকল সাধন-শাস্ত্রেই গুরুর আসন অতি উচ্চে। গুরু ঈশ্বরের সমান পদবীর পুরুষ। কারণ, গুরুর সাহায্য ব্যতীত আত্মদর্শন সম্ভবপর নহে। তবে সোজাসুজি আমাদের ইংরেজী বুদ্ধি লইয়া তন্ত্র পড়িলে বুঝা যায় যে, Anatomy, Physiology এবং Biology, এই তিন তত্ত্বের সাহায্যে উহা আত্মদর্শনের সাধনপদ্ধতি মাত্র। তন্ত্রের মধ্যে যে Black Art নাই, এমন কথা বলি না। যে যে সাধনে দেহের ভাল মন্দ এবং বাহ্য জগতের ভাল মন্দ সকল প্রকারের শক্তিসঞ্চয়, শক্তির উন্মেষ ঘটে, তন্ত্র সেই সকল সাধনের উন্মেষ করিয়াছেন। তন্ত্রসার, সারদাতিলক প্রভৃতি সঙ্কলনগ্রন্থে সেই সময়কার পৃথিবীর বহু সাধনধর্ম্মের উল্লেখ আছে। পুরাতন সিদ্ধাচার্য্যদিগের সহজিয়া বৌদ্ধ তন্ত্রধর্ম্ম, নাথীদিগের ধর্ম্ম, অঘোরঘণ্টের ধর্ম্ম, এমন কি, মুসলমানদের সুফী ও শক্তিসাধনার উল্লেখও আছে। ইউরোপের মধ্যযুগে Satan Worship বা সয়তানের পূজার এক গুপ্ত সাধনা প্রচলিত ছিল। সে সাধনা অনেকটা তন্ত্রসাধনার অনুরূপ, অনেকটা বৌদ্ধ মহাযানীদিগের মারসাধনার অনুরূপ ; তাহার বিবরণও কোন কোন সঙ্কলনগ্রন্থে পাওয়া যায়। তন্ত্র বলিলে একটা বিরাট্ বিশাল বিশ্বব্যাপী সাধনধর্ম্মের, শক্তিসাধনপদ্ধতির সমবায় বুঝিতে হইবে। তন্ত্রের এক দিকে মদ্য মাংস মৈথুনাদির যেমন কঠোর নিষেধ আছে, অন্য দিকে মদ্য মাংস মৈথুনাদির ছড়াছড়ি আছে। গো শূকরের মাংস মহামাংস বলিয়া তন্ত্রে পরিচিত হইয়াছে, আবার উহাদের ব্যবহার স্থানান্তরে নিষিদ্ধও আছে। কাজেই তন্ত্রের বিচার করিতে হইলে কেবল সঙ্কলন-গ্রন্থ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রাদির ন্যায় সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিলে চলিবে না। উহার মূল গ্রন্থসকলকে লইয়া ভাগ করিতে হইবে ; ক্রান্তি, আম্নায় প্রভৃতি ধরিয়া ভাগ করিতে হইবে ; বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য, নাথী, কালচক্রযানী, মঞ্জুঘোষী, জালালী, আউলিয়া, দরবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায় ধরিয়া উহাদের ভাগ করিতে হইবে ; ভাগ শেষ হইলে তখন বুঝা যাইবে—কোন্ তন্ত্র কোন্ স্তরের, কোন্ যুগের, এবং কোন্ জাতির। রাজার সাহায্য না পাইলে এবং বহু তান্ত্রিক পণ্ডিতের সমাবেশ না হইলে এ কাজ

পূর্ণ হইবার নহে। যখন তাহার প্রয়োজন বোধ হইবে, তখন তাহা সম্পন্ন হইবেই।

তন্ত্রের adaptibility বা উপযোগিতার একটা পরিচয় এইখানে দিব। আকবর শাহ দীন-ই-ইলাহি নামক এক মুসলমানী নব বিধানের সৃষ্টি করেন। এই দীন-ই-ইলাহির সাধনপদ্ধতি তন্ত্রের সাধনপদ্ধতির অনুরূপ; যাহারা এই সাধনা করিত এবং ফকিরী গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে জালালী ফকির বলিত। বৃহৎতন্ত্রসারের দুই একখানা পুঁথিতে জালালী সাধন-পদ্ধতির নির্দেশ আমি দেখিয়াছি। আধুনিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা তন্ত্রপুস্তক ছাপাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকে নিজ নিজ পুঁথি "শুরুদ্দ" করিয়া—মুসলমানী ও বৌদ্ধগন্ধবর্জ্জিত করিয়া ছাপিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই হাতের লেখা পুঁথি না পাইলে তন্ত্রের অনেক তত্ত্ব ঠিকমত বুঝা যায় না। অনেকে বলেন, ইংরেজী সভ্যতার গুণে orthodoxy অনেক কমিয়াছে; আমার কিন্তু বিশ্বাস, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার গুণে orthodoxy বা হীন গোঁড়ামি বেজায় বাড়িয়াছে। পুরাতন পরিচয় মুছিয়া ফেলিবার জন্য যেন সবাই ব্যস্ত; খ্রীষ্টানী moral আদর্শের এবং বৈদিক বর্ণাশ্রমী হিন্দু যেন সবাই ছিল, এই পরিচয় সকলকেই দিতে ব্যস্ত। তন্ত্রধর্ম্মের ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে মোগল পাঠানের শাসনকালে সমাজে যে কি একাকারই ঘটিয়াছিল, তাহার পরিচয় এখন অনেকেই ঢাকিতে চেষ্টা করেন। ফলে আসল সত্য কথা ক্রমশঃ ঢাকাই পড়িতেছে। তন্ত্রের ঐতিহাসিকতার বিষয় যদি আলোচনার যোগ্য হয়, তবে সে বিচার পরে হইবে।

তন্ত্রের কাম ও মদনের philosophy বা দার্শনিকতা এবং theory বা তত্ত্বকথা সজ্জনসমাজে যতটুকু ইসারা ইঙ্গিতে বলা যায়, ততটুকু আমি বলিয়াছি। ভিতরকার কথা শুনিতে হইলে গুরুমুখ করিয়া শুনাই কর্ত্তব্য। তন্ত্র শক্তিসঞ্চয়ের সাধনার কথাই বলিয়াছেন; যেখান হইতে যতটুকু শক্তি সঞ্চয় করিতে পারা যায়, তন্ত্র তাহারই আহরণ করিয়াছেন। কাম ও মদন সৃষ্টির আদি শক্তি, কাম ও মদন জীবসৃষ্টির আদি তত্ত্ব, তাই কাম ও মদনের সাহায্যে জীবসৃষ্টির গুপ্ত তত্ত্ব জানিবার জন্য তন্ত্র ব্যস্ত। তন্ত্র বলেন, নরনারীর কাম ও মদন হইতে সদ্যোজাত নূতন শিশুর অহঙ্কার বা আত্মানুভূতি ঘটিয়া থাকে। কাম ও মদন সাহায্যে এক দেহ হইতে

অন্য দেহে জীবাত্মার সঞ্চার হয়। অতএব এই কাম ও মদনের বিশ্লেষণই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রধান উপায়। দুই হইতে তিন কেমন করিয়া জন্মায়, ইহা না বুঝিলে এককেও বুঝিবে না, দ্বিতীয়কেও চিনিবে না, তৃতীয়ের মূল্যও যাচাই করিতে পারিবে না। নর নারীর যোগ হইলেই কিছু গর্ভ-সঞ্চার হয় না;—কেন হয় না? ইহার উত্তর যদি ঠিকমত দিতে পারে, তাহা হইলেই বুঝিবে, আত্মশক্তির ক্রিয়া কেমন ভাবে দেহের মধ্যে হইতেছে। অমোঘাঃ পশবো বীর্য্যাঃ—ইহাই বা হয় কেন? মানুষের পক্ষে এমন ব্যাঘাত ঘটে কেন? ইহার ভিতরকার তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে,—জীবসৃষ্টির মহিমা বুঝিতে পারিবে, দেহতত্ত্বের অনেক কথা জানিতে পারিবে। তন্ত্রসাধনায় এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয়। এই সকল জিজ্ঞাসার উচিত উত্তর পাইলেই, আত্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; পরিচয় ঠিকমত পাইলে আত্মসাক্ষাৎকার কঠিন বা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয় না। Theory এবং theory অনুসারে experimentএর process দুই তন্ত্রে বলা আছে—তত্ত্বও আছে, ক্রিয়াপদ্ধতিও আছে। এই কর্ম্মপদ্ধতি সত্য কি মিথ্যা, তাহা যে করিয়া দেখে নাই, সে কেমন করিয়া বুঝিবে। কাজেই ইহার অধিক আর বলা চলে না। ['প্রবাহিণী,' ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২২]

তন্ত্রে মূর্ত্তিপূজা

১

আমাদের বিশ্বাস এবং ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণেরও মত এই যে, বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের আর্য্য বর্ণাশ্রমীদিগের মধ্যে আধুনিক হিসাবের মূর্ত্তিপূজার প্রচলন ছিল না। বৈদিক ধর্ম্মের প্রাবল্যের যুগে দ্বিজাতি মাত্রেই যাগ যজ্ঞ করিতেন, গৃহে গৃহে অগ্নিহোত্রী বিরাজ করিতেন, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য সর্ব্বব্যাপী হইয়াছিল। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে মূর্ত্তিপূজা নাই, মীমাংসা শাস্ত্রে প্রতিমা নির্ম্মাণের এবং প্রতিমা পূজার কোন পদ্ধতির উল্লেখ নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষব্যাপী হইলে বুদ্ধদেবের

প্রতিমূর্ত্তির পূজা এ দেশে প্রথম প্রচলিত হয়। পরে বৌদ্ধ মহাযানী তান্ত্রিকগণ প্রজ্ঞাপারমিতা, তারা, নীল সরস্বতী প্রভৃতির পাষাণময়ী মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন। তবে তাঁহারা গৃহে গৃহে উৎসব উপলক্ষ্যে মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করিতেন না। তাঁহারা মন্দির গড়াইয়া, সেই মন্দিরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিতেন এবং বৌদ্ধ নরনারী-সকল প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা মন্দিরে যাইয়া দেবতার পূজা আরতি করিয়া আসিতেন। তাহার পর বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতন ঘটিলে যে নব হিন্দু ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, সে ধর্ম্মের ধার্ম্মিকগণ বৌদ্ধ প্রথা অনুসরণ করিয়া মন্দিরে বা মঠে যাইয়া প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা করিয়া আসিতেন। বৌদ্ধ যুগাবসানের পর সংস্কৃত ভাষায় যে সকল নাটক নাটিকা লিখিত হইয়াছে, সে সকল পুস্তকে মন্দিরে যাইয়া পূজার পদ্ধতির উল্লেখই আছে। এখনও ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই বাঙ্গালার মতন মাটির মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করা হয় না। মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা বাঙ্গালায় যেরূপ সাধারণ ভাবে প্রচলিত, এমন মূর্ত্তিপূজার প্রচলন ভারতবর্ষের আর কোন দেশে বা জাতির মধ্যে নাই।

দুই চারি জন বিশেষজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলিয়া থাকেন যে, তন্ত্রধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের মতন পুরাতন এবং সনাতন। শিবলিঙ্গপূজা কেবল ভারতবর্ষে কেন—এশিয়া, ইউরোপ এবং আফরিকার বহু দেশেই বহু যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া প্রচলিত আছে। পুরাতন ফিনিক্, মিশরের কপ্‌ট বা গুপ্ত জাতি, রোমক, যবন, অসুর প্রভৃতি বহু পুরাতন জাতির মধ্যে লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল। পুরাতন বাবিলনে ও তাতার দেশে লিঙ্গপূজা হইত। বাবিলনের মলছ, বাল প্রভৃতির পূজা কতকটা তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতির মতন। অনার্য্য বর্ব্বর জাতিসকল ত অনাদি কাল হইতে ভূত প্রেত ও মূর্ত্তিপূজা করিয়াই আসিতেছে, আর্য্য জাতির বহু শাখার মধ্যে মূর্ত্তিপূজা বা প্রতীকপূজার প্রচলন ছিল। অতএব বলিতে হয় যে, যাগ যজ্ঞ, হোম জপ যেমন সনাতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, প্রতিমা বা প্রতীকপূজাও তেমনি সনাতন কাল হইতে প্রচলিত আছে। সুতরাং নিগমাগম বা তন্ত্রের ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের সমসময় কালের বলিলেও চলে; বোধ হয়, বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা পুরাতন হইলেও হইতে পারে। এই সকল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের বিশ্বাস যে, শ্বেতাঙ্গ আর্য্যদিগের উদ্ভবের সময়ে

অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণাঙ্গ আর্য্যও এক দল ছিল। বেদে কৃষ্ণাঙ্গ আর্য্যদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা ইরান বা পারস্য দেশ হইতে বাহির হইয়া বর্ত্তমান কাবুলের উত্তর উপত্যকা বাহিয়া, তাগ্‌লা-মাকান অধিত্যকা হইতে কাশ্মীরে নামিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিল; পরে কাশ্মীর হইতে পার্ব্বত্য প্রদেশ বাহিয়া বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অন্য দিকে গান্ধার সুবাস্তু হইয়া লাট ও মহারাষ্ট্র প্রদেশ পর্য্যন্ত ইহাদের বিস্তার ঘটিয়াছিল। ইহারাই না কি ভারতবর্ষে তন্ত্রধর্ম্ম আনয়ন করে, ইহারাই আদিম বর্ব্বরগণের পৌত্তলিকতা তন্ত্রধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লয়। সুতরাং—এই অনুমান বা থিওরি সত্য হইলে বলিতে হয় যে, মূর্ত্তিপূজা বৈদিক যজ্ঞধর্ম্মের সমসময়ের এবং সনাতন।

কিন্তু খ্রীষ্টানগণ এবং মুসলমানগণ যাহাকে idolatry বা বোধ-পরস্ত বলেন এবং যাহার নিন্দা করেন, তাহা কিন্তু বেদেও নাই, তন্ত্রেও নাই। উহা ষোল আনা বৌদ্ধ পৌত্তলিকতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। বোধ-পরস্ত শব্দটা হইতেই ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। Idolatry শব্দটার ইতিহাস জানিতে পারিলে ঐ বৌদ্ধ পৌত্তলিকতার বা বর্ব্বর পৌত্তলিকতার ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। কোন তন্ত্রে পুতুল, প্রতিমা, প্রতিমূর্ত্তি পূজার বিষয়ীভূত নহে; উহারা প্রতীক, আলম্বন, ধ্যানের সহায়ক মাত্র। তবে সাধু মহাত্মার প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার চিহ্ন বা স্মারক হিসাবে পূজ্য এবং সেব্য। যেমন শাক্যসিংহের, জামদগ্ন্যের, জড় ভরতের, দত্তাত্রেয়ের প্রতিমা পূজা করিতে হয়—প্রতিমারই হিসাবে, সাধু সজ্জনের প্রতিমূর্ত্তির হিসাবে, প্রতীক বা আলম্বনের হিসাবে নহে। এ ক্ষেত্রে প্রতিমাই পূজ্য; কেন না, ঐ সকল সাধু মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্যই তাঁহাদের প্রতিমা গড়াইয়া রাখিতে হইয়াছে। পরন্তু ঈশ্বরোপাসনায় যে প্রতিমার পূজা করিতে হয়, তাহা প্রতীকের হিসাবেই করিতে হয়। কুলার্ণব তন্ত্রে লিখিত আছে,—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

এই শ্লোক রামতাপনীয় শ্রুতিতেও পাওয়া যায়। কুলচূড়ামণি গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের স্থূল সূক্ষ্ম দুই রূপই এক। যেমন জমা ঘি এবং তরল ঘি, দুই-ই ঘৃত, কেবল অবস্থান্তর মাত্র, তেমনি চিন্ময়

ব্রহ্মের স্থূল সূক্ষ্ম দুই একই রূপ। কারণ, পূজক যিনি, তিনি আত্মাবান্ পুরুষ, তাঁহার সোপাধিক আত্মা পরমাত্মার সহিত মিশিতে চাহে, তাই সে উপাসনা করিতে উদ্যত হয়। সেই উপাসনার সহায়তার জন্যই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিতে হয়। যেমন কোদাল কুড়ুল লইয়া বন কাটিয়া রাজপথ তৈয়ার করিতে হয়, তেমনই প্রতিমা, পূজার উপচার, পত্র, পুষ্প, ফল গন্ধদ্রব্য, বাদ্যভাণ্ড প্রভৃতির সাহায্যে উপাসকের ভক্তির পথ প্রশস্ত করিতে হয়। তস্মাৎ সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্ম স্ত্রীপুংরূপং ধত্তে। —ইহাই হইল তন্ত্রের মূর্ত্তিপূজার গোড়ার কথা।

ইহার উপর তন্ত্র দুইটা theory বা সিদ্ধান্ত কথা বলিয়াছেন। প্রথম থিওরি,—"দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্।" অর্থাৎ দেবতার শরীর বীজমন্ত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাই ইষ্টদেবতার মূর্ত্তিকে মন্ত্রঘটকীভূতা প্রতিমা বলা হয়। মন্ত্র জপ করিতে করিতে দেহঘটে বা হৃদয়ের মধ্যে বা চিন্তাক্ষেত্রে এক একটা মূর্ত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। সেই মূর্ত্তিই সাধকবিশেষের ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি, তাহার আরাধ্য, তাহার উপাস্য। এই প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া তন্ত্র বলিয়াছেন,—"বর্ণরূপেণ যা দেবী জগদাধাররূপিণী।" যামলে লেখা আছে যে, ধ্যান দুই প্রকারের—স্থূল এবং সূক্ষ্ম; 'সূক্ষ্মং মন্ত্রময় দেহং স্থূলং বিগ্রহচিন্তনম্'। সূক্ষ্ম ধ্যান মন্ত্রময়, মন্ত্রজপ এবং মন্ত্রের উপর একাগ্রতা, ইহা বড় কঠিন, কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে। স্থূল ধ্যান বিগ্রহচিন্তা—রূপের ধ্যান। এই ধ্যানই সাধারণ সাধকে করিতে পারে এবং এই ধ্যানে সিদ্ধ হইলে সাধক আপনা আপনি সূক্ষ্মতত্ত্বে যাইতে পারে। অতএব তন্ত্র আদেশ করিতেছেন যে, "তস্মাৎ বীজাত্মকং মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ"—বীজাত্মক মন্ত্র জপ করিয়া, ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মময় হইতে পারে।

দ্বিতীয় theory বা সিদ্ধান্ত ভক্তিমার্গের—উপাসনাতত্ত্বের সিদ্ধান্ত। বড় সাধ এই হয় যে, জগদীশ্বরের উপাসনা করি, তাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহাকে মাতা, পিতা, গুরু, প্রভু, সখা বলিয়া ডাকি, তাঁহাকে সেইরূপে দেখিতে থাকি। আমার হৃদ্গত একাদশ আসক্তির তৃপ্তির জন্য আমি বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে চাহি। এই পিপাসা—এই উপাসনার তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য যে পূজাপদ্ধতির নির্দ্দেশ আছে, তাহাতে দেবতার রূপ পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট থাকে। সে রূপ বাঙ্ময় রূপ হইতে

পারে, চিত্রলেখা হইতে পারে, ধাতুনির্ম্মিত বা পাষাণ ও মৃত্তিকানির্ম্মিত হইতে পারে। ইহা রসের রূপ—ভাবের রূপ। এই রূপে ভক্তি কেন্দ্রীকৃত হইলে, একনিষ্ঠার বিকাশ হইলে, সাধকের পরিতৃপ্তি সাধন হয়, তিনি সদানন্দ লাভ করিতে পারেন। স্তব স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে, ভাষার সাহায্যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে একটা রূপ আপনিই ফুটিয়া উঠে, একটা রূপের ছাপ হৃদয়ে গাঁথিয়া যায়ই। এই ছাপ, এই আলেখ্য প্রতিমায় পরিণত হইলে উহা দেবতার বিগ্রহ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। শ্রীরামচন্দ্রের বা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি রামায়ণ ও ভাগবতাদি গ্রন্থের বর্ণনা—হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। দেশভেদে, রুচিভেদে, কলাকৌশলের প্রকারভেদে এই সকল মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। পূজা ও উপাসনার প্রধান অবলম্বন বলিয়া, ভাবোন্মেষের প্রধান সহায় বলিয়া, জনসমাহারের প্রধান উপায় বলিয়া এই সকল মূর্ত্তি শ্রদ্ধার সামগ্রী। তাই তন্ত্র বলিতেছেন,—"যা যস্যাভিমতা পুংসঃ সা হি তস্যৈব দেবতা।" সাধকের অভিমত বা রুচি প্রবৃত্তি অনুসারে এক এক দেবমূর্ত্তি তাঁহার ইষ্টদেবতা হইয়া থাকে। ইহা প্রবৃত্তিমার্গের ও অধিকারতত্ত্বের কথা। নিবৃত্তিমার্গের কথা স্বতন্ত্র।

এইবার তন্ত্রের প্রথম থিওরির বা সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করিব। কথা এই যে,—বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে দেবতাবিশেষের শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ যথাপদ্ধতি বীজমন্ত্র অনবরত জপ করিলে স্বয়মেব একটা মূর্ত্তির বিকাশ মনোমধ্যে হইয়া থাকে। যেমন একটা ধাতুপাত্রে জল থাকিলে এবং সেই ধাতুপাত্রের পার্শ্বের কোন স্থানে আঘাত করিলে জলে একটা কম্পন হয় এবং কম্পনজনিত একটা রূপের প্রকাশ হয়; অথবা একটা থালায় অল্প কিছু সূক্ষ্ম বালুকাকণা থাকিলে এবং সে থালার তলায় আঘাত করিলে আঘাতজনিত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বালুকাকণাগুলি নড়িয়া, ঘুরিয়া, ছুটিয়া একটা স্বতন্ত্র আকার ধারণ করে, তেমনই আসন করিয়া বসিয়া বীজমন্ত্র একনিষ্ঠভাবে জপ করিতে থাকিলে মনোময় আস্তরণে একটা রূপের বিকাশ হইয়া থাকে। তন্ত্র বলেন যে, প্রত্যেক শব্দেরই একটা রূপ, একটা আকার আছে। সঙ্গীতের প্রত্যেক সুরের একটা রূপ আছে; সেই রূপ সেই সুরের দেবতা। সেই সুর আলাপ করিতে করিতে যত ক্ষণ না মনোমধ্যে উহার রূপের বিকাশ হইতেছে,

তত ক্ষণ সে সুরে সিদ্ধ হওয়া যায় না। আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্র এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন এবং ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন রূপের নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, সপ্ত স্বরেরও ভিন্ন ভিন্ন পরদায় রূপের নির্দ্দেশ আছে। বাহ্য জগতে রূপ ফুটিবার পূর্ব্বে শব্দ ফুটিয়া উঠে। তন্ত্র বলেন,—প্রথম প্রভাতে অরুণোদয়ের পূর্ব্বে নিসর্গ-সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গে প্রণবের ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়, তবে মুদিতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের কনকরেখা আকাশক্রোড়ে ফুটিয়া উঠে। অতি ঘোর অমানিশায়, দ্বিযামার পরে, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বা শ্মশানক্ষেত্রে হুঙ্কারের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়; সে শব্দ না হইলে নিশার তমোময় রূপ ফুটে না। প্রকৃতির সকল অবস্থায় একটা করিয়া শব্দ আছে, আর সেই শব্দের অনুরূপ একটা রূপ আছে; প্রত্যেক ঋতুর রূপ আছে, ত্রিসন্ধ্যার রূপ আছে। এ রূপ যে কেবলই মানব মানবীর রূপ, তাহা নহে; অন্য নানা রূপের অবস্থানুসারে বিকাশ হইয়া থাকে। তবে মানুষের চিত্তক্ষেত্রে প্রায়শঃ মানব মানবীর রূপের বিকাশ হয় বলিয়াই, মানুষের অনুভূতিগম্য যাহা, তাহার রূপ অনেক সময়ে নরনারীর রূপের মতন একটা কিছু রূপ হয়। তন্ত্র বলেন, মানুষের দেহ একটা শব্দযন্ত্রবিশেষ। বহু তন্ত্রে নরদেহকে বীণার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বীণার বহু তার টানা বাঁধা থাকে, দেহের মধ্যেও বহু তার, তন্ত্র, তাঁত, নাড়ীর আকারে টানা বাঁধা আছে। দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে, আসক্তির সাহায্যে গুরু সেই দেহগত বীণা-যন্ত্রকে একটা সুরে, একটা গ্রামে বাঁধিয়া দেন। সাধক সেই বাঁধা যন্ত্রে বীজমন্ত্রের আলাপ করিয়া থাকেন। আলাপ করিতে করিতে যখন সুর বেশ জমিয়া যায়, একটা শব্দবিভূতির সৃষ্টি হয়, তখন সেই বিভূতির অভিব্যঞ্জনাস্বরূপ একটা রূপের ছবি মনোমধ্যে ফুটিয়া উঠে। ইহাকেই বলে—ধ্যানসিদ্ধ মূর্ত্তি। সাধকবিশেষে, রুচি-বিশেষে, মন্ত্র জপের পদ্ধতি অনুসারে এই ধ্যানসিদ্ধ মূর্ত্তিসকল নানা ভাবে প্রকট হইয়া থাকে। তাই যামলে বলা হইয়াছে,—“ধ্যানগম্যং প্রপশ্যন্তি রুচিভেদাৎ পৃথগ্বিধম্।” তন্ত্র বলেন, যেমন সকল বীণায় রাগ রাগিণী সমান ভাবে ধ্বনিত হয় না, নির্ম্মাতার নির্ম্মাণকৌশল অনুসারে শব্দ ও সুর ধ্বনিত হয়, তেমনি দেহ হিসাবে, পিতা মাতার প্রকৃতি অনুসারে, বংশের ধারা অনুসারে, রূপের বিকাশ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হইয়া থাকে।

যেমন বাজারের বেহালা এবং Stradivarius বেহালায় আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে, একখানা ষ্ট্রাড বেহালার মূল্য এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, সে বেহালার শব্দ গগন ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠে, তেমনি পবিত্র ব্রাহ্মণগৃহের ঋষি মুনির বংশধরের পুত্রের দেহমধ্যে সিদ্ধ মন্ত্র এক অপূর্ব্ব রূপের বিকাশ করে। আবার যেমন, কেবল ভাল যন্ত্র হইলেই গান হয় না, সেই সঙ্গে উচ্চাঙ্গের ভাল যান্ত্রিক থাকা চাই,—ভাল সুরজ্ঞ, চতুর বাজিয়ের হাতে সর্ব্বোত্তম বীণা থাকিলে সে যেমন অপূর্ব্ব সঙ্গীতের বিকাশ করে, তেমনি ভাল ক্ষেত্র, ভাল দেহ, ভাল সাধক হইলেই হইবে না—বাজিয়ে ভাল চাই, গুরু ভাল চাই, তবে ত গান জমিবে, সাধনায় সিদ্ধি সদ্য সদ্য হইবে। মহাত্মা সিদ্ধ সাধক ত্রিপুরানন্দের মতন গুরু মিলিয়াছিল বলিয়াই সর্ব্বানন্দ এক জীবনে সর্ব্ববিদ্যা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। সর্ব্বানন্দ মূর্খ, দুরন্ত ছেলে ; ব্রাহ্মণের ঘরের মূর্খ বলিয়া পিতা মাতার পরিত্যক্ত—উপেক্ষিত। কিন্তু সর্ব্বানন্দ অত্যুৎকৃষ্ট আধার, তাহার দেহ ব্রাহ্মণের দেহ, তাহার যন্ত্র উচ্চাঙ্গের। সঙ্গে সঙ্গে গুরুও মিলিল—ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। সর্ব্বানন্দ এক জপের প্রভাবেই মাতৃদর্শন করিল, সর্ব্ববিদ্যা লাভ করিল, স্বীয় বংশকে ধন্য করিয়া গেল। তাহার দেহমধ্যে মহামন্ত্রের ঝঙ্কার দণ্ডেক কাল হইতে না হইতেই সুর জমিয়া গেল, আত্মময় আকাশে harmony এবং melody দুইয়ের বিস্তার ঘটিল, সর্ব্বানন্দের ভাগ্যে অরূপের রূপদর্শন হইল। তেমন রূপের বিকাশ তোমার আমার চিত্তাকাশে হইবার নহে ; কেন না, তুমি আমি সাধারণ বাজারের বেহালা, ষ্ট্রাড নহি, ত্রিপুরানন্দের মতন ওস্তাদ বাজিয়ে, বড় গুরু তোমার আমার ভাগ্যে জুটে নাই। তাই তন্ত্রে সাধারণ সাধকদিগের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, সিদ্ধ সাধকগণের তপঃসিদ্ধ মস্তিষ্কপ্রতিভাত যে রূপ, সেই রূপকে অবলম্বন করিয়া বীজমন্ত্র জপের সহিত ধ্যান করিতে হইবে। এই ধ্যান প্রগাঢ় হইতে থাকিলে সিদ্ধ সাধ্য মূর্ত্তি তোমার প্রকৃতির অনুকূল হইয়া ফুটিয়া উঠিবেন। তখন বুঝিতে হইবে, সাধক সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছেন। তন্ত্র এইটুকু জাতিভেদ মানিয়া থাকেন ; দেহের যোগ্যতা বিচার করিবার কালে, কোন্ দেহ কেমন মন্ত্রের উপযোগী, তাহা নির্দ্দেশ করিবার কালে তন্ত্র জাতিবিচার এবং জন্মকোষ্ঠী মান্য করেন।

তন্ত্রের এই রূপতত্ত্ব অপূর্ব্ব ব্যাপার; শব্দবিজ্ঞানের বহু সিদ্ধান্ত এই রূপবিকাশের ব্যাখ্যায় তন্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন। তন্ত্র স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছেন যে, আমার নির্দ্দেশমত সদ্‌গুরুর সাহায্যে সাধনা করিয়া দেখ; দেখিবে—সদ্য সদ্য ফল পাইবে, অরূপিণীর রূপের আলোয় তোমার প্রাণ মন ভরিয়া উঠিবে। তাই তন্ত্র বলেন যে, যদি রূপ দেখিতে চাও, রূপসাগরে ডুবিতে চাও, তাহা হইলে মানস পূজা—অন্তর্জপ করিতে থাক। ভূতশুদ্ধিতে আছে—

"সর্ব্বাসু বাহ্যপূজাসু অন্তঃপূজা বিধীয়তে।
অন্তঃপূজা মহেশানি বাহ্যকোটিফলং লভেৎ॥"

যামল গ্রন্থেও লিখিত আছে,—

"পূজাভাবে মহেশানি হৃদয়ে পূজয়েচ্ছিবাং।
সর্ব্বপূজাফলং দেবি প্রাপ্নোতি সাধকঃ প্রিয়ঃ॥"

আমাদের দেশে একটা রীতি প্রচলিত আছে যে, সিদ্ধ সাধকগণ জপ-যজ্ঞের ফলে যে ধ্যানগম্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন, যাহার মানস পূজা করিয়া কৃতার্থ হন, স্তব স্তোত্রের ইশারায় তাঁহারা সেই রূপের বর্ণনা লোকসাধারণের শ্রবণগোচর করিয়া দেন। সাধারণ পূজকে সাধকের মুখ-নিঃসৃত স্তব শুনিয়া একটা রূপের, একটা প্রতিমার কল্পনা করিয়া লয়, এবং ধাতু, পাষাণ বা মাটির মূর্ত্তি গড়িয়া তাহারই প্রকাশ্যে পূজা অর্চ্চনা করে। লোকহিতের জন্য, সমাজে একটা ভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি অনুসারে বাঙ্গালায় মূর্ত্তিপূজার প্রচলন হইয়াছে। এখন যে সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গার প্রতিমা গড়িয়া আমরা পূজা করিয়া থাকি, শত বর্ষ পূর্ব্বে ঠিক এমন ভাবের প্রতিমা বাঙ্গালার কারিকর গড়িত না। গোড়ায় যখন সিংহবাহিনীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পূজা এ দেশে প্রচলিত হয়, তখন কার্ত্তিক গণেশ, লক্ষ্মী সরস্বতী, কেহই ছিলেন না, তখন একা সিংহবাহিনী মহিষাসুর মথন করিতেছেন। সেকালের সিংহের চেহারা আর এক রকমের ছিল, মহিষাসুরও আজকালকার চোরা অসুরের মতন ছিল না। যাহার যেমন অভিরুচি হইয়াছে, যেমন শখ হইয়াছে, ধ্যানে যে যখন নূতন কিছু দেখতে পাইয়াছে, তখন সে তাহাই প্রতিমার সঙ্গে বসাইয়া দিয়াছে। কারণ, আসল কথা এই যে, দুর্গোৎসবের সময়ে যে প্রতিমা গড়াইয়া, চণ্ডীমণ্ডপ জোড়া করিয়া আমরা যে উৎসব করিয়া

থাকি, সে উৎসবে ঠিক সেই প্রতিমার পূজা হয় না ; পূজা হয় ভদ্রকালীর, পূজা হয় পূর্ণ ঘটের, দেবীকে আহ্বান করিতে হয় যন্ত্রে ও ঘটে ; কেন না, ঘট ঐখানে পূজকের দেহঘটের অনুকল্প মাত্র। প্রতিমা বাহ্য শোভার জন্য রাখা হয় এবং লোকসাধারণের তুষ্টির জন্য উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামান্য একটু পূজা করা হয়। কালীপূজাতেও ঐ একই ব্যাপার ঘটে। পঞ্চাশৎবর্ণরূপিণী মুণ্ডমালিনী কালীকে আরাধনা করিতে হয় বর্ণে বর্ণে, চক্রে চক্রে ; মন্ত্রের উপর হোম করিতে হয়, মন্ত্রের উপর কালিকাশক্তির আহ্বান করিতে হয়। বাহিরের মূর্ত্তি অবলম্বন মাত্র, লোক দেখাইবার ছবি মাত্র। অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে, এখন যে কালীমূর্ত্তি গড়িয়া আমরা পূজা করি, ঠিক ঐ ভাবের মূর্ত্তিপূজা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশই এই দেশে প্রচলন করিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে মূর্ত্তি গড়িয়া প্রতি অমাবস্যায় পূজা করিতেন এবং স্বয়ং তাহাকে মাথায় করিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া আসিতেন। তাই নিয়ম আছে যে, কালীপূজা স্বয়ং করিতে হইবে, অথবা গুরুর দ্বারা করাইতে হইবে। অন্য পুরোহিতের দ্বারা কালীপূজা করাইলে তাহা ফলপ্রদ হয় না। আগমবাগীশের এই ব্যবস্থার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কালীপূজা মন্ত্রে বা ঘটস্থাপনা করিয়া হইত, অথবা সিদ্ধ সাধকের পীঠস্থানে যাইয়া পূজা করিতে হইত। কোন কোন তন্ত্রে দেখিতে পাই যে, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না শ্যামা কুমারীকে আনিয়া, তাহাকেই কালী বলিয়া পূজা করা হইত। এ ক্ষেত্রে মিডিয়মের (medium) হিসাবে কালীপূজা হইত। মাটি খুঁড়িয়া যত পাষাণ-প্রতিমা বাহির হইতেছে, তাহার মধ্যে আধুনিক হিসাবের কালীমূর্ত্তি একটাও পাওয়া যায় নাই। সিংহবাহিনী বা কমলা জগদ্ধাত্রীর মূর্ত্তিরও বহু পার্থক্য ঘটিয়াছে।

রূপের কথায় তন্ত্র আর একটা নূতন কথা কহিয়াছেন। তন্ত্র বলেন, আমাদের দেহস্থ ছয়টা চক্রে ছয়টা মাতৃমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে। বৌদ্ধ তন্ত্রে ইহাদিগকে ছয়টা শূন্য বলে। এই ছয় শূন্য কুণ্ডলীর সাহায্যে ভেদ করিবার সময়ে ছয়টা রূপের বিকাশ হয় ; তাহার পর চিত্রার পথে যাইলে আরও আটটা শূন্যে বা চক্রে আরও আটটা রূপের বিকাশ হয় ; শেষে রূপ অরূপে মিশাইয়া যায়।

"ভুজঙ্গরূপিণীং দেবীং নিত্যাং কুণ্ডলিনীং পরাম্।
বিসতন্তুময়ীং দেবীং সাক্ষাদমৃতরূপিণীং।
অব্যক্তরূপিণীং দিব্যাং ধ্যানগম্যাং বরাননে।
ধ্যাত্বা জপ্ত্বা চ দেবেশি সাক্ষান্মন্ত্রময়ো ভবেৎ॥"

এই ভুজঙ্গরূপিণী দেবীকে ষট্‌চক্রে ষট্ শিবার সাহায্যে অর্থাৎ ষট্‌চক্রের অধিষ্ঠাত্রী ষট্ শক্তির সাহায্যে ষট্‌চক্র ভেদ করিতে হয়। এই ষট্ শিবার নাম—ডাকিনী, রাকিনী, শাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, হাকিনী। ইহাদেরই প্রভাবে বীজমন্ত্রের ঝঙ্কারে এবং ষট্‌চক্রভেদের সাধনার প্রভাবে এক একটি রূপ ফুটিয়া উঠে।

"ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং তত্র ইষ্টদেবস্বরূপিণীম্।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং।
পূর্ণচন্দ্রনিভাননাং সদা চঞ্চললোচনাম্॥"

এই ভাবে তন্ত্র স্তরে স্তরে রূপের বিকাশ ঘটাইয়াছেন। দেহের মধ্যে যত শক্তি আছে, সকলেরই এক একটা মূর্ত্তি আছে, অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছে। দেহের যত ক্রিয়া, যত শক্তির অভিব্যঞ্জনা, সবই আদ্যা শক্তির সাহায্যে হইয়া থাকে। যেমন দেহভাণ্ডে, তেমনই বিশ্বভাণ্ডে শক্তির এবং রূপের বিকাশ হইয়া থাকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল শক্তির, সকল ক্রিয়ার অন্তরালে ঐ কুণ্ডলী শক্তি এক এক রূপে বিরাজ করিতেছেন। যাঁহারা সিদ্ধ সাধক, তাঁহারা দেহভাণ্ডে রূপের বিকাশ করিয়া, সেই রূপকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তৎসম ক্রিয়ার উপর ফুটাইতে পারেন। সাধকের ভাগ্য ভাল হইলে, সিদ্ধ পুরুষের কৃপায় নদীর জলে সে জলদেবীকে—মকরবাহিনী গঙ্গাকে দেখিতে পাইবে, পর্ব্বতে পার্ব্বতীর ছায়ারূপ তাহার নয়নগোচর হইবে। দেহের সর্ব্বাঙ্গে যেমন বিসতন্তুময়ী, সাক্ষাৎ অমৃতরূপিণী দেবী নানারূপে বিরাজ করিতেছেন, তেমনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাঙ্গে, সর্ব্বব্যাপারে বিসতন্তুময়ী দেবী বিরাজ করিতেছেন। তিনি না থাকিলে কিছু থাকে না, কিছু দেখা যায় না, কোন পদার্থ অনুভূতিগম্য হয় না। তিনি ভিতরে এবং বাহিরে থাকিয়া কেবল দেখাদেখি করিতেছেন, নিজেকেই নিজে দেখিতেছেন এবং নিজে দেখাইতেছেন। তন্ত্রের রূপতত্ত্ব বড়ই কঠিন, বড়ই দুরধিগম্য বিষয়। যে সাধক নহে, সে উহা বুঝিতে পারে না।

অথচ এই রূপতত্ত্বের উপরই মূর্ত্তিপূজা প্রতিষ্ঠিত। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্ম্মহাদ্যুতেঃ।
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা॥"

অর্থাৎ নিরাকারা কালজননী মহাদ্যুতি কালিকার গুণক্রিয়ার অনুসারে রূপ কল্পনা করা হয়। গুণ বলিলে বুঝিবে—সাধকের দেহের প্রকৃতি, কালের প্রভাব, দেশের প্রভাব, এবং ক্রিয়া বলিলে বুঝিতে হইবে—বীজমন্ত্রপ্রভাব এবং গুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে সাধনপদ্ধতি। এইটুকু বলিয়া মহানির্ব্বাণ তন্ত্র কালীর যে ধ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক কালীমূর্ত্তি হইতে অনেক পৃথক্। এ কালী রক্তাম্বরপরিধানা, উলঙ্গিনী নহেন; এ কালীর যুগলপাণি, এক হাতে অভয়, আর এক হস্তে বর দান করিতেছেন এবং সুমধুর মাধ্বীক অর্থাৎ মধুপুষ্পজাত মদ্যপানানন্তর নৃত্যপরায়ণ মহাকালকে সম্মুখে দর্শন করিয়া যাঁহার বদনকমল প্রফুল্ল হইয়াছে। এই কালীকে মায়ারাহিত্য, মোহরাহিত্য, লোভরাহিত্য, দম্ভরাহিত্য প্রভৃতি এবং অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি পঞ্চদশ ভাবরূপ পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবে।

এইবার ভাবের কথা আসিল। এই দ্বিতীয় থিওরি বা সিদ্ধান্ত ভক্তিশাস্ত্রের পথ দিয়া বুঝিতে হইবে। আমাদের দেহে একাদশটা আসক্তি আছে, তাহাদের ইংরেজীতে emotions বলিলে কতকটা বুঝা যায়। এই আসক্তির সাহায্যে উপাসনা করিতে হয়। যাহার যে আসক্তি প্রবল, সে সেই আসক্তির অনুরূপ দেবতার রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করিবে। এ কথাটা আমি গত বৎসরে 'প্রবাহিণী'র পাঠকগণের নিকট নিবেদন করিয়াছি। তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। এই ভাবের উপাসনায় বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক একমত,—সিদ্ধান্ত বিষয়ে কেহ কাহারও বিরোধী নহে। এ সম্বন্ধে পরে প্রয়োজন হইলে বলিতে পারি। মনে রাখা ভাল যে, তন্ত্র এবং উপনিষদের কথা ধরিয়াই পুরাণের সৃষ্টি। সিদ্ধান্তশাস্ত্র বলিতে গেলে তন্ত্র এবং উপনিষদ্‌ই বুঝায়; এই দুই সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের বেদীর উপর পৌরাণিক বা আধুনিক হিন্দু ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। এই হেতু তন্ত্রের মন্ত্রাংশের একটা সিদ্ধান্ত ধরিয়া এত কথা বলিতে হইল।

ভাবের ও ভক্তির আলোচনা করিতে হইলে প্রবন্ধান্তরে পরে করিব।
('প্রবাহিনী,' ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)

২

যখন কোন পুরাতন ধর্ম্মে, আচারপদ্ধতিতে বিকৃতি বা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে, তখনই সেই উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবাদস্বরূপ একটা নূতন ধর্ম্মের উদ্ভব হয়। খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম, মুখ্যভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিবাদ। মানুষ ছাড়া, মনুষ্যের আত্মা ছাড়া যে একটা স্বতন্ত্র ধাতা, পাতা, স্রষ্টা পরমেশ্বর আছেন, ইহাই বুঝাইবার জন্য খ্রীষ্টান ধর্ম্মের উদ্ভব। বৌদ্ধ অজ্ঞেয়তাবাদ বা agnosticismএর প্রতিবাদ খ্রীষ্টান ঈশ্বরবাদ বা Theism। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রথম উদ্ভবকালে মূর্ত্তি বা প্রতীকপূজার তেমন তীব্র বিরোধ ঘটান হয় নাই। রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানগণ অনেকটা পৌত্তলিক, ইসলাম ধর্ম্ম এই পৌত্তলিকতার ঘোর প্রতিবাদ। আরবে ইসলাম ধর্ম্ম উদ্ভবের পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও তন্ত্রধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল। হূণ ও তাতারগণ বৌদ্ধ ছিলেন; পারসীক ও ইরানীগণ অগ্নিপূজক ও তান্ত্রিক ছিলেন। ইসলাম ধর্ম্ম এই বৌদ্ধ ও তন্ত্রধর্ম্মের প্রতিবাদস্বরূপ। মুসলমানের মসজিদে কোন ছবি বা কাহারও প্রতিমূর্ত্তি শোভার্থেও রাখিতে নাই, গৃহশোভার হিসাবেও পক্ষী বা মৃগ বা ফল ফুলের আলেখ্য অঙ্কিত করিতে নাই। মোসলেম ধর্ম্মের মতন পৌত্তলিকতার এমন ভীষণ প্রতিবাদ জগতে পূর্ব্বে আর কখনও হইয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না। আটলান্টিক মহাসাগরের তীর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের যেখানে মোসলেম গিয়াছে, সেইখানেই মূর্ত্তি বা দেবপ্রতিমা ভাঙ্গিয়াছে, দেবমন্দির চূর্ণ করিয়া তাহার উপর মসজিদ গড়িয়াছে।

এই খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম্মের উদ্ভবে জগতের ভাবরাজ্যে একটা ওলট্-প্পালট্ ঘটিয়াছে। উপনিষদে, দেবীসূক্তে যেমন আমিই সব, আমা হইতে সব—এই তত্ত্বের উপর তন্ত্রধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছিল, খ্রীষ্টানের ঈশ্বরবাদে তাহা চাপা পড়িয়া যায়। আমা হইতে প্রবলতর, প্রবীণতর একটা শক্তি আছে, তিনি ইচ্ছাময়, শক্তিময়, কৃপাময় মহাপুরুষ—তিনিই ঈশ্বর। জীব, মানুষ

এই ঈশ্বরের কিঙ্কর, সেবক, দাসানুদাস; ঈশ্বর সকলের প্রভু, বিভু ও সর্ব্বব্যাপী। এই ভাবটা প্রবল হইয়া উঠিল। এই ভাব হইতেই রামানুজাচার্য্যের কৈঙ্কর্য্যবাদ ও সেবাপ্রধান বৈষ্ণব ধর্ম্ম। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, রামানুজাচার্য্যের কাল হইতে শ্রীচৈতন্যের কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, সে সকলের তলায় প্রচ্ছন্নভাবে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সিদ্ধান্তসকল লুকান আছে। তাঁহারা বলেন যে, শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত তন্ত্র ও উপনিষদের আত্মপ্রধান অদ্বৈত সিদ্ধান্তের ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রবল ছিল। তাহার পর যত বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, সে সবই খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের সিদ্ধান্তসকলের সহিত আপোস মাত্র। যেখানে আত্মা ছাড়া অন্য একটা ঈশ্বরের উপকল্পনা হইয়াছে, সেইখানেই বৈদেশিক প্রভাব বিরাজ করিতেছে বুঝিতে হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, ভাবময় দেব-মূর্ত্তির পরিকল্পনা এন্টিওকের আর্ম্মিনিয়ান খ্রীষ্টান বুধগণের সিদ্ধান্তের ছায়া মাত্র। এ কথাটা সত্য কি না, তাহা বলিতে পারি না। তবে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সঙ্গে যে খ্রীষ্টান ও মোসলেম ধর্ম্মসিদ্ধান্তের অনেকটা সাদৃশ্য আছে, তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন। এ সাদৃশ্য কোথা হইতে আসিল, কেন হইল, তাহা এখনও কেহ খুলিয়া দেখাইতে পারে নাই। তবে উহা যে, তন্ত্রসিদ্ধান্তের অনেকটা বিরোধী, তাহা আমাদের মনে হয়।

তন্ত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, আত্মাই আমাদের উপাস্য। তোমার ইষ্টদেবতা ও তোমার আত্মা এক এবং অভিন্ন পদার্থ। তুমি যাহা খাও, যাহা ব্যবহার কর, তাহাই তুমি তোমার ইষ্টদেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিবে। তুমি মাংসাশী হইলে তোমার ইষ্টদেবতাকে মাংস নিবেদন করিয়া দিবে। তোমার পক্ষে যাহা ভাল, তোমার ইষ্টদেবতার পক্ষে তাহাই ভাল। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে এই কথাটা অতি স্পষ্টভাবে লেখা হইয়াছে।

"সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈবতে।
যদাত্মনি প্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ॥"

অর্থাৎ দেবতা বিষয়ে দেয় বস্তুতে সাধকের ইচ্ছাই বলবতী। যে যে বস্তু আপনার প্রিয়, তাহাই ইষ্টদেবতাকে দিবে। যে সুরাপায়ী, সে শোধন করিয়া, দেবতার প্রসাদ করিয়া, তবে সুরা পান করিবে। মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, শল্লকী, শশক, গোধা, কূর্ম্ম ও গণ্ডার, এই দশবিধ পশু

বলিদানে প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। সাধকের ইচ্ছানুসারে অন্যান্য পশুও বলি প্রদান করিবে। কেবল নরমাংস ও নরাকার পশুর মাংস ভোজন করিবে না; গো অতিশয় উপকারক জীব, তাই গোমাংস ভক্ষণ করিবে না। তবে বৃহৎতন্ত্রসারে আগমবাগীশ বলিয়াছেন যে, গোমাংস মহামাংস; ভৈরবীচক্রে গোমাংসভোজী সাধক বসিলে উহা দেবীকে নিবেদন করা যাইতে পারে। এ কুলধর্ম্ম কেমন? মহানির্ব্বাণ তন্ত্র উত্তর করিতেছেন—

"অশুচির্যাতি শুচিতামস্পৃশ্যঃ স্পৃশ্যতামিয়াৎ।
অভক্ষ্যমপি ভক্ষ্যং স্যাদ্‌যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ॥
কিরাতাঃ পাপিনঃ ক্রূরাঃ পুলিন্দা যবনাঃ খসাঃ।
শুধ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শাত্তান্ বিনা কোঽন্যমর্চ্চয়েৎ॥"

অর্থাৎ এই কুলযোগী ও কুলধর্ম্মের স্পর্শে অশুচি শুচি হয়, অস্পৃশ্য স্পৃশ্য হয়, অভক্ষ্য ভক্ষ্য হয়, অব্যবহার্য্য ব্যবহার্য্য হয়। কিরাত, পাপী, ক্রূর, পুলিন্দ, যবন, খস, কুলযোগীর ও কুলধর্ম্মের স্পর্শে পবিত্র হয়। কারণ, কুলধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম, কুলযোগী আত্মদর্শী পুরুষ। যত জীব, তত শিব; যত নারী, তত শক্তি; সুতরাং ভিতরের ব্যাপারে সকল দেশের নর নারীই সমান; কেবল যোগ্যতার হিসাবে ছোট বড়র বিচার হইয়া থাকে। তন্ত্র, দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকে অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত পদার্থ বলিয়া মনে করেন না। তন্ত্র বলেন, ভাষায় তেমনি করিয়া বুঝাইতে পারি না বটে, কিন্তু এক বার সাধনা করিয়া দেখ দেখি, আত্মার আস্বাদন পাইলে কি অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়। যে বুঝিয়াছে, সে-ই মজিয়াছে। তাই তন্ত্র বলেন—"যৎ যৎ শাস্ত্রমধীতব্যং তস্য তস্য ব্রতং চরেৎ"—যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, তাহার অনুকূল ব্রতাচরণ করিতে হইবে। কারণ, ব্রতাচরণ না করিলে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ঠিকমত বুঝা যায় না। এই তন্ত্রতত্ত্ব মূর্ত্তিও বুঝে না, অমূর্ত্তও কিছু মানে না; তন্ত্র বলেন,—আত্মার সাগরে কি আছে, কে জানে? এক বার ডুব দিয়া দেখ না, এক বার অকূল পাথারে গা ভাসাইয়া দেখ না! যদি মূর্ত্তি না পাইলে তোমার সাধ না মিটে, তবে মূর্ত্তিপূজা করিও; যদি উপাসনা করিলে, মন্ত্র জপ করিলে সাধ মিটে, তবে তাহাই করিও। আত্মাই ইষ্ট, আত্মাই পূজ্য, আত্মাই সব।

এই অতিপুরাতন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ হইল খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম এবং ভারতবর্ষের আধুনিক আচার্য্যগণ-ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব ধর্ম্মসকল। এই সকল ধর্ম্ম জীব ও শিবকে নিত্য পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। এই জীব ও শিবে নিত্যপার্থক্য তন্ত্র মানেন না। তন্ত্র বলেন,—যেমন সকল দেশের, সকল জাতির শিশু আকারে ও প্রকৃতিতে প্রায় একই রকমের, শিশুর খেলায়, শিশুর ব্যবহারে যেমন শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের ভেদ থাকে না;—যেমন মরণ ব্যাপারটা সকল জীবের পক্ষে সমান, মরিবে সবাই, মরণভয় সকলেরই আছে, মরণপদ্ধতি সকল জীবের পক্ষে সমান, তেমনই আত্মা গোড়ায় সব এক, অভিন্ন ও একপ্রকৃতিক। পরমাত্মায় ও দেহাবচ্ছিন্ন আত্মায় কোন ভেদ নাই; যে ভেদ দেখিতে পাও, তাহাই মায়া মাত্র—মিথ্যা মাত্র। এই মায়ার জাল ছেদ করাই সাধনার উদ্দেশ্য। গীতায়, দেবীপুরাণে এবং অন্য তন্ত্রগ্রন্থে (নিগমগ্রন্থে) এই একই সিদ্ধান্তবাচক শ্লোক অবিকৃত ভাবে আছে,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"

এই মায়াজন্যই তুমি আমি ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। এই মায়া কাটাইতে হইলে তোমার আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়া প্রয়োজন। তুমি আমাকে চিনিলে (তোমাকে চিনিলে) সব এক বলিয়া জানিতে পারিবে—আমাময় হইতে পারিবে। এখন জিজ্ঞাস্য—এই মায়া ছেদ করি কেমন করিয়া? উত্তরে তন্ত্র বলিতেছেন,—"বিনা চোপাসনং দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাং"—বিনা উপাসনায় মনুষ্য কোন ফলই লাভ করিতে পারে না। সে উপাসনা কি ও কেমন? এক আত্ম-আরাধনা, দ্বিতীয় পূজা, পাঠ, স্তুতি, গীতি, এবং রসাশ্রিত ভাবের উপাসনা। আত্ম-আরাধনার কথা সংক্ষেপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সন্দর্ভে বলিয়াছি। সে আরাধনার মধ্যে কাম ও মদনতত্ত্ব, সেই আরাধনার মধ্যে নাম ও রূপতত্ত্ব, সে আরাধনার মধ্যে জপযজ্ঞ ও শক্তিসাধনা—ষট্‌চক্রভেদ, শবসাধনা প্রভৃতি। পূজা, পাঠ, স্তব স্তুতির মধ্যে খাঁটি মূর্ত্তিপূজা -প্রবৃত্তিমূলক পূজা ও শেষে নিষ্কাম উপাসনা আছে। এই উপাসনায় ঈশ্বরের অসংখ্য মূর্ত্তি, অগণ্য প্রতিমা আছে; এই উপাসনায় দেশভেদে, জাতিভেদে নানা পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তন্ত্র উপাসনাপদ্ধতির সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন। তবে যে সকল

তন্ত্রে কেবল পূজোপাসনার পদ্ধতি বর্ণিত আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহাতে দ্বৈতবাদের, জীব-শিবের ভেদজ্ঞানের বিচারও আছে। বুধগণ বলিয়া থাকেন যে, যে তন্ত্রে দ্বৈতবাদের আলোচনা আছে, তাহা বেজায় আধুনিক। সে সকল তন্ত্রগ্রন্থ সম্প্রদায়গত পুস্তক মাত্র, সকল উপাসক সম্প্রদায়কে আবেষ্টন করিবার উদ্দেশ্যেই সে সকল তন্ত্র লিখিত হইয়াছিল। তন্ত্রের আধুনিক সংকলনকর্ত্তারাও কিন্তু দ্বৈতবাদের প্রাধান্য স্বীকার করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মানন্দ গিরি, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতি তন্ত্রসংগ্রাহকগণও অদ্বৈতবাদের জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তথাপি তন্ত্র কিন্তু দ্বৈতভাবে পূজা করিতে বাধা দেন না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—যাহার যেমন ভাবনা, যেমন রুচি, তাহার তেমনই ভাবে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ইহাই তন্ত্রের অনুশাসন। তন্ত্রের যেখানে যত দেবদেবীর পূজাপদ্ধতির উল্লেখ আছে, সেইখানেই স্তবের আবরণে অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তসকল বেমালুম চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। গণেশ, শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, সূর্য্য—যাঁহার স্তব পাঠ করিবে, তাঁহাকেই সর্ব্বময় ও অদ্বৈততত্ত্বের আধারস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে—সকলেই সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বভাবময়, সর্ব্বরূপময়, সর্ব্বসাক্ষী ও সনাতন। সাধারণ পাঠকে বলিয়া থাকেন যে, পুরাণ তন্ত্রের বড় মজা, যখন যে দেবতার পূজা করে, তখনই তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া তোলে। আসল কথা—সবাই এক, এক পরমাত্মার, এক আত্মার বিভিন্ন পাত্রানুসারে, ভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যঞ্জনা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এক পরমাত্মাই আছেন, আর সব তাঁহার উপর সাধকের আরোপিত ভাবের ছায়া মাত্র। সাধকের কল্পনা ছাড়া তাহাদের অন্য স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। যখন যে ভাবের উপাসনা করিতে হয়, তখন সেই ভাবকে বাড়াইয়া তুলিতে হয়, তবেই ভাবসামরস্য ঘটিয়া থাকে। যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে; পুত্র মায়ের কোলে শুইয়া মায়ের মুখ যেমন দেখে, এমন মিষ্ট ও মধুর আর কিছু দেখে না; প্রণয়ী যুবক প্রণয়িনীকে যত সুন্দরী ও মাধুর্য্যময়ী দেখে, এত আর কিছুই দেখে না। যেখানেই ভাব, যেখানেই আসক্তির কেন্দ্র, সেইখানেই ভাবুকের সর্ব্বাপেক্ষা মধুর ও সুন্দর বোধ হয়—সে তেমন আর দেখে নাই, তেমন আর দেখিবে না। তেমনই ভাবের দেবতা প্রকৃত ভাবুকের কাছে, রসিক প্রেমিকের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, মনোহর,

শক্তিশালী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভাবের দিকের এই গুপ্ত তত্ত্বটুকু লইয়া, তাহার সহিত অদ্বৈত সিদ্ধান্ত জড়াইয়া আমাদের স্তবস্তোত্রসকল রচিত হইয়াছে। তাই যখন যে দেবতার কথা পুরাণে বা তন্ত্রে লেখা থাকে, তখন তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সুন্দর ও মনোহর বলিয়া পরিচিত করা হয়। কালীর স্তব করিতে যাইয়া মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিতেছেন,—

"ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ীতনুঃ॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ॥

এই নমুনা হইতে বুঝা যায়—আমাদের তান্ত্রিকী উপাসনা তত্ত্বতঃ কেমন। চণ্ডী, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকাপুরাণ, শিবপুরাণ ও শক্তিধর্ম্ম-প্রচারক যে পুরাণ, যে তন্ত্র পাঠ কর না কেন,' সর্ব্বত্র এই ভাবের কথাই পাইবে। আত্মতত্ত্ব ও পরমাত্মচিন্তা সকল উপাসনার, সকল মূর্ত্তিপূজার অন্তরালে আছে। দ্বৈতবাদীরা বলেন বটে যে, জীব ও শিব কখনই এক হইবে না, সাধক অনন্তকাল সেবা করিবে; কিন্তু এ কথাটা নিত্য-রসাস্বাদনের লোভেই বলা হইয়াছে। চিনি খাইব, চিনি হইতে পারিব না—ইহা মধুররসলম্পট সাধকদিগের কথা। সে রসের কথা পরে বলিব।
('প্রবাহিণী,' ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)

তন্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য

তন্ত্রের সিদ্ধান্তবাক্যের মধ্যে অনেকগুলি কথা সাধারণ ভাবে আমি পাঠকগণকে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখন যে ভাবে যে সকল তন্ত্র-গ্রন্থ এ দেশে প্রচলিত আছে, তাহা হইতে তত্ত্বকথা খুঁজিয়া বাহির করা বড়ই কঠিন। তন্ত্রের সংহিতাভাগ এবং উপনিষৎভাগ সাধারণ্যে প্রচলিত নাই; শারদাতিলক, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, বৃহৎতন্ত্রসার প্রভৃতি সঙ্কলনগ্রন্থ হইতেই

তত্ত্ব-কথাসকল খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়; তাহা ছাড়া মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, কুলার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থও আংশিক ভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার উপর যাহার কাছে যেমন পুঁথি আছে, সে তদনুসারে স্বীয় বক্তব্য প্রকাশের জন্য সমর্থক বচনপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে। তন্ত্র গুরু-মুখ করিয়াই পড়িতে হয়, গুরুপরম্পরা অনুসারে উহার ব্যাখ্যা নানা ভাবে ও রকমে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। শিবের পঞ্চ মুখ হইতে পাঁচটা আম্নায় নির্গত হইয়াছে, এই পাঁচটা আম্নায় অনুসারে তন্ত্রের পাঁচটা পদ্ধতি এ দেশে প্রচলিত ছিল। তন্ত্রের সিদ্ধান্তবাক্য বা philosophy উর্দ্ধা-ম্নায়ে নিবদ্ধ ছিল। এখন আর পাঁচটা পদ্ধতি স্বতন্ত্র ভাবে ব্যক্ত নাই; আম্নায় অনুসারে পুঁথিসকলের বিভাগ নাই, আম্নায় অনুসারে গুরু-পরম্পরার বিচারও কেহ করে না। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের কাল হইতে আম্নায়ের বিচার একরকম লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইংরেজের শাসনকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় কেবল গুরুপরম্পরা ধরিয়া তান্ত্রিকদিগের শ্রেণীবিভাগ হইত। ইংরেজের শাসনের পর হইতে সে পক্ষেও বিষম গোলযোগ ঘটিয়াছে। তবে তন্ত্রের বিরাট্ বিশাল অসংখ্য পুস্তকরাশি দেখিলে ইহা মনে স্থির ধারণা হয় যে, এক কালে এই তান্ত্রিক ধর্ম্ম বাঙ্গালার জাতীয় ধর্ম্ম ছিল, রাজমান্য এবং রাজার দ্বারা পরিচালিত ধর্ম্ম ছিল। এই সকল তন্ত্রপুস্তকের মধ্যে বাঙ্গালার দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস লুকান আছে, যুগে যুগে জাতির পদ্ধতি, রীতি নীতির কথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই তন্ত্রসাগর মন্থন করিতে পারিলে বাঙ্গালার বহু লুপ্ত রত্নের উদ্ধার হইতে পারে, বাঙ্গালা ইতিহাসের বহু তমসাবৃত কোটরে আলোকমালা ফুটিয়া উঠিতে পারে। কেবল তাহাই নহে; ছিল এক দিন, যখন বাঙ্গালীর সহিত তিব্বত ও চীনের, ব্রহ্ম ও তাতারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। যখন বাঙ্গালার সিদ্ধ সাধকগণ তিব্বতে ও চীনে, শ্যামে ও অন্নামে, জাপানে ও তাতারে যাইয়া তন্ত্রধর্ম্ম প্রচার করিতেন, সকল দেশের পণ্ডিতগণ বাঙ্গালায় আসিয়া সাধনতত্ত্ব শিক্ষা করিতেন। ছিল এক দিন, যখন বাঙ্গালীর সহিত তিব্বত ও চীনবাসীদের বৈবাহিক আদান প্রদান চলিত, যখন শৈব বিবাহের প্রভাবে বাঙ্গালী এশিয়ার পূর্ব্বদিকের সকল প্রধান জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ ছিল। শৈব বিবাহপদ্ধতিটা রাজা রামমোহন রায়ের সময় পর্য্যন্ত এই বাঙ্গালা দেশে

সাধারণ ভাবেই প্রচলিত ছিল। এই শৈব বিবাহের ফলে বাঙ্গালায় যে জাতিবিচারে কতটা গণ্ডগোল ঘটিয়াছিল, তাহা এখন আমরা সহজে আর বুঝিতে পারি না। শৈব বিবাহ ছাড়া, ভরার মেয়ে বিবাহ করা, কামপত্নী রাখা, বাঙ্গালার অবস্থাপন্ন লোক মাত্রেরই নিয়মিত ব্যবহার ছিল। মগ, চীনা ও তিব্বতীয়দিগের সহিত আমাদের যে কতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। পুরাকালের বড় বড় বাঙ্গালী তিব্বতে ও চীনে যাইয়া নিয়মিত বাস করিতেন, তিব্বতের গুরু ড়ুম্-পা প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাঙ্গালায় আসিয়া ঘর-সংসার পাতাইতেন। একে ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গালায় জাতিবিচার কতকটা লোপ পাইয়াছিল, তাহার উপর বরেন্দ্রভূমিতে, উত্তর-বাঙ্গালায় বজ্রযানী বৌদ্ধদের প্রভাবে সমাজে অনেকটা একাকার হইয়াছিল; তাহার উপর বৈষ্ণবদের ভেক, তান্ত্রিকদিগের শৈব বিবাহ এই একাকারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

সমাজের এই সকল কথা তন্ত্রের মধ্যে লুকান আছে। বল্লালসেন-প্রমুখ রাজগণ দক্ষিণ দেশ হইতে আসিয়া বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলেও, তন্ত্রের প্রভাব বল্লালের মত রাজাও এড়াইতে পারেন নাই; তাঁহারও একটি চণ্ডালিনী শক্তিরূপে ছিল, তিনিও তন্ত্রসাধনা করিতে উদাসীন ছিলেন না। এই চণ্ডীপূজার প্রকৃত ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হইলে বাঙ্গালার অনেক কথা প্রকাশ পাইবে। চণ্ডীকে 'হাড়ির ঝি' কেন বলা হয়, কেন চণ্ডীপূজার প্রকরণ বাঙ্গালার ব্যবসায়ী সাধু বেনিয়াদের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল, কেন মুকুন্দরামের চণ্ডীতে ব্রাহ্মণের কথা নাই, বেনিয়া-সওদাগরের কথাই আছে, উলার উলাই-চণ্ডী কে, আড়ার চণ্ডী কে এবং কোথা হইতে আসিল, এ সকল কথা ঠিকমত বুঝিতে পারিলে বাঙ্গালী জাতির একটা দুর্গম ইতিহাসকথা আমরা জানিতে পারিব। তাহার পর শ্রীচৈতন্যের প্রাদুর্ভাবকালে বাঙ্গালায় সামাজিক কেমন একটা ওলটপালট হইয়াছিল, শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কেমন করিয়া বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকগণের মধ্যে একটা আপোসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে আপোসের ফলে সমাজের কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহাও আমরা ভাল করিয়া বুঝি নাই। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ দশা কেমন

ছিল, তাঁহার মধুর রসের সাধনাপদ্ধতি প্রচারের প্রভাবে বাঙ্গালায় জাতিসকলের কেমন করিয়া সমীকরণ হইয়াছিল, তাহারও কোন পরিচয় আমাদের জানা নাই। পরে নাটোর এবং কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মণ-রাজবংশের প্রভাবে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম আবার কেমন করিয়া মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, তখনকার ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও কবিগণ কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর সমাজের উপর ব্রাহ্মণ্যের পালিশ চড়াইয়াছিলেন, সে তত্ত্বটাও আমরা বুঝিতে শিখি নাই। কেন চণ্ডীর গান স্বর্ণকার শিল্পী জাতি বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছিল, কেন রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন চাপা পড়িয়া ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রবল হইয়াছিল, কেন শত চেষ্টা সত্ত্বেও মুকুন্দরামের চণ্ডীই এ দেশে প্রচলিত ছিল এবং আছে, ইহারও গুপ্ত তত্ত্ব আমরা জানি না। তন্ত্র না পড়িলে এ সকল কথা বুঝা যাইবে না। ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বাঙ্গালায় অনেক জাল জুয়াচুরি চলিয়াছিল, ঘটক ঠাকুরেরা অনেক সত্যের গোপন করিয়াছেন, স্মার্ত্ত নাটোর ও নদীয়ার ব্রাহ্মণ-রাজাদের প্রভাবে ও চেষ্টায় আরও অনেক গোলমাল ও গোলযোগ স্মৃতিশাস্ত্রের রূপার তবকে ঢাকা পড়িয়াছে। এই সকল আবরণ খুলিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে তন্ত্রের আলোচনা করিতে হইবে। বাঙ্গালার গত দুই হাজার বৎসরের প্রকৃত ইতিহাস প্রচার প্রয়োজন, তীব্রবুদ্ধি ঐতিহাসিকগণের সাহায্যে উহাদের আলোচনার প্রয়োজন, এবং নির্ভয়ে সত্য কথা ব্যক্ত করিবার বুকের পাটারও প্রয়োজন; এই তিন প্রয়োজন সিদ্ধ না হইলে বাঙ্গালী জাতির অতীত ইতিহাস ঠিকমত প্রকাশিত হইবে না, বাঙ্গালার পুরাতন গৌরবের মহিমা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিব না। ইহা ছাড়া আর একটা কথা আছে। কেন পাঠানগণ বাঙ্গালায় আসিতে পারিয়াছিলেন, বাঙ্গালা দেশ তাঁহারা কি ভাবে জয় করিতে পারিয়াছিলেন, বাঙ্গালা জয় করিয়া পাঠানগণ কোন্ পদ্ধতিক্রমে বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের স্মারক চিহ্নসকল মুছিয়া ফেলিতে উদ্যম করিয়াছিল, পাঠানদের উপদ্রবে বাঙ্গালায় কোন্ জাতি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তান্ত্রিকগণ সে মুসলমানদের সঙ্গে কোন্ পথে আপোস করিতে পারিয়াছিলেন, পরে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে মুসলমানদের সহিত আমাদের কেমন সম্বন্ধ হইয়াছিল,—এ সকল কথাও না জানিতে পারিলে, বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত ইতিহাস আমরা

বুঝিতে পারিব না। তন্ত্রসাগর মন্থন করিতে না পারিলে, এ সব কোন কথাই আমরা বুঝিতে পারিব না। ইতিহাসের হিসাবেও তন্ত্র অমূল্য সামগ্রী—অতুল্য এবং অদ্বিতীয়।

একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইব, আমরা তন্ত্রের মাহাত্ম্য কতটা উপেক্ষা করিয়া থাকি। রাজা রামমোহন রায় যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এ দেশে প্রচার করেন, তাহা তন্ত্রধর্ম্মের একটা শাখা মাত্র। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের গোড়ার কয়টা উল্লাস আদি ব্রাহ্ম সমাজের বুনিয়াদস্বরূপ। উহাতে লিখিত স্তবস্তোত্রসকল এখনও আদি সমাজে নিয়মিত পঠিত হয়, উহার দীক্ষাদান-পদ্ধতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবিতকাল পর্য্যন্ত আদি সমাজে প্রচলিত ছিল। এমন কি, ঠাকুরবাড়ীর যে বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহাও মহানির্ব্বাণ তন্ত্রসম্মত। ইদানীং বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং তান্ত্রিকগণের ব্যবহারদোষে তন্ত্র ধর্ম্মসমাজে নিন্দনীয় হওয়াতে রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রসম্মত আদি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপর উপনিষদের ধর্ম্মের আবরণ দিয়াছিলেন। সাধারণ্যে উপনিষদের দোহাই দিয়াই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচার করা হইত, পরন্তু দীক্ষিত ব্রাহ্মের সাধন বিষয়ে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের পদ্ধতিই অবলম্বিত হইত। সেই আদি ব্রাহ্ম সমাজের উপর কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র খ্রীষ্টানীর মশলা চড়াইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের উপর বিলাতী বিলাস মাখাইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সৃষ্টি হয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের পদ্ধতি হইতে ব্রাহ্ম সমাজ যতটা দূরে গিয়া পড়িয়াছেন, ততটা দেশের লোকের সমবেদনা হারাইয়াছেন,—ততটা উহা বিজাতীয় আকার ধারণ করিয়াছে। যাউক সে কথা; আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচার পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে কোনটাই তন্ত্রতত্ত্বের গণ্ডীর বাহিরে নহে। বাঙ্গালায় যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এ দেশে বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বর্ণনা পড়িলে মনে হয়, তাঁহারা খাঁটি বৈদিক ছিলেন না, তাঁহাদের মধ্যেও তন্ত্রপ্রভাব প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পরে তাঁহাদের বংশধরগণ বাঙ্গালায় কুলীন হইয়া তন্ত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। সিদ্ধাচার্য্যদিগের বৌদ্ধ তন্ত্র এখনও এই বাঙ্গালায় লোপ পায় নাই, সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের

আবরণে সে ধর্ম্ম এখনও সজীব আছে। বাঙ্গালার মেয়েলী ব্রত উৎসবের মধ্যে খুঁজিলে এখনও বৌদ্ধ গন্ধ পাওয়া যায়; তন্ত্রের মধ্যে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত যেন ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করিতেছে। যে-কোন তন্ত্র খুলিয়া দেখ না, সাধনা ও আরাধনার কাণ্ডে জাতিবিচার নাই, কেবল অধিকারিবিচার আছে। বলিতে পার, ইহাই তন্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত, বৌদ্ধগণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র। অন্ততঃ বজ্রযানী ও কালচক্রযানী বৌদ্ধগণের ইহাই মত। এই মহাযানী বৌদ্ধগণ আধুনিক তন্ত্রের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। আধুনিক এমন একখানা তন্ত্রের পুঁথি পাইলাম না, যাহাতে বৌদ্ধ মনীষার প্রভাব দেখিতে পাইলাম না। তবে তন্ত্রের যে-কোন পুঁথি পাঠ কর না কেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, অতি পুরাতন একটা শক্তিধর্ম্মের বুনিয়াদের উপর বৌদ্ধ মনীষা একটা নূতন ধর্ম্মের প্রাসাদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, পরে নব্য হিন্দুর ব্রাহ্মণপ্রতিভা বৌদ্ধের সেই মনীষা-প্রাসাদের উপর ব্রাহ্মণ্যের লেখা গাঢ় করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন। একটু বুঝিয়া হিসাব করিয়া তন্ত্রের পুঁথি পাঠ করিলেই বুঝা যায়, উহার স্তরে স্তরে বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস লুকান রহিয়াছে; কারণ, তন্ত্রধর্ম্ম জাতির হিসাবে বাঙ্গালারই ধর্ম্ম, বাঙ্গালীরই ধর্ম্ম; বাঙ্গালীর প্রতিভা যেন দ্বাদশ সূর্য্যের মতন তন্ত্রের পত্রে পত্রে জ্বলিতেছে; যে দেখিতে জানে, সেই দেখিতে পায়—তাহারই জীবন ধন্য হয়।

একটা মজার কথা বলিব। বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলে, বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটা ধারা বহিতেছে; একটা চণ্ডীমঙ্গল, অন্যটা ধর্ম্মমঙ্গল; রামায়ণ মহাভারত পৌরাণিক কথা, বাঙ্গালা ভাষায় কতকটা আধুনিক ব্যাপার। রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল হইতে ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যত ধর্ম্মমঙ্গল প্রচারিত হইয়াছে, সে. সকলেরই নায়ক ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নহে, বেনিয়া সওদাগর বা অন্য কোন মল্ল জাতি। চণ্ডী-মঙ্গলেরও সেই কালকেতু, ধনপতি সওদাগর, সেই ব্যাধ ও ইতর শ্রেণীর কথা। শিবায়ন ও মনসার গানেও ঐ ব্যাপার। তবে উপর্য্যুপরি ব্রাহ্মণ কবিগণ এই সকল বিষয়ে কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া ধীরে ধীরে উহাদের উপর ব্রাহ্মণের ভাব প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের

অন্নদামঙ্গল, চণ্ডীর গানের শেষ ব্রাহ্মণ সংস্করণ। কবিকঙ্কণের চণ্ডী ব্রাহ্মণ কবির লিখিত হইলেও উহাতে ব্রাহ্মণেতর জাতির মহিমা অধিক লিখিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার তেমন পরিচয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য গোড়ায় ঠিক ব্রাহ্মণের সাহিত্য ছিল না; বাঙ্গালা সাহিত্য গোড়ায় ব্রাহ্মণেতর জাতিরই সাহিত্য ছিল, দেশের ইতর জাতির সাহিত্য ও ধর্ম্মের ভাষা ছিল। গোড়ায় ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য লইয়া মগ্ন ছিলেন, দেশের জনসাধারণের ভাষা এবং ধর্ম্মের প্রতি তেমন দৃষ্টি রাখিতেন না। তখন দেশের ব্রাহ্মণেতর জাতি তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। মহাযানী সম্প্রদায়ের বজ্রযানী ও কালচক্রযানীদের নানা শাখা উপশাখার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার জনসাধারণে পরিতৃপ্ত থাকিত। এই সময়ে বাঙ্গালার তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের সহিত তিব্বতের ও চীনের বৌদ্ধগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কান্যকুব্জ, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজার আহ্বানে আসিয়াছিলেন, রাজার আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালার আদিম সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন না, বাঙ্গালীর ভাবনা ভাবিতেন না; তাঁহারা নিজের ঘরে বসিয়া যাগ যজ্ঞ হোম করিতেন এবং বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। বাঙ্গালায় পাঠান আক্রমণের পর বাঙ্গালার কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহিত খাস বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ ধীরে ধীরে তান্ত্রিক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া, তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ সাধক হইয়া সমাজের উপর নেতৃত্ব আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদেরই চেষ্টায় বৌদ্ধ তন্ত্র ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্য ভাবে বিমণ্ডিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, ত্রিপুরানন্দ প্রভৃতি তন্ত্রের নানাবিধ সঙ্কলনগ্রন্থ রচনা করিয়া তন্ত্রে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাব ফুটাইয়া তুলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ কবিগণ দেশপ্রচলিত কিম্বদন্তী ও ধর্ম্মের কথা অবলম্বন করিয়া, পুরাতন ধারার সহিত একটা নূতন কাব্যের ধারা প্রবাহিত করিয়া দিলেন। বাঙ্গালী ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের এবং ভাবের শাসনাধীন হইয়া পড়িল। বাঙ্গালীকে ব্রাহ্মণশাসনাধীন করিতে পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণগণকে তান্ত্রিক এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত অনেকটা আপোস করিতে হইয়াছিল। সে আপোসের চিহ্ন বাঙ্গালার সকল ব্যবস্থাগ্রন্থে, সকল কাব্যগাথায় এখনও

পরিস্ফুট আছে। তবে আধুনিক তন্ত্রগ্রন্থে যে এই আপোসের নিদর্শন অতি সুস্পষ্ট, তাহা তন্ত্রের পাঠক মাত্রেই জানেন। বাঙ্গালার নানা জাতির ইতিহাস খুঁজিতে হইলে তন্ত্র হইতে যত সত্য—প্রকৃত কথা বাহির হইবে, এত আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এইখানে আর একটা কথা বলিব। যখন তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম্ম বাঙ্গালায় প্রবল ছিল, তখনও কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির প্রাধান্য ছিল। সে সকল ব্রাহ্মণ বৈদিক আচারভ্রষ্ট ছিলেন, তন্ত্রসাধনায় তাঁহারা জাতিবিচার করিতেন না; তাঁহারা চীন তিব্বতে যাইয়া শবরাচার অবলম্বন করিতেন, সে দেশের ভোজ্য পেয় গ্রহণ করিতেন। এই সকল ব্রাহ্মণ শক্তি রাখিবার ছলে বহু অন্ত্যজজাতীয়া নারীকে শৈব পদ্ধতিমতে বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার চালাইতেন। চণ্ডীদাস রামী রজকিনীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়া, সে কথা গোপন করিতেন না, তজ্জন্য লজ্জা বোধ করিতেন না। বাশুলী পৌরাণিক বা ব্রাহ্মণগ্রাহ্য কোন দেবতা নহে; উহা বৌদ্ধ তন্ত্রের দেবতা; সহজিয়া ধর্ম্ম খাস বৌদ্ধ ধর্ম্ম, সিদ্ধাচার্য্যগণের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম। ব্রহ্মানন্দ গিরি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার হাড়ীজাতীয়া এক রমণী শক্তি ছিল; তিনি এই হাড়ীর ঝিকে চণ্ডী বলিয়া প্রকাশ করিতেন এবং তাহার সহিত স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ প্রকাশ্য ভাবে রাখিতেন। হাড়ী, ডোম, চণ্ডাল, রজক, নাপিত প্রভৃতিজাতীয়া নারী না হইলে যেন সেকালের ব্রাহ্মণ তান্ত্রিকদিগের তন্ত্রসাধনাই হইত না। তন্ত্রে একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, বশিষ্ঠ ঋষি কামরূপে (কেহ বলেন, রামপুরহাটের কাছে তারাপুরে) তারা আরাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া প্রকাশ করেন যে, যত জীব, তত শিব, যত নারী, তত শক্তি; অতএব সাধনচক্রে জাতি-বিচার নাই, কেবল অধিকারীর বিচার করিবে। বশিষ্ঠের এই ব্যবস্থা অনুসারে বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তরবাঙ্গালায় তিব্বত ও চীনের, ব্রহ্মের ও মগদেশের বহু নরনারী শৈব বিবাহপদ্ধতিক্রমে বাঙ্গালার নানা জাতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। এই শৈব বিবাহের প্রভাব রঘুনন্দনের স্মৃতির প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থপ্রমুখ উচ্চ জাতিদের মধ্যে অনেকটা সঙ্কোচ লাভ করিয়াছিল; পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে উহা শিষ্টসমাজ হইতে অনেকটা লোপই পাইয়াছিল। যাঁহারা তন্ত্রসাধনা করিতেন, তাঁহারা গোপনে শক্তি রাখিয়া কাজ

করিতেন। রাজা রামমোহন রায় কিন্তু সেটুকুও গোপন রাখিতে পারেন নাই।

অন্য দিকে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারের ফলে বাঙ্গালার হীনযান শ্রেণীর বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৈষ্ণব আকার ধারণ করিয়া আত্মগোপন করিয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার Modern Buddhism বা আধুনিক বৌদ্ধ ধর্ম্ম শীর্ষক গ্রন্থে এ তত্ত্বটা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কেবল হীনযানী বৌদ্ধ কেন, মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের এক শাখা মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয়ে আত্মগোপন করিতে পারিয়াছিল। এই যে কর্ত্তাভজা, কিশোরীভজা প্রভৃতি সাধনার প্রণালী এ দেশে প্রচলিত রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক পদ্ধতি এখনও অনেকটা ফুটিয়া আছে। ভারতবর্ষের নানা দেশের বহু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও বৌদ্ধ তান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলিত আছে; অনেক সম্প্রদায়ে অবলোকিতেশ্বরের পূজা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। সে অবলোকিতেশ্বর এখন শিবলিঙ্গে পরিণত হইয়াছে, পূর্ব্বে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তিই পূজিত হইত। শাস্ত্র বলেন,—দ্বিজাতি ব্যতীত, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য কোন জাতির সন্ন্যাসে অধিকার নাই। কিন্তু গরীবদাসী, কাণফোড়, নাগা, নাথপন্থী, রামানন্দী প্রভৃতি এমন বহু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় জাতিবিচার না করিয়া যাহাকে তাহাকে স্ব-স্বদলভুক্ত করিয়া লয়। নাগারা ত পূর্ব্বে ছেলে চুরি করিয়া আনিয়া, সেই সব শিশুকে প্রতিপালন করিয়া নিজেদের দল পুষ্ট করিত,—এখনও করিয়া থাকে। এই হেতু যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টকে শিশু রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ত কথাই নাই; কথাতেই আছে—জাতি হারাইলেই বৈষ্ণব। বাঙ্গালার ছত্রিশ জাতি সম্পিণ্ডিত হইয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণবে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিমের কবীরপন্থী, নানকপন্থী, দাদুপন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায়ও নানা জাতির সমবায়ে সৃষ্ট—নানা জাতির সম্মেলনে উদ্ভূত। বরং বাঙ্গালায় কুলাচার্য্যগণ থাকাতে, কুলজী গ্রন্থসকল থাকাতে অনেক জাতির একটা হিসাব, একটা ইতিহাস পাওয়া যায়; বিহার হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত এই বিরাট্ দেশে জাতি-বিশেষের পরিচয় পাওয়া দুর্ঘট; এমন কি, ব্রাহ্মণের শাখাবিশেষের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না—বিশেষ কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না।

এই সকল কথা এতটা ঘুরাইয়া, বার বার বলিবার একটু হেতু আছে। বাঙ্গালী যেন নিজেকে চিনিবার জন্য, জাতির অতীত ইতিহাস ঠিকমত জানিবার জন্য একটু উদ্যত হইয়াছে। এই জন্য কেহ বা কুলজী গ্রন্থ সকল ঘাঁটিতেছেন, কেহ বা তাম্রশাসন খুঁজিতেছেন, কেহ বা শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিতেছেন। এ সব ভাল কথা বটে, উত্তম উদ্যম বটে; পরন্তু বাঙ্গালীকে ঠিকমত চিনিতে হইলে তন্ত্র না পড়িলে ঠিক পরিচয় জানা যাইবে না। তন্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার অতি পুরাতন কাল হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত যে বাঙ্গালায় খাঁটি সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার বিশ্লেষণ করিতে হইবে। কারণ, বৈষ্ণব এবং তান্ত্রিক ভাষা-সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালার পুরাতন ইতিহাস অনেকটা লুকান আছে। সে লুকান কথা বুঝিতে হইলে তন্ত্র পড়িতেই হইবে। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে তখনকার বাঙ্গালার অনেকগুলি ছবি আছে, পাষণ্ডীদের অনেক মজার গ্লানির কথা আছে। সে সব বাছিয়া বাহির করিতে পারিলে বাঙ্গালীর অনেক বিস্মৃত সামাজিক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এ সব বুঝিতে হইলে, ঠিক জিনিস ঠিক স্থান হইতে বাহির করিতে হইলে তান্ত্রিক আচার পদ্ধতি, রীতি নীতি জানা প্রয়োজন। এই হিসাবেও তন্ত্র বাঙ্গালীর পক্ষে অমূল্য গ্রন্থমালা। জাতির cohesiveness বা সংহতিশক্তি বৃদ্ধির পক্ষে তন্ত্রের শক্তিধর্ম্ম যে প্রবল ও প্রকৃষ্ট উপায়; চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ছত্রিশ জাতিকে এক সূত্রে সমভাবে বন্ধন করিতে তন্ত্র যতটা সহায়তা করিয়াছিল, এত আর কোন ধর্ম্মই করে নাই। তন্ত্রের পর শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনেকটা কাজ করিয়াছিল। এখন সমাজে কোন ধর্ম্মের প্রাবল্য নাই, আছে বিলাস ও একাকার বা নৈরাকারের প্রবৃত্তি। ইহার সাহায্যে Nation building বা বিরাট্ জাতির সৃষ্টি হয় না। আবার তন্ত্রকে জাগাইয়া তুলিতে না পারিলে জাতির হিসাবে আমরা উন্নত হইতে পারিব না। ইহাই আমার বিশ্বাস।

('প্রবাহিণী,' ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)

তন্ত্রের দেহতত্ত্ব

যাহা আছে দেহভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।" ইহাই সকল তন্ত্রের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া সকলে তন্ত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্ত্রের এই ব্যাখ্যা পুরাণাদি নানা শাস্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন। তাই পুরাণ ও তন্ত্র, সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তকথা দেহতত্ত্ব অনুসারে ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। এই দেহতত্ত্ব আনুসারিক ব্যাখ্যাকে অনেকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নাম দিয়া থাকেন। যাহা খাঁটি ইতিহাস নহে, সত্য ঘটনার পুনরুল্লেখ নহে, যাহা উপাখ্যান এবং আখ্যায়িকা, যাহা সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যার রোচকস্বরূপ, সে সকলেরই দেহতত্ত্ব অনুসারে প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা সম্ভবপর। এই হেতু মার্কণ্ডেয় চণ্ডী এবং শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দেহতত্ত্ব অনুসারে ব্যাখ্যা সুধী-সমাজে প্রচলিত আছে।

তন্ত্রের প্রায় সকল সাধনা ও আরাধনার দুইটা দিক্ আছে; একটা বাহিরের বা বিশ্বতত্ত্বের দিক্, অপরটা ভিতরের বা দেহতত্ত্বের দিক্। সকল সিদ্ধিরই বিকাশের দুইটা দিক্ আছে, একটা জগতের বা বাহ্য প্রকৃতির দিক্, অপরটা ভিতরের বা দেহগত প্রকৃতির দিক্। তুমি আত্মশক্তি বিকাশের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পার, অথবা বাহ্য শক্তি আয়ত্ত করিয়া আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পার। সিদ্ধির ব্যাঘাত বাহিরের শক্তির দ্বারা হইতে পারে, ভিতরের কাম ক্রোধ লোভাদি দ্বারাও হইতে পারে। শক্তির অভিব্যঞ্জনা বাহিরেও যেমন হয়, ভিতরেও সেই পদ্ধতি অনুসারে হইয়া থাকে। সেই হেতু তান্ত্রিক সাধক মাত্রেই সাধনার দুইটা পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন; এক—মানস পূজা, অন্তর্যাগ প্রভৃতি মানস পূজা-পদ্ধতি; দ্বিতীয়—বাহিরের পূজা পাঠ, যোগ যাগ, সাধনা আরাধনা প্রভৃতি। তন্ত্র বলিতেছেন যে, যখন ব্রহ্মাণ্ড ও দেহভাণ্ড একই পদ্ধতি অনুসারে, একই রকমের উপাদান সাহায্যে নির্ম্মিত, উভয়ের মধ্যে একই ভাবে নানা শক্তির খেলা হইতেছে, তখন দেহগত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি তোমার অনুকূল, সহায়ক হইবে। তুমি ব্যোমযান বা এরোপ্লেন চড়িয়া তাহার সাহায্যে উড়িতে পার; আবার দেহের সাহায্যে খেচরী সিদ্ধি লাভ করিলে তুমি বিনা ব্যোমযান বা

এরোপ্লেনে বিমানপথে উড়িয়া যাইতে পার। যে শক্তির সহায়তা লাভ করিবার জন্য তোমাকে ব্যোমযান বা এরোপ্লেন গড়িতে হয়, খেচরী সিদ্ধি হইলে সেই শক্তি তোমার দেহের আকর্ষণে তোমার দেহে ব্যাপ্ত হইয়া তোমাকে উড়াইয়া লইয়া যাইবে। ইউরোপের যান্ত্রিকগণ যন্ত্রের সাহায্যে বাহিরের শক্তিকে বশে আনিবার চেষ্টা করেন, দেহগত আত্মশক্তির উন্মেষ সাধনে বিশেষ তৎপর হন না; ভারতবর্ষের তান্ত্রিক সিদ্ধ পুরুষগণ আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটাইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সকল শক্তিকে বশে আনয়ন করেন। এ দেশের সিদ্ধগণ বলেন যে, মনুষ্যদেহের মতন পূর্ণাবয়ব যন্ত্র আর নাই; এমন যন্ত্র আর কেহ গড়িতে পারে না, এমন যন্ত্র নির্ম্মাণ করাও মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতএব এই যন্ত্রস্থ সকল গুপ্ত এবং সুপ্ত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে, অন্য কোন স্বতন্ত্র যন্ত্র ব্যতিরেকে তোমার সকল বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। বিনা তারের টেলিগ্রাম চলিতেছে বটে, কিন্তু এখনও দুইটা যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। তোমাদের দেহ যদি ঠিকমত প্রস্তুত থাকিত, তাহা হইলে বিনা তারে এবং বিনা স্বতন্ত্র যন্ত্রের সাহায্যে তোমরা বহু দূরে থাকিলেও নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিতে। প্রকৃতির গুপ্ত শক্তিসকলের সহিত দেহের গুপ্ত বা সম্মূঢ় শক্তির কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কি ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বা কি ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারা যায়, ইহা যে সাধনার ফলে জানা যায় বা আয়ত্তগত করিতে পারা যায়, তাহাই তন্ত্রসাধনা। এই তন্ত্রসাধনার মূল হইল দেহতত্ত্ব। তাই দেহের কথা লইয়া তন্ত্র আগাগোড়া ব্যস্ত।

ব্রহ্মাণ্ডের সহিত দেহভাণ্ডের সাম্য ভাব দেখাইবার জন্য তন্ত্র বলিতেছেন :—

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।
পাতালং ভূধরা লোকা আদিত্যাদি নব গ্রহাঃ॥
নাগাশ্চ সর্ব্বদেহিনাং পিণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ।
পাদাধস্তুতলং বিদ্যাত্তদূর্দ্ধং বিতলং তথা॥
জান্বনোঃ সুতলঞ্চৈব তলঞ্চ সন্ধিরন্ধ্রকে।
তলাতলং গুল্ফ মধ্যে লিঙ্গমূলে রসাতলং॥
পাতালং কটিসন্ধৌ চ পাদাদৌ লক্ষয়েদ্বুধঃ।
ভূর্লোকো নাভিদেশে তু ভুবর্লোকস্তথা হৃদি॥

স্বর্লোকঃ কণ্ঠদেশে তু মহর্লোকশ্চ চক্ষুষি।
জনলোকস্তদূর্দ্ধঞ্চ তপোলোকো ললাটকে ॥
সত্যলোকো মহাযোনৌ ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
ত্রিকোণে চ স্থিতো মেরু রুদ্রলোকে চ মন্দরঃ ॥
কৈলাসো দক্ষিণে কোণে বামকোণে হিমালয়ঃ।
বিন্ধ্যো বিষ্ণুস্তদূর্দ্ধে চ সপ্তেতে কুলপর্ব্বতাঃ ॥"

এই ভাবে পুরাণের ব্রহ্মাণ্ড বর্ণনায় যেখানে যাহা ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাই যে মনুষ্যদেহে বিদ্যমান, তন্ত্র তাই দেখাইতেছেন। মনুষ্যদেহভাণ্ড যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার, ইহাই তন্ত্র বলিতে চাহেন। কেবল তাহাই নহে। তন্ত্র ইহাও ইঙ্গিত করিতেছেন যে, পুরাণে হর-গৌরীর, কৃষ্ণ-রাধিকার যে সব লীলা উপাখ্যানের আকারে বর্ণিত আছে, তাহা দেহগত স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্বের নানা লীলার বাহ্যিক অভিব্যঞ্জনা মাত্র। এই দেহেতেই কৈলাস, এই দেহেতেই হিমালয়,—এই দেহেতেই শ্রীবৃন্দাবন, এই দেহেতেই গোবর্দ্ধন;—এই দেহাভ্যন্তরেই হরগৌরী বা কৃষ্ণরাধিকা নানা লীলানাট্য প্রকাশ করিতেছেন। তাহাই গুপ্ত বৃন্দাবন ধামের নিত্যলীলা, তাহাই একাম্রকাননে উমার খেলা। দেহতত্ত্বের এই গুপ্ত রহস্যটুকু বুঝাইবার জন্যই তন্ত্র কথাটা এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। পুরাণের বহু কাহিনী যে দেহতত্ত্বের কথা, তন্ত্রের এই কুঞ্চিকা ব্যতীত অন্য কাহারও সাহায্যে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। বাঙ্গালার সহজিয়াগণ এবং তাঁহাদের সিদ্ধাচার্য্যগণ এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেহতত্ত্বের গুপ্ত রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বৈতবাদীই কি, আর অদ্বৈতবাদীই কি, যাঁহারা সাধনপরায়ণ, শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে তৎপর, তাঁহারাই দেহতত্ত্বের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কারণ, সাধক মাত্রেই আত্মার উপাসক; দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকে নানা রসের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডাবচ্ছিন্ন আত্মার সহিত তাঁহারা মিশাইতে চাহেন। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার সম্মেলনচেষ্টাই সাধনা। এই সম্মেলন রসের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে এবং দেহগত শক্তি-বিশেষের উন্মেষ সাধনেও ঘটিয়া থাকে। ভক্তি ও ভাবের সহায়তায় রসের উন্মেষ হয়, ষট্‌চক্রভেদ, শব সাধনা প্রভৃতির দ্বারা শক্তির উন্মেষ হয়। যাঁহারা রসিক এবং ভাবুক, তাঁহারা শক্তির সহায়তা গ্রহণ করেন; যাঁহারা খাঁটি শাক্ত, তাঁহারাও প্রয়োজন হইলে রসের ও ভাবের সহায়তা

গ্রহণ করেন। লীলা ও নাট্যের সাহায্যে রসের বিকাশ হয়; কেবল সাধনা করিলে শক্তির বিকাশ ঘটে। উভয়েই উভয়ের সহায়ক। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাটা আগাগোড়া দেহতত্ত্বের সহিত মিলাইয়া ব্যাখ্যা করা যায়। কুমারসম্ভব এবং হর-গৌরীর লীলাটাও দেহতত্ত্বের সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া ব্যাখ্যা করা যায়। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী আগাগোড়া দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা মাত্র; এই দেহের মধ্যেই দেবাসুরের সংগ্রাম; মহিষাসুর, মধুকৈটভ, শুম্ভ নিশুম্ভ দেহেই আছে; এই দেহের মধ্যেই চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি নানা রূপ ধরিয়া অসুর নাশ করিয়া থাকেন। যাহারা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইতে জানে, তাহারাই সপ্তশতীর সকল ঘটনা ও প্রত্যেক আখ্যায়িকা দেহের ভিতরের শক্তির লীলার সহিত মিলাইয়া দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে পারে। এই দেহতত্ত্বের মাপকাঠি লইয়া পরে গীতারও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

আসল কথা, আমরা আমাদের পুরাণ তন্ত্রের ভাষা বুঝিবার শক্তি হারাইয়াছি; কোন্ শব্দের কোথায় কেমন দ্যোতনা, কেমন ভাবে কোন্ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, সে খবর আমাদের নাই। পুরাণ তন্ত্রে প্রযুক্ত নানা শব্দের পারিভাষিক অর্থ আমাদের জানা নাই। তাই পুরাণ তন্ত্রের অনেক কথা এখন আমাদের গাঁজাখোরি বলিয়া মনে হয়। উহার যে কোনটাই গাঁজাখোরি নহে—উদ্ভট, অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে, তাহা দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ জানিতেন এবং বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। যাঁহারা নানা দর্শনের স্রষ্টা ও ব্যাখ্যাতা, তাঁহারা যে সমাজশিক্ষার জন্য উদ্ভট ও উৎকট কথার প্রচার করিবেন, ইহা মনে করিলেও পাপ আছে। শ্রীচৈতন্যের তুল্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও দার্শনিক কেন যে বৃন্দাবনলীলায় আস্থা স্থাপন করিতেন, কেন যে সে লীলার কথা মনে করিলে ভাবাবেশে অধীর হইতেন, তাহা ত ভাবিয়া দেখিতে হয়। বাহিরের উদ্ভটতা ও উৎকটতা ছাড়া উহার ভিতরে যে এমন একটা কিছু আছে, যাহার জন্য অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, শ্রীমন্নিত্যানন্দ, জীব গোস্বামী প্রভৃতি মহামহা-পণ্ডিতগণ ভাবে বিহ্বল হইতেন, এইটুকু মনে না করিলে এই সকল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণের প্রতি অবিচার করা হয়। ইদানীং এই ইংরেজের আমলেও যাঁহারা একবার দেহতত্ত্বে ডুবিয়াছেন, তাঁহারা অমনি পুরাণ তন্ত্রের সকল উদ্ভট গল্পে ও কাহিনীতে আস্থা স্থাপন করিয়া ভাবাবেশে ধূলায়

গড়াগড়ি দিয়াছেন। একটা উদাহরণ কথা শুনাইব। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঘোর ব্রাহ্ম ছিলেন; কিন্তু যাই সাধনার পথে অগ্রসর হইলেন, যাই দেহতত্ত্বের গুপ্ত কথা তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটিতে লাগিল, অমনি তিনি লীলা শ্রবণ করিলে ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন। তখন আর তাঁহার বুদ্ধিতে পুরাণের লীলা আখ্যানের মধ্যে উদ্ভট উৎকট গাঁজাখোরি বলিয়া কিছু মনে হইত না—গোবর্দ্ধন ধারণ, কালীয়দমন, পুতনাবধ, রাসলীলা প্রভৃতি কোনটাই উদ্ভট বা গাঁজাখোরি বলিয়া মনে হইত না। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পালের, শ্রীযুত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার, এবং সদ্‌গুরুর আশীর্ব্বাদে ধন্য আরও অনেকের এখন আর পুরাণকথা, শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যান অংশ বা চণ্ডীর লীলা উদ্ভট উৎকট বা গাঁজাখোরি বলিয়া মনে হয় না। যে এক বার ভিতরের কথা বুঝিবে, দেহতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের প্রহেলিকার মর্ম্ম জানিতে পারিবে, যে এক বার সদ্‌গুরুর কৃপায় সাধনার এবং আরাধনার অপূর্ব্ব রসাস্বাদনে ধন্য হইবে, সে-ই আর পুরাণ তন্ত্রকে, আখ্যায়িকা উপাখ্যান সকলকে, লীলা ইতিহাসকে গাঁজাখোরি ব্যাপার বলিতে সাহস পাইবে না। সে-ই পুরাণ তন্ত্রের ভাবে মজিবে, রসে ডুবিবে। দেহতত্ত্ব পুরাণ তন্ত্রের কুঞ্চিকাস্বরূপ। যিনি দেহতত্ত্ব জানেন না, তিনি পুরাণ তন্ত্র, ভাগবতী লীলা নাট্য, কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, আমাদের শাস্ত্রের রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিবেন। কেবল ভাষার সাহায্যে ঠিকমত দেহতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব বুঝান যায় না; সঙ্গে সঙ্গে সাধনশীল না হইলে উহার মর্ম্ম বুঝা কঠিন। যেমন যে ব্যক্তি সাঁতার জানে না, তাহাকে ঢেউয়ের উপর ভাসিবার সুখটা কেমন, তাহা যেমন বুঝান যায় না, তেমনি দেহতত্ত্বের দার্শনিক হিসাবে বিশ্লেষণ করিয়া যতই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা কর না কেন, যে কর্ম্মী নহে, সাধক নহে, সে কিছুতেই ঠিকমত বুঝিতে পারিবে না। এ সকল বিষয়ের একটা স্বতন্ত্র অনুভূতি থাকা প্রয়োজন, একটা সংস্কার থাকা প্রয়োজন। যাহার সঙ্গীতের কান নাই, সুরবোধ নাই, সে যেমন কড়ি কোমলের মজা বুঝে না, তেমনি যাহার সাধনার সংস্কার নাই, সে চিরজীবনটা দেহতত্ত্বের ও রসতত্ত্বের কথা শুনিতে থাকিলেও উহার মজাটা সে কিছুতেই পাইবে না। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—সাধনার কথা, রসতত্ত্বের কথা যাহার তাহার কাছে বলিবে না; বাজে লোকে এ সকল কথা শুনিলে নাস্তিক

হইয়া উঠিতে পারে, উহার প্রকৃত রসটুকু বুঝিতে না পারিয়া স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে। এই হেতু তন্ত্র বলিতেছেন,—

"চরাচরমিদং দেবি সর্ব্বং কর্ম্মাত্মকং প্রিয়ে।
মাতা কার্য্যং পিতা কর্ম্ম কর্ম্মৈব পরমো গুরুঃ॥
কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম্ম পুনর্দ্দেহে প্রলভ্যতে॥
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুবিন্দতি॥"

অর্থাৎ হে দেবি, এই চরাচর সকলই কর্ম্মাত্মক; মাতাই কার্য্য, পিতাই কর্ম্ম; কর্ম্মই পরম গুরু অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা জীব, মাতৃপিতৃলাভ করিয়া থাকে, কর্ম্মই সাধকের গুরুস্বরূপ। এই কর্ম্ম দ্বারাই জীব জন্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটিয়া থাকে। একটা কর্ম্মপরম্পরা শেষ হইলে একটা দেহের নাশ হয়, আবার অভুক্ত কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য নূতন দেহ ধারণ করে। যেমন মাঠে সহস্র গো এবং বৎস বিচরণ করিতেছে; কে কাহার বৎস, তাহা তুমি আমি চিনিতে পারি না, পরন্তু বৎস নিজের জননীকে চিনিয়া ঠিক বাহির করে, তেমনি শুভাশুভ কৃত কর্ম্ম কর্ত্তাকে বাছিয়া বাহির করে এবং তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নূতন দেহের সৃষ্টি করে। এই কর্ম্মাত্মক দেহাভ্যন্তরে কুণ্ডলিনী বিরাজ করেন এবং কর্ম্মানুসারে জীবকে পাপ পুণ্যের ভাগী করিয়া থাকেন। রেশমের গুটি যেমন গুটিপোকা নিজেই গড়িয়া তোলে, তেমনি আমাদের দেহ আমরা নিজের কর্ম্মানুসারে গড়িয়া তুলি। এই দেহ কেমন?

"আদৌ সংজায়তে বীজং ব্রহ্মাণ্ডৈঃ সহ সাঙ্কুরং।
তস্য মধ্যে সুমেরুশ্চ কঙ্কালদণ্ডরূপকঃ॥
চরাচরাণাং সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং বিশেষতঃ।
আলয়ঃ সর্ব্বভূতানাং মেরোরভ্যন্তরেঽপি চ॥
প্রদীপকলিকাকারো জীবো হৃদি সদা স্থিতঃ।
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ॥

অর্থাৎ প্রথমে ভ্রূণের দেহেতে ব্রহ্মাণ্ডের বীজস্বরূপ অঙ্কুরাকারে বীজের উৎপত্তি হয়, সেই দেহের মধ্যে সুমেরুর ন্যায় কঙ্কালের দণ্ড বা পিঠের দাঁড়া তৈয়ার হয়। ইহারই মধ্যে সর্ব্বচরাচর, দেব দেবী, এবং সর্ব্বভূতের

আলয় ন্যস্ত থাকে। এইখানেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী সকল শক্তির লীলা বিকাশ হইয়া থাকে। এই মেরুদণ্ডের মধ্যেই ষট্‌চক্রের বিন্যাস আছে, সপ্ত লোকের অবস্থিতি আছে। এইখানেই সূর্য্য চন্দ্রের বিকাশ, স্বর্গ নরকের খেলা, দেবাসুরের লীলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার এই দেহভাণ্ডে জীবাত্মা প্রদীপকলিকার ন্যায় হৃৎস্থানে বাস করেন। রজ্জুবদ্ধ শ্যেনপাখী যেমন রজ্জুর আকর্ষণে আবার পূর্ব্বস্থানে আসে, তেমনি জীবাত্মাও দেহাবচ্ছিন্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ দেহে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

এই দেহস্থ কুণ্ডলিনী শক্তি সাধকের রুচি অনুসারে স্ত্রী বা পুরুষরূপ ধারণ করেন। এবং সেই রূপ অনুসারে তাঁহার লীলার বিকাশ হইয়া থাকে। এই কুণ্ডলিনীর স্ত্রীরূপ লীলায় কালী, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা, কামাখ্যারূপিণী, মাতঙ্গী, শৈলসুতা, তারা, উমা, গিরিজা, বৈষ্ণবী প্রভৃতি অনন্ত রূপ আছে, এবং অনন্ত রূপে এই দেহের মধ্যে অনন্ত লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই কুণ্ডলিনী পুংরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দশাবতার, দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি নানা বিভূতির বিকাশ করিয়াছেন। পুংদেবতার লীলাও দেহাভ্যন্তরে চক্রে চক্রে হইয়া থাকে। সেই সকল লীলার কথা নানা পুরাণে এবং ব্যাখ্যান-পুস্তকে প্রকট হইয়াছে। তন্ত্র এমন কথা বলিতেছেন না যে, এই সব ভাগবতী লীলার ইতিহাসকথা নাই, পরন্তু সে সব ইতিহাসকথা অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছে মাত্র। যেমন শ্রীরাম কর্ত্তৃক রাবণবধ ইতিহাসকথা এবং ঐ রাবণবধের হেতু শ্রীরামচন্দ্রকে জনসাধারণ ভগবানের অবতার বলিয়া মনে করে। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কর্ত্তৃক কংসবধ, ভারতযুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনা তাঁহাদের বিভূতির প্রকাশক, অবতার বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের খ্যাতির খ্যাপক। পরন্তু দেহতত্ত্বের দিক্ দিয়াও উঁহাদের ঐ সকল ঘটনার সার্থকতা আছে। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা নিভাঁজ রসতত্ত্বের ব্যাখ্যান মাত্র, উহার সার্থকতা দেহতত্ত্বের মাপকাঠির সাহায্যে বুঝিতে হয়। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রকৃত মর্ম্ম দেহতত্ত্বের সাহায্যে বুঝিতে হইবে। এই দেহতত্ত্ব বুঝিলে হইলে প্রথমে কর্ম্মবাদ বুঝিতে হইবে ;—কোন্ কর্ম্মের প্রভাবে কেমন দেহ ধারণ করিলে, সে দেহে দেব ও অসুরের লীলা কেমন ভাবে হইতে পারে, তাহা জানিতে হইবে। তাহার পর তন্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে ষট্‌চক্রভেদ ব্যাপারে শক্তির লীলাবিকাশ

জানিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার এই দেহের মধ্যে কোথায় কোন্ স্থূল ও সূক্ষ্ম শক্তির কেমন খেলা হইতেছে, তাহা জানিতে হইবে। তখন বুঝিবে—"মদমত্ত মাতঙ্গিনী কে রমণী নেচে ধায়," "কার বামা নাচে রে, রণে উলঙ্গিনীবেশে" প্রভৃতি মহাজনরচিত সঙ্গীত-সকলের মর্ম্ম কি। শেষে রসতত্ত্বের কথা, ভাবের কথা, ভক্তির কথা আপনা আপনি মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে। তখন বুঝিবে—বাঞ্ছা-কল্পতরুর প্রকৃত অর্থ কি ;—সে তরু কোথায় থাকে, সে তরুতলে কে বসিতে পায়, কাহার কেমন বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, এ সকলের প্রকৃত অর্থ জানা যাইবে। ভাষার নানাবিধ অলঙ্কারের আবরণে যে আমাদের পুরাণ তন্ত্র কত মজার ও রসের কথা লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা এ ব্যাপারে যে না ডুবিয়াছে, সে বুঝিতে পারে না। এই দেহের মধ্যেই সর্ব্বতীর্থ, সকল নদ নদী, সকল পর্ব্বত সাগর বিদ্যমান ; এই দেহের মধ্যে সকল দেবতার সকল লীলা নিত্য হইতেছে। এই দেহ যেমন আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র, আমাদের জন্মভূমি ভারতভূমি তেমনি আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র। দেহক্ষেত্রের সহিত জন্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সমতা রক্ষা করিবার জন্য, দেহের মধ্যে যেমন কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার, পুরীধাম প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্র আছে, তেমনই পুণ্যতীর্থসকলের বিন্যাস যথাসম্ভব ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র করা হইয়াছে। দেহের তীর্থে তীর্থে কুণ্ডলিনীকে লইয়া যাইয়া স্নান দান করাইলে যে অপূর্ব্ব ফলোদয় হয়, বাহিরের কাশী গয়া আদি পুণ্যক্ষেত্রে তীর্থ করিতে যাইয়া দান পূজা করিলে সেই ফলশ্রুতি লিখিত হইয়াছে। দেহের যে স্থানে গদাধরের পাদপদ্ম গয়াক্ষেত্র, সেইখানে পিণ্ড দিলে, কুণ্ডলিনীর সাহায্যে বীজগর্ভদোষের পরিহার করিতে পারিলে, দেহগত পৈতৃক ধারার বিমুক্তি বা পরিশুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রত্যেক সাধকের পক্ষে পিতৃধারার শোধন বা বিমুক্তি অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রত্যেক গৃহস্থ হিন্দুর পক্ষে গয়ায় পিণ্ডদান অবশ্য কর্ত্তব্য। ইঙ্গিতে ইসারায় কত আর বলিব ! সাধক যে ভাবে যাহা বুঝিয়া থাকেন, যে ভাবে বুঝিতে পারিলে শাস্ত্রতত্ত্ব অনেকটা বুঝিতে পারা যায়, তাহা যতটুকু পারা যায়, ইঙ্গিতে বলিয়াছি। আসল কথা, আমাদের শাস্ত্র—আমাদের সাধনতত্ত্ব বুঝিতে হইলে,—

"ডুব দে রে মন কালী ব'লে,
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।

রত্নাকর নয় শূন্য কথনো,
দুই চার ডুবে ফল না পেলে।"

ইহা ছাড়া অন্য পন্থা নাই, অন্য সোজা পথ নাই। ('প্রবাহিণী,' ৬ আষাঢ় ১৩২২)

তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব

১

দেহতত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায় না। কারণ, তন্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, জীবদেহ—বিশেষতঃ মানবদেহ যে পদ্ধতি অনুসারে সৃষ্ট হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সেই একই পদ্ধতি অনুসারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশ্বসৃষ্টি এবং জীবসৃষ্টির মধ্যে পদ্ধতির কোনরূপ বৈষম্য নাই। যে ক্রিয়া জীবসৃষ্টির ব্যাপারে সূক্ষ্মভাবে হইয়া থাকে, সেই ক্রিয়া বিশ্বসৃষ্টিতে বিরাট্ ও বিশাল ভাবে ঘটে। উন্মেষের ক্রম ও পদ্ধতি উভয় পক্ষেই এক; এমন কি, এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু সৃষ্ট হইতেছে, সকলেরই সৃষ্টির ক্রম ও পদ্ধতি একই রকমের। কেবল সৃষ্টির কেন, নাশেরও—সংহার-কার্য্যেরও ক্রম ও পদ্ধতি একই রকমের। তন্ত্রসিদ্ধান্তের এই সর্ব্বব্যাপিত্বটুকু, এই সর্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম ভাবটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, তন্ত্রের মহিমা উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাই গোড়ায় তন্ত্রের দেহতত্ত্বের গোটাকয়েক সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছি। এইবার সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলিব।

তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়ে মনীষী মান্যবর বিচারপতি মিঃ জে, জি, উড্‌রফ মহাশয় গত ৮ই জানুয়ারি তারিখে ডালহৌসি ইনষ্টিটিউটগৃহে একটি সন্দর্ভ পাঠ করেন। স্যর জন উড্‌রফ ইংরেজী ভাষাতে তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বের দার্শনিক অংশটুকু ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তিনি দেহতত্ত্বের সিদ্ধান্তের সহিত সৃষ্টিতত্ত্বের সিদ্ধান্তের তুলনায় সমালোচনা করেন নাই। তথাপি বলিব, দার্শনিক অংশটুকু তিনি যে ভাবে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, ঠিক সেই ভাবে তন্ত্রসিদ্ধান্ত আজ পর্য্যন্ত কেহ ব্যাখ্যা করেন নাই।

শুনিলাম, তাঁহার এই সন্দর্ভ বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করা হইতেছে। আমরা তাহার অপেক্ষায় না থাকিয়া তাঁহার বক্তব্যের মর্ম্মানুবাদ করিয়া পাঠকগণকে উপঢৌকন দিব; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বক্তব্যও বলিয়া রাখিব। তবে আগাগোড়া সকল কথা একটা সন্দর্ভে বলা চলিবে না, ধীরে ধীরে সকল সিদ্ধান্তই ব্যক্ত করিব।

এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে অনবরত ও অবিশ্রান্ত জন্ম মৃত্যু ঘটিতেছে, একটা পরিবর্ত্তনের প্রবাহ চলিতেছে। এই পরিবর্ত্তনের প্রবাহের মধ্যে একটা অপরিবর্ত্তনীয় বিষয়ের অনুভূতি হয়ই। নদীর জল স্রোতোমুখে অনবরত চলিয়া যাইতেছে; যে জল এই সম্মুখে আবর্ত্তবেগে উথলিয়া উঠিয়াছিল, সে জল আর নাই, ভাসিয়া গিয়াছে; তথাপি মনে দৃঢ় ধারণা হইতেছে যে, এক নদীর জলই দেখিতেছি এবং স্পর্শ করিতেছি। গঙ্গা চিরকালই আছেন, চিরকালই গঙ্গাগর্ভ বহিয়া জল চলিয়া যাইতেছে; যে জল কাল গিয়াছে, সে জল আজ যাইতেছে না, তথাপি যুগে যুগে সবাই বলিয়া আসিতেছে যে—গঙ্গার জল পবিত্র, গঙ্গা পতিতপাবনী, সর্ব্বপাপসংহন্ত্রী। আমি আছি,—শৈশবে যেমন আমি ছিলাম, যৌবনে সেই আমি বিরাজ করিয়াছি, প্রৌঢ় কালে সেই আমার আমিত্বের অনুভব হইয়াছে, এখন বার্দ্ধক্যে সেই আমি—সেই সোপাধিক আমির সম্যক্ অনুভূতি হইতেছে। অথচ ক্ষণে ক্ষণে, পলে পলে, বর্ষে বর্ষে আমার দেহের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; আকারে, প্রকারে, বর্ণে, রূপে, বুদ্ধিতে, বিদ্যাতে আমার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে;—তথাপি কিন্তু আমার আমিত্বের বোধটুকু আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে রহিয়াছে এবং থাকিবেও। এই যে নিত্য-পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনের ভাব, এই যে এক পক্ষে অনবরত পরিবর্ত্তন, অন্য দিকে নিত্য সত্যবস্তুর দ্যোতনা, ইহাই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কথা। কূটস্থ চৈতন্যের চারি দিকে মহামায়া প্রকৃতি সতীর লীলা হইতেছে। সেই কূটস্থ চৈতন্য পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ; তিনি অখণ্ড স্বরূপে নিত্য বিদ্যমান; তাঁহাতে পরিবর্ত্তন নাই, ক্রিয়া নাই, বিকার নাই, বিভব নাই। তিনি অনাদি কাল হইতে আছেন এবং অনাদি কাল পর্য্যন্ত থাকিবেন; তাঁহাতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ নাই। তিনি কেবল বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া প্রকৃতি-দেবী লীলা করিতেছেন। এই বিশ্বসৃষ্টি সেই মহামায়ার খেলা,

তাঁহারই বিভূতি। এই সৃষ্টিলীলার মধ্যে সর্ব্বব্যাপিরূপে নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল ও সনাতন পুরুষ বিরাজ করিতেছেন বলিয়াই, পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে একটা স্থিতির ভাব সদাই ফুটিয়া আছে। পুরুষ ও প্রকৃতি লইয়াই সৃষ্টি; পুরুষ হইতে অব্যাহত স্থিতির বোধ ফুটিয়া উঠে, প্রকৃতি কেবল নাম রূপের দ্যোতনার সাহায্যে পরিবর্ত্তনের আবর্ত্ত ঘটাইতেছেন। প্রকৃতির আবার দুইটা বিভাগ আছে; এক—মূলা প্রকৃতি, দ্বিতীয়—সৃষ্টি প্রকৃতি। মূলা প্রকৃতিই বেদান্তের মায়া এবং তন্ত্রের মূলভূতা অব্যক্তা। এই মূলা প্রকৃতিই সৃষ্টিকামনার, একে বহুত্বের দ্যোতক। এই মূলা প্রকৃতিই আদ্যাশক্তি সনাতনী। এই মূলা প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টিপ্রকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই চণ্ডী বলিতেছেন,—

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥"

এই বিসৃষ্টির মধ্যে, অর্থাৎ এই বিশ্ববিকাশের মধ্যে তুমিই সৃষ্টিস্বরূপা এবং ইহার পালন ব্যাপারে তুমিই স্থিতিরূপা, পরে এই বিশ্ববিকাশের সঙ্কোচ ও সংহরণকার্য্যে তুমিই সংহাররূপিণী; অতএব এই জগতের তুমিই জগন্ময়ী দেবী। বিসৃষ্টি কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। মনীষী শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের দেবীসূক্তের ব্যাখ্যার কতকাংশ উদ্ধার করিয়া বিসৃষ্টির ব্যাখ্যা করিয়াছি। সুতরাং তাহার আর পুনরুল্লেখ করিব না। সচ্চিদানন্দ পুরুষে এক আমি বহু হইবার কামনা যখন ফুটিয়া উঠে, তখনই বুঝিতে হইবে—মূলা প্রকৃতির কার্য্য সূচিত হইয়াছে। এই মূলা প্রকৃতি পুরুষে নিত্য বিদ্যমান। যখন তিনি সম্মূঢ় অবস্থায় থাকেন, তখন প্রলয়কাল; যখন তিনি জাগিয়া উঠেন, তখন সৃষ্টির বিকাশ হয়। সৃষ্টির নাম ও রূপ এই মূলা প্রকৃতি হইতেই সমুদ্ভূত; কিন্তু সৃষ্টি-প্রকৃতিতেই উহার সম্যক্ বিকাশ হইয়া থাকে।

দেহতত্ত্বের দিক্ দিয়া তন্ত্র বলিতেছেন যে, প্রকৃতি পুরুষ সকল জীবদেহেই বিরাজ করিতেছে। পুরুষের দেহে পুংস্ত্বের প্রাবল্য, স্ত্রীত্ব সম্মূঢ়; নারীর দেহে স্ত্রীত্বের প্রভাব অধিক, পুংস্ত্ব সম্মূঢ়। পুরুষের মনে এক আমি বহু হইব, এই কামনার উদ্রেক না হইলে, স্ত্রীর মনে সেই বহুত্বের কামনার প্রতি অনুরাগের ভাব না জাগিলে, উভয়ের সম্মেলনে নূতন সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। যে পদ্ধতিক্রমে নর-নারীর সংযোগে

নূতন জীবের সৃষ্টি হয়, সেই পদ্ধতিক্রমে পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে বিশ্বসংসারের উদ্ভব হইয়াছে। পুরুষের প্রভাবে নূতন জীবে আমিত্বের বোধ ফুটিয়া উঠে, দেহের মধ্যে যাহা কতকটা স্থিতিবাচক, তাহারই সৃষ্টি হয়, আর নারীর প্রভাবে দেহের নাম ও রূপ, যাহা কিছু পরিবর্ত্তনশীল, তাহারই সৃষ্টি হয়। তাই তন্ত্র অনুমান করেন যে, মেদ, মজ্জা, অস্থি, নখ প্রভৃতি পিতৃবীর্য্যে সৃষ্ট হয় : মাতৃরজে শোণিত, মাংস, চর্ম্ম, কেশ প্রভৃতি উদ্ভূত হইয়া থাকে। তেমনি বিশ্বসংসারে পুরুষ-প্রকৃতির প্রেরণায় সৃষ্টির বিকাশ হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষ ও মূলা প্রকৃতির মধ্যে একটা স্পন্দনের—কম্পনের ভাব অনুভূত হয়। এই স্পন্দন জন্যই পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যে বিয়োগ ও মিলন ঘটে। এই মিলনের ফলে বিন্দুর সৃষ্টি বা পতন ; আর সেই বিন্দুর মধ্যে সৃষ্টিপ্রকৃতির লীলা হইতে থাকে, সেই লীলার ফলেই বিশ্বসৃষ্টির বিকাশ। এই বিন্দুতে বিলাস করিয়া মহামায়া সৃষ্টি ঘটাইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম বিন্দুবিলাসিনী। এই স্পন্দন-তত্ত্বের সাহায্যে বৈষ্ণবদিগের রাস, দোল, ঝুলন প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা যায়, এবং উহা হইতেই শাক্তদিগের উমার নাচের (অর্থবাদের) গূঢ় অর্থ বুঝা যায়। মহাকাশে যাহা স্পন্দন, নর-নারীর মধ্যে তাহা কাম ও মদনের লীলা। দেহের মধ্যে "আমি আছি" এই অবিকারী জ্ঞানময় মহাদেব বা শিবলিঙ্গ যেন চক্রে চক্রে বিরাজ করিতেছেন ; সেই শিব আছেন বলিয়া দেহ-প্রকৃতির নানা লীলা ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছে—নিত্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটা অপরিবর্ত্তনের ভাব নির্ব্বাতনিষ্কম্প প্রদীপজ্যোতির মতন বিরাজ করিতেছে। তেমনই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল ও সনাতন শিব চক্রে চক্রে বিরাজ করিতেছেন ; তিনি আছেন বলিয়া পরিবর্ত্তনের ভীম ভৈরব আবর্ত্তনের মধ্যে একটা সনাতন ভাবের জ্ঞান বা বোধ যেন সর্ব্বব্যাপী হইয়া আছে। কাম ও মদনজন্য যেমন নূতন জীবের নাম ও রূপের বিকাশ হয়, তেমনই পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যে কাম ও মদনের স্পন্দন জন্য বিশ্বব্যাপী নাম এবং রূপের বিকাশ হইয়াছে। ইহাই হইল বিশ্বসৃষ্টি এবং জীবসৃষ্টির মধ্যে পদ্ধতির সমতাবিষয়ক গোটাকয়েক মোটা কথা। তন্ত্রবিশেষে বিশ্বসৃষ্টির জন্য শিবশক্তির এবং জীবসৃষ্টির জন্য নর-নারীর মিলনের একতা পদে পদে খুলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আছে। বাহ্য প্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে শিবশক্তির সামঞ্জস্য কেমন করিয়া ঘটে,

তাহা তন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রে পাওয়া যাইবে না। উপনিষদ্ ও পুরাণে ইঙ্গিতে কথাটি বলা আছে। বলিয়া রাখা ভাল যে, তন্ত্র এই সৃষ্টিতত্ত্ব যতটা ফুটাইয়া—খোলসা করিয়া বলিয়াছেন, এতটা আর কোন শাস্ত্রে খুলিয়া না বলিলেও সৃষ্টিতত্ত্বের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সকল শাস্ত্রই একমত। শ্রুতির 'এক আমি বহু হইব' এই মহাবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া সকল শাস্ত্রই সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেবল অদ্বৈতবাদে পরের পর্য্যায়গুলিকে মায়াজন্য বলিয়া 'মিথ্যাভূত' এই ভাবে আখ্যাত করা হইয়াছে। তন্ত্র সাধনার ধর্ম্ম, সাধনার সম্বল এই নরদেহ লইয়াই যত ব্যস্ত, তাই সাধনার সহায়তার উদ্দেশ্যে তন্ত্র, সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত দেহতত্ত্ব মিলাইয়া বিশ্বসৃষ্টির প্রহেলিকা বুঝাইয়াছেন।

মূলা প্রকৃতি হইলেন আদ্যা শক্তি; তাঁহা হইতেই জড় প্রকৃতির উদ্ভব। এই মূলা প্রকৃতির বিকৃতিই নাম ও রূপ; নাম ও রূপ হইতে বিশ্বসৃষ্টি। নাম ও রূপ বেদান্তের মতে অবিদ্যাজাত, সুতরাং মিথ্যা। তন্ত্র বলেন,—মূলা প্রকৃতি আদ্যা শক্তি যখন সনাতনী, তখন তদ্ভব নাম ও রূপ মায়াজন্য হইলেও মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। মনুষ্যদেহ যেমন জড় প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত—মায়াজন্য, অতএব মিথ্যাভূত হইলেও উহারই সাহায্যে সাধনা করিয়া পুরুষ-প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া থাকি, তেমনি বিশ্বসৃষ্টির নাম-রূপকে অবজ্ঞা করিলে নামরূপের অতীত যিনি, তাঁহাকে বুঝিতে ধরিতে পারা যাইবে না। কেবল বিচারের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মায় না। কথা আছে—"বিচারে পণ্ডিত, আচারে সাধু"—বিচার করিয়া, কেবল তর্ক করিয়া সংসারকে মায়াময় সিদ্ধান্ত করিলে পাণ্ডিত্যের প্রকাশ হইতে পারে বটে, পরন্তু আচারবান্ কর্ম্মী না হইতে পারিলে সাধু হওয়া যায় না, সাধু না হইলে মিথ্যার মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান ঠিক-মত করা যায় না। তন্ত্র বার বার বলিতেছেন,—"যৎ যৎ শাস্ত্রমধীতং তস্য তস্য ব্রতং চরেৎ"—যে যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, সেই সেই শাস্ত্রের অনুকূল ব্রতের আচরণ না করিলে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ঠিকমত বুঝিতেই পারিবে না। অতএব শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ঠিকমত বুঝিতে হইলে ব্রতাচরণ করিতেই হইবে। কর্ম্মীর পক্ষে 'জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য' বলিলে কোন ফলোদয় হইবে না; পরিণামে হয়ত কর্ম্মী নাস্তিক হইতে পারে। এই হেতুই অনেকে বলিয়াছেন যে, "মায়াবাদম্ অসৎশাস্ত্রম্ প্রচ্ছন্ন-

বৌদ্ধমেব তৎ," অর্থাৎ মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্র, উহা বৌদ্ধের নাস্তিক্য ধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। তন্ত্র বলেন, এই সংসারে যদি কিছু জ্ঞেয় থাকে, তবে সে তোমার দেহ। ঐ দেহের সাহায্যে তোমার জ্ঞানোদয় হয়, ঐ দেহের সাহায্যে তুমি জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য বলিয়া থাক, ঐ দেহের সাহায্যে তোমার আত্ম-অনুভূতি হইয়া থাকে এবং সেই অনুভূতি হইতে তুমি বিশ্বাত্মার ধারণা করিতে সমর্থ হও; অতএব এই দেহটাকে বাতিল করিলে চলিবে না। দেহকে মান্য করিলেই দ্বৈতবাদ আসিবেই, আমি ও তুমির বোধ হইবেই। বাস্তবিক যত দিন সাধক থাকিতে হইবে, তত দিন আমি ও তুমির ভেদ থাকিবেই। সাধনার প্রভাবে আমি ও তুমি যে এক ও অদ্বিতীয়, তাহা বুঝিতে পারিব। যত দিন সাধনায় সিদ্ধি লাভ না হইতেছে, যত দিন রামপ্রসাদের মতন "এবার কালি তোমায় খাব, তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা করে যাবো" এই ভাবটা মনে না জাগিবে, তত দিন মা ও ছেলে, প্রভু ও ভৃত্য, পিতা ও পুত্র, সখা ও মিত্র, স্বামী ও স্ত্রী, গুরু ও শিষ্য পৃথক্ ও স্বতন্ত্র ভাবে থাকিবেই। এই পার্থক্যের ভাব ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে, পরন্তু যত দিন আমরা দেহী, তত দিন এই ভ্রান্তির সাহায্যে জগদ্‌ভ্রান্তির অপনোদন সাধন করিতেই হইবে। 'বিষস্য বিষমৌষধম্' এই তত্ত্বের অনুসারে ভ্রান্তির দ্বারা ভ্রান্তির নিরসন কর্ত্তব্য। ইহাই তন্ত্রের সার কথা—গোড়ার কথা। সেই গোড়ার কথা কহিয়া তন্ত্র বলিয়াছেন যে, আমার পদ্ধতি অনুসারে কর্ম্ম করিয়া দেখ—সাধনা করিয়া দেখ; অল্পায়াসেই বুঝিতে পারিবে, আমার সিদ্ধান্ত ঠিক কি না।

ভাবের দিক্ দিয়া মার্কণ্ডেয় চণ্ডী এইখানে তন্ত্রের সহায়তা করিয়াছেন। তন্ত্রের শাক্ত সাধকগণ বলেন যে, শিব ত স্থাণুসদৃশ একটা বিদ্যমানতার দ্যোতক মাত্র, তাঁহার উপাসনা করি কোন্ হিসাবে। শক্তি না থাকিলে শিব ত শব, অথচ শক্তিশূন্য শিব হইতেই পারেন না। অতএব শিব আছেন, মাথার উপর থাকুন, আমরা মায়ের—আদ্যা শক্তির উপাসনা করিব। কারণ, তিনিই ত সব—তিনি মেধা, তিনি মায়া, তিনি লজ্জা, তিনি ক্ষমা, তিনি বুদ্ধি, তিনি ধৃতি, তিনি বিদ্যা, তিনি ছায়া, তিনি শান্তি, তিনি ক্ষান্তি—তাঁহাকে পূজা করিব না ত কাহার পূজা করিব? সত্য বটে যে—

"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ বস্তু সদসৎ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥"

হে অখিলাত্মিকে মহামায়া, এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু সৎ বা অসৎ থাকুক না, সে সবই তুমি; কারণ, সে সকলের অন্তরালে তোমারই শক্তি খেলা করিতেছে, অতএব তোমার আবার স্তব স্তুতি কি ও কেমন। তথাপি তিনি আমাদের জ্ঞানের, আমাদের বোধের ত অতীত নহেন; তাই তাঁহার সাধনা করিলে শিবযুক্তি বুঝা যাইবে, বিদেহমুক্তিও লাভ হইতে পারিবে। কারণ, সৃষ্টিলীলা বুঝিতে হইলে তাঁহাকেই সর্ব্বাগ্রে বুঝিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সপ্তশতী চণ্ডীতে সিদ্ধান্তের কথাসকল ভাবের ভাষায় সুন্দর ব্যাখ্যা করা আছে। চণ্ডী বুঝিতে পারিলে এই দেহতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব পরিষ্কার বুঝা যায়। ভাবের সহিত অলঙ্কারের ভাষা মিলাইয়া তন্ত্রের বহু সিদ্ধান্ত চণ্ডীতে যেমন ব্যাখ্যাত আছে, এমন আর কিছুতেই নাই। এক হিসাবে সপ্তশতী চণ্ডী তন্ত্রের সার। গীতা যেমন উপনিষদ্‌সকলের সার, চণ্ডীও তেমনি তন্ত্রের ভাবের ও সিদ্ধান্তের সার। তাই এক দিন বাঙ্গালার গৃহে গৃহে প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ হইত; বেদের পরেই চণ্ডীকে বাঙ্গালী পূজা ও উপাসনা করিত। চণ্ডী গালগল্প নহে, আষাঢ়ে গল্পের পুঁথি নহে, দেহতত্ত্বের এবং সৃষ্টিতত্ত্বের সিদ্ধান্তপূর্ণ অপূর্ব্ব ও উপাদেয় গ্রন্থ। তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে গেলে চণ্ডীর কথা স্বতঃই মনে পড়ে বলিয়া এইটুকু এইখানে বলিয়া রাখিলাম।

২

একটা মজার কথা এইখানে বলিব। যাঁহারা পুরাণের আঠারোখানা বই পড়িয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, প্রত্যেক পুরাণের সৃষ্টিপ্রকরণ স্বতন্ত্র; এক পুরাণের সৃষ্টিপ্রকরণের বিবরণ অন্য পুরাণের বর্ণনা হইতে অনেকটা পৃথক্। এ পার্থক্য কেন ঘটে? সৃষ্টি যখন হইয়াছিল বা পরে যখন আবার হইবে, তখন একই পদ্ধতি অনুসারে হইয়াছিল, একই ক্রম অনুসারে হইবে। অধুনা কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, অষ্টাদশ পুরাণ এক মহর্ষি বাদরায়ণ বেদব্যাসের রচিত; তিনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, তাঁহার মস্তিষ্কে মিথ্যার বিকাশ হইবার নহে, সদাই

সত্য প্রতিভাত হইত। তবে তাঁহার প্রত্যেক পুরাণের সৃষ্টিপ্রকরণ ভিন্ন রকমের কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমি দুই রকমে দিব। পুরাণ-কর্ত্তার উল্লেখ করিতে যাইয়া পুরাণই বলিয়াছেন—ব্যাসাদিমুনিভিঃ রচিতম্—যাহা ব্যাসপ্রমুখ মুনিদিগের রচিত, তাহাই পুরাণ। সুতরাং বুঝিতে হইবে, পুরাণসকল এক জনের রচিত নহে, বহুবচনান্ত "ব্যাসাদি-মুনিভিঃ" বলাতেই স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, পুরাণসকলের কর্ত্তা এক জন নহেন; বহু মুনির দ্বারা উহা রচিত হইয়াছে; তবে পুরাণকর্ত্তাদের মধ্যে ব্যাস প্রধান। কিন্তু ব্যাস এক জন নহেন; পুরাণ হইতেই জানিতে পারা যায় যে, আটাশ জন ঋষি ও মুনি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন; বাদরায়ণ বেদব্যাস তাঁহাদের মধ্যে একজন। ব্যাস শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাতা—বিভাগকর্ত্তা; যিনি শাস্ত্রের বিশ্লেষণ করিয়া শাস্ত্রমর্ম প্রকাশ করেন, তিনিই ব্যাস। সুতরাং "ব্যাসাদিমুনিভিঃ" বলাতে তিনি যে, পুরাণকর্ত্তা বাদরায়ণ ব্যাস, তাহা বুঝাইতেছে না। বাদরায়ণ ব্যাস কোন একখানা পুরাণ রচনা করিলেও করিতে পারেন, নাও করিতে পারেন। কেবল ব্যাস শব্দ ব্যবহার করাতে বুঝিতে হইবে যে, আটাশ জন ব্যাস উপাধিযুক্ত মুনিদিগের মধ্যে অনেকে, অথবা সকলেই এবং আরও অন্য মুনি মিলিয়া মিশিয়া এই অষ্টাদশ পুরাণের রচনা করিয়াছিলেন। আরও একটা কথা ভাবিতে হইবে, পুরাণ ঋষিপ্রণীত নহে; বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্টই উল্লেখ করা আছে যে, পুরাণ মুনিবিরচিত। মুনি এবং ঋষিতে অনেক পার্থক্য আছে। বাদরায়ণ বেদব্যাস ঋষি ছিলেন, মুনি ছিলেন না। অতএব বলা যাইতে পারে যে, বাদরায়ণ বেদব্যাস পুরাণের রচনা করেন নাই, যে সকল মুনি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এবং অন্য মুনি পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া অষ্টাদশ মহাপুরাণ হইতে এমন অনেক বচনপ্রমাণ সংগ্রহ করা যায়, যাহা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পুরাণসকল যে এক জনের রচিত নহে, তাহা পুরাণকারেরা নিজ নিজ লিখিত পুরাণেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অধুনা বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ কলিকাতায় এমন রাসভবুদ্ধির লেখক দুই একটি আছেন, যাঁহারা জীবনে কখনও কোন পুরাণ উল্টাইয়া দেখেন নাই, রামায়ণ মহাভারতও আগাগোড়া পড়েন নাই, কেবল পরের মুখে ঝাল খাওয়া গোঁড়ামির উপর নির্ভর করিয়া, নিজেদের কোটে বসিয়া লেজ সাপ্টা মারিয়া বলিয়া

থাকেন যে, অষ্টাদশ মহাপুরাণ এক বেদব্যাসেরই রচিত। ইঁহারা শাস্ত্রীয় বিচারপদ্ধতি জানেন না, ইংরেজী হিসাবেও তর্ক বিচার করিতে পারেন না। উপেক্ষার অবহেলায় ইঁহাদের কথা উড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পরন্তু ইহাও সত্য বটে, এমনই একটা প্রবাদকথা হিন্দু সমাজের সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচারিত আছে বটে যে, একা বেদব্যাসই অষ্টাদশ মহাপুরাণের রচনা করিয়াছিলেন। পুরাণধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পর, পুরাণসকলকে লোকদৃষ্টিতে একটু বড় করিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রবাদটা জনকয়েক স্মার্ত্ত পণ্ডিতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ বাদরায়ণ বেদব্যাস পুরাণের রচনা করেন নাই, পুরাণসকল একজন ব্যাসের দ্বারা রচিত নহে, পুরাণসকল এককালে এক যুগে বা এক সময়ে রচিত হয় নাই। যখন ভিন্ন ভিন্ন লেখক, তখন সৃষ্টির theory বা অনুমান ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইবারই কথা; প্রত্যেক পুরাণের সৃষ্টিপ্রকরণ ভিন্ন রকমের দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ দেখি না। ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের কাছে সৃষ্টিপ্রকরণটা যেমন ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি তেমনই ভাবে তাহা লিখিয়াছেন। এই গেল এক রকমের উত্তর।

দ্বিতীয় রকমের উত্তর এই। প্রত্যেক পুরাণই এক একটা সিদ্ধান্ত-কথার বিশ্লেষণ করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত। শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, শৈব প্রভৃতি পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়গত মত প্রচারের জন্য এক একখানি পুরাণ আছে। আবার এই পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি বাদ অনুসারে পুরাণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে; ফলে প্রত্যেক পুরাণের সৃষ্টিপ্রকরণ এই বাদ অনুসারে ভিন্ন রকমের হইয়া গিয়াছে। আর একটি কথা আছে। বৈষ্ণব পুরাণ মাত্রেই, যথা—বিষ্ণু, গরুড়, নৃসিংহ, ক্ষাত্রপুরাণ অর্থাৎ ক্ষত্রশক্তি বিকাশের, ক্ষাত্র মহিমা প্রচারের পুরাণ। আর শৈব ও শাক্ত পুরাণে ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠার কথাই ফুটাইয়া তোলা আছে। বৈষ্ণব পুরাণসকলে অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস প্রভৃতিকে শাক্ত বা শৈব ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে; যেমন রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংসপ্রমুখ অসুর মাত্রেই শৈব বা শাক্ত,—এবং বৈষ্ণবদ্বেষী। পাল্টা জবাবের হিসাবে শৈব ও শাক্ত পুরাণে বিষ্ণুভক্ত অসুর বা দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয় রাজার উল্লেখ আছে। জয়দেবের

সময় হইতে বাঙ্গালার লোকসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া আছে যে, ভগবান্ দশটা অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, শ্রীভগবানের অসংখ্য অবতার, তাহার মধ্যে প্রধান বাইশ জন। শ্রীমদ্ভাগবতের তালিকায় যে বাইশটি অবতারের উল্লেখ আছে, শৈব ও শাক্ত পুরাণের তালিকায় সে বাইশটি অবতারের উল্লেখ নাই। আমার মনে হয়, শৈব শাক্ত এবং বৈষ্ণবের মধ্যে আপোস করিয়া, ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাইয়া ভগবানের দশটা অবতারের উদ্ভব সাধন হইয়াছে। দশ অবতারের মধ্যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ, পাঁচ জন ক্ষত্রিয়; মৎস্য, বরাহ, বামন, পরশুরাম এবং কল্কী, এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণ; কূর্ম্ম, নৃসিংহ, শ্রীরাম, বলরাম, বুদ্ধ, এই পাঁচ জন ক্ষত্রিয়। শৈব ও বৈষ্ণব পুরাণে নৃসিংহের জাতি লইয়া একটু বিরোধ আছে। শৈব পুরাণমতে নৃসিংহ ব্রাহ্মণ এবং শিবের অবতার, বিষ্ণুপুরাণমতে নৃসিংহ ক্ষত্রিয় এবং বিষ্ণুর অবতার। এই আপোস এবং বিরোধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক পুরাণের সৃষ্টিপ্রকরণ বুঝিবার চেষ্টা করিলে প্রত্যেক পুরাণ হইতেই এক একটা নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইতে পারে। সৃষ্টিপ্রকরণ প্রত্যেক পুরাণের সূচক বা introductory; সৃষ্টিপ্রকরণ পাঠ করিলেই কতকটা বুঝা যায়—সেই পুরাণে কোন্ সিদ্ধান্তের কেমন বিশ্লেষণ করা হইবে।

এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। সৃষ্টিতত্ত্ব দেহতত্ত্বের সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া লেখা। বিশ্বসৃষ্টি এবং মনুষ্য বা জীবদেহসৃষ্টি যে একই প্রকরণ অনুসারে হইয়া থাকে, ইহা তন্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্ত সকল পুরাণই গ্রহণ করিয়াছেন। দেহতত্ত্বের বিশেষণ যে পুরাণে যে ভাবে করা হইয়াছে, সেই পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব সেই ভাবে লিখিত হইয়াছে। শিব, কালিকা, মার্কণ্ডেয়, লিঙ্গ প্রভৃতি শৈব ও শাক্ত পুরাণসকলে তন্ত্রের সিদ্ধান্ত ষোল আনা অনুসরণ করিয়া সৃষ্টিপ্রকরণ লেখা হইয়াছে। বৈষ্ণব পুরাণসকলে পুরা দ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত মান্য করিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শৈব ও শাক্ত কখনই জীব ও শিবের পার্থক্য ঘটান না, তেমন চিন্তাও করিতে পারেন না। বৈষ্ণব, জীব ও ঈশ্বরে নিত্য পার্থক্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এবং তদনুসারে সৃষ্টিপ্রকরণের ব্যাখ্যান করিয়াছেন। বৌদ্ধ দর্শন হইতে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দর্শনের উন্মেষ-ভঙ্গী যেন কতকটা বুঝা যায়; মনে হয়, অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ শূন্যবাদের

একটা সংস্করণ অথবা বৌদ্ধ শূন্যবাদ ঔপনিষদ অদ্বৈতবাদের একটা নিরীশ্বর সংস্করণ। তন্ত্রের জীব শিবে একীকরণ বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও অদ্বৈতবাদের আপোস মাত্র। Personal God, একটা স্বতন্ত্র ঈশ্বরের কল্পনা তন্ত্রেও নাই, বৌদ্ধ দর্শনেও নাই। বৌদ্ধ শূন্যবাদকে আস্তিক করিতে হইলে প্রথম অদ্বৈতবাদে আসিয়াই পড়িতে হয়। তন্ত্র তাহার উপর একটু রসান চড়াইয়া আত্মাকেই, জীবদেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকেই উপাস্যে পরিণত করিয়াছেন। অতিপুরাতন তন্ত্রসকলে কেবল শক্তির সাধনাই আছে; যে শক্তির দ্বারা জীবদেহ সঞ্জীবিত, সেই শক্তির অন্বেষণ আছে,—উপাসনা নাই, ভাবের বিকাশ নাই; অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তিকে আসক্তির সাহায্যে রূপময়ী ও ভাবময়ী করিয়া পূজা উপাসনার পদ্ধতি নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক তন্ত্রে দেবদেবীর মূর্ত্তির বিবরণ আছে, সেই সকল মূর্ত্তির উপর মাতৃত্ব পিতৃত্ব প্রভৃতি আসক্তির আরোপ আছে,—দেবীকে জীব হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহার স্তব স্তুতির ব্যবস্থা আছে। এই দ্বৈতবাদ সিদ্ধান্ত-পূর্ণ তন্ত্রসকলের উপর আধুনিক বৈষ্ণব Deism বা ঈশ্বরবাদের প্রগাঢ় ছায়া যে পড়ে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বে যামুন মুনির সময় হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বরের পরিকল্পনা ব্রাহ্মণপ্রমুখ বর্ণাশ্রমী সমাজের এক অংশের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রামানুজাচার্য্য বিষম শঙ্করদ্বেঁষী, অদ্বৈতবাদের প্রতিবাদকারী ছিলেন। বোধ হয় তিনিই এবং তাঁহার গুরু যামুন মুনি প্রথমে প্রকাশ্যভাবে শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিরোধ ঘটাইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী রামানুজাচার্য্যের জীবনকথা লিখিয়া যে পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, সেই পুস্তকে যামুন মুনির পূর্ব্বে যে সকল ভক্ত বৈষ্ণবদিগের বর্ণনা দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত ছিলেন না; সবাই শূদ্র বা আদিম পঞ্চমজাতীয় পুরুষ ছিলেন। ইহা হইতেই অনুমান করা যায় যে, দাক্ষিণাত্যে যামুন মুনির পূর্ব্বে বৈষ্ণব ধর্ম্ম—ভক্তির ও উপাসনার ধর্ম্ম আর্য্য দ্বিজাতির ধর্ম্ম ছিল না; দ্রবিড়জাতীয় আদিম পঞ্চম জাতিসকলের ধর্ম্ম ছিল। শঙ্করাচার্য্যের সময়ে এবং তাহার পূর্ব্বে শৈব ও শাক্ত ধর্ম্ম, আর্য্যাবর্ত্তের ও দাক্ষিণাত্যের উভয় দেশের বর্ণাশ্রমী সমাজের ধর্ম্ম ছিল। তবে তন্ত্রের শাক্ত ধর্ম্ম যে, আদিম জাতিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, উহাতে যে বর্ণবৈষম্য প্রকট কখনই ছিল

না, এ কথাটা জোর করিয়া বলা যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের দুইটি প্রধান শাখা ছিল—হীনযান এবং মহাযান। হীনযানের প্রভাব দাক্ষিণাত্যেই প্রবল ছিল; মহাযান আর্য্যাবর্ত্তে ও উত্তরাখণ্ডে প্রবল ছিল। মহাযানী বৌদ্ধগণ তন্ত্রের শাক্ত ধর্ম্মের সহিত আপোস করিয়া কালচক্রযান, বজ্রযান প্রভৃতি নানা শাখার সৃষ্টি করেন। বাঙ্গালার ও উত্তরাখণ্ডের ও কাশ্মীরের তান্ত্রিক শক্তিধর্ম্ম তাই অনেক ক্ষেত্রে মহাযানের ছায়া অনুসরণ করিয়াছে। লক্ষ্মণাচার্য্যের লিখিত শারদাতিলক পাঠ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে রাঘব ভট্টের টীকা পড়িলে মনে এই ধারণাটা প্রবল হইয়া উঠে। আধুনিক তন্ত্রের সর্ব্বাঙ্গে যে মহাযানের লেখা গাঢ়ভাবে অঙ্কিত আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে তান্ত্রিক শক্তিধর্ম্ম যে মহাযান অপেক্ষা বহু পুরাতন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদ্ভবের বহু পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, ইহাও অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্মে, অন্ততঃ রামানুজাচার্য্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে বৌদ্ধ হীনযানের বহু সিদ্ধান্ত যে খুঁজিলে পাওয়া যায়, তাহা মান্দ্রাজের অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করেন। দক্ষিণের শৈবদিগের মধ্যে যে হীনযানের অনেক কথা প্রচলিত আছে, বিশেষতঃ দক্ষিণামূর্ত্তি শিবের উপাসনা ও হীনযানের সাধনা যে স্পষ্ট একই রকমের, একই দর্শনসিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা দক্ষিণের অভিজ্ঞ শৈব সন্ন্যাসী স্বীকার করেন। রামানুজাচার্য্য ছাড়া মাধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য ও নিম্বাদিত্যের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে হীনযানের অনেক পদ্ধতি আধুনিক হিন্দু আকারে আকারিত হইয়া প্রচলিত আছে। এই হীনযান ও মহাযানের পদাঙ্ক নানা আকারে পুরাণ ও তন্ত্রে এবং আধুনিক নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে বেশ স্পষ্ট আছে। ভারতবর্ষের ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিতে হইলে, এই সকল বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা না করিলে ঠিক ইতিহাস লেখা হইবে না। আমাদের চারি দিকে যে সকল আচার ব্যবহার, রীতি পদ্ধতি রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিলেই আমাদের ধর্ম্মপদ্ধতির শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস ঠিকমত পাওয়া যাইবে। পুরাণের এই সৃষ্টিপ্রকরণ ব্যাখ্যানের মধ্যে অনেক কথা, অনেক ইতিহাস লুকান আছে। ধর্ম্মভাবোন্মেষের এক একটা পর্য্যায় এক একটা পুরাণের সৃষ্টিপ্রকরণে আংশিক ভাবে নিবদ্ধ আছে। সে কথার আলোচনা বর্ত্তমান সন্দর্ভে করিবার নহে, কেবল ইঙ্গিতে যতটুকু

পারিলাম, ততটুকু বলিয়া রাখিলাম। মনে রাখা ভাল যে, আমরা এখনও আমাদের চিনিতে পারি নাই, আমরা যে কে ও কেমন, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই; বুঝিলে এবং চিনিলে, নিজের পরিচয়—নিজেদের পিতৃপরিচয় যথার্থ ভাবে জানিতে পারিলে, এ সকল কথা বলিবার কোন প্রয়োজন হইত না। আমি কেবল চিনিবার পথ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। মনে হয় এই পুরাণ তন্ত্রের পথে, আধুনিক আচার্য্যগণের প্রচারিত নব্য বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইলে আমরা আমাদের পূর্ব্বপরিচয় পাইলেও পাইতে পারি। আমাদের শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে, পুরাণ এবং তন্ত্রে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহু সম্পত্তি লুকান আছে বলিলে লজ্জিত হইবার হেতু দেখি না। কারণ, বৌদ্ধ ধর্ম্মও ত আমাদের ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্মও ত আমাদেরই ধর্ম্ম; বিদেশের নহে, ভিন্ন জাতির নহে। যাহা আমাদের, তাহা আমাদের মধ্যেই আছে ও থাকিবে। কারণ, হিন্দু আমরা কখনও কোন সামগ্রী পরিহার করি ন্যই, করিবও না; আমরা যাহা পাই, তাহা নিজেদের মতন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করি। যাহা থাকে, তাহা থাকিয়াই যায়, যাহা পিছলাইয়া পড়ে, তাহা বিস্মৃতির গর্ভে একেবারেই ডুবিয়া যায়। এখন যাহা আছে, তাহার বাছাই করিতে পারিলে, আমাদের পূর্ব্বপরিচয় আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবে। তন্ত্রের মধ্যে এই পরিচয় লুকান আছে বলিয়াই, তন্ত্রধর্ম্ম এক সময়ে বাঙ্গালী জাতির এবং বাঙ্গালা দেশের ধর্ম্ম ছিল বলিয়াই এখনও তন্ত্রের প্রভাব আমাদের সামাজিক সকল কার্য্যে, ব্রত নিয়মে ফুটিয়া আছে বলিয়াই তন্ত্রের কথা এমন ভাবে বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে হইতেছে। তন্ত্র সাধনার ধর্ম্ম; যে জিজ্ঞাসু সৎগুরু লাভ করিয়া, যথাপদ্ধতি দীক্ষিত হইয়া জপ তপ করিতে পারিবে, সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারিবে, সেই তন্ত্রের সাধনধর্ম্মের মহিমা বুঝিতে পারিবে। ভাষায় সে মহিমা বুঝান যায় না, প্রবন্ধ সন্দর্ভ লিখিয়া সে মহিমার ব্যাখ্যান সম্ভবপর নহে। তাই তন্ত্রের ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক দিক্‌টাই ভাল করিয়া ফুটাইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে হয়। এই জন্যই তন্ত্রের সকল বড় বড় সিদ্ধান্তের সহিত পুরাণের কি সম্বন্ধ, দর্শনশাস্ত্রের কতটুকু তন্ত্রের মধ্যে আসিয়াছে অথবা তন্ত্রসিদ্ধান্ত দর্শনশাস্ত্রে কতটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহাই দেখাইবার জন্য অধিক প্রয়াস করিতে হয়।

এইখানে আর একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখিব। দেহসৃষ্টি এবং বিশ্বসৃষ্টি একই পদ্ধতিক্রমে হইয়াছে, এই সাধারণ সিদ্ধান্তটা বা generalisation বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ কামবজ্রযান নাম দিয়া একটা উপাসক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যখন পাঠানগণ এ দেশে প্রথম আগমন করেন, তখন বাঙ্গালায় এই সম্প্রদায়ের সাধকদিগের বেজায় প্রাবল্য ছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই সম্প্রদায়ের প্রচলিত দুই চারিখানি তন্ত্রগ্রন্থ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। সে সকল গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে, উহা এতই কুৎসিত ক্রিয়াকাণ্ডের বর্ণনায় পূর্ণ। তাঁহাদের মত এই যে, মনুষ্যদেহ যেমন কামের সাহায্যে সৃষ্ট বা উৎপন্ন, বিশ্বসৃষ্টিও তেমনি কামের সাহায্যে সৃষ্ট বা উৎপন্ন। কামে যেমন রেতঃস্খলন হয় এবং রজঃ ও রেতের সম্মেলনে জীবের সৃষ্টি হয়, তেমনি বিশ্বসৃষ্টি শক্তিসমন্বিত শিবলিঙ্গের রেতঃস্খলন হইতে উৎপন্ন। এই হেতু বিশ্বসৃষ্টিকে তন্ত্রে বিসৃষ্টি বা discharge বলিয়াছে। অর্থাৎ কামান্ধ বিশ্বব্যাপী আত্মা হইতে এই বিশ্বসৃষ্টি একটা স্খলন বা বিসৃষ্টি মাত্র। এই সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকগণের মত এই যে, যেমন যুবক যুবতী সদা রিরংসায় পূর্ণ থাকে, তেমনি বিশ্বব্যাপী শিব ও শক্তি সদাই নিত্য নব সৃষ্টির জন্য রিরংসায় পূর্ণ। তাঁহাদের নিত্য সম্মেলনে ক্ষণে ক্ষণে বিসৃষ্টি হইতেছে, ফুটিতেছে, উঠিতেছে, ডুবিতেছে, শুকাইতেছে। বিশ্বসৃষ্টির রিরংসা এবং জীবদেহগত রিরংসার সামরস্য ঘটাইতে পারিলেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যাইতে পাবে। ইহারা তাই সদাই কামসাধনা করিত। ইহাদের অত্যাচারের প্রভাবে জাতিটা একেবারেই নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। সাধনার দোহাই দিয়া ইহারা নির্লজ্জভাবে সমাজের সর্ব্বাঙ্গে কামের প্রকট বিকাশ ঘটাইত। মন্দিরে, মঠে, দেবায়তনে, সর্ব্বত্রই রিরংসার ছবি অঙ্কিত করিয়া রাখিত। কালাপাহাড় ইহাদের মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়া, শেষে হিন্দুর সকল দেবমন্দিরই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন। বিরূপাক্ষ নামের একজন হিন্দু তান্ত্রিক চৈতন্যদেবের সমসময়ে সাধনার প্রভাবে অনেক দেবদেবীর বিগ্রহ ফাটাইয়া দিয়াছিলেন। প্রবাদ এই ছিল যে, যে দেবদেবীর মধ্যে দৈব ভাব না থাকিত, সে দেবদেবীকে বিরূপাক্ষ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে তাহা ফাটিয়া যাইত। তাই কথা প্রচলিত ছিল যে, "কালাপাহাড়ের ফাট

আর বিরূপাক্ষের ফাট” অর্থাৎ কালাপাহাড়ের তলোয়ারের চোট এবং বিরূপাক্ষের বিগ্রহ ফাটাইবার প্রভাব, দুই দুর্নিবার্য্য ছিল। মোট কথা, এই বিরূপাক্ষ এই কামচক্রযানীদের বাঙ্গালা হইতে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, জগন্নাথের শ্রীমন্দির এই কাম-চক্রযানীদের প্রভাবকালেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিমলার ক্ষেত্র কামযানীদের পুণ্যক্ষেত্র ছিল। মজা এই যে, ভারতবর্ষের সকল তীর্থে যেখানে শক্তির মন্দির আছে, সেইখানেই পার্শ্বে শিবমন্দির ভৈরবরূপে বিদ্যমান আছে। অথচ শ্রীক্ষেত্রে বিমলার ভৈরব স্বয়ং জগন্নাথ, কোন শিব নহে। কামচক্রযানীরা বৌদ্ধ ছিল, তাহাদের শিব অবলোকিতেশ্বর, তাহাদের ভৈরব স্বয়ং বুদ্ধদেব। বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, এই তিন লইয়া জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা হইয়াছেন ; সুতরাং বিমলার ক্ষেত্রে জগন্নাথই ভৈরব। বৌদ্ধ তন্ত্রে সঙ্ঘ চক্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। সঙ্ঘে জাতিবিচার নাই, চক্রেও জাতিবিচার নাই। কেবল তাহাই নহে, সঙ্ঘে যোনিবিচার নাই, চক্রেও যোনিবিচার নাই। ইহা বিমলাক্ষেত্রে যতটা পরিস্ফুট, এতটা অন্য কুত্রাপি নহে। আমি এখনও সকল পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সকল পুঁথি দেখিতে পাই নাই, তথাপি যতটুকু পড়িয়াছি ও বুঝিয়াছি ও তাহা হইতে জগন্নাথের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে একটা theory বা মতলব আঁটিতে পারিয়াছি। আমার প্রিয় সুহৃদ্ মনীষী শ্রীমান্ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁহার 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' নামক অপূর্ব্ব পুস্তকে শ্রীমন্দিরের কুৎসিত ছবি লইয়া একটা theory করিয়াছেন, পাঠকগণকে তাহার পরিচয় দিয়া রাখিয়াছি। এইবার যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিতে পারিলে আমি আমার theory সাধারণের বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব। এখন এইটুকু বলিয়া রাখিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, কামযানীদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া বিসৃষ্টির প্রতিমারূপে শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিশ্বসৃষ্টি এবং দেহসৃষ্টির সমরসতা এই শ্রীমন্দিরেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অশ্লীল ছবির মধ্যে পুরুষ মাত্রেই কামযানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, নারী মাত্রেই দেবদাসী অথবা ভিক্ষুণী। মন্দিরটা আগা-গোড়া বৌদ্ধ কামযানীদের principles বা মতানুসারে নির্ম্মিত। দেশীয় ভাস্কর্য্য পদ্ধতির উপর সৃষ্টিতত্ত্বের অর্থবাদ পাষাণের লেখায় ফুটান আছে। জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে আমাদের জাতির একটা যুগের ধর্ম্মমতের ইতিহাস

ও রীতি পদ্ধতি লুকান আছে। যে দিন ঐ মন্দিরের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইবে, সেই দিন জাতির ইতিহাসকথা জানিতে পারিব। ('প্রবাহিণী,' ২০ আষাঢ় ১৩২২)

সেকাল আর একাল

হায় রে সেকাল! যাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না; যাহা আছে, তাহা আর থাকিবে না! নূতনের জগঝম্প ইউরোপে বাজিয়া উঠিয়াছে, নবীনতার প্রতিষ্ঠা ইউরোপে হইলেই, উহার অনুকল্প ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবেই। অতএব সেই সেকাল, যে কালের গল্প, যে কালের উপকথা পিতামহীর ক্রোড়ে শুইয়া শুনিতাম,—শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম,—সেই সেকালের কথাটা জীবনের এই তৃতীয় আহ্নিকে আর এক বার আবৃত্তি করিলে হয় না? কি জানি, অতীতের এত মোহ কিসের জন্য? যত দিন যায়, যতই জীবনটা কোন ভূত কালের বিষয়ীভূত হইতে থাকে, ততই কেন সাগ্রহে কেবল অতীতের দিকে তাকাইতে ইচ্ছা করে? এ কি ছাই একা আমার রোগ! বুড়া হইলেই ঐ রোগে সকলকে যেন পাইয়া বসে! যে দিন ভবিষ্যতে নিবদ্ধ স্থিরদৃষ্টি নৈরাশ্যের আঘাতে ব্যাহত হইয়া অতীতের উপর যাইয়া পিছলাইয়া পড়িল,—সে দিন ভাবী আশার কল্পনা দুই চোখ ভরা অশ্রুর আড়ালে তাহার সোহাগের সপ্ত বর্ণ লুকাইল, সেই দিন বুঝিলাম বুড়া হইয়াছি; সেই দিন হইতে কেবল অতীতের জল্পনা কল্পনা করিতে লাগে ভাল; সেই দিন হইতে অহরহঃ কেবল লুপ্ত স্মৃতির ই মন্থন করিতেছি, কেবল অতীত ইতিহাসেরই রোমন্থন করিতেছি। গো-ব্রাহ্মণকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছে কেন? উভয়েই রোমন্থনপ্রিয়। গো, ভোজ্য রোমন্থন করে, ব্রাহ্মণ, চিন্তা রোমন্থন করে। এক বার সেকালের রোমন্থনটা করি, তোমরা দেখ, পার ত বুঝিতে চেষ্টা কর।

সেকালে সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে পাচক ব্রাহ্মণ থাকিত না, এখনকার মতন খানসামা থাকিত না, জুতা জামা কাপড়ের এত ছড়াছড়ি ছিল না। বৃহৎ পরিবার হইলে দুই এক জন চাকরাণী

থাকিত, তাহারাই পোড়া বাসন মাজিত, ঘর দুয়ার নিকাইত, গরুর জাব দিত, ঘুঁটে করিত, ধান ভানিয়া চাউল করিত। বাড়ীর মেয়েরা সংসারের অন্য সকল কাজ করিতেন। কিশোরী ও যুবতীদিগের কলসী কাঁকে করিয়া পুকুর বা নদীর ঘাট হইতে জল আনিতে হইত। গৃহিণীদিগের হুকুম ছিল যে, কক্ষে কলসী করিয়া জল না আনিলে কোমর মোটা হইয়া যাইবে। সেকালে স্থূলোদরী নারীর মোটেই আদর ছিল না; অনেক রূপসী কোমর মোটা হইলে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইতেন। মেয়েরা পাকশালায় যাইয়া অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিতেন, এঁটো বাসন মাজিতেন, হেঁসেল ঘর নিকাইতেন, ক্ষার করিয়া কাপড় কাচিতেন। ব্রাহ্মণের বাড়ীর বস্ত্র কদাচিৎ রজকালয়ে যাইত। ধোয়া কাপড় বাড়ীতে আসিলে তাহা আবার জলকাচা করিয়া, তবে কেহ পরিতে পাইত। ধোপদস্ত বস্ত্র অশুচি ছিল, তাহা কেহ স্পর্শ করিত না। সেকালের ব্রাহ্মণ কায়স্থ গৃহস্থ কখনই বাজার হইতে চাউল কিনিয়া আনিয়া খাইতেন না। সকলেরই জমি জমা ছিল, ধান আসিত, মরাইভরা ধান থাকিত; সেই ধান সিদ্ধ করিয়া, ঢেঁকিতে ছাঁটিয়া চাউল করিয়া লইতে হইত। ধান শুকান, ধান সিদ্ধ করা এবং ধান ভানা সকল গৃহস্থের একটা প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। প্রায় সকল বাড়ীতেই ঢেঁকি থাকিত, গোহালঘরও থাকিত। দুগ্ধ কিনিয়াও কেহ খাইত না। বিদেশী কেহ আসিলেই গ্রামের হাট বাজার হইতে চাউল, দাল, দধি, দুগ্ধ কিনিয়া খাইত। গ্রামস্থ কেহই লক্ষ্মী কিনিয়া খাইতেন না। যে গৃহস্থ উঠ্না খাইত, অর্থাৎ প্রত্যহ দোকান হইতে খাদ্য দ্রব্য কিনিয়া আনিয়া খাইত, তাহাকে লোকে লক্ষ্মীছাড়া বলিত, সমাজে তাহার বেজায় নিন্দা হইত।

প্রাতঃকালে মেয়েরা উঠিয়া ছড়া ঝাঁট করিবার পর পুকুরঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিত। তাহাদের মধ্যে যাহারা নবপ্রসূতি, কচি ছেলের মা, অথবা পোয়াতী বা প্রসূতি, তাহারা ঠাকুরঘরে যাইয়া একটা প্রণাম করিয়া, দশ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া "বাড়া ভাত" খাইত। পূর্ব্বরাত্রে স্বামী, শ্বশুর, ভাসুর ভাত খাইবার পর তাঁহাদের পাতে যাহা থাকিত, তাহাই গৃহিণী ঢাকিয়া রাখিতেন। সেই কড়কড়ে ভাত সকালে উঠিয়া নূতন পোয়াতীরা খাইত। দেড় বৎসর হইতে সাত বৎসরের ছেলেরা উঠিলে মুখ হাত পা ধুইয়া ক্ষুদের জাউ খাইত। অর্থাৎ চালের ক্ষুদ দুধের

সহিত বা জলে সিদ্ধ করিয়া, তাহাতে একটু চিনি দিয়া বা লবণ দিয়া প্রত্যেক শিশুকে খাইতে দিতে হইত। লোণা জাট হইলে অনেক গৃহিণী তাহার সঙ্গে এক মুঠা কাদাচিংড়ি সিদ্ধ করিয়া তেল নুন মাখিয়া দিতেন। এখন এই ক্ষুদের জাট বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলখানার কয়েদীরা খায়, গৃহস্থবাড়ীতে উহার ব্যবহার আর নাই। এইবার গোসেবা ও গোদোহন হইত, রস্থইঘর নিকান হইত, ঠাকুরঘর ধোয়া, পূজার বাসন মাজা আরম্ভ হইত। এই সময়ে বাড়ীর কর্ত্তাদের মধ্যে কেহ কেহ গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া ফুলের সাজি হাতে বাহির হইতেন; যুবকের দল উঠিয়া কেহ বা উন্নুন ধরাইবার জন্য কাঠ কাটিয়া দিত, কেহ বা একখানা খ্যাপ্‌লা লইয়া পুকুরে মাছ ধরিতে যাইত, কেহ বা হাটে যাইত। সংসারের কাজ সকলকেই অল্পবিস্তর করিতে হইত। কেহ ঠায়ে বসিয়া থাকিতে পারিত না।

বেলা দেড় দণ্ড কাটিলে ছেলেরা পাততাড়ি বগলে করিয়া, কোঁচড়ে মুড়ি লইয়া পাঠশালের দিকে ছুটিত। যুবকদিগের মধ্যে যাহারা টোল চতুষ্পাঠীতে পড়িত, তাহারা হয় স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া, নহিলে কেবল প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া, খুঙ্গি পুথি বগলে করিয়া গ্রামের চতুষ্পাঠীতে পাঠ লইতে যাইত। যাহারা নবদ্বীপে পড়িতে যাইত, তাহারা গুরুগৃহেই বাস করিত। বাড়ীর যুবকদের আর একটা কাজ ছিল। হাটের দিন হইলে কোথায় কোন্ হাটে কোন্ সামগ্রী সস্তা পাওয়া যায়, তাহার খোঁজ করিয়া সস্তায় ঘৃত, তৈল, লবণ, পাকের মশলা, গুড়, শর্করা প্রভৃতি খরিদ করিয়া আনিতে হইত। তখন, এখনকার মতন ঝাঁকামুটে সর্ব্বত্র পাওয়া যাইত না। বাড়ীর ছেলেরাই মোট মাথায় করিয়া বাড়ীতে আনিতেন। ইহাতে কাহারও কোন লজ্জাবোধ হইত না। বেলা দশটার পর বারোটার পূর্ব্বে বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ সকলের স্নান আহ্নিক, ঠাকুরপূজা ও গৃহস্থালীর সকল কাজ শেষ করিতে হইত। স্ত্রী পুরুষ কেহই শুধু হাতে গঙ্গাস্নানে যাইতেন না। সকলেই একটা ছোট কলসী হাতে করিয়া স্নানে যাইতেন। গল্পে আছে, দাওয়ান ৺রামকমল সেনের পিতা কলিকাতায় পুত্রকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দাওয়ান রামকমলের জন্য চারিটা ঘড়া ভরিয়া জল রাখিয়া দেওয়া হইত; তিনি তাহাতেই স্নান করিতেন। বৃদ্ধ পিতা গঙ্গাস্নানে যাইবার সময়ে একটা ঘড়া হাতে

করিয়া গিয়াছিলেন। দাওয়ান রামকমল এ জন্য একটু ক্ষুব্ধ হন এবং পিতাকে অমনভাবে জল আনিতে বারণ করেন। উত্তরে পিতা বলিলেন, বাবা, শুধু হাত পা দোলাইয়া ত খাইতে পারিব না, ভাত হজম হইবে কেন। অতএব আমাকে গরীফার গ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইল। এই বলিয়া বৃদ্ধ রাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া যান। তাহার পর আর কলিকাতার বাটীতে আসেন নাই।

সকল বাটীর মেয়েরা পাককার্য্য ছাড়া অনেক শিল্পকার্য্যও জানিত। চরকা ও টেকোয় সুতা কাটা তখন সকল বাড়ীতেই ছিল। ইহা ছাড়া শিকা তৈয়ারি করা, সুজুনি সেলাই করা, কাঁথা তৈয়ারি করা অনেকে ভালরূপেই জানিত। তখন ফিতার রেওয়াজ এত ছিল না, তাই প্রত্যেক সীমন্তিনীই চুলের দড়ি বুনিতে জানিত, খোঁপার সাজসরঞ্জাম যোগাড় করিতে পারিত। পুরুষদের মধ্যেও অনেকে অনেক রকম শিল্পকার্য্য জানিতেন। বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিত যেমন এক দিকে পাণ্ডিত্যের সাগর ছিলেন, তেমনি অন্য দিকে নানা শিল্পকার্য্যে পণ্ডিত ছিলেন। হালিশহরের বলরাম বিদ্যাভূষণ ভাল ঘর ছাইতে জানিতেন; তিনি এক জন পাকা ফরাসী ছিলেন। বাণেশ্বর সুজুনি সেলাই করিতে অদ্বিতীয় ছিলেন, মথুরেশ তালের ও খেজুরের চেটাই বুনিতে পারিতেন। সকল পণ্ডিতই এবম্প্রকারের একটা না একটা শিল্পকার্য্যে পটু ছিলেন। যে পুরুষ লাঠি খেলিতে, সন্তরণ দিতে, কুস্তি করিতে পারিতেন না, ঘর-গৃহস্থালীর কোন একটা কাজ ভালরূপে না জানিতেন, তাঁহাকে লোকে গোবরগণেশ বলিয়া ঠাট্টা করিত। ব্রাহ্মণের ছেলেকে রন্ধনকার্য্য শিখিতেই হইত। ছেলে বিদেশে যাইলে কাহার হাতে খাইবে, এই চিন্তার বিষণ্ণ হইয়া সেকালের ব্রাহ্মণীসকল নিজ নিজ পুত্রকে অল্প বয়স হইতেই রন্ধনকার্য্য শিখাইতেন। তখন ত যাহার তাহার হাতে যে-কেহ খাইত না; এমন কি, অপরিচিত ব্রাহ্মণের হাতে কায়স্থাদি ব্রাহ্মণেতর জাতিসকল খাইত না; গতিকেই পুরুষ মাত্রেই পাককার্য্য শিখিতে বাধ্য হইতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে বড় বড় পাচক ছিলেন। শেষ বিখ্যাত ও পটু পাচক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন। সেকালের লোকে বেজায় স্বাবলম্বী ও সর্ব্বকার্য্যে পটু হইতেন; বিশেষ যাঁহারা দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহারা ত পাকা দশকর্ম্মান্বিত পুরুষ হইতেন।

লেখাপড়ার সঙ্গে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত, নিজের সকল অভাব নিজের চেষ্টায় পূর্ণ করিতে হইত, তাই সেকালের লোকের অম্লরোগ, মন্দাগ্নি, বহুমূত্র প্রভৃতি হইত না। কবি ভারতচন্দ্র বাবু ছিলেন, সৌখীন ছিলেন, তাঁহার বহুমূত্র রোগ হয় এবং তাহাতেই মৃত্যু ঘটে। এই জন্য তখনকার পণ্ডিতসমাজ ভারতচন্দ্রকে লইয়া রং তামাসা করিতেন। তিনি পেনেটি হইতে নৌকা চড়িয়া কৃষ্ণনগরে যাতায়াত করিতেন; লোকে হাসিত; বলিত, হাঁটা পথ থাকিতে পুরুষ মানুষে নারীর মতন নৌকায় চড়িয়া যায়! ছিঃ—ওটা আবার মানুষ! তখনকার ভদ্রলোকে দশ ক্রোশ পথ হাঁটিতে ভয় পাইত না, উহা অনেকের পক্ষে নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। যে দশ ক্রোশ হাঁটিতে পারিত না, তাহাকে পুরুষ বলিয়া কেহ গ্রাহ্য করিত না।

সেকালের মেয়েরাও খুব বলিষ্ঠা হইতেন। প্রায় সকলেই সাঁতার দিতে জানিত, গুলেল হাতে করিয়া বাঁটুল ছুঁড়িতে পারিত। পিতামহীর কাছে গল্পে শুনিয়াছি যে, খামারপাড়ার মেয়েরা দল বাঁধিয়া বাঁটুল ছুঁড়িয়া এক দল বর্গীকে হটাইয়া দিয়াছিল। রাঢ়ের অর্থাৎ পঞ্চকোটের, বাঁকুড়ার ও বিষ্ণুপুরের মেয়েরা ভাল তীর ধনুক ছুঁড়িতে পারিত। ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনের এক দল বর্গীকে বীরভূম জেলার নারীহস্তে নিৰ্জ্জিত হইতে হইয়াছিল। সেকালের মেয়েদের বীরত্বের অনেক কাহিনী আমাদের পিতামহীর আমলে পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালী কেবল নবাবী সিপাহী ও কোম্পানীর ন্যাংটা গোরার দলকে বেজায় ভয় করিত। নবাবের ফৌজ আসিতেছে শুনিলে গ্রাম ছাড়িয়া সবাই বনে যাইয়া আত্মগোপন করিত। পরে কোম্পানীর ন্যাংটা গোরা (Highlander) এবং লাল পল্টন ও তেলেঙ্গা সিপাহী দেখিলে বাঙ্গালী গ্রামবাসী বেজায় ভয় পাইত। ইহারা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল, ইহাদের স্পর্শে জাতি যাইত, নবাবের সিপাহীরা জোর করিয়া অনেককে মুসলমান করিত, গ্রামে আসিয়া গোবধ করিত, যুবতী দেখিলে তাহাকে কাঁড়িয়া লইয়া যাইত, তাই নবাবের ফৌজের নামে বাঙ্গালী থরথর কম্পিত হইত।

বাঙ্গালার কোন গ্রামে সেকালে কোন প্রকারের অবরোধপ্রথা ছিল না। গ্রামের ঝিউড়ীরা, যত বয়সই হউক না, কখনই মাথায় কাপড়

দিয়া পথে ঘাটে যাইত না। বাপের বাড়ীর দেশে মেয়েদের সাড়ে ষোল আনা স্বাধীনতা ছিল। বধূদিগের পক্ষে অবগুণ্ঠনের ব্যবস্থা ছিল বটে, পরন্তু ঘোম্‌টা টানিয়া তাহারা গ্রামের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারিত; কেবল যত দিন ক'নে বৌয়ের অবস্থা থাকিত, যত দিন শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিতেন, তত দিন একটু আটক ছিল। যত দিন পুত্রবতী না হইতেন, তত দিন বধূদের নাম তাঁহাদের বাপের বাড়ীর গ্রাম অনুসারে হইত। যেমন ভাটপাড়ার বৌ, কালীঘাটের বৌ ইত্যাদি। ইহা ছাড়া বাড়ীতে পাঁচ সাতটি ছেলে থাকিলে, সেই কয় ছেলের বধূ ঘরে আসিলে, তাহাদের সোহাগের নাম দেওয়া হইত। যথা চাঁদ বৌ, মাণিক বৌ, গোলাব বৌ, সাধের বৌ, খুকী বৌ, বড় বৌ, মেজ বৌ, সেজ বৌ ত বলিতই, সঙ্গে সঙ্গে সাধের নামও থাকিত। মুর্শিদাবাদ ও কাটোয়া অঞ্চলে এই সাধের নাম প্রায়ই দেওয়া হইত বলিয়া, উহাকে "সওদাবেজে ঢং" আমাদের দক্ষিণ দেশে বলিত। দিনের বেলায় স্বামি-স্ত্রীতে দেখা হইত না, তবে শ্বশুরবাড়ী যাইলে, অর্থাৎ পত্নীর বাপের বাড়ী যাইয়া পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে দিনের বেলায় দেখা হইত। কারণ, বাপের বাড়ীতে মেয়েদের সাত খুন মাফ ছিল। আমাদের ধারণা আছে যে, সেকালের মেয়েরা লেখাপড়া জানিত না। ইহা ভুল ধারণা—সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ীর মেয়েরা প্রায় সকলেই লেখাপড়া শিখিত; অনেক ব্রাহ্মণীর হাতের লেখা চণ্ডী পুঁথি আমরা দেখিয়াছি। ব্রাহ্মণকন্যা মাত্রেই দশকর্ম্মের পদ্ধতি জানিতেন, অনেকের মন্ত্র পর্য্যন্ত মুখস্থ থাকিত। অনেকে স্মৃতিশাস্ত্রের খবর রাখিতেন, মোটামুটি অনেক ব্যবস্থা বলিয়া দিতে পারিতেন। গল্প আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের পত্নী নবদ্বীপের গঙ্গায় স্নান করিতে যাইলে, অনেকে তাঁহার কাছে অনেক ব্যবস্থার কথা জানিয়া লইত। তাই এক দিন তর্কালঙ্কার হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"গৃহিণি, তুমিই যদি পাঁতি দিতে আরম্ভ করিলে, তবে আমি চৌপাঠী ছাড়িয়া কেবল কাঁথা সেলাই করি।" উত্তরে গৃহিণী নথ নাড়িয়া বলিয়াছিলেন,—"তুমি কি মনে কর, আমি পারি না; তোমার ছেলেদের আমি তোমার চেয়ে ভাল করিয়া পাঠ দিতে পারি।" সত্যই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগৃহিণী পতি বিদেশে যাইলে ছাত্রদের পাঠ দিতেন। এমন দুই একটা ঘটনার কথা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ তাঁহার লিখিত ব্রাহ্মণ

জাতির ইতিহাসে লিখিয়াছেন। কেবল ব্রাহ্মণকন্যা কেন, বৈদ্য, কায়স্থ, গন্ধবণিক্ প্রভৃতি জাতির মেয়েরা বেশ লেখাপড়া জানিতেন। বাঙ্গালায় অনেক মেয়ে কবি ছিল, তাহাদের দল ছিল, তাহারা ছড়া কাটাইত, গান বাঁধিত। আসল কথা এই, মুসলমানদের রাজ্য যাইবার পর কোম্পানীর রাজ্য পাকা হইয়া বসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় অতি ভীষণ অরাজকতা হইয়াছিল। সেই ভয়ানক অরাজকতার সময়ে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ ছন্নছাড়া হইয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে লেখাপড়া, রাগরঙ্গ সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। লোকে জান ও মান লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। সেই সময়কার মূর্খতার ঢেউ ইংরেজের প্রথম আমলে সমাজের উপর ছিল; তাই রাজা রামমোহন রায়ের সমসময়ের সমাজসংস্কারকগণ বাঙ্গালার হিন্দু সমাজকে মূর্খ বলিয়া ঠাওরাইয়াছিলেন।

সেকালে এখনকার মতন এত ময়দার প্রচলন ছিল না। বাঙ্গালী প্রধানতঃ ভাতই খাইত, এবং চাউলের নির্ম্মিত পায়স পিষ্টক খাইত। লুচি একটা luxury, একটা সখের খাদ্য ছিল। কাহারও বাড়ীতে লুচি হইলে শ্লাঘার আর সীমা থাকিত না। হালুইকর ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাহারও দোকান হইতে কেহ কোন প্রকারের খাদ্য দ্রব্য কিনিয়া খাইত না। হালুইকরের দোকানে কেবল কাঁচা গোল্লা তৈয়ার হইত, পক্বান্ন সামগ্রী হইত না; কেহ খাইত না। কচুরি, জিলাপি, সিঙাড়া, মিঠাই, দোকান হইতে আনিয়া কেহ খাইত না। দোকানে কাঁচা গোল্লা, বীরখণ্ডী, কদমা ও বাতাসা পাওয়া যাইত। সাধারণতঃ দুধে বাতাসা দিয়া লোক খাইত; দুধের সহিত চিনি বা শর্করা কদাপি মিশাইত না। বাতাসাকে ফেণী বলিত। দধির সহিত চিনি বা শর্করা মিশাইয়া খাইত। কদমা, মঠ প্রভৃতির চলনটা তখন বেশী ছিল। এখন কেবল দোলের সময়ে মঠ, কদমা ও বাতাসা তৈয়ার হয়। সেকালের গৃহিণীরা বলিতেন যে, বাতাসা ও কদমায় চিনির দোষ নষ্ট হয়; চুন মিলান থাকিত বলিয়াই ছেলেদের হাতে গৃহিণীরা বাতাসাই দিতেন। আমরা বালককালে কখনই পিতামহীর নিকট হইতে সাদা চিনি খাইতে পাইতাম না; তিনি বাতাসা বা কদমা সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন, আমাদের তাহাই দিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, সাদা চিনি খাইলে বহুমূত্র রোগ হয়; বাতাসা ও কদমায় সে দোষ থাকে না। এখন মনে হয়, পিতামহীর সে কথাটা খুব খাঁটি। কি

ধনী, কি নির্দ্ধন, সকলের পক্ষে সেকালে মুড়িই প্রধান জলখাবার ছিল, সকালে গুড় ছোলা বা আদা ছোলা, অপরাহ্নে মুড়ি—ইহাই সকলের জলপানের উপাদান ছিল। ঘি, দুধ, মাছ, ভাত, গৃহজাত শাকসব্জি, ইহাই বাঙ্গালীর প্রধান ভোজ্য ছিল। কালীপূজা না হইলে পাঁঠার মাংস বাঙ্গালীর ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিত না; কোন বাঙ্গালী বৃথামাংস খাইত না। তবে পূর্ব্বে কচ্ছপের মাংস, কচ্ছপের ডিম বাঙ্গালী অধিক খাইত। ভারতচন্দ্র কচ্ছপের ডিমকে "গঙ্গামণ্ডা" বলিয়া আদর করিয়া গিয়াছেন। কুম্ভীরের ডিমও বাঙ্গালী খাইত; তবে এখনকার মতন কাঁকড়ার প্রচলন এতটা ছিল না। ব্রাহ্মণে কাঁকড়া খাইত না। হাঁসের ডিম পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্বঙ্গের লোকে অধিক খাইত। ব্রাহ্মণে হংসডিম্ব প্রায়ই খাইত না, খাইলে কিন্তু কাহারও জাতি যাইত না। তান্ত্রিক গৃহস্থদিগের বাড়ীতে মাংসটা প্রায়ই হইত। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালায় প্রচারিত হইবার পর হইতে বাঙ্গালায় মাংস ভোজন অনেকটা সঙ্কোচ লাভ করিয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণ বাঙ্গালীকে মাছ ছাড়াইতে পারেন নাই, মাংসভোজন হইতে অনেকটা বঞ্চিত করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্যে গন্ধবণিক্‌দের ভোজের বর্ণনা আছে; তাহাতে মাংসের বর্ণনা খুব আছে; সকল বেণেই পংক্তিতে বসিয়া নানাবিধ মাংস খাইয়াছিল; সে ভোজে সুবর্ণবণিক্‌ও ছিল। কিন্তু এখন বাঙ্গালার বণিক্‌গণ তুলসীর মালা গলায় পরিয়া, কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, মাংসভোজন একেবারেই বর্জ্জন করিয়াছে। এ পরিবর্ত্তন যে কবে হইল, তাহা ঠিক বলিতে পারি না, তবে কবিকঙ্কণের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালার বণিক্ জাতি যে খুব মাংসভোজী ছিলেন, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার একটা পানীয় ও খাদ্য, যাহা পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা এখন একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে; উহা কাঁজি এবং ক্ষুদের জাউ। নেবুর রস দিয়া কাঁজি নিত্য পান করা হইত; বিশেষতঃ শরৎ, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে উহা সকলেই নিয়মিত পান করিত; এখন তাহার পরিবর্ত্তে লোকে চা পান করে। ক্ষুদের জাউ ত ছেলেরা নিত্য প্রাতঃকালে খাইত; যুবক ও প্রৌঢ়ের দলও ভাত খাইবার পূর্ব্বে একটু ক্ষুদের জাউ খাইয়া লইত। ক্ষুদ খাওয়াটা এখন একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে; কাঁজি তৈয়ার করিতে এখন আর কেহ জানে না, খুঁজিলেও

এখন কাহারও বাড়ী হইতে পুরাতন কাঁজি পাওয়া যায় না। এখন গৃহস্থ চালের ক্ষুদ ফেলিয়া দেন বা গরুকে দেন, পূর্ব্বে উহা মনুষ্যের একটা উপাদেয় খাদ্যে পরিণত হইত। এখন আমরা ভাতের ফেন ফেলিয়া দিই, পূর্ব্বে উহা ফেলা যাইত না; উহার কিছু গরুতে খাইত, কিছু মানুষে খাইত। ফেনের সহিত চাট্টি সফেদা বা ক্ষুদ দিয়া, একটু দুধ ঢালিয়া দিয়া ও কিঞ্চিৎ শর্করা মিশাইয়া ছেলেদের একটা উপাদেয় খাদ্য তৈয়ার হইত। নেও কাঁঠালের রস ভাল আতপ তণ্ডুলের ফেন মিশাইয়া খাইবার পদ্ধতি ছিল; আর খাজা কাঁঠাল ক্ষীর দিয়া খাইতে হইত। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর গৃহে কোন কিছুর অপচয় হইতে পাইত না। আলু, কুমড়া, পটোল প্রভৃতির খোসা আবার ছোট ছোট করিয়া কুটিয়া, তাহাতে দুটিখানি নটে শাক ও চিংড়ি মাছ দিয়া ছোট ছোট মেয়েরা বাটিচচ্চড়ি করিত; সেই বাটিচচ্চড়ির তরকারি ক্ষুদের জাউয়ের সহিত মেয়েরা পরম পরিতোষের সহিত খাইত। এখন বাটিচচ্চড়ি অনেকে বুঝেই না। একটি পিতলের বাটিতে একটু তৈল দিয়া, তরকারির বাখলা দিয়া এবং কাদাচিংড়ি মিশাইয়া ঘুঁটের আগুনের উপর বা কয়লার আগুনে বসাইয়া রাখিতে হয়। অল্প আগুনে দুই তিন ঘণ্টায় উহা সুসিদ্ধ হইয়া উঠে। অনেকটা ছ্যাঁচড়ার মতন খাইতে হয়, লাগেও ভাল। ফেলাছড়ার রীতি পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীর ঘরে ছিল না; কেহ ভাত ফেলিয়া দিলে বা চাল ধুইতে যাইয়া পুকুরঘাটে চাল ফেলিলে গৃহিণীরা রাগে গর্জ্জিয়া উঠিতেন। ভাত খাইতে না পার, জল দিয়া রাখিয়া দেও, ও-বেলা খাইবে। তুমি না পার, অন্যে খাইবে; মানুষে না খায়, গরুতে খাইবে,—পরন্তু খবরদার, ভাত আঁস্তাকুড়ে ফেলিও না। এই মিতব্যয়িতা এবং সংযম ছিল বলিয়াই বাঙ্গালীর কখনই ভাতের অভাব হয় নাই। বাঙ্গালীর পক্ষে হাভাতে, হাঘরে বেজায় গালাগালি ছিল। আর আজ সেই বাঙ্গালী হা ভাত, হা ভাত করিয়া কেবল কাঁদিতেছে।

সেকালের বাঙ্গালীর বসন ভূষণও অতি পরিমিত ছিল। সাধারণতঃ পুরুষের কাপড় ও গামোছাই পর্য্যাপ্ত বসন ছিল। কোন ভিন্ন গ্রামে যাইতে হইলে একখানা চাদর হইলেই ঢের হইত। সেলাই-করা জামা ব্রাহ্মণ মাত্রেই ব্যবহার করিতেন না। ব্রাহ্মণেতর জাতি এবং ধনবান্

ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলেরা আঙরাখা বা মির্জ্জাই পরিত। যাঁহারা দরবারী ছিলেন, তাঁহারা জামা, চোগা, পাগড়ি এবং ইজার পরিধান করিতেন। চরণে চটি জুতাই প্রায় শোভা পাইত; যাহারা একটু মুসলমানী ফ্যাশানের ছিল, তাহারা লক্কাদার দিল্লীর বা কাশীর জুতা পরিত। গ্রামে খড়মেই চলিয়া যাইত; গাড়ু, গামোছা এবং খড়মই গ্রামের পোষাক ছিল। বৎসরে ছয়খানা কাপড় এবং তিনখানা গামোছা হইলেই পর্য্যাপ্ত হইত। এক জোড়া খড়মে এক বৎসর বেশ কাটিয়া যাইত। জুতা কখনই চরণতলে থাকিত না, প্রায়ই হাতে হাতে ঘুরিত। দূরে গ্রামে যাইতে হইলে, মাঠের পথে চটি জুতা হাতে হাতেই যাইত, গ্রামের প্রান্তে এক পুষ্করিণীর ঘাটে যাইয়া, হাত মুখ ধুইয়া সবাই জুতা পায় দিতেন। আট-পহুরে কাপড়ের সুতা প্রায়ই বাড়ীর মেয়েরা কাটিয়া দিত, সেই সুতা গ্রামের তাঁতীকে দিলে সে কাপড় বুনিয়া দিত। কাপড় বুনাই খরচ এক কাহন ধান বা আড়াই পণ কড়ি ধার্য্য ছিল। এবম্প্রকারের আট-হাতি কাপড়ের দুই জোড়া পাইলেই পুরুষের এক বৎসর কাটিয়া যাইত। মেয়েদের জন্যে আটপহুরে গড়া ধুতি দেওয়া হইত; তাহার চারিখানায় একটি মেয়ের জন্য এক বৎসর বেশ চলিত। তাহাদের ভাল ধুতি শান্তিপুরে বা সাতগেঁয়ে (এখনকার লালবাগানের) শাটী হইলেই চূড়ান্ত হইত। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর মেয়েরা রং-করা কাপড় অধিক ব্যবহার করিত। এখনকার মতন পাড়দার সাদা ধুতি প্রায় বাঙ্গালী সধবা স্ত্রীলোকে ব্যবহার করিত না। নীলের কোর দেওয়া, পেঁয়াজের রং, হরিদ্রাবর্ণ বা মুর্শিদাবাদের লাল শাটীই মেয়েরা অধিক ব্যবহার করিত। বিধবা ও ব্রাহ্মণ পুরুষে সাদা কাপড় পরিত। সেকালে পাছাপেড়ে ধুতি ছিল না; পাছাপেড়ে ধুতি ইংরেজের আমলেই হইয়াছে; বোধ হয় ষাট বৎসরের অধিক পুরাতন হইবে না। সেকালে গুল-বসান, তেরছা-বুনান কল্কা ও ডুরে শাটীই সাধারণতঃ ব্যবহার হইত। এত পাতলা ধুতির রেওয়াজ ছিল না। পুরুষ মানুষে মিহি কাপড় পরিলে সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইত। কালাপেড়ে কাপড়ও খুব আধুনিক; কোন বাঙ্গালী কালাপেড়ে কাপড় পরিত না। মেয়েরাও নীলাম্বরী ছাড়া কালাপেড়ে পরিত না। কালাপেড়ের চলন পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইবে না। ধোপার সহিত সম্পর্ক বাঙ্গালীর খুব কমই ছিল। আটপহুরে কাপড়

বাড়ীতে ক্ষারেই কাচা হইত, ভাল কাপড় ধোপায় কাচিয়া আনিয়া দিত। মেয়েদের কাপড় ময়লা হইলে ক্ষারে কাচিয়া, তাহাতে আবার রং চড়াইয়া লওয়া হইত। শিউলি ফুল, শিমপাতার রস এবং বকম কাট দিয়াই প্রধানতঃ কাপড় ছোবান হইত। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরের মেয়েদের কাপড় ধোপার বাড়ী না যাইয়া রংরেজের বাটীতেই যাইত। মেয়েরা জামা বা বডিস্ পরিত না, কাঁচুলির ব্যবহার খুব অধিক ছিল। কাঁচুলি ছাড়া বাঙ্গালীর মেয়ে প্রায়ই ঘরের বাহির হইত না। ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়েরা সেলাই-করা জামা প্রায়ই পরিত না, কিশোরী এবং যুবতী ব্রাহ্মণকন্যাদের কেহ কেহ উৎসব আনন্দে কাঁচুলি পরিত। সেকালে কাঁচুলির দাম ছিল—দুই টাকার কমে এক জোড়া কাঁচুলি হইত না; পঞ্চাশ টাকার অধিকও কাঁচুলির মূল্য নির্ণীত ছিল, হাজার টাকা মূল্যের কাঁচুলিও ব্যবহৃত হইত। কাঁচুলির বর্ণনায় ঘনরাম, মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিগণ তাঁহাদের কাব্যের যে কত পৃষ্ঠা ব্যয়িত করিয়াছেন, তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন। নারীদের কাপড় চোপড় অপেক্ষা অলঙ্কারই অধিক ছিল। রাজা মানসিংহ বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীর নারীদের মত সালঙ্কৃতা এবং সু-অবয়বসম্পন্না নারী আমি ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে দেখি নাই। হিন্দুস্থানে একটা ঠাট্টার কথা প্রচলিত আছে যে, বাঙ্গালার পীনোন্নতপয়োধরা নারী দেখিয়া এবং কাঁচুলির অপূর্ব্ব নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়া রাজা মান বাঙ্গালীর মেয়েদের দেহ হইতে কাঁচুলি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সেই অবধি—

ছাদ, বাজ, কেশ
তিন বাংলা দেশ।
চুণা চুচী দহি
তিন বাংলা নহি॥

এই প্রবচন ভারতবর্ষের হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে। রাজা মানই বাঙ্গালীর পাগড়ি এবং কাঁচুলি কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

বাঙ্গালীর ভোজ্যের ও কাণ-ভূষণ এবং আভরণের বর্ণনা বারান্তরে দিব। এবার মোটামুটি সাধারণ গোটাকয়েক কথা বলিয়া রাখিলাম। ('প্রবাহিণী,' ২৭ আষাঢ় ১৩২২)

পঞ্চ 'ম'কার

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—ইহাই তন্ত্রসাধনার পঞ্চ মকার বা পঞ্চ তত্ত্ব। শ্লীলবাদী বাবুরা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, এই পঞ্চ তত্ত্বের কি কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে, কোন esoteric অর্থ আছে, না উহা সোজাসুজি সাধারণ ভাবে বুঝিতে হইবে? এই জিজ্ঞাসার সহিত এটুকু ইঙ্গিতও করা হয়, যেন সোজা অর্থে উহা বেজায় মন্দ, ধর্ম্মের নামে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়; উহা Black Art বা কালা বিদ্যা, বামমার্গ বা সজ্জন-সমাজের হেয় ব্যাপার। তন্ত্রগ্রন্থসকল পাঠ করিয়া আমাদের যাহা ধারণা হইয়াছে, তাহাতে ত আমরা বুঝি—পঞ্চ তত্ত্বের তিন প্রকারের প্রয়োগ আছে। (১) এক, মোটামুটি সোজাসুজি অর্থ; মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন বাহ্য পূজায় এবং স্থূল সাধনায় উহার নিয়মিত প্রয়োগ আছে; (২) মানস পূজায় উহার অর্থ স্বতন্ত্র নহে, তবে তাহা কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র; মনে মনে কল্পনা করিতে হইবে যে, আমি সাধক দেবীকে সুরার সাগর, মাংসের পর্ব্বত, মৎস্যের স্তূপ, মুদ্রার ভাণ্ডার দিতেছি এবং পদ্মিনী নারীর সহিত মৈথুন সাহায্যে কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করিতেছি; (৩) ষট্চক্রভেদে পঞ্চ তত্ত্বের অর্থ স্বতন্ত্র, প্রয়োগও স্বতন্ত্র, সেখানে উহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বা ইসটরিক অর্থ আছে। কিন্তু তন্ত্রের পদ্ধতিমত ষট্চক্রভেদ কয় জন করিতে পারে? কয় জন বাহিরের শক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন ঘটাইতে পারে? পারে না—সচরাচর হয় না বলিয়াই উহার সোজা অর্থ ধরিতে হয়, সাধারণতঃ লোকে পঞ্চ মকারে যাহা বুঝে, তাহাই ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে লজ্জার বা সঙ্কোচের বিষয় কি আছে? তন্ত্রধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম নহে, উহা গুপ্ত—গোপ্য সাধনার ধর্ম্ম; যাহার যেমন শক্তি, যাহার যেমন অধিকার, তাহাকে তেমনই কর্ম্মপদ্ধতি দেখাইয়া দিয়া তন্ত্র, জীবমাত্রেরই উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। তন্ত্র ভাবের ঘরে চুরি করে না, ভিতরের পর্দ্দা ও বাহিরের পর্দ্দা রাখে না; তুমি যেমন, তোমার প্রবৃত্তি যেমন, তেমনই সাধনপদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সুতরাং পঞ্চ মকারে লজ্জাবোধ করিবার ত কোন হেতু দেখি না।

পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, আত্মশক্তি, উন্মেষ সাধনই তন্ত্রসাধনা। তন্ত্র নিজের দেহস্থ আত্মা ছাড়া অন্য কোন বাহ্য শক্তিকে দেবতা, ঈশ্বর বলিয়া মানে না। তন্ত্র বলেন যে, আমার দেহমধ্যে যে এক জন বিরাজ করিতেছেন, তাহা আমি বুঝি; তিনি জগৎকে বুঝিতে চাহেন, সৃষ্টি-প্রহেলিকাকে উদ্ঘাটন করিতে চাহেন। তাই অনুমান করিতে হয় যে, যিনি আমার ভিতরে আছেন, তিনিই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে আছেন। আমার ভিতরের ঠাকুরকে আমি চিনিতে পারিলে বাহিরের ঠাকুরটি আপনি আসিয়া ধরা দিবেন। এখন দেখিতে হইবে, আমার ভিতরের ঠাকুরের বিকাশ কেমন করিয়া হয়। আহারে বিহারে, জীবনের উপভোগে ভিতরের ঠাকুরটি যেন একটু জাগিয়া উঠেন। বিশেষতঃ কাম ও মদনের চেষ্টায় ভিতরের ঠাকুরের যেন কতকটা নাগাল পাওয়া যায়; কারণ, কাম-চর্চ্চার ফলে নরনারীর সংযোগে একটা নূতন জীবের সৃষ্টি হইতেছে। অতএব মৈথুন হইতেই কুণ্ডলিনীর জাগরণের পদ্ধতি অনেকটা বুঝা যায়। তন্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন, সিসৃক্ষা বা সৃজন ইচ্ছা কামের নামান্তর মাত্র। যে পরমাত্মা 'এক আমি বহু হইব' বলিয়া সৃষ্টিপ্রহেলিকার বিকাশ করিয়াছিলেন, সেই পরমাত্মা তোমার দেহস্থ থাকিয়া এক আমি বহু হইবার সাধ অন্য নারীতে উপগত হইয়া মিটাইয়া থাকে। আদি সৃষ্টিতে যেমন আদ্যা শক্তির জাগরণের ফলে বিশ্বাত্মার মনে সিসৃক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তেমনই নারী-দেহাভ্যন্তরে আদ্যা শক্তি কুণ্ডলিনী জাগিয়া উঠিলে, তবে সে নারী পুরুষকে আকর্ষণ করে এবং সেই আকর্ষণের ফলে, স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্বের সংযোগে নূতন জীবসৃষ্টি হয়। কুণ্ডলিনী না জাগিলে কোন স্ত্রীই গর্ভবতী হইতে পারে না, কুণ্ডলিনী না জাগিলে কোন পুরুষের রেতঃপ্রবাহের সহিত আত্মশক্তির নিঃসরণ হয় না, নারীর জরায়ুতে নব জীবের আধান হয় না। অতএব প্রকৃত মৈথুনপদ্ধতির বিশ্লেষণ করিতে পারিলে আত্মশক্তির কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহাই হইল তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বের থিওরি বা সিদ্ধান্তকথা। একা তন্ত্র কেন—উপনিষদে, পুরাণে, বৈষ্ণব শৈব সকল শাস্ত্রে এই একই সিদ্ধান্ত নানা ভাবে, নানাপ্রকারের ভাষায় বর্ণিত আছে। অন্য সকল শাস্ত্র যাহা থিওরির হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়া নিরস্ত আছেন, তন্ত্র তাহাকে করিয়া কর্ম্মিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। এইখানে একটা কথা বলিব। আমাদের

দেশে কতকটা হঠযোগের প্রভাবে, কতকটা খ্রীষ্টানধর্ম্মের প্রভাবে নারী বা স্ত্রীজাতি সমাজে যেন একটু নিম্ন স্থান অধিকার করিয়াছেন। অথচ বেদ হইতে পুরাণ তন্ত্র পর্য্যন্ত সকল ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রই বার বার বলিয়া রাখিয়াছে যে, নারী নরের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী, ধর্ম্মকর্ম্মের সহচরী। বেদের কোন যজ্ঞই পত্নী ব্যতীত হইবার জো নাই; অগ্নিহোত্রী হইতে হইলে পত্নী চাহি। পৌরাণিক ক্রিয়াকর্ম্ম পত্নীর সহিত করিতে হয়; পত্নীসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া তীর্থদর্শন করিলে সে দর্শন ব্যর্থ হয়; শ্রাদ্ধ শান্তিও পত্নী সহ করিতে হয়। শক্তিশূন্য হইয়া কোন যজ্ঞ করিবার উপায় নাই। দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে পতি পত্নী একসঙ্গে লইতে হইবে; জপযজ্ঞ করিতে হইলে পতি পত্নী একসঙ্গে করিতে হইবে; মহানির্ব্বাণতন্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ভৈরবীচক্রে পত্নীকে শক্তিরূপে পাইলে অন্য নারীর প্রয়োজন হয় না। অন্য নারীকে শক্তি করিতে হইলে শৈব পদ্ধতিমতে তাহাকে বিবাহ করিয়া, পত্নীর পদে বরণ করিয়া, তবে চক্রে বসিতে হইবে। যাহার পত্নী নাই, তাহার কোন বৈধ কর্ম্মে অধিকার নাই; সে গৃহস্থাশ্রমে থাকিতেই পারে না। তাহাকে হয় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে হইবে, নহিলে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে। গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইলে বিপত্নীক পুরুষকে বিবাহ করিতেই হইবে। অবশ্য যদি কোন গৃহীর পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হইলে স্ত্রীবিয়োগ হয়, তাহা হইলে তিনি ইচ্ছা করিলে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু গৃহী কর্ত্রী থাকিতে হইলে তাঁহাকে শৈব মতে বিবাহ করিয়া ঘর সংসার চালাইতে হইবে। ইহাই তন্ত্রের আদেশ। শঙ্করাচার্য্য নারীকে নরকের দ্বার বলিয়াছেন, এই হেতু ব্রহ্মানন্দ গিরি শঙ্করাচার্যকে খুব একহাত তিরস্কার করিয়াছেন। তন্ত্রমতে নারীই আদ্যাশক্তিস্বরূপিণী—জগন্ময়ী—জগজ্জননী; সুতরাং নারী পূজনীয়া, অর্চ্চনীয়া, সাদরে রক্ষণীয়া। খ্রীষ্টানধর্ম্মে নারীকে শয়তানের প্রলুব্ধা জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। খ্রীষ্টানধর্ম্ম অনুসারে নারীসঙ্গ শয়তানের প্ররোচনায় হইয়া থাকে। অতএব মেয়েমানুষ ও মৈথুন খ্রীষ্টানধর্ম্মের সিদ্ধান্ত অনুসারে মহাপাপজ। মনীষী শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন যে, খ্রীষ্টানধর্ম্মের এবং হঠযোগী নিষ্কামধর্ম্মীদিগের নারীর প্রতি এই বিতৃষ্ণার ভাব গোড়াকার বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবেই ঘটিয়াছিল। আমরা এ সিদ্ধান্ত অমান্য করিতে পারি না। কিন্তু মজা এই, যে ধর্ম্ম বা

সাধনপদ্ধতিতে নারীর অত্যন্ত নিন্দা আছে, সেই ধর্ম্মের ধার্ম্মিকগণ পরে লাম্পট্যদোষে দুষ্ট হইয়া অধঃপাতে গিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতন লাম্পট্যদোষেই ঘটিয়াছিল; খ্রীষ্টানধর্ম্মের অধঃপতনও ঐ লাম্পট্যদোষেই ঘটে। পরে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রচার হইলে খ্রীষ্টান ইউরোপ একটু সামলাইয়াছিল বটে, পরন্তু আবার বর্ত্তমান বিলাসপ্রধান সভ্যতার দংশনে আধুনিক ইউরোপে লাম্পট্যের অতিবিস্তার ঘটিয়াছিল। এখন যে ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার পরিণামে ইউরোপের লাম্পট্যদোষের কতকটা সংবরণ হইতে পারে।

সে যাহা হউক, এই নারীর নিন্দা হইতেই আমরা মৈথুনকার্য্যের নিন্দা করিতে শিখিয়াছি। যে কার্য্যের ফলে জীবসৃষ্টি হইবে, প্রজাবৃদ্ধি হইবে,—প্রজাবৃদ্ধি ও জীবসৃষ্টির জন্যই যাহার বিধান, তাহার নিন্দা করিতে নাই; উহাকে একটা গুপ্ত কাণ্ড বলিয়া উহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে নাই। উহাকে চাপিলেই—লুকাইলেই লাম্পট্যের বৃদ্ধি হইবে, লোকে গুপ্ত পিশাচে পরিণত হইবে। কেবল তাহাই নহে, নরনারীর সঙ্গমটাকে জঘন্য ব্যাপার বলিয়া পরিচিত করিলেই, তাহার পর হইতে দুর্ব্বল পুত্র কন্যা উৎপন্ন হইবে, যথাশাস্ত্র বংশরক্ষা দুষ্কর হইবে। জর্ম্মন মনীষিগণ এইটুকু বুঝিতে পারিয়াই গত কুড়ি বৎসর কাল জর্ম্মনির চিকিৎসকগণ মৈথুনের সায়ান্স-সম্মত পদ্ধতি প্রকাশ্য-ভাবেই ব্যাখ্যা করিতেছেন। অধ্যাপক শেঙ্ক ইহার প্রধান ব্যাখ্যাতা। চিকিৎসক ও তত্ত্বজ্ঞগণের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হওয়ায় জর্ম্মন জাতির মধ্যে বন্ধ্যা নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; তাই আজ সংখ্যায় জর্ম্মন জাতি ইউরোপের শিরোমণি; কেবল তাহাই নহে, সুপুষ্ট সবলকায় পুত্র কন্যায় আজ জর্ম্মনি পূর্ণ। জর্ম্মনির বিদ্বজ্জনসমাজে জীবসৃষ্টির পদ্ধতির ব্যাখ্যা লজ্জাজনক নহে। আমাদের দেশে যখন তন্ত্রধর্ম্ম প্রবল ছিল, তখন মৈথুনটা গোপ্য, নিন্দনীয় ও জঘন্য ব্যাপার বলিয়া পরিচিত ছিল না। খ্রীষ্টানী বুদ্ধিতে এখন তন্ত্রের পঞ্চ মকারের নিন্দা করিলে চলিবে কেন? আবার মজা এই, যাঁহারা প্রকাশ্যে পঞ্চ মকারের নিন্দা করেন, তাঁহাদের অনেকে ভিতরে ভিতরে এক একজন মিথুন-মাষ্টার। কাহারও পত্নী প্রতি একাদশ মাসের শেষে এক একটি নব কুমার বা কুমারী স্বামিচরণে উপঢৌকন দিতেছেন এবং বর্ষে বর্ষে এমনই উপঢৌকন

দিতে দিতে শেষে ক্ষয়রোগে তনু ত্যাগ করিতেছেন। কেহ বা গুপ্তভাবে দুই তিনটি কামপত্নী রাখিয়াছেন; কেহ বা পরনারী দেখিলে নয়নপথে তাহাদের আড়ে গিলিতে চাহেন। তন্ত্রের দৃষ্টিতে এবম্প্রকারের লাম্পট্য অতিপাতক, মহাপাতক বলিয়া পরিচিত। বাহিরের লেপাফাদোরস্ত সাধুতা তন্ত্রের হিসাবে বেজায় দোষের—মহাপাপজ। তন্ত্র ভাবের ঘরে চুরি করিতে, প্রবৃত্তি লইয়া লুকাচুরি করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছেন। তন্ত্র, প্রকাশ্য দুষ্ট নষ্ট নর নারীকে ক্ষমা করিতে পারেন, পরন্তু কপট শঠকে কখনই ক্ষমা করেন না। তন্ত্র বলেন, গুরুর কাছে হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দেখাইবে, লজ্জাবোধ করিবে না। তাই তন্ত্র শিষ্যের কাছে—তন্ত্র-পাঠকগণের কাছে কিছুই লুকাইয়া রাখেন নাই। ইহা দোষের নহে, বরং শ্লাঘার বিষয়।

অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, তন্ত্রধর্ম্মের বেজায় অধঃপতন ঘটিয়াছিল। মানুষের ব্যবহারে ধর্ম্মমত উন্নত হয় বা অধঃপতিত হয়। মানুষ ভাল হইলে ধর্ম্ম ভাল হয়, মানুষ মন্দ হইলে ধর্ম্মকর্ম্মও মন্দ হইয়া যায়। মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির দোষে পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্ম্মই নষ্ট হইয়াছে, মানুষের ব্যবহারের গুণে অনেক সামান্য ধর্ম্ম উন্নত হইয়াছে। জাতির অধঃপতন ধর্ম্মের দোষে ঘটে না। বিলাসে মানুষকে নষ্ট করে, হীন হেয় করিয়া তোলে; মন্দ লোকের প্রভাবে ধর্ম্মও কপটতার আশ্রয় হইয়া উঠে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কত বিলাসী জাতি যে কত পাপ করিয়াছে, কত পশুত্বের প্রচার করিয়াছে, তাহা হিসাব করিয়া বলা যায় না। জাতি বিলাসী না হইলে ধর্ম্ম বিলাসের আশ্রয় হয় না। সুতরাং ধর্ম্মকে নিন্দা করিতে নাই; যেমন মানুষে যে ধর্ম্মের যেমন ভাবে আচরণ করিবে, সেই ধর্ম্ম তেমনই ভাবে ফুটিয়া উঠিবে। মানুষের দোষে তন্ত্রধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, মানুষের দোষে ভারতবর্ষের অন্য সকল ধর্ম্মও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে এখনও যেখানে সাধনা, যেখানে আরাধনা, সেইখানেই তন্ত্রের প্রভাব পরিস্ফুট। আত্মশক্তির উন্মেষ যিনিই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাকেই তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইসলাম ধর্ম্মের সুফীগণ, খ্রীষ্টানধর্ম্মের মঙ্কগণ—যাঁহারাই সাধনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অর্থাৎ সাধনার একটা পদ্ধতিই এখন পৃথিবীর সকল সভ্য

দেশেই প্রচলিত আছে। সে পদ্ধতি আমাদের দেশে তন্ত্রপদ্ধতি বলিয়া পরিচিত, অন্য সকল দেশে অন্য নামে পরিচিত; পরন্তু আসলে সকল দেশের সাধনাই একই রকমের। এই যে পঞ্চ তত্ত্বের বা পঞ্চ মকারের সাধনা, ইহা তান্ত্রিকদিগের মধ্যে যেমন ভাবে প্রচলিত, অন্য সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও দেশভেদে ও রুচিভেদে কিঞ্চিৎ আকারান্তরিত হইয়া প্রচলিত আছে। কেহ বা মোটামুটি বাহ্যিক হিসাবে করে, কেহ বা মানস পূজার হিসাবে করে, কেহ বা ষট্‌চক্র ভেদের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া করে। আবার তন্ত্রে পঞ্চ মকারের অনুকল্পের ব্যবস্থাও আছে। যথা—সুরার পরিবর্ত্তে ডাবের জল, মিছরির সরবৎ, এমন কি, তাম্রাধারে জল পর্য্যন্ত অনুকল্প বিধান করা হইয়াছে। যাহার যেটা সহে, যাহার যেমন জীবন, যেমন রুচি প্রবৃত্তি, তাহার জন্য তেমনই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তন্ত্র বলেন—তোমার আত্মা যখন তোমার ইষ্ট, তখন আত্ম-তৃপ্তির জন্য তুমি যাহা কর, তাহাই ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া করিবে। তুমি মদ্যপান নিয়মিত করিয়া থাক, মদ্যপানে বেশ আনন্দ বোধ করিয়া থাক, অথচ তুমি সুরা নিবেদন করিয়া পান কর না। যদি সত্যই বুঝিয়া থাক যে, মদ্যপান করিলে পাপ হয়, তাহা হইলে উহার পরিহার কর্ত্তব্য। তেমনই মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, যাহাই তুমি উপভোগ করিবে, তাহাই দেবতার প্রসাদ করিয়া খাও,—ইষ্টদেবীকে দিয়া আত্মতুষ্টি সাধন কর। দেবতাকে উপভোগ করাইয়া, অর্থাৎ দেবতাকে নিবেদন করিয়া, প্রসাদবোধে সকল সামগ্রী উপভোগ করিলে, উপভোগের মুখে একটা গণ্ডী পড়ে। মানুষের মধ্যে যে পশু আছে, সে পশু অবাধে প্রবৃত্তির পথে নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতে পারে না। তুমি তখন যেখানে সেখানে মদ্যপান করিয়া বেড়াইতে পারিবে না। যেখানে সেখানে মৎস্য, মাংস, মুদ্রার উপভোগ করিতে পারিবে না। সংযমের পক্ষে ইহা একটা প্রশস্ত উপায়। তন্ত্র বলিতেছেন, তোমার সঙ্গেই তোমার দেবতা ফিরিতেছেন, তোমার দেহাভ্যন্তরেই আছেন। তাঁহাকে তোমার সকল উপভোগ্য সামগ্রী নিবেদন করিতেই হইবে; কারণ, মায়ের ছেলেকে মায়ের প্রসাদ ছাড়া অন্য কিছু খাইতে নাই। যেমন করিয়া প্রসাদ করিতে হয়, তাহার পদ্ধতি তন্ত্রে লেখা আছে; সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তোমার উপভোগ্য সকল সামগ্রী প্রসাদ করিয়া লইবে। তন্ত্রের এই আদেশ মান্য করিয়া

চলিলে, যেখানে সেখানে, যখন তখন মদ্যপান করা বা মৎস্য মাংস.মুদ্রার উপভোগ করা চলে না। মৈথুনেরও বেজায় বন্ধন আছে, সে সব জপ তপ করিয়া, মন্ত্র পাঠ করিয়া লতাসাধনা যে-সে মানুষের কর্ম্ম নহে।

ইহা ত গেল এক পক্ষের কথা। সাধনার হিসাবে, আত্মশক্তির উন্মেষের হিসাবে এই সকল সামগ্রীর একটা উপযোগিতা আছে। যে সাধনার পথে অগ্রসর হয় নাই, বস্তুতত্ত্বের খবর রাখে না, তাহাদের সে উপযোগিতার কথা ভাষার সাহায্যে বুঝান যায় না। আত্মশক্তির উন্মেষ কেবল মনুষ্যদেহেই হয় না, জীব জন্তুর দেহেতেও আত্মার বিকাশ ঘটে, এক একটা অপূর্ব্ব শক্তির উন্মেষ হয়। সাধকের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে সেই সকল শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। তখন সাধকবিশেষকে জীব-বিশেষের জীবন-সাধন করিতে হয়। যাঁহারা শিবাসাধনা করেন, তাঁহারা শৃগালের ন্যায় কিছু কাল অবস্থিতি করেন। ইহা অঘোরপন্থার কথা। কোথায়—কোন্ জীবে কোন্ আত্মশক্তি কেমন ভাবে ফুটিয়াছে, তাহা ত আমরা জানি না; যখন যেটা জানিতে পারি, তখন সেইটার সাধন করিয়া আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করি। ঠিকমত আয়ত্ত হইলে একটা সিদ্ধির লাভ হয়। এক একটি করিয়া সিদ্ধি সঞ্চয় করিয়া যখন বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া যায়, তখনই অন্তর্দর্শন ঘটে, দেহগত আত্মার এবং বিশ্বব্যাপী আত্মার পরিচয় হয়। শক্তি সর্ব্বত্র সমানভাবে ছড়ান আছে,—সর্ব্ববস্তুতে, সর্ব্বপদার্থে শক্তি আছেই। কোথায় সে শক্তির কেমন ক্রিয়া হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? বিষ্ঠা মনুষ্যদেহে থাকিলে মহাবিষে পরিণত হয়, কিন্তু মাটিতে পড়িলে উহা শ্রেষ্ঠ সার, শূকরের উহা প্রধান ভোজ্য। তোমার পক্ষে যাহা হেয়, অন্যের পক্ষে তাহা শ্রেয়ঃ। অতএব সংসারে হেয় শ্রেয়ঃ কিছু নাই, পাপ পুণ্য কিছু নাই। অবস্থাগতিকে পাত্রের হিসাবে কোনটা কখন বা হেয়, কখন বা শ্রেয়ঃ, কখন বা পাপজ, কখন বা পুণ্যাত্মক। এই সংসারে তোমার আমার বুদ্ধির মাপকাঠিতে যাহা কিছু সদসৎ আছে, তাহাদের মধ্যে যে শক্তি আছেন, তিনিই আত্মাশক্তি, তিনিই মহামায়া। তাঁহাকে যেখান হইতে পার, সেইখান হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে। এই শক্তিসংহরণের নামই সাধনা। মাতাল না হইলে গোটাকয়েক আত্মশক্তির বিকাশ হয় না—তা ভাবেই মাতাল হও, ভক্তিতেই মাতাল হও, কীর্ত্তনানন্দে মাতাল হও, তোমাকে মাতাল

হইতে হইবে,—নইলে শক্তির বিকাশ ঘটিবে না। তন্ত্র এক সম্প্রদায়ের সাধকের জন্য সোজাসুজি মদের ব্যবস্থাই করিয়াছেন। রিরংসা হইতে আর এক শ্রেণীর শক্তির বিকাশ হয়; এ কথাটা সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। সহজিয়া, বৈষ্ণব, শৈব, কিশোরীভজা, কর্ত্তাভজা, পরকীয়া সাধনা—সবই রিরংসার উপর প্রতিষ্ঠাপিত। তন্ত্র উহার উপর ভাবের আবরণ রং চড়াইয়া, উহাকে মধুরতর না করিয়া, সোজাসুজি পঞ্চতত্ত্বে মৈথুনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইঙ্গিতে যতটুকু পারিলাম—বলিলাম; ইহার অধিক আর বলা যায় না, বলিতে নাই। আবার বলিয়া রাখি, তন্ত্রের মধ্যে শক্তিসাধনার অসংখ্য ও অনন্ত পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট আছে। যাহা তোমার ভাল লাগে, তাহা তোমার পক্ষে ভাল; যাহা আমার ভাল লাগে বা উপযোগী, তাহা আমার পক্ষে ভাল। তুমি নিজের পন্থার যশঃ কীর্ত্তন করিতে পার, আমি আমার পন্থার বিজয় ঘোষণা করিতে পারি; কিন্তু আসলে সব এক, সেই আত্মদর্শনচেষ্টা, ইষ্টের সাক্ষাৎকার। ('প্রবাহিণী,' ২৭ আষাঢ় ১৩২২)

শিব ও শক্তি

পূর্ব্বে এই 'প্রবাহিণী'তেই আমি শিবতত্ত্বের সামান্য একটু ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। তন্ত্র, শিবকে সৃষ্টির সার সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শিব অধিকারী, অবিনশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়, অচল ও সনাতন; ইনি আছেন বলিয়া সৃষ্টি আছে; ইনি অনাদি, অনন্তকালস্থায়ী, ইঁহাতে জড়িতা সৃষ্টি-শক্তিও অনাদি ও অনন্তকালব্যাপিনী। যেমন একটা বাঁশের খোঁটার উপর একটা অপরাজিতা বা মাধবী লতা জড়াইয়া দিলে, লতা যেমন পত্রপুষ্পে সেই বংশখণ্ডকে আবরণ করিয়া রাখে, বাহিরের লোকে বাঁশ দেখিতে পায় না, কেবল লতাপত্রের বেষ্টনে একটা দণ্ডাকার পুষ্পমালা দেখে, তেমনি সৃষ্টিশক্তিবেষ্টিত—কুণ্ডলিনীবলয়িত শিবকে কেহই দেখিতে পায় না—কেবলই শক্তির বিকাশ দেখে, সৃষ্টির লীলাখেলা দেখে। যেমন বংশবেষ্টনে লতার ঊর্দ্ধগুবিকাশ ভিতরে বংশের বিদ্যমানতা হেতু হইয়া থাকে; বাঁশ না থাকিলে লতা ধুলায় লুটাইত, অথবা অমন গজাইত

না, উহার শোভা দূর হইতে লোকে দেখিতে পাইত না; তেমনি সৃষ্টি-চাতুরীর অন্তরালে শিব আছেন বলিয়া—নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ অচলোঽয়ং সনাতনঃ—পুরুষ আছেন বলিয়া প্রকৃতির এত লীলাখেলা ফুটিয়া উঠিতেছে—সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে। সৃষ্টির আবরণের ভিতরে তিনি আছেন, তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, বুঝিতে পারা যায় না, জানিতে পারা যায় না বলিয়াই শিব কেবল লিঙ্গের দ্বারা—চিহ্নের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। শিবের নমস্কারের মন্ত্রে আছে,—

"তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ॥"

অর্থাৎ হে মহাদেব, তোমার তত্ত্ব জানি না; তুমি কেমন, তাহাও ত জানি না; তুমি যেমনই হও না, তুমি যাহাই হও না, আমি তেমনকে, তাহাকে বার বার নমস্কার করিতেছি। সে শিব, সে তেমন, সে তাহা কেমন?

"ধরাপোঽগ্নিমরুদ্ব্যোমমখেশেন্দ্বর্কমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বভূতান্তরস্থায় শঙ্করায় নমো নমঃ॥
শ্রুত্যন্তঃকৃতবাসায় শ্রুতিরূপাখিলাত্মনে।
অতীন্দ্রিয়ায় মহসে শাশ্বতায় নমো নমঃ॥
স্থূলসূক্ষ্মবিভাগাভ্যামনির্দ্দেশ্যায় শম্ভবে।
ভবায় ভবভূতায় দুঃখহন্ত্রে নমোঽস্তু তে॥"

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যজ্ঞ, ঈশান, চন্দ্র ও সূর্য্য-মূর্ত্তির অন্তরালে তুমি প্রকট রহিয়াছ, সর্ব্বভূতের অন্তরে অন্তরাত্মস্বরূপে তুমি বিরাজমান; হে শঙ্কর! তোমাকে নমস্কার। তুমি শ্রুতিপ্রতিপাদ্য, শ্রুতিস্বরূপ, তুমি নানা মূর্ত্তিতে কীর্ত্তিত হইয়া থাক, তুমি ইন্দ্রিয়ের অগম্য, অথচ প্রকাশস্বরূপ, সেই নিত্য শঙ্কর দেব তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যাঁহাকে স্থূল বা সূক্ষ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ যিনি স্থূল সূক্ষ্মের অতীত, যিনি ভব বা সৃষ্টির সত্তাস্বরূপ, যিনি বা যাঁহা হইতে সৃষ্টি বা ভব উৎপন্ন হইয়াছে, তেমন দুঃখহারী শঙ্করকে নমস্কার। এই সকল স্তব স্তোত্র হইতে বুঝা যায় যে, শিব অস্তিত্ব-জ্ঞাপক মাত্র। এই যে আছে—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আছে, জন্ম জরা মরণ আছে, পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন সংহরণ আছে, ইহা শিবের অস্তিত্বের জন্যই

থাকে ও আছে। আমি আছি,—বাল্যে যেমন ছিলাম, যৌবনে যেমন ছিলাম, প্রৌঢ়ে যেমন ছিলাম, এখন বার্দ্ধক্যে যেমন আছি, সে এক আমিই আছি; এই যে অস্তিত্বের একটা অপরিবর্ত্তনীয় বোধ,—ইহা আমাতে শিব আছেন বলিয়াই আছে,—সৃষ্টির সকল লীলার অন্তরালে শিব থাকেন বলিয়াই এই বোধটা—এই অস্তিত্বের জ্ঞানটা থাকে। অহমস্মি—এই জ্ঞানই শিবজ্ঞান, আমার নয়নের উপর বিশ্ব বিকশিত হইয়া আছে—ইহাও শিবজ্ঞান। শিব—জগতের অস্তিত্বস্বরূপ—অখণ্ড দণ্ডায়মান কালস্বরূপ, সনাতন স্থাণুর স্বরূপ। তাই শিবের নাম ভব, সর্ব্ব, মৃড়, হর প্রভৃতি।

"শূন্যরূপং শিবং সাক্ষাৎ"—ষট্‌চক্র বর্ণনায় তন্ত্র বার বার বলিয়াছেন যে—শিব শূন্যময়; শূন্যাকার, শব্দময়, ওঁকাররূপী,—সুতরাং শিব স্বয়ম্ভু লিঙ্গ অর্থাৎ স্বয়ম্ভু চিহ্নস্বরূপ। মানুষের দেহের ছয়টা চক্রে শিবজ্ঞান বা জ্ঞানময় শিবরূপ ছয় ভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে। আর কুণ্ডলী শক্তি "সর্পাকারা শিবং বেষ্ট্য সর্ব্বদা তত্র সংস্থিতা" অথবা যিনি "সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াকারা কোটিবিদ্যুৎসমপ্রভা" অর্থাৎ তিনি শিবের চারি দিকে সাড়ে তিনটা পাক খাইয়া কোটি বিদ্যুতের প্রভা বিকিরণ করিয়া আছেন। "শূন্যরূপং শিবং সাক্ষাদিন্দুং পরমকুণ্ডলীং" অর্থাৎ শূন্যরূপ শিবের চারি দিকে চন্দ্রজ্যোতিঃসম্পন্না কুণ্ডলী বিরাজ করিতেছেন। ইহাই শিব শক্তি, ইহাই অবিভাজ্য, নিত্য এবং গুণত্রয়সমন্বিত, এই শিব-শক্তিতে ত্রিগুণ বিরাজ করিতেছে; কেবল শিবে কোন গুণ নাই। কারণ, শক্তির সাহায্যেই গুণের বিকাশ হয়; শক্তিশূন্য শিব চিন্তার ও কল্পনার অতীত। মনুষ্য ও জীবদেহে শিবশক্তি সমন্বিত হইয়া যুগলে বিরাজ করিতেছেন। কেবল জীবদেহে কেন বলি—সৃষ্টির সর্ব্বস্বে, সর্ব্বব্যাপারে, স্থূলে সূক্ষ্মে, স্থাবর জঙ্গমে, অণু পরমাণুতে শিব শক্তিযুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। শিব শক্তিশূন্য বা শক্তিবর্জ্জিত হইয়া কখনই থাকিতে পারেন না, তবে তাঁহাতে শক্তি কখনও সম্মূঢ়াবস্থায় বিরাজ করেন, কখনও প্রকট ভাবে বিদ্যমান থাকেন। যখন শক্তি সম্মূঢ়, তখন তিনি বিন্দুরূপিণী—বিন্দুবাসিনী, সে বিন্দু শিবের মধ্যেই সংন্যস্ত। যখন শক্তি প্রকট, তখন তাঁহার নানা রূপ, নানা বিভাব, নানা বিকাশ। কিন্তু তাহাতেও তন্ত্র বলিতেছেন,—

"ভুজঙ্গরূপিণীং দেবী নিত্যাং কুণ্ডলিনীং পরাম্।
বিসতন্তুময়ীং দেবীং সাক্ষাদমৃতরূপিণীম্॥
অব্যক্তরূপিণীং দিব্যাং ধ্যানগম্যাং বরাননে।
ধ্যাত্বা জপ্ত্বা চ দেবেশি সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়োঽভবেৎ॥"

এই পরা শক্তি কুণ্ডলিনী ভুজঙ্গরূপিণী, পদ্মনালের সূত্রের মতন অতি সূক্ষ্ম, অতি মধুময়ী, তিনি অব্যক্তরূপিণী, দিব্যরূপা এবং ধ্যানগম্যা, তাঁহাকে ধ্যান করিলে, জপ করিলে সাধক ব্রহ্মময় হইতে পারে। মায়ের রূপ যাহা, তাহার আলোচনা "তন্ত্রে মূর্ত্তিপূজা" শীর্ষক সন্দর্ভে কতকটা করিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং সে ভাবের—রূপের কথা এখন আর বলিব না। শক্তির হিসাবে মা—জগন্ময়ী—

"যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥"

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সদসৎ যাহা কিছু আছে, তাহাদের অন্তর্গত যে শক্তি আছে, সে তুমিই; অতএব তোমার আর স্তব করিব কি! কারণ, আমিই যে তুমি—

"অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।"

আমার মধ্যে যে সকল শক্তি বিরাজ করিতেছে, সে যে তুমি; তোমার জন্যই জীবন, তোমার জন্যই দেহ, তোমার জন্যই বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, ধৃতি —তুমিই আমার সব। অতএব তোমার আবার স্তব স্তুতি কি!

এই শিব শক্তির সমন্বয়ে সৃষ্টির বিকাশ। এই শিব শক্তির ক্রিয়া বুঝিয়া এক আমি বহু এই কামনার প্রকাশ করাতেই সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল। কাম ও মদন তত্ত্ব পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। মদন না থাকিলে সৃষ্টি হয় না, মদনের প্রভাবেই এক অপরকে আকর্ষণ করিতেছে, প্রত্যাখ্যান করিতেছে, আবার সম্মিলিত হইতেছে। এই মিলন ও বিয়োগের ফলে, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের প্রভাবে একে দুই, এবং দুই হইতে বহুর বিকাশ হইতেছে। এই তত্ত্বটা মদনভস্ম এবং কুমারসম্ভবের অর্থবাদের সাহায্যে তন্ত্র বড় মিষ্ট করিয়া বলিয়া রাখিয়াছেন। সে কথার পরে প্রয়োজন হইলে ব্যাখ্যা করিব। এখন শিবত্বের কথাটা আর একটু ফুটাইয়া বলিতে হইবে। তন্ত্রের হিসাবে শিব কেবল সংহারমূর্ত্তিই নহেন, তিনি সৃষ্টিস্থিতির বিধানকর্ত্তাও বটেন। যাহাতে সকল পদার্থের

সংহৃতি বা সঙ্কয় হয়, তিনিই রুদ্র বা শিব। শিবের চারি দিকেই সৃষ্টিশক্তির বিকাশ, শিবত্বেই সেই শক্তির বিলয় বা সেই শক্তি সম্পুটিত হয়; অতএব পদার্থের পরিণতি যাহা, তাহাই শিবে যাইয়া সঞ্চিত হয়। তাই পুরাণের ভাষায় কবির অলঙ্কারে শিব শ্মশানবাসী, চিতাভস্ম মাখিয়া আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া আছেন। তিনি শূন্যময়; তাই রজতগিরিনিভং—শ্বেতকায়, তন্ত্রে শূন্যের শ্বেত বর্ণ। তিনি মৃত্যুঞ্জয়—জরা-মরণ-বিষ কণ্ঠস্থ। এইখানে তন্ত্রের একটা theoryর কথা বলিব। তন্ত্র বলেন যে, হিংসাই জীবনের অবলম্বন; প্রবল দুর্ব্বলকে হিংসা করে—দুর্ব্বলকে উদরস্থ করিয়া স্বীয় বল রক্ষা করে। সৃষ্টির সর্ব্বস্বে ও সর্ব্বব্যাপারে হিংসাই বিদ্যমান, যাহার হিংসা যত প্রবল, সে তত দিন অধিক বাঁচিয়া থাকে, তাহার বল তত অধিক হয়। এই হিংসাশক্তি যে দিন কমিয়া যায়, সেই দিনই জীব পঞ্চত্ব লাভ করে। তন্ত্র বলেন, সকল পদার্থের, সকল জীবের জীবন আছে, সর্ব্বস্বে জীবনরূপিণী শক্তি বিরাজ করিতেছে। তুমি নিরামিষাশী বৈষ্ণব হইয়া শাক পাতা খাও, ঘৃত দুগ্ধ খাও, তাহাতেও প্রবল হিংসা আছে। কারণ, বৃক্ষ লতা পাতা, ফল মূল, এ সকলই সজীব প্রাণময় পদার্থ; ইহাদের মধ্যে স্বয়ং কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজ করিতেছে। গাছের ফল যদি আপনি পাকিয়া পড়িয়া যায়, তাহা হইলে এক কথা, কিন্তু বৃক্ষশাখা হইতে ফল ছিঁড়িয়া লইয়া তাহা ভোজন করিলে যেমন হিংসা হয়, মাছ ধরিয়া খাইলেও তেমনি হিংসা হয়। মূল ও কন্দ খাইবার জন্য গাছটাকে উপাড়িয়া তুলিয়া খাইলে যে হিংসা হয়, ছাগমাংস খাইলেও সেই হিংসা হয়। সর্ব্বাপেক্ষা বড় হিংসা—বৎসকে মাতৃদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত করিয়া গাভীর দুগ্ধ চতুরতার সহিত দোহন করিয়া লইয়া পান করিলে কেবল হিংসাই হয় না, সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দয়তা ও কপটতার প্রকাশ পায়। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বৃক্ষ লতা গুল্মাদির, উদ্ভিদ্ জীব মাত্রেরই বেদনা-বোধ আছে—অনুভূতি আছে; অন্য জীবের যেমন সুখ দুঃখ জ্ঞান আছে, যেমন বেদনাবোধ হয়, ঠিক তেমনই আছে। গাছের পাতা ছিঁড়িলে, ফুল তুলিলে বৃক্ষ ব্যথা পায়, রোদন করে। এই কথাটা—এই তত্ত্বটা তন্ত্র বহু পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছেন। তন্ত্রের যুক্তি এই যে, উদ্ভিদ্ যখন দেহী, তখন দেহীর সকল গুণ তাহাতে আছে; তবে উদ্ভিদের শব্দ বা বাক্-

শক্তি নাই, তাই বেদনা পাইলে বৃক্ষ লতা পাতা চীৎকার করিয়া রোদন করে না, ব্যথা জানায় না; পরন্তু ব্যথাবোধ জন্য ঠিক জঙ্গম জীবের মতন অধৈর্য্য প্রকাশ করে। যাউক সে কথা, তন্ত্র Biology বা জীবতত্ত্বের এই নিয়মটা বহু পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছেন যে, জীব যত ক্ষণ প্রাণ ধারণ করিয়া সজীব থাকিবে, তত ক্ষণ তাহাকে অপর জীবের হিংসা করিতেই হইবে। জীবের পুষ্টি জীবের দ্বারাই হইয়া থাকে, কোন জীব নির্জীব পদার্থ ভোজন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবী জীবে পূর্ণ, ধরাগর্ভস্থ রস জীবনদায়িনী শক্তিতে পূর্ণ, বৃক্ষ লতা পাতা, কীট পতঙ্গ জীবাণু, সবই জৈবী শক্তির দ্বারা সম্পুষ্ট ও সুরক্ষিত। নিরামিষ বৃক্ষ লতা পাতা খাইলে জীব খাওয়া হয়, দুগ্ধ ক্ষীর ঘৃতও প্রত্যক্ষ জীবাংশ ও জীবাণুপূর্ণ ত বটেই। মানুষের—মানুষের কেন, সকল জীব জন্তুর, স্থাবর জঙ্গমের এমন ভোজ্য সম্ভবে না, যাহাতে অন্য জীব নাই—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু নাই, জীবনদায়িনী শক্তি নাই। কাজেই হিংসা না করিলে ভোজন হয় না, ভোজন না হইলে জীবন থাকে না। অতএব যত ক্ষণ জীবন, তত ক্ষণ হিংসা থাকিবেই। সিংহ শার্দ্দূলকে হিংসার সাবয়ব মূর্ত্তি বলা হয়। হিংসা হইতেই সিংহ শব্দের উৎপত্তি। এই হিংসার নাশে সৃষ্টির নাশ—জীবের নাশ, অন্য পদার্থসকলেরও সাবয়ব স্বতন্ত্র সত্তার নাশ হয়। শিব পরিণামের দেবতা, তাই তিনি বাঘাম্বর, অর্থাৎ মৃত হিংসার খোলসটা যেন তাঁহার কাছে থাকে, তাহাই যেন তাঁহার আবরণ! অর্থাৎ হিংসাবিরহিত জীবসত্তা তাঁহাতে যেন সম্পুটিত হইয়া আছে।

আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তিসকলকে পুরাণের ভাষায় সর্প বা ভুজঙ্গম বলা হইয়াছে। এই শক্তিসমবায়ে বিশ্বসৃষ্টির বিন্যাস এবং বিকাশ। যখন শক্তির খেলা হয়, চারি দিকে বিকাশ হয়, তখন বিশ্বসৃষ্টি ফুটিয়া উঠে; তখন চারি দিকে সাপের খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন বিশ্ববিকাশের সঙ্কোচ ঘটে, তখন শক্তির সার শিবদেহে যাইয়া সঞ্চিত থাকে। সর্পের সার সর্পবিষ; সেই সর্পবিষ মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের কণ্ঠস্থ—উদরস্থ নহে। উদরস্থ হইলে যদি হজম হইয়া যায়, আর না বাহির হয়, তাই শিব নীলকণ্ঠ হইয়া সর্পবিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। যখন আবার সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তখন কণ্ঠের বিষ বাহির হইয়া নূতন ভাবে

শক্তির বিধান সৃষ্টি করে,—তখন নীলকণ্ঠ নীললোহিত মহাদেবে পরিণত হন। এমনই ভাবে সংহারমূর্ত্তি, শিবের মূর্ত্তি, যাহা পুরাণের—কাব্যের কাল্পনিক ভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহার একটা গূঢ় ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কেবল অনুমানের সাহায্যে এমন ব্যাখ্যা করিতে হয় না, পুরাণ ও তন্ত্র এ ব্যাখ্যার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

এইবার শিবশক্তিসমন্বয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের কথাটা বলিব। বলিয়াছি ত, তন্ত্র generalisation করিতে বড়ই পটু। সংসারের তাবৎ ঘটনাকে গোটাকয়েক নিয়মের দ্বারা তন্ত্র বাঁধিতে চাহেন, বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। তন্ত্র বলেন, যে পদ্ধতি অনুসারে দুইটা জীবের সম্মেলনে পরে বহু জীবের উৎপত্তি হয়, ঠিক সেই পদ্ধতির দ্বারায় জগৎসৃষ্টি হইয়াছে—হইতেছে। অনন্ত কাল পর্য্যন্ত অনন্ত জগৎ সৃষ্ট হইতে থাকিবে। সে পদ্ধতি কি? স্ত্রীত্ব এবং পুংস্ত্বের সম্মেলনে—স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তির আকর্ষণ বিকর্ষণে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে—হইবে। এই তত্ত্বের অর্থবাদ শিবশক্তি-সমন্বয়—allegory হইল শিবলিঙ্গের চারি ধারে গৌরীপট্টের আবেষ্টন। এই অর্থবাদের খাতিরে শিবলিঙ্গ কেবল শিবত্বের চিহ্ন মাত্র নহে,—প্রজনন-শক্তি সঞ্চারের প্রতীকস্বরূপ। গৌরীপট্টও তখন আর সার্দ্ধত্রিবলয়াকার কুণ্ডলিনী শক্তি নহে, জীবসৃষ্টির জরায়ু—বীর্য্যান্তের আধানস্থান। কেবল অলঙ্কারের খাতিরে, অর্থবাদের লোভে তন্ত্রের এবং পুরাণের কবিগণ শিব ও শক্তিকে নর নারীতে পরিণত করিয়া সৃষ্টিতত্ত্বে রিরংসার ক্রিয়াটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। উপমা উপমেয়ের ব্যাপারটা এত দূর চালান হইয়াছে যে, শেষে লোকে আসল কথাটা, তত্ত্বকথাটা ভুলিয়া গিয়া, অর্থবাদের অংশটুকু—গল্পের ও অলঙ্কারের ভাগটুকুকেই আসল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে।

ইহা হইল তন্ত্রের কথা, সৃষ্টিতত্ত্বের একটা রহস্য মাত্র। কিন্তু শৈব সাধকগণ বলেন যে, আমরা তত্ত্ব বুঝিতে চাহি না, সংসারে শক্তির ক্রিয়া দেখিতে চাহি না। আমরা চাহি জুড়াইতে—মুক্তি লাভ করিতে, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে। যে শিবে সৃষ্টির সর্ব্বস্ব যাইয়া সংহৃত হয়, সৃষ্টির সকল জীব যাইয়া শান্তি লাভ করে, যিনি নির্ব্বাণের আধার—নির্ব্বাণস্বরূপ, যাঁহাতে সূক্ষ্মভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংস্থিত, যিনি কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্বকে নিজের মধ্যে সংহৃত করিয়া লইতেছেন,—আমরা সেই করুণার আধার

সদাশিবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহি। এই সংসারে গতাগতির জন্যই যত জ্বালা, যত কষ্ট, যত ক্ষোভ, যত বাধা। শিব সেই গতাগতির শেষ করেন—পরিসমাপ্তি ঘটান। আমরাও তাহাই চাই। অতএব এই "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" শিবই আমাদের সেব্য—আরাধ্য—পূজ্য। এই পথের পথিক যে সকল শৈব, তাঁহারাই দক্ষিণামূর্ত্তি শিবের পূজা করেন। সে শিবের গৌরীপট্ট নাই, শক্তির আবেষ্টন নাই, তিনি কেবল লিঙ্গ, কেবলই চিহ্ন, কেবলই প্রতীক, কেবলই স্থাণু। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য গোড়ায় এই দক্ষিণামূর্ত্তি শিবের সাধক ছিলেন। এই শৈব সম্প্রদায়ের সহিত হীনযানী বৌদ্ধদের করুণা সাধনা ও নির্ব্বাণতত্ত্বের বড় বেশী পার্থক্য নাই। ইঁহারা বুদ্ধদেবকে অবলোকিতেশ্বর মহাদেবে পরিণত করিয়া, তাঁহাতেই জীবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির বিধান করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে এই মতটা এক সময়ে খুব প্রবল ছিল। মান্যবর মহারাজাধিরাজ মনীষী শ্রীযুত স্যর বিজয়চন্দ মহাতাব্ বাহাদুর সম্প্রতি বর্দ্ধমানে এই মত অনুসারে অপূর্ব্ব বিজয়ানন্দ বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ভাবুক মাত্রেরই সে বিহার দর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য। সে বিহার নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে "শিবশক্তি" পুঁথি রচনা করিয়া তিনি ইঙ্গিতে এই সকল সিদ্ধান্ত-কথা সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শিবশক্তি পুঁথিটা আগাগোড়া আমরা এই 'প্রবাহিণী'তে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া দিয়াছি। কূটস্থ চৈতন্যরূপী শিব কেমন করিয়া শক্তির ছলাকলাকে পরিহার করিতে পারেন, তাহার ইঙ্গিত মনস্বী মহারাজাধিরাজ অতি সুন্দর ভাবেই করিয়াছেন। সে কথাটা খুলিয়া বুঝিতে হইলে মদনভস্মের অর্থবাদ, কুমারসম্ভবের রোচক আখ্যায়িকার ভিতরকার তত্ত্বটুকু বুঝিতে হয়। এক বার পত্রান্তরে 'কার্ত্তিকের জন্ম' বলিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিয়া আজ চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই তত্ত্বটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তখন সেটা অরণ্যে রোদন হইয়াছিল, কেহই সে ভাবটা ধরিতে পারে নাই। এখন যখন ধারাবাহিকরূপে শিবতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলিতেছি, তখন অবান্তরভাবে মদনভস্মের তত্ত্বটা বুঝাইতে পারিলে অন্ততঃ শিবসাধনার একটা স্তর বুঝিতে পারা যাইবে। তন্ত্র বলেন যে, শিব সাধনার দেবতা নহেন, শক্তিই সাধনার দেবতা। শক্তিসাধনায় সিদ্ধ হইলে শিবত্ব

আপনিই ফুটিয়া উঠে। বৌদ্ধের করুণাবাদের পথ দিয়া যাইলে শিব-সাধনার উপযোগিতা বেশ বুঝা যায়।

সে করুণাবাদ অতি কঠিন তত্ত্ব, সেই করুণাবাদের উপরই শিবের আশুতোষ ভাবটা ফুটিয়াছে। শিব আশুতোষ না হইলে সাধনার দেবতা হন না। কাজেই শিবত্ব বুঝিতে হইলে করুণাবাদটা বুঝিতেই হইবে। করুণাবাদ না বুঝিলে মহারাজাধিরাজের নূতন পুঁথি শিবশক্তির মাধুর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে না। তথাপি যতটুকু বুঝাইয়াছি, তাহা ধরিয়া শিবশক্তি পাঠ করিলে ভাব অনেকটা ধরা যাইতে পারে। করুণাবাদের কথা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'নারায়ণ' নামক মাসিক পত্রে একটু ইঙ্গিতে বলিয়া রাখিয়াছেন। বুঝিবার পক্ষে তাহা কিন্তু পর্য্যাপ্ত নহে। যাহা হউক, করুণাবাদটা যে বাঙ্গালীর আধুনিক সাহিত্যে আবার ফুটিয়া উঠিয়াছে, এটুকুর জন্য শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। এই করুণার theory মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য আকারান্তরিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই করুণার থিওরির উপরই "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত। শাক্ত তন্ত্রসকল এই করুণাবাদের বিরোধী। আমার মনে হয়, শক্তিসাধনায় এই কঠোরতার প্রতিবাদস্বরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি। কারণ, বৌদ্ধ শাস্ত্র পদে পদে তন্ত্র-সিদ্ধান্তেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্মও এই তন্ত্রসিদ্ধান্তের প্রতিবাদ। এমন কি, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ ও শৈব ধর্ম্মও তন্ত্রসিদ্ধান্তের প্রতিবাদ। আমাদের দেশে ও সমাজে যে কত ধর্ম্মবিপ্লব, কত নূতন নূতন ধর্ম্মমতের ও সম্প্রদায়ের যে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হিসাব করিয়া এখন কেহ বলিতে পারে না। এক একটি পুরাণ যেন এক একটি ধর্ম্মভাবের প্রচারক, এক একখানি তন্ত্র যেন এক একটি নূতন ধর্ম্মসাধনার প্রবর্ত্তক। কত পুরাণ, কত উপপুরাণ, কত তন্ত্র, আগম নিগম যে আছে—পঞ্চ আম্নায়ের মধ্যে যে কত অসংখ্য পুঁথি আছে, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। তন্ত্রের পুঁথি-সকলের মধ্যে সব আছে। সে সব খুঁজিয়া বাহির করা একটা মানুষের কাজ নহে, এক যুগেরও কাজ নহে। কারণ, আমার বিশ্বাস, তন্ত্রের শক্তিধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ধর্ম্ম; ইহারই বেদীর উপর, ইহার প্রতিবাদস্বরূপ, ইহার সহিত আপোস করিয়া, ইহার উপর রং চড়াইয়া

পরবর্ত্তী সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। তাই তন্ত্রের অঙ্গে সকল ধর্ম্মের ছায়া ও কায়া উভয়ই আছে। বৌদ্ধ ও শৈব করুণাবাদ বুঝিতে হইলে এই তন্ত্রেরই সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। সে পরের কথা, পরে হইবে। আপাততঃ আমরা মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে আবার ধন্যবাদ করিতেছি যে, তিনি বিজয়ানন্দ বিহার রচিয়া, এবং শিবশক্তি পুস্তক রচনা করিয়া বাঙ্গালায় একটা লুপ্ত ভাবের পুনরভ্যুত্থানের চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সঙ্গে আর একটু বলিয়া রাখা ভাল যে, শৈব ধর্ম্মের মধ্যে নাথী সম্প্রদায়ের হাত অনেকটা আছে। গোরক্ষনাথ, আদিনাথ, স্বয়ম্ভূনাথের অনেক ব্যাখ্যান ও বিকৃতি শৈব ধর্ম্মের মধ্যে সম্পুটিত হইয়া আছে। নাথদের প্রভাব এক কালে বাঙ্গালায় অতিমাত্রায় ছিল। এখনও তাহাদের লুপ্ত পদচিহ্ন বাঙ্গালার বহু স্থানে খুঁজিলে পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় জৈন ধর্ম্মের প্রভাবও খুব ছিল। জৈনদের অনেক কথা শৈব সম্প্রদায় স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছেন। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর দক্ষিণামূর্ত্তি শিবের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালার ও দক্ষিণাত্যের গোড়ার কথা যেন টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুঃখ এই, ক্ষোভ এই যে, বাঙ্গালায় এখন তেমন পণ্ডিত নাই, পাণ্ডিত্য সংগ্রহের সে উপাদান নাই, আয়োজনও নাই। আঁধার ঘরে দীপের আলো লোকে দূর হইতে দেখিবে ও অবাক্ হইয়া থাকিবে; নহে ত যাহারা মূর্খ ও অজ্ঞ, তাহারা অহঙ্কারের উপর ভর করিয়া ব্যর্থ বাদ প্রতিবাদ চালাইবে। সে বাদ প্রতিবাদে দলাদলি বাড়িবে, জ্ঞানান্বেষণ যথারীতি হইবে না। তুমি জান মা, তোমার মনে কি আছে, ছার আমরা, তোমার নিমিত্ত মাত্র হইবারও যোগ্য নহি।

২

শিব শক্তি—শূন্য কখনই নহেন। যখন তিনি শক্তিসমাহৃত—তাঁহাতে শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, তখন তিনি বাক্য মনের অগোচর, কেবল সনাতন পুরুষ মাত্র। তখন শিব একা বসিয়া আছেন, এক তানপুরা লইয়া, শব্দব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া নিজের ভাবে নিজে বিভোর হইয়া

আছেন। তখন বিশ্বসৃষ্টি তাঁহাতে সংহৃত, তাঁহার মধ্যে যেন সম্পুটিত। তখন তাঁহাতে কোন ক্রিয়া নাই, কোন চেষ্টা নাই, কেবল তিনি বিরাজ করিতেছেন। এ অবস্থা মনুষ্যের চিন্তার অতীত—কল্পনার অতীত; কিন্তু যখন তানপুরা বাজিয়া উঠে, শব্দব্রহ্মে ঝঙ্কার হয়, তখনই মহাবাক্য উত্থিত হয়। সেই ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এক আমি বহু হইব, এই ইচ্ছাশক্তি যেন জাগরিতা হন। এই ইচ্ছা বেশ জমাট বাঁধিলেই, সৃষ্টিশক্তি কিশোরী গৌরীরূপে তাঁহার বাম উরুর উপর জাগিয়া বসেন। তখন এক হইতে দুইয়ের উৎপত্তি হয়। এই দুই হইতেই, এই শিবগৌরী হইতেই জগতের সৃষ্টি—বিশ্বের বিকাশ। বিশ্বের স্তরে স্তরে যেমন বিকাশ ঘটিতে থাকে, তেমনি স্তরে স্তরে আদ্যা শক্তির দশ মহাবিদ্যা রূপ ফুটিয়া উঠে। যেই ক্ষণ হইতে সৃষ্টি আরম্ভ, সেই ক্ষণ হইতেই নাশেরও উদ্ভব। অপচয় ও উপচয় এক সঙ্গেই ঘটিয়া থাকে; মা যে মুহূর্তে উমা, সেই মুহূর্তে কালী। কারণ, ক্রিয়ার অর্থই উপচয় এবং অপচয়; এক দিকে উপচয়, অন্য দিকে অপচয়; এক দিকে ক্ষরণ, অন্য দিকে বিকাশ। ক্রিয়া না হইলে সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি একটা ক্রিয়া মাত্র। শক্তি সঞ্চালিত—আন্দোলিত—স্পন্দিত হইলেই ক্রিয়া হইল। শক্তির স্পন্দন—আন্দোলন—সঞ্চালন তখনই হয়, যখন এক দিকে অপচয়, অন্য দিকে উপচয় ঘটে। সুতরাং সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নাশ দেখা দিবেই, জনমের সঙ্গে সঙ্গে মরণ আসিবেই। তাই সদাশিবে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তিনই বিদ্যমান; তাই উমা দেখা দিলেই কালী এবং ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী ও বগলা দেখা দিয়া থাকেন। এক বিদ্যার বিকাশ হইলে, অন্য নয়টা বিদ্যা ফুটিয়া উঠেন।

যখন সৃষ্টির খেলা পুরাদমে চলিতে থাকে, তখন শক্তি কালীরূপে বিকশিতা। শিব শবাকারে চরণতলে পড়িয়া আছেন, মা শিবের বুকের উপর দাঁড়াইয়া অসংখ্য যোগিনী সঙ্গে নাচিতেছেন। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নাশ হইতেছে, নাশের সঙ্গে নূতন সৃষ্টির বিকাশ হইতেছে। আদ্যা শক্তি এক খাইতেছেন, আর গড়িতেছেন, আবার খাইতেছেন, আবার গড়িতেছেন। জনন মরণের এই পরম্পরা অনন্ত শৃঙ্খলের আকারে যেন তাঁহার ব্যাদিত বদনের মধ্য দিয়া কেবল যাইতেছে; তাহার যেন আগা নাই, গোড়া নাই, আদি নাই, অন্ত নাই—কেবল চলিয়াছে নদীপ্রবাহের মতন, অনন্ত জলপ্রপাতের মতন কেবল চলিয়াছে, কেবল ঝর ঝর

ঝরিতেছে। ইহাই সৃষ্টি শক্তির পূর্ণ বিকাশ। এ সময়ে শিবের শিবত্ব যেন ঢাকা পড়িয়া যায়, শিব যেন শবের মতন হইয়া যান। আর শক্তি তখন উন্মাদিনী—কোটি রূপে, কোটি ভাবে অসংখ্য দিক্ দিয়া বিকশিতা; তখন মায়ের খেলা যে কত রকমে দেখা যায়, তাহা আর হিসাব করিয়া বলা যায় না। তখন শক্তি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ও সর্ব্বস্বে প্রকটরূপা; তখন শক্তি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না; আর কাহারও খোঁজ পাওয়া যায় না। তখনকারই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভক্ত গান করিয়াছেন—

"বাজবে মহেশের বুকে
নেবে নাচ গো ক্ষেপা মাগী।"

অমন পাগলিনীর মত নাচিও না মা, বেচারা শিবের বুকখানা যে তোমার চরণতাড়নের চোটে ফাটিয়া যাইবে। যদি তুমি অমন ভাবে না নাচিয়া থাকিতে না পার, তবে পাগলী মেয়ে, শিবের বুক হইতে নামিয়া নৃত্য কর। কিন্তু তাহা ত হইবার জো নাই। শিবের বুকের উপর ছাড়া, মা আমার অন্য কোথাও নাচিতে পারে না; শিবের বুক ছাড়া তাঁহার নাচিবার অন্য স্থানও নাই। কারণ, শিব যে সর্ব্বব্যাপী; সে অখণ্ড সত্তা সর্ব্বস্বে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। মা যেমন সর্ব্বব্যাপিনী, শিবও তেমনি সর্ব্বাধারভূত। সুতরাং নাচিতে হইলে মাকে শিবের বুকের উপরেই নাচিতে হয়। কল্পলতিকা তিনি, কল্পদ্রুম শিবের চারি দিকে, সর্ব্বাবয়বে জড়াইয়া লতাইয়া আছেন। তাই রঙ্গ করিয়া ভক্ত বলিয়াছেন,—"নেবে নাচ গো ক্ষেপা মাগী।" নেবে নাচিবার মায়ের উপায় নাই—শক্তি নাই। শিব ছাড়া শক্তি ফুটিতেই পারে না;—শিবদেহসমাশ্রিত বলিয়াই শক্তি গতিরূপিণী ও লীলাময়ী। পক্ষান্তরে তেমনই শক্তি ছাড়া শিব থাকিতেই পারেন না। শক্তি প্রকটই হউক, অথবা সম্পুটিতাই হউক, সদাই শিবদেহ-সমাশ্রিত। যখন শক্তি সংহৃতা, তখন শিব আত্মারাম, মহাযোগে নিমগ্ন। যখন শক্তি প্রকট, তখনও শিব যোগবিভোর বটে, পরন্তু ইচ্ছাময়। তাঁহা হইতে সিস্থক্ষা বা সৃজনইচ্ছা ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর ক্ষণে ক্ষণে এক এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইতেছে—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব ও বিলয় তাঁহাতেই হইতেছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে লীলা অহরহঃ হইতেছে, প্রত্যেক জীবের দেহভাণ্ডেও সেই শিবশক্তির লীলা অহরহঃ চলিতেছে। দেহভাণ্ডে শক্তি কুণ্ডলিনী-রূপে বিরাজিতা, আর 'আমি আছি' এই শিবজ্ঞান অখণ্ডভাবে তাহার মধ্যে বিরাজ করিতেছে। জীবন শক্তির একটা লেখা বটে, শক্তি নানা ভাবে লীলা করিয়া জীবনকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন বটে, পরন্তু 'আমি আছি' এই শিবজ্ঞান অব্যাহত ভাবে শক্তির খেলার মধ্যগত হইয়া না থাকিলে, শক্তির নানা বিকাশকে কেন্দ্রগত না করিলে জীবের জীবত্বই সম্ভবপর হয় না। স্থাবর, জঙ্গম, সকল প্রকার জীবেই 'আমি আছি' এই জ্ঞানটা থাকিবেই। দেহাবচ্ছিন্ন আমি দেহেতেই বিরাজ করিতেছি, অন্য পদার্থ-সকল হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজ করিতেছি, এই জ্ঞান যত ক্ষণ থাকিবে, তত ক্ষণ সেই দেহ সজীব থাকিবে। নহিলে শক্তি জড়শক্তি মাত্র—প্রাণহীন, জ্ঞানহীন শক্তি মাত্র। কোন কোন তন্ত্রে ইহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, জড় ও অজড় বুঝি না, সকল পদার্থেই, সকল শক্তির খেলাতেই, যেখানে স্বাতন্ত্র্য আছে, সেইখানেই, যেখানে পদার্থের বিশিষ্টতা আছে, সেই পদার্থেই শিব ও শক্তি বিদ্যমান আছেন। বিশ্বসৃষ্টিতে শিবশক্তিবর্জ্জিত কিছু হইতে পারে না, কিছু থাকিতে পারে না। এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেখানে যাহা কিছু আছে,—হইতেছে, হইয়াছে এবং হইবে, সে সকলেই শিবশক্তি আছে। শক্তির এক প্রকারের বিকাশকে আমরা জীব বলি, অন্য প্রকারের প্রকাশকে জড় বলি; প্রকৃতপক্ষে জড় ও অজড়, জীব ও জড়, দুই এক, অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু জীবসামান্য ধর্ম্ম জড় পদার্থেও আবিষ্কার করিয়াছেন। জড়েরও এক প্রকারের অনুভূতি আছে, উপচয় অপচয় আছে। যখন জড়ে ও জীবে শক্তিক্রিয়ার একরকম পরিণতি ঘটিতেছে, তখন জড় ও জীব দুই এক, কেবল অবস্থার বিকাশভঙ্গি স্বতন্ত্র প্রকারের। এই হিসাবে তন্ত্র বলেন যে, সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরই প্রাণ আছে, অনুভূতিশক্তি আছে, সুখদুঃখবোধ আছে। এই মেদিনীমণ্ডল একটা সজীব পদার্থ, সৌর মণ্ডল একটা প্রাণযুক্ত যন্ত্র মাত্র—দেহী পুরুষস্বরূপ। তাহার উপর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা বিরাট্ জীব, বিরাট্ পুরুষ। যেমন মনুষ্য বা পশু-দেহ জীবসমবায়ে স্বতন্ত্র সত্তারূপে বিদ্যমান, তেমনি পৃথিবীটা জীব-সমবায়ে সত্তারূপে—জীবরূপে বিরাজমান। তাহার উপর সৌর মণ্ডল

ব্রহ্মাণ্ড একটা স্বতন্ত্র পুরুষ—একটা বিরাট্ জীব। এমনই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-জীবে এই অনন্ত আকাশ পরিপূর্ণ। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-জীবপূর্ণ আকাশ আবার এক অনন্ত আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিত। আত্মাশূন্য স্থান নাই—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটা বিশ্বাত্মার সাগর। সেই সাগরের একটি বুদ্বুদ এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। সৃষ্টিতত্ত্বের এমন grand idea, এমন বিরাট্ ভাব আর কোন জাতির কোন শাস্ত্রে আছে কি না, জানি না। এ ভাব ভারতবাসীর মাথাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ভারতবর্ষেই এখনও নিবদ্ধ আছে।

তন্ত্র এই সঙ্গে বলিতেছেন যে, জীবের কলেবরে যে ক্রিয়া যেমন ভাবে হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেই ক্রিয়া তেমন ভাবেই হইতেছে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে ক্রিয়া যেমন ভাবে হইতেছে, মনুষ্যদেহেও সেই ক্রিয়া তেমন ভাবেই হইতেছে। তাই পৃথিবী একটা জীব, মেদিনীর শ্বাস প্রশ্বাস আছে, সুখ-দুঃখবোধ আছে, কুণ্ডলী শক্তির ক্রিয়া আছে, এক অপূর্ব্ব ভাষার সাহায্যে ভাবের অভিব্যঞ্জনা আছে। তন্ত্র বলেন যে, জীব ছাড়া জীবের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। পৃথিবী হইতে যখন নানা জীব সমুৎপন্ন হইতেছে, তখন পৃথিবী সজীব পদার্থ। যত ক্ষণ সৃষ্টিলীলা চলিতে থাকে, তত ক্ষণ কোন জীবের, কোন পদার্থের নাশ নাই, কেবল অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ঘটে মাত্র। যত ক্ষণ শিবশক্তির লীলা চলিতে থাকিবে, তত ক্ষণ কিছুরই নাশ হইবে না। তাই তান্ত্রিক ভক্ত বলিয়া থাকেন যে, মা থাকিতে ছেলে মরে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত ক্ষণ মায়ের লীলা হইতে থাকিবে, তত ক্ষণ মায়ের ছেলে মরিবে না। এক দেহ হইতে দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে, পরন্তু শিবশক্তি-সমুৎপন্ন জীব—'আমি আছি' এই জ্ঞান, 'আমার আছে' এই বোধ, আমিত্ব বিস্তারের এই শক্তি কখনই নষ্ট হইবার নহে। কারণ, উহার নাশ ঘটিলে সৃষ্টির নাশ ঘটিয়া থাকে; তাহা সম্ভবপর নহে, তাহা হইবার নহে। অতএব তন্ত্রের প্রবচন যে, মা-বাপ থাকিতে ছেলে মরে না, উহা সত্য।

এইবার তন্ত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রথম সিদ্ধান্তের সহিত বিবাদ বাধাইয়াছেন। শাক্ত তন্ত্র মাত্রেই লেখা আছে যে, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এমন কথা হইতেই পারে না। উহা অস্বাভাবিক কথা। জীবনই হিংসা, হিংসা না হইলে জীবন থাকে না, মায়ের বাহন হিংসার অবতার সিংহ। তুমি খাইবে কি?

যাহা খাইবে, তাহাই জীব; জীবহত্যা না করিলে তোমার ভোজ্যই প্রস্তুত হইবে না। পশু মারিয়া মাংস খাইতে হইলে, মুমূর্ষু পশুর কাতর ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাও, তোমার দুর্ব্বল স্নায়ু বিচলিত হয়, তুমি দয়াপরবশ হইয়া মাংসভোজন পরিহার কর। কিন্তু গাছের ফল ছিঁড়িলে বৃক্ষ রোদন করে না? তাহার বেদনার অশ্রুধারায় যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যায়। সে রোদনের ভাষা শুনিতে পাও না, বুঝিতে পার না, তোমার দয়া হয় না। গোবৎসকে বঞ্চিত করিয়া তাহার মাতৃদুগ্ধ পান কর কোন্ হিসাবে? তোমার জননীর স্তনযুগল হইতে যে ক্ষীরধারা প্রবাহিত হয়, বিধাতার বিধানে তাহা তোমার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। তুমি তাহা পরকে খাইতে দিলে বাঁচিতে পার কি? তেমনি ছাগ ও গাভীশিশুকে রক্ষা করিবার জন্য আদ্যা শক্তি মাতৃদুগ্ধরূপে তাহাদের জননীর স্তনে বিরাজ করেন। তুমি তাহা পান কর কোন্ লজ্জায়? ছাগ বা মৃগমাংস ভোজন করা যদি পাপ হয়, তাহা হইলে দুগ্ধপান, ক্ষীরভোজন মহাপাপ; তাহা হইলে কোটি কোটি জীব নষ্ট করিয়া গোধূম, ধান্য, ব্রীহি প্রভৃতি শস্য, আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফল, কন্দ মূল, পত্র পুষ্প ভোজন করা অতি-পাতক। আত্মরক্ষায় দয়া নাই, হিংসাই আছে। কোনটা বা প্রকট হিংসা—মনুষ্যের অনুভূতিগম্য হিংসা, কোনটা বা অপ্রকট হিংসা, মনুষ্যের অনুভূতির বাহিরের হিংসা। তুমি উঠিতে বসিতে, শুইতে খাইতে জীব-হত্যা করিতেছ, সঙ্গে সঙ্গে কত জীব সৃষ্টিও করিতেছ। তুমি হিংসা ছাড়া থাকিতে পার কি? তোমার দেহের মধ্যে কত জীব, অন্য কত জীবকে সদা সর্ব্বদা খাইতেছে। তাহা রোধ করিতে পার কি? জীবের দ্বারাই জীবের পুষ্টি হইতেছে, বিস্তৃতি ঘটিতেছে। একটা বড় জীবের অবস্থিতির জন্য কোটি ক্ষুদ্র জীবকে ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ দিতে হইতেছে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটান যায় না, কখনও ব্যত্যয় হয় না। তন্ত্রের এই প্রতিবাদের উত্তর হীনযানী বৌদ্ধ দিতে পারেন নাই। তাঁহারা উত্তরে নীতির কথা, সমাজের কথা তুলিয়াছেন। তবে তন্ত্র বলেন যে, যাহার যাহা সহ্য হয়, সে তাহাই খাইবে। ঘাস খাইলে সিংহ ব্যাঘ্র বাঁচিতে পারে না, ঘাস সিংহ ব্যাঘ্রের খাদ্য নহে; মাংস খাইলে গো, ছাগ, মেষ, মৃগাদি বাঁচে না, মাংস উহাদের খাদ্য নহে। তেমনি মানুষের ধাতু অনুসারে, দেশ ও কাল অনুসারে যখন যাহা খাদ্য, তখন মানুষ তাহাই

খাইবে। আহারের বিচারে মানুষের উচ্চ নীচ বিচার করিতে নাই এবং মানুষের যাহা খাদ্য, তাহা সবই পবিত্র—হেয় নহে, বর্জ্জনীয় নহে; মানুষ যাহা খায়, তাহাই মায়ের বলি; যাহা খায় না, তাহা মাকে নিবেদন করিতে নাই। যত জীব, তত শিব, প্রত্যেক দেহাবচ্ছিন্ন শিবের চারি পার্শ্বে কুণ্ডলিনীর ক্রিয়া হইতেছে, সেই কুণ্ডলিনীকে তুষ্টা রাখিবার জন্যই মাকে ভোগ দিতে হয়, জীবের ভোজ্য স্থির করিতে হয়। এই জন্য বৃহৎতন্ত্রসার গ্রন্থে আগমবাগীশ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মানুষ যাহা খাইবে, তাহাই মায়ের প্রসাদ, পঞ্চ তত্ত্বে বা পঞ্চ মকারে মাকে তাহাই দিতে হইবে। তাই মা সৃষ্টিতত্ত্বে এবং সংহারতত্ত্বে সর্ব্বব্যাপারেই ছিন্নমস্তা, নিজের শোণিত নিজে পান করিতেছেন, সে শোণিতে নিজে পুষ্ট হইতেছেন। ইহাই সৃষ্টির যোগ্য, গুপ্ত এবং অব্যক্ত লীলা।

শিব ও শক্তির সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বকর্তৃত্ব বুঝাইয়া তন্ত্র তাঁহাদের রূপের কথা কহিয়াছেন। নাম ও রূপ না বুঝিলে রূপতত্ত্ব বুঝা যায় না। রূপের দুইটা স্তর আছে,—এক অনুভূতিগম্য রূপ, আর বোধাতীত রূপ। বোধাতীত যাহা, তাহা বুঝান যায় না; সুতরাং সে কথা চাপা থাকাই ভাল। অনুভূতিগম্য রূপও দুই শ্রেণীর—এক জ্ঞানাভাস বা Concept, দ্বিতীয় বোধাভাস বা Percept। বোধের আভাস যাহা, অনুভূতিগম্য যাহা, তাহারই আলোচনা করিতে হয়। সে কথা পরে বলিব। শিবের Concept এবং Percept দুইয়ের সুন্দর বিশ্লেষণ তন্ত্রে আছে। এই জ্ঞানাভাস ও বোধাভাস লইয়াই মায়ের দশ মহাবিদ্যার রূপ নির্ণীত হইয়াছে। তন্ত্র বলেন, সে কথা গুরুমুখ করিয়া শুনিতে হয়। অর্থাৎ যাহার মুখে শুনিবে, তাহাকে প্রথমে গুরুর পদে বরণ করিতে হইবে। সুতরাং সে সকলের ব্যাখ্যা করিবার অধিকার আমার নাই। যতটুকু ছিল, ততটুকু পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছি। এখন পরে অন্য কথা বলিব।

('প্রবাহিনী,' ১৭ শ্রাবণ ১৩২২)

নায়কের তর্পণ

দেখিতে পাই, তর্পণটা ইংরেজীনবীস ভদ্রলোক—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য অপেক্ষা দোকানদার, ব্যবসাদার, বেনে প্রভৃতি স্বাধীনব্যবসায়ী জাতির হিন্দুগণের মধ্যেই নিবদ্ধ। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাচরণ দরিদ্রেরই অবলম্বন ; যাহারা গরীব, যাহারা জীবনে অনেক ঠকিয়া ঠেকিয়া বুঝিয়াছে, তাহারাই ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া থাকে। যাহাদের টাকা আছে, বাবুয়ানির বিলাস আছে, যৌবনের কিংবা ক্ষমতার মদমত্ততা আছে, তাহারা সহজে ধর্ম্মকর্ম্ম করে না। তবে ধনী, পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে যে একেবারেই ধর্ম্মকর্ম্ম নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প ; কেন না ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার তাড়সে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এতটা বিগড়াইয়াছেন যে, সদাচার অবলম্বন করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। দেহে কুলাইয়া উঠে না বলিয়াই অনেকে হিন্দু ধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়াও হিন্দুর সদাচার গ্রহণ করিতে পারেন না, অথবা দেহের দোহাই দিয়া তাঁহারা কদাচার করিয়া থাকেন।

কিন্তু তর্পণ কেবল সদাচার বা ধর্ম্মকর্ম্ম নহে,—উহার ভিতরে দেশাত্মবোধটা পরতে পরতে জড়ান মাখান আছে। উহাতে দেশের পরিচয়, জাতির পরিচয়, পিতৃপরিচয় লুকান আছে। যাঁহাদের গর্ব্বে তোমাদের এতটা গর্ব্ব, সেই বৈদিক ঋষি মুনির, ভৃগু, বশিষ্ঠ, সনক, সনন্দ, ব্যাস, গৌতম প্রভৃতির, ভীষ্ম দ্রোণ, রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির তর্পণ করিতে হয়। প্রথমে ভাবিতে হয়, এই আমার দেশ, সপ্ত-সরিদ্বরা, হিমালয়-মণ্ডিতা, সাগরাম্বরা, কাননকুন্তলা, জম্বুদ্বীপ ভারতবর্ষ আমার দেশ, এই দেশে যাঁহারা জ্ঞানে বিদ্যায় সাধনায় বড় হইয়াছেন, পতিতোদ্ধারে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠায় যাঁহারা বড় হইয়াছেন, আত্মপরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাদের তর্পণ করিতে হয় ; কেন না, তাঁহারাই ত এ ভারতবর্ষের স্রষ্টা, তাঁহাদের মনীষা-মণ্ডিত হইয়া এই ভারতবর্ষ স্বীয় বিশিষ্টতা লাভ করিতে পারিয়াছে, তাঁহাদের জন্যই ত হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর মনুষ্যত্ব, তাঁহাদের আত্মপ্রভাবের দ্বারা আমাদের আত্মা, জীবাত্মা বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। তাই তাঁহাদের তর্পণ বিধেয়। তাহার পর নিজের পিতা পিতামহ প্রপিতামহ, মাতা

মাতামহ প্রমাতামহ প্রভৃতি জ্ঞাতি কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের তর্পণ করিতে হয়। কেন না, তাঁহাদের সত্তার দ্বারা আমার আমিত্বের বিকাশ। তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের আত্মার পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে তিলাঞ্জলি দিলে আমার আত্মার পরিতোষ সাধন করা হইবে। তাঁহারাই আমার আমিত্ব, তাঁহারাই আমার পরিচয়, তাঁহারাই আমার মনুষ্যত্বের ধাতা, পাতা, নিয়ন্তা; তাঁহারা না থাকিলে আমি হইতাম না, তাঁহাদের জন্যই আমার জন্মের শ্লাঘা, পিতৃপরিচয়েব গৌরব। তাই পিতৃগণের তর্পণ করিতে হয়। তাহার পর আমার দেশের সজাতীয় বা বিজাতীয় যে-কেহ অপুত্রক মরিয়াছে, নির্ব্বান্ধব ভাবে মরিয়াছে, রণে বনে দুর্গমে মরিয়াছে, অনাহারে, মহামারীতে, জলপ্লাবনে, অগ্নিদাহে মরিয়াছে, যে-কেহ সর্পাঘাতে, ব্যাঘ্রকবলিত হইয়া বা অন্য কোন রকমে অপঘাতে মরিয়াছে, তাহাদের সকলের জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তর্পণ করিতে হইবে। কেন না, তাহারা যে আমার স্বদেশবাসী। যে ভূমির ক্ষীর-নীরধারা পান করিয়া আমি পুষ্ট, যে জন্মভূমিকে মা বলিয়া আমি ধন্য, তাহারা সেই দেশের মানুষ; সুতরাং দেশগত সম্বন্ধে আমার আত্মীয়; তাহাদের আত্মার পরিতৃপ্তিতে আমার পরিতৃপ্তি—কাজেই তাহাদের তর্পণ করিতে হয়। শেষে ভাবিতে হয়, এই সৃষ্টিচাতুরীর মধ্যে আমিও একজন, এই বিশ্বব্যাপী আত্মার এক বুদ্‌বুদ আমার আত্মা, অতএব বিশ্বাত্মার পরিতৃপ্তি হইলে আমার আত্মার পরিতৃপ্তি হইবে। তাই আব্রহ্ম তৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত বিশ্বসংসারের সর্ব্বস্বের, প্রতি অণু হইতে মহান্ মহত্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বাবয়বের, সর্ব্বপদার্থের তৃপ্তি-সাধন উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতে হয়।

Patriotismএর এমন প্রগাঢ় বিবৃতি, দেশাত্মবোধের এমন মূলস্পর্শিনী অভিব্যঞ্জনা, এমন বিশ্বব্যাপী মহাভাবের বিকাশ—তর্পণ ছাড়া আর কিছুতেই হয় না, হইবার নহে। তর্পণ করিতে করিতে মনে হয়, আমি ক্ষুদ্র নহি, সামান্য নহি, হীন—হেয় নহি; মনে হয়, আমি তাঁহাদেরই একজন, যাঁহারা এক কালে জগদ্বরেণ্য, জগৎপূজ্য ছিলেন; মনে হয়, আমি তাঁহাদেরই, যাঁহারা বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ রচনা করিয়া গিয়াছেন; মনে হয়, আমার দেশের দুঃখী আতুর, অনাথ কাঙ্গাল, দরিদ্র ভিখারী, সবাই আমার মধ্যে, আমাতে সন্নিহিত, আমি তাহাদের, তাহারা আমার; মনে হয়, পাপী তাপী রোগী ব্যথিত, পাষণ্ড, দুর্দ্ধর্ষ দস্যু, সবাই আমার, আমার দেশের,

আমার জাতির, সুতরাং আমার নিজস্ব; মনে হয়, আমার আমাতে—আমার এই ক্ষুদ্র আমিত্বটুকুর মধ্যে আমার দেশ, আমার জাতি, আমার বর্ণ, আমার ধর্ম্ম, আমার শিল্প সাহিত্য, শ্লাঘা কলঙ্ক, আমার সর্ব্বস্ব লুকান মাখান জড়ান আছে; তাহাদের তৃপ্তিতে আমার তৃপ্তি, তাহাদের উদ্ধারে আমার উদ্ধার। আমার জাতির অতীত ইতিহাস, আমার জাতির গৌরব ও কলঙ্ক আমার মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে নিবদ্ধ। তর্পণ স্মৃতির আলোড়ন, তর্পণ বিস্মৃতি-সাগরের মন্থন, তর্পণ আমার আমিত্বের পরিচয়, আমার অতীত ও বর্ত্তমানের সমাহার। এ তর্পণে উচ্চ নীচের বিচার নাই, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের বৈষম্য নাই, ধনী দরিদ্রের পার্থক্য নাই। মায়ের কোলে সকল সন্তানই সমান, মাতৃদৃষ্টিতে সন্তানগণের উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী দরিদ্র নাই। পতিতপাবনী জননী জাহ্নবীর ক্রোড়ে দাঁড়াইয়া সবাই সমান ভাবে পবিত্র পূত হইয়া আজ এই পঙ্ককাল তর্পণ করিতেছে। সে জননী জাহ্নবী তরল তরঙ্গে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস, অতীত গৌরবগাথা, অতীত কলঙ্কের কথা কুলুকুলু ধ্বনিতে সদাই গান করিতেছেন। সে জননী জাহ্নবী ব্রহ্মাবর্ত্ত ও আর্য্যাবর্ত্ত বিধৌত করিয়া যুগে যুগে স্তরে স্তরে পেলব পবিত্র মৃত্তিকা সঞ্চয় করিয়া এই বঙ্গভূমিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার স্তরে স্তরে ভারতেতিহাস যেন গ্রথিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের অতীত স্মৃতি যেন জাগরূক রহিয়াছে। সেই গঙ্গায় দাঁড়াইয়া, জন্মভূমির দিকে তাকাইয়া অতীতের শ্লাঘা আলোড়ন করিবার জন্য হিন্দু তর্পণ করিয়া থাকেন। তর্পণে যেমন জাতিবিচার নাই, তেমনই ধর্ম্ম-বিচার নাই। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, সকল সম্প্রদায়ের প্রত্যেকই তর্পণ করিতে সমান অধিকারী, সবাই সমানভাবে সাগ্রহে ও স্পর্দ্ধার সহিত তর্পণ করিয়া থাকে। ইহা জাতির ধর্ম্ম, national কর্ত্তব্য, যে এই দেশের ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে এই দেশের অতীতে শ্লাঘাবোধ করিয়া থাকে, সে-ই তর্পণ করিতে পারে। যাহার পিতৃপরিচয়ে সম্মানবোধ আছে, জাতিপরিচয়ে শ্লাঘাবোধ আছে, জননী জন্মভূমিকে মা বলিয়া ডাকিতে পারে এবং ডাকিতে জানে, সে-ই তর্পণ করে। তাই তর্পণ সর্ব্ববাদিসম্মত আচার। এমন মহাভাবপূর্ণ, জাতির উদ্বোধনসূত্র সমেত ধর্ম্মকার্য্য নাই বলিলেও চলে। তাই মহালয়ার দিনে গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে অতীতের পদচিহ্নে

প্রত্যেক হিন্দুই পিণ্ড দিয়া থাকেন। হিন্দুর পক্ষে ইহা নিত্যকর্ম্ম, কেবল কাম্য নহে। এস ভাই, আজ সবাই তর্পণ করি—ব্রহ্মতর্পণ, বিশ্বতর্পণ, ভীষ্মতর্পণ করি। ('নায়ক,' ২০ আশ্বিন ১৩২২)

শ্যামাপোকা

শ্যামাপোকা, শ্যামাপোকা, তোর গোড়ে নমস্কার, তোর পায়ে নমস্কার। যাহা জর্ম্মনির রাবণ কৈসার করিতে পারে নাই, সেনাপতি হিন্দনবর্গ এবং সেনাপতি মাখন সেন যাহা সিদ্ধ করিতে পারে নাই, যাহা জর্ম্মনির গোলা গুলিতে, গ্যাসে ও অগ্নিপ্রবাহে, টববিমান বা সবমেরিনে সাধন করিতে পারে নাই, আজ তিন দিনে তুমি কলিকাতার সাহেবপাড়ায় তাহাই ঘটাইয়াছ। তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণতি।

হে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, হে কোটিসাগররাজসম বংশবৃদ্ধিপরায়ণ কীটরাজ, তোমার মহিমা অপার। তুমি অমর, তোমার স্বেচ্ছামৃত্যু। তোমরা এক একটি ভীমসদৃশ বীর, তোমাদের জয় হউক। ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট্ ব্রিটিশ জাতির মত প্রবল আর কেই বা আছে, কেই বা ছিল; এই ব্রিটিশ জাতির জীবনের সার-সর্ব্বস্ব পান ও ভোজন, নৃত্য ও গীত, রাগ ও রঙ্গ, একা তুমিই এই তিন দিন বন্ধ রাখিয়াছ; তোমার জয় হউক। স্থির দামিনীদীপ্তিতে দ্যুতিমান্ গ্রাণ্ড হোটেলে রাত্রি সাড়ে আটটার পর পূর্ব্বেকার মত নিরাপদে নর নারী সম্মিলিত হইয়া আর ভোজন করা চলে না। ডিনারের সে বাহার, সে ভুবনভুলান ভঙ্গী আজ দুই রাত্রির জন্য কে যেন হরিদাবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ইংরেজ এ কয় দিন চোরাগোপ্তা ডিনার করিতেছে। ভয়ে ভয়ে ব্যাদিত অধরোষ্ঠের মধ্যে মাংসখণ্ডসকল ফেলিতেছে, চকিত—ভীত ত্রস্তভাবে প্রদীপ্ত শ্যাম্পেনধারা গলাধঃকরণ করিতেছে,—অতি ভয়ে ভয়ে—অতি সাবধানে—অন্ধকারে আড়ালে আবডালে যাইয়া প্রেয়সীর মুখচুম্বন করিতেছে। শত অলকাপুরী সম্পিণ্ডিত করিয়া যে কলিকাতা নির্ম্মিত হইয়াছে, শত নন্দনের শোভা কেন্দ্রীকৃত রাখিয়া যে কলিকাতা রচিত হইয়াছে, যে নগরে মদন ও রতি নিশ্চল ও নিথরভাবে বিরাজ করিতেছেন,

সেই অতুল্য ও অপূর্ব্ব কলির নগর কলিকাতায় হে নবদূর্ব্বাদলশ্যামসুন্দর, নবীন নটবর, দেওয়ালীর কীট, তুমি সবুজ দুঃখ যেন ঢালিয়া দিয়াছ। আবার বলি—তোমার জয় হউক। কোটি বাঙ্গালী কেরাণী এবং বাঙ্গালার স্যর রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া চারু, হারু, নবীন, প্রবীণ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্যসেবীকে এক সঙ্গে ময়দা ঠাসার মত ঠেসিয়া একটি পিণ্ডে পরিণত করিলে, এবং তাহার সঙ্গে বাঙ্গালী এডিটাররূপী লেখকগণের লবণ মিশাইলে এবং সাহিত্য-পরিষদের দপ্তরখানার মুন্সীদিগকে, প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণবের কুলজীদপ্তরের ও বিশ্বকোষের লেখকগণকে কেলেজিরার মত ছড়াইয়া দিলে যাহা হয়, তাহারই এক বিরাট্ লেখক গড়িয়া, বৈদ্যুতিক শক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া, বঙ্গোপসাগরের পানিকে মসীতে পরিণত করিয়া এবং বঙ্গবাসী, হিতবাদী ও বসুমতীর অতিকায় বিস্তারকে কোটি-গুণ বাড়াইয়া যদি তোমার মহিমা বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলেও হাজার বৎসরে সে বর্ণনা শেষ করা যায় না।

হে প্রভু, তুমি শক্তিধর। তোমার প্রভাবে গেইটি থিয়েটারে শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গী অভিনেতা ও অভিনেত্রী ব্যাদিত বদনে গান করিতে পারে না। তোমার প্রভাবে আর শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গী রাজহংস-মিথুনের মতন জোড়া জোড়া গাঁথিয়া এই ফিকা শীতের রাত্রে ময়দানের ভিতর ঝোপে ঝাপে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না। আজ কলিকাতার চৌরঙ্গীরূপ নন্দনকাননে মদন স্থবির, রতি অন্ধকারে প্রচ্ছন্না। তোমার প্রভাবে সন্ধ্যার পর রাজপথে বিচরণ করা কঠিন, ইডেন বাগানে বিচরণ করা দুঃসহ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তোমাকে বার বার নমস্কার। তোমার কৃপাও অপার অসীম অনন্ত! যে মানুষ পাখী খায়, সেই মানুষকে সারা রাত জব্দ করিয়া তুমি প্রত্যহ প্রাতে বিহঙ্গকুলকে ভূরিভোজন করাইতেছ। কাকসকলের আনন্দই কত, চড়াইয়ের স্ফূর্ত্তিই কেমন! তুমি লণ্ডনে দেখা দিলে জর্ম্মনির জেপলিন বিমানপথে উড়িতে পারিত না, তুমি বলকান দেশে বিরাজ করিলে বুলগারগণ নীশ অধিকার করিতে পারিত না, হয়ত বা লর্ড কিচেনারকে দেশছাড়া হইতে হইত না। হে সুরেন্দ্রনাথ, কি ছার রাজনীতির চর্চ্চা করিতেছ! কি ব্যর্থ কনষ্টিটিউশনাল এজিটেশান করিতেছ! এক বার শ্যামাপোকার বাহাদুরির প্রতি লক্ষ্য কর। শ্যামা ঘরে বাহিরে, ইংরেজকে, চৌরঙ্গীবিহারীদিগকে ঘেরিয়া ধরিয়াছে। শ্যামা

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিচরণ করিয়া সাহেব বিবিদের পাগল করিয়া তুলিয়াছে। শ্যামা, পানে ভোজনে, পোষাক পরিচ্ছদে, টেবিলে চেয়ারে, কোচে খট্টাঙ্গে, সুখশয়নে সুখাসনে, গেলাসে টমব্লারে, ডিকাণ্টারে বোতলে, মুখে কানে চোখে—সর্ব্বাঙ্গে, সর্ব্বস্বে, সর্ব্বকার্য্যে, সকল ব্যাপারে ক্ষুদ্র হরিৎ দেহখানি ছাড়িয়া দিয়া, জগজ্জয়ী ইংরেজকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। এই অস্থৈর্য্য যত দিন থাকিবে, তত দিন তুমি যাহা চাহিবে, ইংরেজ তাহাই দিতে পারে। হোমরুল, ফেদেরেশন, ঔপনিবেশিক শাসন, এমন কি, কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যানি—সর্ব্বস্বই ইংরেজ তোমাকে দিতে পারিত; হে সুরেন্দ্রনাথ! তুমি যদি শ্যামাপোকা হইতে বা শ্যামাপোকা দলের বাগ্মী রাজা ও ট্রিবিউন হইতে। হাজারটা কংগ্রেস করিলে যাহা না হয়, তিন দিন শ্যামাপোকার কংগ্রেসে তাহা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। এক একটি শ্যামাপোকা যেন এক একটি দধীচি মুনি,—দেহ দিয়া অসুরদলন করিতেছেন এবং দুর্ব্বল বিহঙ্গকুলের উদরপূর্ত্তি করিতেছেন। দধীচি একখানা হাড় দিয়াছিল, শ্যামাপোকা সর্ব্বস্ব দিতেছে—দেহ প্রাণ উৎসর্গ করিতেছে। এমন ত্যাগ, এমন সন্ন্যাস, এমন সংযম আর কোথায় পাইবে? নরলোকে এমনটি কখনও সম্ভবপর নহে। শ্যামাপোকা, তোমায় প্রণাম।

আমরা শ্যাম শ্যামার পূজক শ্যামকায় বাঙ্গালী, আমাদের দেবতাই হইল শ্যামাপোকা! শ্যামাপোকা এক পক্ষে চৌরঙ্গীর সুখে—দুঃখের গরল ঢালিতেছে, অন্য পক্ষে যে সকল কৃষ্ণকায় চৌরঙ্গীবাসী, তাহাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছে যে, এ স্থান তোমাদের নহে। যেখানে কালো রূপের সাগর উথলিতেছে, দশ লক্ষ কালা আদমী একসঙ্গে বাস করিতেছে, সেই স্থানে যাইয়া বাস কর; আমার উপদ্রব তোমাদের সহিতে হইবে না। তুমি কালোবরণ, ধলাদের সঙ্গে থাকিবে কেন? শ্যামাপোকা ইহাও বুঝাইতেছে যে, আমি শ্যামাপোকা, নিরামিষভোজীর দর্পহারী আমি, পোপ পঞ্চানন হইতে হীরেন্দ্র দত্ত পর্য্যন্ত সকল ঘাসখোরের উদরস্থ হইতেছি। সত্যই আমি সকল দর্প খর্ব্ব করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে এই সময়ে দেখা দিয়া থাকি। আমার কাছে শ্বেতাঙ্গের তোপ কামান ব্যর্থ, প্রেস এক্ট, দেশরক্ষা আইন, প্রেস-সেন্সর—সবাই বিকল ও পঙ্গু; আমার কাছে টিকটিকি জব্দ, পুলিসের লাল পাগড়ি জব্দ। একটাও পাহারাওয়ালা ল্যাম্প-পোষ্টের নীচে

রাত্রিকালে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, সকলকেই পানওয়ালীর অন্ধকার নীড়ে যাইয়া আত্মগোপন করিতে হয়। আমিই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, দর্পহারী মধুসূদন। তোমরা আমাকে নমস্কার কর।

"নমস্তে সতে তে জগৎকরণায়
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।"

হে শ্যামাপোকা—তোমাকে নমস্কার, বার বার—কোটি বার নমস্কার। শিষ্যস্তেঽহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্! ('নায়ক,' ২৪ কার্ত্তিক ১৩২২)

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার অন্তরালে বাঙ্গালার একটা বড় রকমের সমাজ ও সাধনসংস্কার লুকান আছে। যাঁহারা তন্ত্রতত্ত্ব জানেন না, বাঙ্গালীর সাধনকাণ্ডের কোন খবরই রাখেন না, তাঁহারা আমাদের এই কথাটার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন না। সাধনার সম্বন্ধে বাঙ্গালার প্রায় সবাই শাক্ত এবং তন্ত্রপদ্ধতির অনুসরণকারী। শ্রীচৈতন্যদেব যখন ঈশ্বর পুরীর শিষ্যত্ব এবং কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন আমরা অন্য প্রমাণ-প্রয়োগ না দেখাইয়া বলিতে পারি যে, তিনি তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ত তান্ত্রিক ছিলেনই; একে ত তিনি অবধূত, তাহার উপর তাঁহার সাধনসিদ্ধির পরিচয় পাইলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি গোড়ায় ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। শ্রীশ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্যও তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে সাধনা করিতেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজের মধ্যে তন্ত্রসাধনা ছাড়া অন্য সাধনা প্রচলিত ছিল না, এখনও নাই। শ্রীচৈতন্য বৌদ্ধ তান্ত্রিক বা পাষণ্ডী দলন করিয়াছিলেন; ধর্ম্মের নামে সমাজে যে অত্যাচার বা অনাচার প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, ভক্তির মন্দাকিনীধারায় তিনি সে সব বিধৌত করিয়া সমাজকে সাধু এবং সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এ দেশে সাধনার কোন নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করেন নাই। তাঁহার ভক্তিধর্ম্মের প্রভাবে তন্ত্রের ইষ্টসাধনার পদ্ধতি যে কতকটা মধুময় হইয়াছিল, তাহা

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীর পূজা সেই মাধুরীর অভিব্যঞ্জনা মাত্র।

বাঙ্গালার দুর্গোৎসব বিরাট্ সামাজিক উৎসব এবং যজ্ঞ। কিন্তু দুর্গোৎসব ছাড়া আর যে সকল পূজা বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, সে সবই ইষ্টদেবীর পূজা, সাধনার বিষয়ীভূত। কালীপূজা ইষ্টপূজা, উৎসব নহে; জগদ্ধাত্রীপূজা ইষ্টপূজা; যাঁহাদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রীপূজা হয়, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই ইষ্টদেবী জগদ্ধাত্রী; তিনিই ধ্যানের মূর্ত্তি, তাঁহারই বীজ জপের মন্ত্র। দশ মহাবিদ্যার মধ্যে জগদ্ধাত্রীর রূপ নাই, অথচ জগদ্ধাত্রী সিদ্ধবিদ্যা। বৃহৎতন্ত্রসারে কৃষ্ণানন্দ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, জগদ্ধাত্রীর বীজ বহু পুরাতন; এত পুরাতন যে, কোন্ সাধকে সিদ্ধি লাভ করিয়া এই বীজ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এদিকে হাতে-কলমে করিয়া দেখিলে বেশ জানা জায় যে, গৃহস্থের পক্ষে এমন সুবিধার মন্ত্র, এমন উপাসনাপদ্ধতি আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চ তত্ত্ব বা মকার নিষিদ্ধ হইলে, ভৈরবীচক্রের ব্যবস্থা প্রকাশ্যে বিশেষ নিন্দনীয় হইলে, পরে জগদ্ধাত্রীর উপাসনা বাঙ্গালা দেশে খুব প্রচলিত হয়। প্রবাদ এই যে, নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্ধাত্রী উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনিই এই পূজা বাঙ্গালায় চালাইয়া যান। জগদ্ধাত্রীপূজা দেড় শত বৎসরের অধিক বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত নহে। দক্ষিণ-বাঙ্গালার অনেকগুলি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণবংশ এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া খুব ধুমধামের সহিত পূজা করিতেন; তাঁহাদেরই দেখাদেখি এ পূজা বাঙ্গালা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ ভট্টপল্লীর গুরুসম্প্রদায় এই মন্ত্রের এবং এই সাধনার প্রচার করেন। দক্ষিণ-বাঙ্গালার অন্যান্য গুরুবংশও জগদ্ধাত্রীর উপাসনা প্রচার করিয়াছেন। এখন জগদ্ধাত্রীপূজা একটা ব্রতের মধ্যে গ্রাহ্য হইয়াছে, অনেকে ব্রতের হিসাবে চারি বৎসর কাল জগদ্ধাত্রীপূজা করেন।

জগদ্ধাত্রী বৈষ্ণবী শক্তি—পালনী শক্তির প্রকট মূর্ত্তি মহালক্ষ্মী এবং ভুবনেশ্বরী দেশমাতৃকার সমন্বয়ে ইহার বিকাশ। ইহার বীজগুলিও সব ধারণী পালনী ও হ্লাদিনীর পরিচায়ক। জগদ্ধাত্রী বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম্মের সমন্বয়ে উৎপন্ন। মায়ের পূজা অতি মার্জ্জিত, অতি সংযত; সাধনাও তাই কঠোর ও পূর্ণ সন্ন্যাসের দ্যোতক। জগদ্ধাত্রীপূজায় যত অধিক

বৈদিক মন্ত্রের ব্যবহার হয়, এত আর কোন শক্তিপূজায় হয় না; জগদ্ধাত্রী কল্যাণময়ী, স্নেহময়ী, ভৈরবীও বটেন, জগন্ময়ী আদ্যাশক্তিও বটেন। ইহাতে পঞ্চ মকারের প্রয়োজন নাই, তাই ঢলাঢলি নাই, উৎপাত উপদ্রব নাই। জগদ্ধাত্রীপূজার ফলে বাঙ্গালার শাক্তগৃহে মদের (?) স্রোত মন্থর হইয়াছিল, স্বেচ্ছাচার সংযত হইয়াছিল, বৌদ্ধ তন্ত্রের উৎকট ব্যাপারসকল একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল। স্মার্ত্ত, শৈব ও বৈষ্ণবের সহিত শাক্তের একটা বিরাট্ সমন্বয়ের ফলে জগদ্ধাত্রীর উদ্ভব। তাই ভাটপাড়ার রামাৎ ঠাকুর মহাশয় সকল বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণদের উপর গুরুগিরি করিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণসমাজ কখনই অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের গুরু করেন নাই; তাঁহারা বাঙ্গালার সিদ্ধবিদ্যার বংশের সাধকদিগের নিকটই দীক্ষিত হইতেন। সর্ব্ববিদ্যা ও সিদ্ধবিদ্যা-বংশের বংশধরগণ অধঃপতিত হইলে পর বৈদিক ব্রাহ্মণ কোন কোন স্থানে বা সমাজে গুরুগিরি করিতে পারেন। এখন তাঁহাদের অধঃপতন হইয়াছে, তাই গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী পাইলেই বাঙ্গালী বাবু গুরু করিতেছে। জগদ্ধাত্রীপূজার সঙ্গে এই গুরুত্যাগ ও সংযম সাধনের কথাটা বেশ লুকান আছে।

জগদ্ধাত্রীপূজা এক দিনের দুর্গোৎসব—দুর্গোৎসবের সংক্ষিপ্তসার। অনেকে ঠিক দুর্গোৎসবের মতন জগদ্ধাত্রীপূজাও তিন দিন করেন। তিন অষ্টমীর জন্য তিনটা পূজার বিশিষ্টতা। দুর্গোৎসবে বীরাষ্টমী, তাই দুর্গোৎসব বীরের পূজা, বিজিগীষু সাধকের পূজা। জগদ্ধাত্রীপূজায় গোপাষ্টমী আছে—ইহা মাধুরীর পূজা, ব্রজের কাত্যায়নীপূজার অনুরূপ। অনেকে বলিয়াছেন যে, ব্রজের কাত্যায়নীপূজাই জগদ্ধাত্রীপূজা; বাঙ্গালার তান্ত্রিকগণ উহাকে নিজেদের মতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন। তৃতীয়, বাসন্তীপূজায় অন্নপূর্ণার অষ্টমী—ঋদ্ধ্যষ্টমী, তখন কেবল অন্নদানই প্রশস্ত। তাই বাসন্তীপূজা দাতার পূজা, সম্রাটের পূজা, সমাজ রক্ষার ও পালনের পূজা। গোপাষ্টমীই জগদ্ধাত্রীর বিশিষ্টতার মূল। গোপাষ্টমীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে জগদ্ধাত্রীর মহিমা বুঝা যাইবে। জগদ্ধাত্রীর স্তবে স্পষ্ট লেখা আছে যে, মা! তুমি সচ্চিদানন্দবিগ্রহপ্রকাশিনী, পঞ্চরসাত্মিকা প্রহ্লাদিনী, চিন্ময়ী অরূপিণী। শাক্তের ভক্তি ও বৈষ্ণবের মধুর রস যাঁহাতে আসিয়া মিশিয়াছে, সেই কদম্ববনচারিণী, বিন্দুবিন্দুবিলাসিনী

সুরনিতম্বিনীসেবিতা দেবীই জগদ্ধাত্রী। জগদ্ধাত্রীতেই রমণী জননী এবং জননী রমণী, এই দুই পর্য্যায়ের বিকাশ হইয়াছে। আর ত বেশী ফুটাইয়া বলিতে পারি না, বলিবার উপায়ও নাই, বলিতেও নাই। শেষে এইটুকু বলিয়া রাখিব যে, জগদ্ধাত্রীপূজা বাঙ্গালার বিশিষ্টতার বিজয়নিশান। জীমূতবাহন যেমন দায়ভাগ রচিয়াছিলেন, রঘুনাথ যেমন নব্য ন্যায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, রঘুনন্দন যেমন নব্য স্মৃতি প্রচার করিয়াছিলেন, কৃষ্ণানন্দ যেমন শক্তিসাধনাকে কলঙ্কশূন্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য যেমন ভক্তির ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গৌড়ের বিশিষ্টতারক্ষা ও সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন, জগদ্ধাত্রীপূজাও তেমনই সাধনার ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। আর কোন দেশে কোন শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ পূজা, এমন সাধনা প্রচলিত নাই। ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব, বাঙ্গালীর নিজস্ব। অথচ তন্ত্র বলিতেছেন যে, এই দেবী এবং ইঁহার বীজমন্ত্র অতি পুরাতন এবং সনাতন। এইটুকুই মজার কথা, বাঙ্গালী সাধকসম্প্রদায়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। হায় বাঙ্গালী! ইউরোপের ছাই ভস্মে এখনও মুগ্ধ হইয়া আছ, এক বার নিজের দিকে তাকাও না—দেশ, সমাজ ও জাতিকে চিনিবার চেষ্টা কর না? তোমার জীবন সার্থক হইবে। ('নায়ক,' ২৯ কার্ত্তিক ১৩২২)

উল্টা রথ

উঠ উঠ উঠ—যে রথে উঠিয়া উল্টা গতিতে কুঞ্জবাটিকা হইতে স্বীয় মণিমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করা যায়, সেই রথে আবার উঠ। যিনি লীলাময়, সৃষ্টিই যাঁহার বিলাস, তিনি বিলাসকুঞ্জে সপ্তাহের অধিক তিষ্ঠিতে পারেন না, তাঁহাকে আবার সেই কর্ম্মের রত্নবেদীর উপরে আসিয়া বসিতে হয়; তাঁহাকে উল্টা গতিতে আবার নিজ নিকেতনের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। কর্ম্মীকে নিজের আয়তনে, নিজগৃহে বসিয়া কাজ করিতে হয়। পরের আশ্রয়ে কর্ম্ম হয় না, সাধনা হয় না। যে সাধক, যে কর্ম্মী, তাহাকে নিজ নিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হইবে; নিজের আসনে আসিয়া আবার বসিতেই হইবে। শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম জীবকে এইটুকু বুঝাইবার

জন্যই উল্টা রথের সৃষ্টি করিয়াছেন। উল্টা রথ প্রত্যাবর্ত্তনের ইঙ্গিত, প্রত্যাবর্ত্তনের লীলা মাত্র।

তাই বলিতেছিলাম—ভাই! আবার ফিরিয়া আইস; তোমার পিতৃপিতামহের অঙ্গনে, তোমার তুলসীমঞ্চের তলে, তোমার পঞ্চবটীর ছায়ায়, তোমার কুটীরে আবার ফিরিয়া আইস। সে শূন্য কক্ষ, শূন্য প্রাঙ্গণ, শূন্য ছায়া, শূন্য তুলসীতল তোমাকে আবার আহ্বান করিয়া গ্রহণ করিবার জন্য যেন অঞ্চল পাতিয়া আছে। এস এস, ব্যাস বশিষ্ঠের ভরদ্বাজ শাণ্ডিল্যের গোত্রগণ! এস এস, ভারতভূমির চারি বর্ণের নরনারী, ভারতীয় সমাজের ছত্রিশ জাতি এবং ছাপ্পান্ন শ্রেণী, এস এস; ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল জাতি, তোমাদের নিজ নিকেতনে আবার ফিরিয়া আইস। দেবতা সে ইঙ্গিত তোমায় করিতেছেন; প্রকৃত অবস্থা দেখিলে মনে হয়, ইহাই ত নিজ নিকেতনে, স্বীয় আসনে প্রত্যাবর্ত্তনের শুভ মুহূর্ত্ত। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন—তোমরা করিবে না কেন?

এইবার চাতুর্মাস্য আরম্ভ হইবে, এইবার নিবিড় নীরদজালে ধরাবক্ষকে আবৃত করিয়া প্রকৃতিদেবী অনবরত বারি বর্ষণ করিবেন। এমন দুর্য্যোগে, এমন দুঃসময়ে নিজের আসন ছাড়িয়া কুত্রাপি যাইতে নাই, গৃহের আচ্ছাদন ছাড়িয়া পরের ছাঁচতলায় দাঁড়াইতে নাই। এই বর্ষাধারাপ্লাবিত ধরায় স্বয়ং ভগবান্ নিদ্রিত ও শায়িত থাকিবেন, এ সময়ে কি নিজের গণ্ডী কাটিয়া বাহিরে যাইতে আছে? এস ভাই, আমরা ঘরের ছেলে, আবার ঘরে যাই, মায়ের অঞ্চল ধরিয়া অঞ্চলের অন্তরালে যাইয়া দাঁড়াই। ঐ দেখ, দূরে—ইউরোপে কি ভয়ানক দামিনীদীপ্তি হইতেছে, কেমন শ্রবণভৈরব নাদে মেঘগর্জ্জন হইতেছে। ঐ দেখ, সে দেশে নরশোণিতের বর্ষাপ্লাবনে কত নরমুণ্ড ভাসিয়া যাইতেছে। কি ভীষণ! নরকপালশ্রেণী বেলাভূমিতে বলাকাশ্রেণীর মত শোভা পাইতেছে। এবার বিধাতার বিধানে সে দেশে নরশোণিতের বর্ষা হইয়াছে। এ দুঃসময়ে, এমন সর্ব্বনাশী লীলার কালে কি বাহিরে থাকিতে আছে? আইস ভাই, ঘরের ছেলে আমরা ঘরে আসিয়া দাঁড়াই।

তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হইবে। তোমরা পর হইতে পার না, অপরের সহিত মিশিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতে পার না। যখন নিজের অতীতকে ভুলিতে পার না, যখন ভারতবর্ষের জল বায়ু ও

প্রকৃতির প্রভাব এড়াইতে পার না, যখন ভারতবর্ষের বিশিষ্টতা তোমাদের মেদ মজ্জার সহিত গ্রথিত, বসার মধ্যে অনুস্যূত, তখন ইহাই ত প্রত্যাবর্ত্তনের সময়। এই সময় ফিরিয়া এস না? তোমার পশ্চাতে কোটি যুগের অতীত ইতিহাস শ্মশান-ভস্মের মত স্তূপীকৃত রহিয়াছে, তোমার প্রতি শোণিতবিন্দুতে বৈদিক যুগ হইতে এখন পর্য্যন্ত সকল কালের, সকল স্তরের সংস্কাররাশি সঞ্চিত রহিয়াছে। তুমি দুই দিনের মানুষ নও, তুমি নবীন জাতির জীবন-বিলাসে প্রমত্ত নও, তুমি পুরাতন এবং সনাতন। তুমি ত সহসা বদলাইতে পার না; তুমি ত হাটে মামা হারাইয়া দীর্ঘ কাল বিভ্রান্ত হইয়া থাকিতে পার না! তোমাকে তোমার সেই নিত্য শান্ত শীতল, স্নিগ্ধ কোমল, নির্ম্মল নিরাবিল ঋষির আশ্রমে আবার আসিয়া বসিতে হইবে, তোমাকে সেই আবার সামগান, সেই শ্যামসঙ্গীত, সেই শ্যামার নাম আবার শুনিতে হইবে। শ্যাম শ্যামার দেশের ছেলে তুমি, তুমি শত চেষ্টা করিলেও ত পর হইতে পার না—পারিবেও না। তবে আর বিলম্ব কেন, আজ উল্টা রথের দিনে এস ভাই, আমার ভারতভূমির সৃষ্টিধর—বংশধরগণ, নিজ নিকেতনে ফিরিয়া আইস।

ছাড়া পাইলে, শাসন না থাকিলে, অনেক দিন সংযম সন্ন্যাসের পীড়নে বুভুক্ষু হইলে যায় বটে, তোমাদের মত অনেকেই দড়িছেঁড়া বৎসের মত ছুটিয়া যায় বটে! সুখৈশ্বর্য্য দেখিয়া, অন্যের বিলাস ব্যসনের মোহবাগুরায় অনেকেই ছুটিয়া যাইয়া আটকা পড়ে বটে! রক্তমাংসের শরীর থাকিলে এমনই ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে। কিন্তু বালক যেমন সারা দিন ধূলিখেলা করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারের আগমনসম্ভাবনা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি নিজ নিকেতনের দিকে ফিরিতে চেষ্টা করে, মা মা রব করিতে করিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতে থাকে, মাঝে মাঝে মায়ের আহ্বান শুনিয়া অপথ ছাড়িয়া সুপথে চলিতে থাকে, তোমরাও তেমনি বর্ষার আসার দেখিয়া, ইউরোপের শ্মশান-চুল্লীর শতজিহ্ব বহ্নির জ্যোতিতে, কোটি অস্ত্রঝনঝনার বিদ্যুদ্বিকাশে নিজ গন্তব্য পথ বাছিয়া লইয়া কেন না নিজনিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে? এস এস, আমাদের সর্ব্বস্বধন, আমাদের ইহকাল পরকালের অবলম্বন, আমাদের জলপিণ্ডের সম্বল, শতচাঁদনিঙড়ান সুধামাখান সুতনু বালকগণ, আজ উল্টা রথের দিনে

পুরুষোত্তমের রথের সহযাত্রী হইয়া, সে রথের দড়ি ধরিয়া টানিতে টানিতে, হরিবোল বলিতে বলিতে এস, তোমরা ঘরে এস! তোমাদের মণিমন্দির মহাসমুদ্রের তীরে, অনন্তের তটে অনাদি কাল হইতে অবস্থিত; সে মন্দিরের রত্নবেদীর উপরে বসিয়া তোমার পুরুষোত্তম তোমার দেশের সাধনা তোমারই দেশের রুচি প্রকৃতির অনুসারিণী করিয়া অবলম্বন করিয়াছেন। এ দেশের যাহা নিত্য সনাতন নহে, তাহা জগন্নাথের ভোগে ব্যবহৃত হয় না, এ দেশের অনাদিকালের শিল্পকলা যাহা নির্ম্মাণ করে না, জগন্নাথ তাহা ব্যবহার করেন না—তোমার জগন্নাথ, তোমার পুরুষোত্তম তোমারই, তোমার নিত্য সনাতন পুরুষ তোমাময় হইয়া, তোমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া, তোমার ভোগে পূর্ণ হইয়া, তোমার মণিমুক্তা সাজ পোশাকে বিভূষিত হইয়া তোমারই পুরীতে বিরাজমান। তিনি তোমার পিতৃপরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তিনি তোমার ইতিহাসের ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন, তিনি তোমার মণিমন্দির তোমার ব্যবহার জন্য নিত্য পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আজ উল্টা রথের দিনে আবার রত্নবেদীতে বসিবার জন্য ঘরে ফিরিতেছেন। ফের, ফের, ফের—বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, মাদ্রাজী, সবাই আজ ইউরোপের পথ ছাড়িয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ফের—এমন দিন আর পাইবে না—এমন অবসর আর আসিবে না।

"ঐ শুন, বাঁশী বাজে—বনমাঝে ও মনোমাঝে।" ঐ নরারণ্য ইউরোপে ধ্বংসের বাঁশী বাজিয়াছে। এক দিন যদুকুল ধ্বংস করিবার জন্য যদুনাথের, দ্বারকানাথের বাঁশী এমনই সুরে বাজিয়াছিল, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কুরু পাণ্ডব নির্ম্মূল করিবার জন্য এক দিন তাঁহার শঙ্খ এমনই ভাবে ধ্বনিত হইয়াছিল। আজ আবার সেই রব—সেই দীপক রাগ শুনিতে পাইতেছি। ঐ রবে, ঐ ধ্বনিতে যদি ভীত হইয়া থাক, যদি ত্রাসে কম্পিত হইতে থাক, তবে ঐ দেখ—পুরীর দ্বারে জননী বিমলা স্নেহের অঞ্চল ছড়াইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছেন। মা আমার বিমলা—আমার মা হইয়াও বিমলা! শতকোটি শরৎশশী কলঙ্কশূন্য করিয়া নিঙড়াইয়া মায়ের চাঁদমুখ গড়িয়া দিয়াছে, সেই বিমলাদেবী তোমাকে অভয় করিবার জন্য তোমাকে সাদরে সস্নেহে ডাকিতেছেন। ভয় কি! মায়ের অঞ্চল ধর, মাকে মা বলিয়া ডাক, তাহা হইলে ইউরোপের বিশ্ববিদারী শঙ্খনাদ তোমার কর্ণে আসিয়া ধ্বনিত হইবে—জয় রাধে শ্রীরাধে! মায়ের পুরীতে মায়ের কোলে

উঠিয়া বসিলে তখন ঐ যাদবনিসূদন বংশীরবে তুমি শুনিতে পাইবে—"মনে পড়িল রে আমার সেই ব্রজভূম।" তখন ব্রজবিলাসের গৌড় সারং সুরে তোমার প্রাণ মন মাতোয়ারা হইয়া উঠিবে। অতএব আর বিলম্ব কেন? আর মহেন্দ্রযোগ কাটাও কেন? বুঝিয়াছ ত, সব ইউরোপ বুঝিয়াছ, এশিয়া বুঝিয়াছ, ইংলণ্ড বুঝিয়াছ, বঙ্গভূমিও বুঝিয়াছ—বুঝিয়াছ ত সব, ঠেকিয়া শিখিয়াছ ত অনেক কথা! আর কেন ভাই, নিজ নিকেতনে ফিরিয়া আইস। যে জগন্নাথপুরীতে তোমার ছত্রিশ জাতি এক হইয়াছে, মায়ের ছেলে সবাই একাসনে বসিয়াছে, যে পুরীধামে জগন্নাথের প্রসাদ পাইয়া তোমরা সবাই ধন্য হইয়াছ, এস এস—আমাদের অন্ধের নড়ি, নয়নের তারা, বার্দ্ধক্যের অবলম্বন, পরকালের ভরসা, আমাদের ঐহিক সর্ব্বস্ব, পারত্রিক আশা—আমার জ্ঞাতি সজ্জন। আমার ভারতভূমির সুসন্তানগণ, তোমরা নিজ নিকেতনে ফিরিয়া আইস। আজ যে উল্টা রথ। ('নায়ক,' ২৬ আষাঢ় ১৩২৩)

মহালয়া

পিতৃতর্পণ

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

শাস্ত্রের এই মহাবাক্য ব্যর্থ নহে, ফলশ্রুতিমূলক অতিরঞ্জিত উক্তি নহে। ইহার মধ্যে সনাতন সত্য নিহিত রহিয়াছে। পিতা ধর্ম্ম, অর্থাৎ পিতৃপদ রক্ষা করিতে পারিলে সকল ধর্ম্মই—সমাজধর্ম্ম ও সাধন-ধর্ম্ম সুরক্ষিত হয়। তাই পিতা ধর্ম্মস্বরূপ; পিতা স্বর্গ, অর্থাৎ জীবনে সকল সৎকর্ম্মের পরিণতি স্বর্গভোগেই হইয়া থাকে, সাধুতার সাধ্য ও ঈপ্সিতই স্বর্গ—মানুষের দেবত্বপ্রাপ্তি, পিতা সেই স্বর্গস্বরূপ, তাহাতেই জীবনের সকল সৎকর্ম্মের বিনিয়োগ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং পিতৃসেবাই পরম তপস্যা—জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। অতএব এ-হেন পিতার প্রীতিসম্পাদন করিতে পারিলে সকল দেবতাই তুষ্ট হইয়া থাকেন।

পিতৃসেবাই সকল তপস্যার সার, পিতাই স্বর্গসুখের আকর, পিতাই সকল ধর্ম্মের প্রতিমা, পিতাই সর্ব্বদেবতার প্রতিনিধি। আবার বলি, ইহা সনাতন সত্যকথা—সর্ব্বযুগের, সর্ব্বদেশের, সর্ব্বজাতির মানুষের পক্ষে এ কথা খাটে ; এ সত্য মান্য ও সেব্য। কথাটা একটু বুঝাইয়া বলিব।

আমরা সকল দেশের বুদ্ধিমান্ মানুষে বলিয়া থাকি যে, পরমেশ্বর বিশ্বস্রষ্টা ; তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাদের পূজ্য, উপাস্য, আরাধ্য ইষ্টদেবতা। কিন্তু সৃষ্টি অনাদি ; কবে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। স্রষ্টা ও সৃষ্ট পদার্থ উভয়ই অনাদি ; এই অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে নাশের লীলাও অনবরত চলিতেছে। নাশ ও সৃষ্টি, এই দুইয়ের পরম্পরা লইয়াই সৃষ্টি। সৃষ্টির জনক বলিয়া পরমেশ্বর জগৎস্রষ্টা ও আমাদের উপাস্য। কিন্তু সে সৃষ্টির প্রহেলিকা কেহ দেখে নাই, কেহ দেখিতেও জানে না। পরের মুখে ঝাল খাইয়া আমরা পরমেশ্বরের পূজা করি। বেদ, বাইবেল, কোরান প্রভৃতির আপ্তবাক্যই এই অজ্ঞেয়ের জ্ঞাতা ; সেই আপ্তবাক্য মানিয়া চলি বলিয়াই আমাদের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরের উপাসক। এই সৃষ্টি-প্রহেলিকাও আমার আমিত্বের পূর্ণ অপেক্ষা করে। আমি আছি বলিয়াই জগদীশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের লীলা দেখিতেছি। আমি আছি বলিয়াই আমার সৃষ্টি আছে, আমার ঈশ্বর আছেন, আমার উপাসনার আকাঙ্ক্ষা আছে। "হম ডুবা ত জগ ডুবা"—অর্থাৎ আমি ডুবিলে আমার জগৎ ডুবিয়া যায়—আমি মরিলে আমার সঙ্গে আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়। সুতরাং গোড়ায় আমি তাহার পরে আমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টিকারক পরমেশ্বর। আমিই যখন মূলাধার, তখন জিজ্ঞাসা করি—আমি কে ? কোথা হইতে আমি আসিলাম ? কে আমায় আনিল ?

আমার আমিত্বের খোঁজ করিতে যাইয়া প্রথমেই দেখিতে পাই—আমার জনক জননীকে ; তাঁহারা না থাকিলে আমি থাকিতাম না—আমি এ জগতে আসিতাম না। দেখিতে পাই—আমার জনক জননীই আমার স্রষ্টা, আমার সৃষ্টিকর্ত্তা। যাহার জন্য, যে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের জন্য পরমেশ্বর জগৎপূজ্য, সেই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সর্ব্বাগ্রে জনক জননীতে দেখিতে পাই। আমার সৃষ্টি, আমার আমিত্বের বিকাশ ও বিস্তার আমার জনক জননীর দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। অতএব আমার জনক জননীই আমার সৃষ্টিকর্ত্তা। পিতৃশব্দ

জনক ও জননী উভয়েই প্রযোজ্য। সুতরাং 'পিতা ধর্ম্মঃ' শ্লোকে পিতা মাতা উভয়কেই বুঝাইতেছে। শাস্ত্র আবার মাতৃষোড়শিকায় স্পষ্ট বলিয়া রাখিয়াছেন যে, জননী সাক্ষাৎ জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী দেবী। মা সন্তানের পক্ষে সজীব দেবতা। মায়ের কোলে ছেলে থাকিলে সন্তান সম্রাট্‌কেও অভিবাদন করিবে না। এমন কি, ইষ্টদেবতা সাকার হইয়া সাধকের সম্মুখে প্রকট হইলে, সেখানে জননী উপস্থিত থাকিলে, অগ্রে জননীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে হইবে। জীবন্মুক্ত পুরুষের জননী জীবিত থাকিলে জননীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেই হইবে। যাহার জননী জীবিতা আছেন, তাহার পক্ষে অন্য দেবতার আরাধনা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং বলিতে হয়, উপরের শ্লোকটিতে নিত্য সত্য কথার প্রকাশ করা হইয়াছে।

আমি কে? আমি কেবল একটা দেহ নহি, রক্ত মাংস মেদ বসা অস্থির সমবায় নহি। আমি একটা জীবনধারায় একটা বুদ্‌বুদ মাত্র, একটা মনুষ্যত্বের অনন্ত শৃঙ্খলায় একটা আংটা মাত্র। আমার পশ্চাতে অনন্ত অতীত, আমার সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ। আমি ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটা বন্ধনী মাত্র। আমাতে অনন্ত অতীতের সংস্কাররাশি সঞ্চিত, আমা হইতে অনন্ত ভবিষ্যতের সংস্কার-সংবদ্ধ মনুষ্যত্বের প্রবাহ স্ফুরিত হইবে। আমার আমিত্বের মধ্যে আমার বংশের পরিচয়, জাতির পরিচয়, দেশের পরিচয় সম্পুটিত রহিয়াছে। আমি ব্যষ্টি, আমার মধ্যে আমাদের দেশের ও জাতির বিরাট্ সমষ্টি সন্নিবিষ্ট। আমি ব্যষ্টি, এই ব্যষ্টিতেই সমষ্টির বিকাশ; আমি বিন্দু, এই বিন্দুর মধ্যেই সিন্ধু উথলায়—অনন্তের লীলা প্রকট হয়। ইহাই সৃষ্টির প্রহেলিকা, এ প্রহেলিকা যে বুঝিতে পারে, সে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে পারে, বিশ্বস্রষ্টার মহিমাও অনুভব করিতে পারে।

আমি কে? "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—আমি আমার জনকের আত্মস্বরূপ,—সে আত্মার একটা টুকরা। আমার জনক আবার তাঁহার জনকের আত্মা বা আত্মাংশ। এমনই অনন্ত পরম্পরায় বিশ্বাত্মা আমাতেই নিহিত। সেই বিশ্বাত্মা আমাকে যিনি দান করিয়াছেন, তিনিই আমার জনক—আমার পিতা। এই পিতৃত্বের ও পুত্রত্বের পরম্পরায় বংশের ধারা সৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে আরও একটু মজা আছে; পিতামহ ও পৌত্র সহোদর সম্বন্ধে সংবদ্ধ; প্রপিতামহ ও প্রপৌত্রে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ নিত্য বিরাজিত।

এই হিসাবে পিতাপুত্রের পরম্পরা বংশের ধারার সর্ব্বত্রই প্রকট রহিয়াছে। পিতা বলিলে বংশ বুঝায়, পিতা বলিলে বংশের ধারা বুঝায়, পিতা বলিলে জনক জননী বুঝায়, পিতা বলিলে আমাকেও বুঝায় এবং আমার জগতের স্রষ্টাকেও বুঝায়। পিতা জগদীশ্বরের নাম, পিতা আমার ঈশ্বরের নাম; পিতা না থাকিলে কি সৃষ্টি হয়। কিংবা সৃষ্টি বজায় থাকে ভাই!

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

এখন জিজ্ঞাসা করি—তর্পণ করি কেন? তর্পণ কি? যাহার দ্বারা তৃপ্তি হয়, তাহাই তর্পণ। আত্মতৃপ্তিই তর্পণের পারিভাষিক শব্দ। আত্মতৃপ্তি হয় কিসে? বলিয়াছি ত, আমি কে, তাহা চিনিলে আত্মতৃপ্তি ঘটিতে পারে। আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সমবায়ে আমি, আমার পিতা ও পিতামহের পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সমন্বয়ে আমি। তাঁহারা সবাই আমাতে আছেন, আমি তাঁহাদের সকলের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে চিরদিনই ছিলাম, এখন তাঁহাদের বংশধররূপে, জলপিণ্ড দানের অধিকারিরূপে প্রকট হইয়াছি। সুতরাং তাঁহাদের নামের আবৃত্তি করিলে, তাঁহাদের তৃপ্তির উদ্দেশে তিলাঞ্জলি দান করিলে, আমার আত্মবোধ ফুটিয়া উঠিবে, আমার বংশানুক্রম, heredity প্রকট হইবে, আমি আমাকে চিনিতে পারিব, স্মৃতির সাহায্যে আমার আমিত্বের প্রসারটা বুঝিতে পারিব, আমার তৃপ্তিবোধ হইবে, আমার তর্পণ হইবে। কেবল আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুল লইয়াই ত আমার আমিত্ব নহে। আমার আমিত্বের বিকাশ আমার দেশের পুরাণেতিহাসে, আমার দেশের মানবশ্রেষ্ঠগণের প্রভাবে হইয়া থাকে। তাই ভীষ্ম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি মনুষ্যশ্রেষ্ঠগণের তর্পণ করিতে হয়; দেশের যাহারা যুদ্ধে, অগ্নিদাহে, সর্পাঘাতে, মহামারীতে বা অন্য যে-কোন উপায়ে মরিয়াছে, যাহাদের বংশের ধারা নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই তর্পণ করিতে হয়। আমি ত কেবল দেশের নহি, আমি বিশ্বের; তাই দেশ ছাড়িয়া বিশ্বের তর্পণ করিতে হয়। আমি ত কেবল বিশ্বের নহি, বিশ্বাত্মার—তাই "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্" বলিয়া বিশ্বাত্মার তুষ্টিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইবে জানিয়া বিশ্বরাটের তর্পণ করিতে হয়।

ইহাই তর্পণ। আমিত্বের উন্মেষই তর্পণের উদ্দেশ্য, আমাকে খুঁজিয়া বাহির করাই তর্পণের সাধনা। সৃষ্টিসৌন্দর্য্যে আমি আমাকে জড়াইয়া বিলাইয়া দিয়া আত্মহারা হইয়া বেড়াই, নব দ্বার দিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপ্তি ঘটাইয়া আমি ইন্দ্রিয় ও আসক্তির পথে আত্মহারা হইয়া ছুটাছুটি করি; তর্পণ আমার সেই আমিত্বের টুকরাগুলিকে সঞ্চয় করিয়া একঠাঁই গোছাইয়া আমাকে দেখাইয়া দেয়। আমি যে ছোট নহি, এতটুকু নহি, নশ্বর নহি—মরি না, মরিতে পারি না, মরিবও না—এইটুকু তর্পণ আমাকে বুঝাইয়া দেয়। তর্পণ জাতির জাগরণ, আত্মপরিচয়ের উন্মেষসাধন। দেবনিদ্রার কালে পাছে মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে, আত্মহারা হইয়া বিহ্বলভাব ধারণ করে, তাই পিতৃপক্ষে তর্পণ। পিতৃযান ও পিতৃলোকের কথা নাই বলিলাম, শাস্ত্রের সাহায্যে পরকালের যবনিকা ছিন্ন করিয়া অপর পারের কথা নাই তুলিলাম,—তাহা ত বিশ্বাস করিবে না, সে দেশের কোন সমাচার ত রাখ না; সে পারের কোন ঘটনা ত তোমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহে। কিন্তু তুমি ত আছ—"a jumble of heredity, a sheaf of forgotten impressions, nation in a nutshell, a link between the past and future"—তোমার তুমিত্বের বিচার করিতে হইলে তর্পণের প্রয়োজন হইবেই, তোমার তুমিত্বের বিশ্লেষণ করিতে হইলে পিতার কথা মনে পড়িবেই। তাই আজ পক্ষকাল ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, সকল হিন্দুগৃহে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে, নদীতীরে, বাপীতটে, তীর্থক্ষেত্রে "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ" মহাবাক্য প্রতিদিন প্রভাতে উচ্চারিত হইতেছে। হিন্দুর এই সমবেত কণ্ঠের কাতর ধ্বনি গগন ভেদ করিয়া বিশ্বরাটের চরণে যাইয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তর্পণ জাতীয়তার প্রথম সোপান, সৌভ্রাত্রের বেদী; তর্পণ সমগ্র হিন্দু জাতিকে এক করিয়া দেয়, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে হিন্দুর নিজস্ব করিয়া দেয়। তর্পণ জাতিসংহতির ও বিশ্বসংহতির মূল মন্ত্র—মহাবাক্য, মহাসাধনা।

আজ মহালয়ার দিনে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে—শ্রীপদচিহ্নে পিতৃপিণ্ড অর্পণ করি কেন? এই এক পক্ষকাল তর্পণ করিয়া বুঝিতে পারি, এই বিরাট্ বিশ্বটা আমার আলয়—মহালয়; এই বিরাট্ বিশ্বটা আমার আমিত্বের আশ্রয় ও লয় হইবার আধার। আমি বিশ্বে আছি, বিশ্ব

আমাতে আছে। কিন্তু তোমাকে—শ্রীবিষ্ণুকে কোথাও ত খুঁজিয়া পাই না—তিনি যে অবাঙ্‌মনসগোচর; তিনি যে অব্যয়, অক্ষয়, অনন্ত, অজ্ঞেয়, অরূপ ও নিষ্কল। তাঁহাকে ত কোথাও খুঁজিয়া পাই না। পরন্তু আমার তৃপ্তি তাঁহাতে, তাঁহার তৃপ্তি আমাতে, কোথায় তুমি? খুঁজিয়া দেখিতে পাই, আমার অহঙ্কাররূপ গয়াসুরের মাথার উপর তোমার পদচিহ্ন বিরাজ করিতেছে। সে চিহ্ন আছে বলিয়াই আমি মাথা হেঁট করিয়া আছি। সে চিহ্ন আছে বলিয়া উন্নত ফণিফণার মত আমার মদ মাৎসর্য্য গগন ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠে না। শ্রীবিষ্ণুর সেই শ্রীপাদপদ্মে আমার আমিত্বের মাধুরী ফুটাইবার জন্য, আমাকে বিনা মূল্যে বিকাইবার সাধে আমি পিতৃপিণ্ড দিয়া থাকি। বলিয়া থাকি—হে দীননাথ, জগন্নাথ! আমার প্রভু, আমার জনক, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির আয়তনে তোমারই স্থানীয়; আমি আমার মধ্যে তাঁহাকে আর যে খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমি তাঁহার হইলেও, তজ্জাত হইলেও বিলাস ব্যসনে, অনুচিকীর্ষায় তাঁহাকে আমাতে ফুটাইতে পারি না। তিনি আমাতে প্রকট হইলে, আমার প্রতি তুষ্ট হইলে আমার সর্ব্বস্ব অমৃতায়মান হইবে। যখন এই সংসার-অরণ্যে বিভ্রান্ত হইয়াছি, পথ হারাইয়াছি, তখন তোমার পদচিহ্নে তাঁহার তুষ্টিসাধনার জন্য জলপিণ্ড দিলাম—তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। গয়াধামে শ্রীচৈতন্যদেবই ব্রাহ্মণের মত পিণ্ড দিয়াছিলেন, তাই পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই হারানিধি পাইয়াছিলেন। সে নিধি বাঙ্গালীকে দিবার জন্য, ভারতবাসীকে বিলাইবার জন্য তিনি পাগল হইয়াছিলেন। আবার তেমনই করিয়া তর্পণ করিবার সময় আসিয়াছে, আবার তেমনই করিয়া গয়াধামে পিতৃপিণ্ড দিবার কাল আসিয়াছে। নহিলে আর যে আমাদের বংশের ধারা বজায় থাকে না, বিশিষ্টতা রক্ষা পায় না। তাই বলি আজ—বল বাঙ্গালী! গঙ্গাস্নান করিয়া, আর্দ্রবস্ত্রে, গললগ্নীকৃতবাসে, করযোড়ে আবার তেমনই করিয়া বল—

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

('নায়ক,' ১০ আশ্বিন ১৩২৩)

কালীয়দমনের যাত্রা

তোমরা ভুলিয়াছ, আমাদের কিন্তু মনে আছে, বিশেষতঃ অশীতিপর জনক জননী মাথার উপর আছেন, তাই অনেক কথা শুনিতে পাই, অনেক কথা মনে রাখি। কাজেই আজ অনুরোধে পড়িয়া গোটাকয়েক পুরানো কথা তোমাদের শুনাইতেছি।

কালীয়দমনের যাত্রা বাঙ্গালায় কখনই কেহ ইয়ারকির বা চিত্তবিনোদনের হিসাবে শুনিতেন না। কালীয়দমনের যাত্রা শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত মধুর রসাশ্রিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের এক প্রধান উপায় ছিল। আমাদের পিতামহ ও প্রপিতামহগণ কীর্ত্তন শুনিবার কালে পট্টবস্ত্র পরিয়া তুলসীর মালা গলায় দিয়া সংযতচিত্তে গান শুনিতেন—ধর্ম্মকথা শুনিবার হিসাবে কীর্ত্তন শুনিতেন, কালীয়দমনের যাত্রাও ঠিক সেই ভাবে শুনিতেন। আসরে বসিয়া কেহ তামাকু সেবন করিতে পারিত না, তাম্বূলচর্ব্বণ করিত না, বাজে গল্প করিত না। ব্রাহ্মণ মাত্রেই যাঁহাদের অবস্থায় কুলাইত, তাঁহারা পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া যাত্রা শুনিতে বসিতেন। যাত্রার আসরে পান তামাক চলিয়াছিল মদন মাষ্টারের সখের যাত্রার প্রবর্ত্তনের সময় হইতে। অনেকের অনুমান, শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কালীয়দমনের যাত্রার প্রবর্ত্তন করিয়া যান; তিনি যে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাই কালীয়দমনের যাত্রার মূল।

দক্ষিণ-বাঙ্গালায় কালীয়দমনের প্রভাব খুব বাড়িয়াছিল ৺নালুর দলের গাওনা হইতে। তেমন গান বুঝি ইদানীং বাঙ্গালায় হয় নাই। সে অক্রূরসংবাদ গাইত, আসরে একটা রথ আনিয়া দাঁড় করাইত। লোকে তাহার গানে এতটা মুগ্ধ হইত যে, গোপীভাবে বিভোর হইয়া রথচক্র ধরিয়া কাঁদিত, রথচক্রের তলায় পড়িয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইত। নালুর গানে বাঙ্গালী ক্ষেপিয়া পাগল হইয়া উঠিত। নালু জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, নিবাস বোধ হয় শ্রীখণ্ডে ছিল। তিনি সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন; তাঁহার অসংখ্য শিষ্য ছিল। নালু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সর্ব্বজনপরিচিত হইয়াছিলেন।

তাহার পরই বদন অধিকারীর কথা বলিতে হয়। বদন অধিকারীও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন; বাঁশবেড়িয়া খামারপাড়ায় তাঁহার এক চতুষ্পাঠী

ছিল; সেই চতুষ্পাঠীতে অলঙ্কার ও রসশাস্ত্র পড়ান হইত এবং সঙ্গীতের চর্চ্চা হইত। বদন দেখিতে অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন—স্ফুট গৌরাঙ্গ পুরুষ, আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু, সে নয়ন কতকটা লোহিতাভ, ব্যূঢ়োরস্ক গজস্কন্ধ, প্রায় আজানুলম্বিত বাহু, আর অতি মধুর কণ্ঠ। এতটা রূপের সহিত অমন সুকণ্ঠ কদাচিৎ কখনও ঘটিয়া থাকে। বদন, ভাগবতে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ৺মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয় বলিতেন যে, অমন সুর লয় তানের সঙ্গে ভাগবতের শ্লোকের আবৃত্তি আমি আর কোন মানুষের মুখে শুনি নাই। বদনের কালীয়দমনের যাত্রা শুনিয়া তখনকার বাঙ্গালী নর নারী প্রায় পাগল হইয়া উঠিত, সে গানের প্রভাব প্রায় সপ্তাহকাল থাকিত। লোকে পাঁচ সাত ক্রোশ হাঁটিয়া আসিয়া বদনের মান ও মাথুরের পালা শুনিত; আহার নিদ্রার কথা কাহারও মনে থাকিত না। বদনের মতন বৈষ্ণব মহাজনদিগের তুক্ক কেহ আবৃত্তি করিতে পারিত না। পিতামহীর মুখে শুনিয়াছিলাম যে, নবদ্বীপের কোন গোস্বামী, বদনের মুখে মাথুরের পালা শুনিয়া তাহাকে স্বগৃহের সকল তৈজসপত্র দান করিয়াছিলেন। পরদিন তাঁহাকে ভাঁড়ে জল খাইতে হইয়াছিল। বদনের মতন কীর্ত্তনিয়া সে সময়ে বাঙ্গালায় অল্পই ছিল।

তাহার পর ৺গোবিন্দ অধিকারী। গোবিন্দ জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন, বদনের দলের এক ছোকরা ছিলেন। গোবিন্দও সুগায়ক ও ভাবুক ছিলেন। গোবিন্দের দূতীয়ালি বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। এমন বৃন্দা দূতী আর কেহ সাজিতে পারিত না। গোবিন্দের দূতীসংবাদ, অক্রূরসংবাদ, মান ও কলঙ্কভঞ্জন শুনিবার জিনিস ছিল। তাহার গানে গত ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দুবাঙ্গালা মুগ্ধ ছিল। ৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এই গোবিন্দের দলের ছোকরা ছিলেন। নীলকণ্ঠ পর্য্যন্ত কালীয়দমনের যাত্রার ধারা বজায় ছিল। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ কমলাকান্ত সে ধারা বজায় রাখিতে পারিলে তাঁহার জীবন ধন্য হইবে।

বলিয়াছি ত, কালীয়দমনের যাত্রা চিত্তবিনোদনের ব্যাপার ছিল না—উহা ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মব্যাখ্যা ছিল; সমাহিতচিত্তে, সংযতভাবে এবং পবিত্রদেহে সে যাত্রা শুনিতে হইত। যাহারা গান করিত, তাহারা ব্যবসাদারী ভাবে গান করিত না। বদন ও গোবিন্দ সত্যই নিজেরা খাঁটি দূতী সাজিয়া মধুররসাশ্রয়ে শ্রীভগবানের যেন আরাধনা করিতেন। বদন

অধিকারী মাথুর গান করিতে করিতে কাঁদিয়া আকুল হইতেন, কখনও কখনও ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন। তখন আসরশুদ্ধ লোকে ব্রাহ্মণ-শূদ্রনির্ব্বিশেষে, বৃদ্ধ-যুবকনির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার পদধূলি লইতেন। গোবিন্দেরও ভাব হইত। গোবিন্দও কাঁদিয়া আকুল হইত। শেষে নীলকণ্ঠকে আমরা আসরে হতচেতন হইতে দেখিয়াছি। সত্যই সে গানের সুর, বেহালার সুর কানে পক্ষকাল যেন লাগিয়া থাকিত। এখনও সে সব মহাজনী পদের আবৃত্তি শুনিলে সেই সুর কানে যেন আবার বাজিয়া উঠে। যাত্রাকে ইয়ারকির জিনিস করিয়া তোলে মদন মাষ্টারের সখের দল। মদন মাষ্টারই প্রথমে যাত্রার আসরে ডুগি তবলার প্রচলন করেন। কালীয়দমনের যাত্রায় খোল ও পাখোয়াজ ছাড়া অন্য বাদ্যভাণ্ড ব্যবহৃত হইত না। ডুগি, তবলা ও ঢোল টপ্পার আনুষঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইত, কালীয়দমনের আসরে উহারা স্থান পাইত না। তাহার পর নাচ; সে নাচ যে না দেখিয়াছে, তাহাকে বুঝান যায় না। কালীয়দমনের যাত্রায় গোষ্ঠের ও রাসলীলার নাচ অপূর্ব্ব ছিল। সে নাচ, সে গান আধুনিক ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত বাঙ্গালীর পক্ষে সত্যই অসাধ্য। সে দিন নাই, সে বাঙ্গালা দেশ নাই, সে বাঙ্গালী জাতি নাই, সে রুচি প্রবৃত্তি নাই, সে শিক্ষা নাই—ধ্যানধারণাও নাই। বলিব কি লজ্জার কথা, পূর্ব্বেকার হাড়ী ডোমে যাহা বুঝিত, যে রসের রসিক ছিল, এখনকার রায়চাঁদী প্রেমচাঁদীরা তাহা বুঝে না, তেমন রসিক নহে। কালীয়দমনের যাত্রায় mass education অপূর্ব্ব পদ্ধতিক্রমে হইত, দেশের জনসাধারণে সদ্ভাবে ভাবুক হইত; লোকে সাধু সংযত ঈশ্বরবিশ্বাসী হইত। হায় রে সে কাল—আবার কি তেমনটি হইবে? ('নায়ক,' ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩২৩)

শ্রীশ্রীবাসন্তীপূজা

দেবীপক্ষ পড়িয়াছে। আজ পঞ্চমী, কাল বুধবারে অশোকষষ্ঠী, মায়ের বোধন। এইটাই আসল খাঁটি দুর্গোৎসব। এ দুর্গোৎসবে মায়ের অকাল-বোধন নাই, আগমনী নাই। মা আমার জাগিয়াই আছেন, ডাকিলেই সাড়া দিবেন; ইহাগচ্ছ বলিলেই দেহঘটে এবং পূজার ঘটে আসিয়া

প্রকট হইবেন। এ যে উত্তরায়ণ, দেবজাগরণের কাল। কিন্তু বাসন্তী দুর্গোৎসব বাঙ্গালায় নিবিয়া গিয়াছে। রাজা কংসনারায়ণের কালে এ পূজার বড়ই ধুম উত্তরবঙ্গে হইত। এই বাসন্তী দেবীর পূজা উদয়পুরে, মীবাড়ে এখনও খুব সমারোহের সহিত হইয়া থাকে। কর্ণেল টডের সময়ে অধিকতর সমারোহ হইত। হিঙ্গলাজে ও জ্বালামুখীতে এখনও কিছু কিছু উৎসব দেখা যায়। মারবাড়ীদের মধ্যে এখনও এই কয় দিন ছোট ছোট কুমারী মেয়েরা পুষ্প ও দূর্ব্বা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দেবীর পূজা করিয়া থাকে। অনেক মারবাড়ীর গৃহে নবরাত্রের মতন এখনও নয় দিন দেবীর ঘটস্থাপনা হইয়া থাকে।

বাঙ্গালায় বাসন্তীপূজা বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে হিন্দু মহিলাগণ অশোকষষ্ঠীর ব্রত করেন, রামনবমীর উপবাস করেন এবং হিন্দু গৃহস্থ অন্নপূর্ণাপূজা করেন। এই নবমী তিথিতে, পুষ্যা নক্ষত্রে বোধ হয় আদিত্য বা রবিবারে শ্রীরামচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। এবার নবমীতে পুষ্যা নক্ষত্র লাগিয়াছে, রবিবারও পড়িয়াছে। এবার জনকপুরে ও অযোধ্যায় খুব বড় উৎসব হইবার কথা। বাঙ্গালায় এক মেটিয়ারীতে একটু বড় রকমের মেলা হইবে। ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা (অবশ্য বশিষ্ঠ গোত্রের বৈদিক ব্রাহ্মণগণ) যখন মানুষের মতন মানুষ ছিলেন, তখন এই রামনবমীতে ভাটপাড়ায় বেশ ধুম হইত। কারণ, ভাটপাড়ার বশিষ্ঠ-গুরুগোষ্ঠী সবাই রামাৎ বৈষ্ণব। অন্নপূর্ণাপূজার সে ধুম নাই, সে রকম অন্নদান হয় না, তবে পূজাটা লোপ পায় নাই ; এইটুকুই যা সুখের।

পূর্ব্বে এক বার বলিয়াছিলাম যে, ভাতুরিয়া গ্রামের জগদ্রাম ভাতুড়ী বাঙ্গালায় মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়াইয়া শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রচলন করিয়াছিলেন এবং বরেন্দ্রের রাজা কংসনারায়ণ রায় বাসন্তী দুর্গোৎসবের প্রচলন করেন। ইহার পূর্ব্বে মাটির প্রতিমা গড়াইয়া তিন দিন মায়ের পূজা হইত না। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মত পূর্ব্বে বাঙ্গালাতেও ঘরে ঘরে ঘটস্থাপনা করিয়া নবরাত্রে চণ্ডীর পূজা হইত। বাঙ্গালার তান্ত্রিকগণ তাম্রটাটে খোদাই-করা যন্ত্র লইয়াই প্রত্যহ মাতৃপূজা করিতেন। আর এক একটা পীঠস্থানে পাষাণময়ী মূর্ত্তি অবলম্বনে শক্তিসাধনা করা হইত। মৃন্ময়ী প্রতিমা পূজার প্রচলন বাঙ্গালায় চারি পাঁচ শত বৎসরের অধিক হয় নাই। উহার আদর বাড়ে এবং সার্ব্বজনীন ভাবে গ্রাহ্য হয় মহারাজ

কৃষ্ণচন্দ্রের আমল হইতে। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলাম, এখনও তাহারই আবৃত্তি করিতেছি; কারণ, এ সম্বন্ধে আমরা যতই তদন্ত করিতেছি, ততই আমাদের পূর্ব্বমত দৃঢ় হইতেছে।

শরৎকালের দুর্গোৎসবে একটা শক্তিরই আরাধনা হইয়া থাকে, এক ভদ্রকালীর পূজা হয়। তাহাও অকালবোধনের জন্য, দেবনিদ্রার কালে পূজার জন্য তাহার উদ্বোধনে অনেক হাঙ্গামা করিতে হয়। বাসন্তী শক্তিপূজায় একেবারে দশ মহাবিদ্যার পূজা হইয়া থাকে। অনেকে শ্রীবিদ্যার যন্ত্রে অন্য নয়টা শক্তির উদ্বোধন ঘটাইয়া একসঙ্গে দশ মহাবিদ্যার পূজা করেন; অনেকে স্বতন্ত্রভাবে দশটা যন্ত্র আঁকিয়া, দশটা প্রতিমা বসাইয়া পূজা করেন। ইহাতেও সকল রকমের কল্পারম্ভ আছে। কেবল পার্থক্য এই, শরতের মহালক্ষ্মী হেমন্ত-শস্যস্বরূপিণী, তাই অকালবোধনের পরে কোজাগরে এবং পরের অমাবস্যায় মহালক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে। বসন্তের মহালক্ষ্মী যবব্রীহিরূপিণী, সদা জাগরিতা; তাই মহামায়ার পূজার সঙ্গে ঐ নবরাত্রের কোন এক তিথিতে শুভ ক্ষণ দেখিয়া লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে। এবার সপ্তমী তিথিতেই লক্ষ্মীপূজা হইবে, আগামী বৃহস্পতিবারেই গৃহস্থের গৃহে লক্ষ্মীর শঙ্খ বাজিবে। কাজেই বলিতে হয় যে, বসন্তের দুর্গোৎসব শক্তিতন্ত্রের দিক্ হইতে বৃহত্তর ব্যাপার, বড় রকমের সাধনার এবং সামাজিক উৎসবের কাণ্ড। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে, রাবণ বাসন্তী দেবীর পূজা করিতেন। শ্রীরামচন্দ্রই শরৎকালে, অকালে বোধন বসাইয়া শারদীয় উৎসবের প্রচলন করেন। আসল কথা এই, আম্নায় হিসাবে শক্তিপূজার ভিন্ন ভিন্ন কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। ধরা গর্ভবতী না হইলে, ক্ষেত্রে খাদ্য শস্যসকল উৎপন্ন না হইলে মহালক্ষ্মীর পূজা হইবে না। মাতৃশক্তির, প্রজননশক্তির বিকাশ যে দেশে যখন হয়, তখনই সেই দেশে জগজ্জননীর পূজা হইয়া থাকে। এই মাতৃশক্তির বিকাশ অনুসারে তন্ত্রের আম্নায়ের নির্দ্দেশ অনেকটা হইয়াছে। বাঙ্গালার লোকে ধান চাউল খাইয়া জীবন ধারণ করে, বাঙ্গালার জীবনদায়ক শস্য-সকল হেমন্তে পাকিয়া উঠে, অম্বুবাচীর পর হইতে বাঙ্গালার ধরা প্রজননশক্তিসম্পন্না হন, তাই জননী শরৎকালেই বঙ্গদেশে প্রকট হন। আর যে দেশে বসন্তকালে যব ব্রীহি গোধূমাদি উৎপন্ন হয়, সে দেশে প্রজননশক্তির বিকাশ বসন্তকালে। তাই সে দেশে বাসন্তী দেবীর পূজা

হয়। পুরাতন তন্ত্রের পুঁথিতে রাম-রাবণের ইতিহাসকথার কোন উল্লেখ নাই, আছে কেবল আম্নায়ের ব্যাখ্যা ; প্রত্যেক দেশের ধরিত্রীর প্রকৃতির বিচার এবং তদনুসারে শক্তি আরাধনার পদ্ধতি। মহাচীনে ও ইলাবৃতবর্ষে বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে শ্রাবণী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত একটা কোন উপযোগী সময়ে মায়ের পূজা করিতে হইবে। এইরূপে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, বৎসরের বারো মাসে দশ মহাবিদ্যার বিন্যাস ঠিক করিয়া, বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হইবার কালে, সেই কাল অনুসারে একটা মহাবিদ্যাকে অবলম্বন করিয়া জগন্ময়ী জগন্মাতার পূজার বিধান তন্ত্র করিয়া গিয়াছেন। পরে ভাবুক কবিগণ এই সঙ্গে ইতিহাসের কথা জড়াইয়া, পুরাণকাহিনী লাগাইয়া, সেই পূজায় মাতৃভাবের একটা নূতন ভঙ্গী ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখিব। প্রত্যেক দেশের ধরা বা পৃথ্বী প্রত্যেক দেশের জননী। প্রত্যেক দেশেই মাতৃদেহের বাহান্ন পীঠ খচিত আছে, আবার সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গে মায়ের বাহান্ন পীঠ আছে। তাহা না হইলে ধরা সুন্দরী মহামায়ার অংশরূপিণী হইতে পারেন না। দেশমাতৃকা ও জগন্মাতৃকা দুই এক হইতে পারেন না। বাঙ্গালার ধরিত্রী জননী এই বাহান্ন পীঠসমন্বিতা, আবার সপ্তসরিদ্বরা, আসমুদ্রহিমালয়বিস্তীর্ণা ভারতভূমিও বাহান্নপীঠ-খচিত। পুরাতন তন্ত্রে সমগ্র পৃথিবীতে বাহান্ন অংশে বাহান্ন পীঠ বিন্যাসের উল্লেখ আছে। এই পীঠ হইতেই তীর্থের উদ্ভব, সাধনাস্থানের নির্দ্দেশ। ভারতবর্ষের কোনও মহাতীর্থ—পুরাতন তীর্থ শক্তিশূন্য নহে ; প্রত্যেকটিই এক একটি পীঠস্থান। এমন যে জগন্নাথক্ষেত্র, তাহাও শ্রীবিদ্যার পীঠ, বিমলার ক্ষেত্র, স্বয়ং জগন্নাথ তাহার ভৈরব। এই পীঠ বিচার করিয়া আমরা ধরিতে পারি, কোন্ তীর্থ প্রাচীন, কোন্‌টাই বা অর্ব্বাচীন। এই পীঠ অনুসারে মায়ের পূজার নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। কামরূপের পীঠশাসনে শারদীয়া পূজার প্রাধান্য। হিমালয়ের উমামহেশ্বরের পীঠশাসনে বাসন্তীপূজার প্রাধান্য। জগদ্রাম কামরূপের পদ্ধতি অনুসারে শারদীয় মহোৎসব চালাইয়াছিলেন। রাজা কংসনারায়ণ চীনাচারের প্রভাবে বাসন্তীপূজার প্রবর্ত্তন করেন। বশিষ্ঠ-পদ্ধতি এবং ত্রিপুরানন্দের ব্যবস্থা, এই দুইয়ের দ্বারা এক দিন বাঙ্গালার তান্ত্রিকগণ শাসিত হইতেন। ভুটানে বাসন্তী মহোৎসবের খুব ধুম আছে।

আর এই প্রথা অনুসারে বাঙ্গালার বহু গ্রামে পূর্ব্বে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে চণ্ডীমহোৎসব হইত; উলা গ্রামের ওলাইচণ্ডীর পূজার কথা বোধ হয় এখনও অনেকের মনে থাকিতে পারে। এই পীঠতত্ত্ব আম্নায়বিভাগ এবং পুরাণের অর্থবাদমূলক দক্ষযজ্ঞের কাহিনী বুঝিতে এবং বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। তাহার স্থান ও সময় ইহা নহে। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, এই সকল সাময়িক পূজাপদ্ধতির অন্তরালে একটা লড় ফিলজফি বা তত্ত্বকথা ঢাকা আছে। দেশের ও জাতির ভাবগত অতিপুরাতন কাহিনী বা ইতিহাসকথা প্রচ্ছন্ন আছে। যিনি এই সব লুকান কথা বুঝিতে পারেন, তিনি বাঙ্গালার জাতি ও ধর্ম্মের ইতিহাস জানিতে ও বুঝিতে পারেন।

বাসন্তীপূজার আগমনী নাই। এস মা, বস মা, উঠ মা, এলো চুল বাঁধিয়া বাপের ঘরে আসিয়া থাক মা—এসব আপ্‌সানির কথা নাই। কারণ, ইহা ত অকালবোধন নহে। এখন মা আমার জাগিয়াই আছেন, সর্ব্বত্র উপস্থিতই আছেন। বসন্তের মা উমা মহেশ্বরী নহেন, নগদুহিতা হৈমবতী নহেন। বসন্তের মা সর্ব্বাণী আদ্যাশক্তি, সদাশিবহৃদ্‌বিহারিণী শিবপ্রসূতি। বসন্তের মা একে দশ, দশে এক; তাঁহাতেই দশ মহাবিদ্যা সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতা, তাঁহা হইতেই দশ মহাবিদ্যা প্রকটিতা। আমি দেখিতে জানিলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইব, ডাকিলেই তাঁহাকে কাছে পাইব—তাই ভক্ত গান করিয়া বলিয়াছেন,—"সেই ভয়ে মুদি না আঁখি, আঁখি মুদিলে পাছে তারাহারা হয়ে থাকি।"

নয়ন মুদিও না ভাই—অহর্নিশ চাহিয়া থাক, মাকে আমার চারি দিকেই ফুটিয়া থাকিতে দেখিবে। মা আমার দশদিক্‌বিহারিণী, দশ-মহাবিদ্যাস্বরূপিণী, এক বার চাও—নয়নময় হইয়া মীনের মতন নির্নিমেষনয়ন হইয়া এক বার চাও, দশ দিকেই মায়ের দশ রূপ প্রকট দেখিতে পাইবে। মা আমার এই জগতের জগন্ময়ী—জগতোঽস্য জগন্ময়ী—আব্রহ্মতৃণস্তম্ব-বিহারিণী, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী—এক বার তাকাও, স্থূলে মূলে, অনলে অনিলে, জলে স্থলে, পর্ব্বতে কন্দরে, অতিসূক্ষ্মে অতিবিরাটে—সর্ব্বত্র সর্ব্বস্বে মায়ের লীলা দর্শন কর।

"যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসৎ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥"

মা ছাড়া কিছু নাই, কিছু হইতে পারে না। তাই এমন মাকে কেবল দেখিতে হয়। সর্ব্বত্র ও সর্ব্বস্বে তাঁহার লীলা কেবল দেখিতে হয়—মুগ্ধ বিস্মিত নয়নে, চকিত চমৎকৃত ভাবে কেবল দেখিতে হয়। এ মায়ের দর্শনেই চতুর্ব্বর্গ লাভ হইতে পারে। তাই বলিতে হয়—

"এক ভাবীর কাছে ভাব পেয়েছি
আর কি যমের ভয় রেখেছি!
যে দেশে রজনী নাই মা,
সে দেশের এক লোক পেয়েছি,
আমি কি বা দিবা কি বা সন্ধ্যা
সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।"

সুতরাং ভাবনা নাই, সৃষ্টির সর্ব্বত্র ও সর্ব্বাঙ্গে মাকে দেখিয়া লও, চিনিয়া লও, বুঝিয়া লও, তোমার মানবজন্ম ধন্য হইবে! ('নায়ক,' ১৪ই চৈত্র ১৩২৩)

জননি, জাগৃহি

"জাগিয়ে দে চৈতন্যময়ি,
এবার আমি জেগে যাই।"

জাগো মা—মেধা, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, ধৃতি, প্রাণ, মন—আমার দেহভাণ্ডের সর্ব্বস্বে জাগিয়া উঠ মা! তুমি আমার দেহভাণ্ডে না জাগিয়া বসিলে, ব্রহ্মাণ্ডে তুমি জাগো বা ঘুমাও, তাহাতে আমার বড় যায় আসে না। কেন না, আমার দেহভাণ্ডই যে আমার পক্ষে আমার ব্রহ্মাণ্ড। আমার দেহগতা কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়া উঠিলে আমার পক্ষে ব্রহ্মাণ্ড সজাগ, সজীব, সতেজ হইবে। এই ত মা, তুমি ইউরোপে জাগিয়াছ—রণোন্মাদিনী ছিন্নমস্তারূপে তাণ্ডব নৃত্যে ইউরোপখণ্ডকে মথিত কম্পিত দলিত করিতেছ। শ্মশানের বিকটভৈরব নাদে ইউরোপ সদা মুখর হইয়া আছে। মায়া, দয়া, ক্ষমা, করুণা, তিতিক্ষা, সব ভুলিয়া ইউরোপের নর নারী মার মার রবে চারি দিকে ধাইতেছে, ধরাবক্ষকে নরনারীর শোণিত-স্রোতে প্লাবিত করিতেছে। যে নারী নরকুলের জননী—স্নেহময়ী করুণাময়ী, ক্ষমারূপে

ক্ষেমঙ্করী—সেই নারী রুষে, জর্ম্মনিতে এবং ফ্রান্সে কৃপাণপাণি হইয়া নৃমুণ্ডমালিনী সাজিয়াছে। ইউরোপে তুমি শ্মশানকালীরূপে, ছিন্নমস্তার আকারে, ভীমা ভৈরবীমূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছ। কিন্তু সে প্রকটনের প্রতিধ্বনি ত আমাদের দেহভাণ্ডে আসিয়া লাগে নাই। আমরা ত রণমদে মজিয়া মাতিয়া উঠি নাই। আমরা যেমন স্থবির, তেমনই স্থবির আছি। আমাদের কুলকুণ্ডলিনী ঊষা কন্যারূপে আমাদের হৃদয়ের কোন অজ্ঞেয় কন্দরে লুকাইয়া ঘুমাইয়া আছেন। নহিলে এই সন্ধিক্ষণে, জগতের এই মহানিশাকালে আমাদের মধ্যেও একটা সাড়া পড়িত। কাজেই বলিতে হয়—উঠ মা, জাগো মা!

মা শক্তিরূপিণী। তুমি সর্ব্বজীবে সদাই বিরাজ করিতেছ। তুমি না থাকিলে জীবের জীবত্ব থাকে না। তাই চণ্ডী বলিয়াছেন,—

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥"

ভালোয় মন্দয়, পাপে পুণ্যে, বিলাসে সংযমে, সর্ব্বত্র সর্ব্বস্বে তুমি বিরাজ করিতেছ। তুমি যখন যেখানে থাক, তখন সেই দেহে যতটুকু শক্তি জাগাইয়া তোল, ততটুকুই জাগিয়া উঠে। বাকী সব সম্মূঢ় অবস্থায় থাকে। তোমার কৃপায় অসভ্য সভ্য হয়, মূর্খ মেধাবী হয়, ভীরু বীর ও তেজস্বী হয়, দুর্ব্বল প্রবল হয়।

"সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি॥"

জগতের ইতিহাস, নানা জাতির নানা দেশের উত্থান পতনের ইতিহাস তোমার এই অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়ার সাক্ষ্য দিতেছে। তুমি পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য দিয়াছ, তুমি বামনের হাতে চাঁদ দিয়াছ, মূককে বাচাল করিয়াছ, আবার জগজ্জয়ী ইন্দ্রকেও অধোগামী করিয়াছ। জগতের অনন্ত অতীতের ইতিহাস তোমার লীলারই কীর্ত্তন মাত্র। জগতের ভবিষ্যতেও তোমারই এই লীলার অনন্ত বিকাশ অনন্ত কাল পর্য্যন্ত চলিবে। যে সিদ্ধান্ত এত দিন ভক্তের, সাধকের, ভবিষ্যদ্দর্শী ঋষির মুখের কথা বলিয়া জানিতাম, যাহার প্রকট প্রকাণ্ড উদাহরণ অনেকের অনেক জীবনে অক্ষিগোচর হয় নাই, আজ তোমার কৃপায় ইউরোপের মহারণ-প্রাঙ্গণে তাহারই স্তরে স্তরে বিকাশ

দেখিতেছি। তাই কানে-শোনা কথা চোখে দেখিয়া তোমার কাছে আব্দার করিয়া বলিতেছি—

"জাগিয়ে দে চৈতন্যময়ী, এবার আমি জেগে যাই।
মহামায়ার মোহবশে আর যেন ঘুমাতে না চাই॥"

দে মা! এইবার জাগিয়ে দে। জাগরণের মহামুহূর্ত্ত আসিয়াছে। এখন যে ঘুমাইয়া থাকিবে, তাহাকে সহজে আর জাগিতে হইবে না। হয়ত তাহাকে এই মোহনিদ্রাঘোরেই জীবলীলা শেষ করিতে হইবে। তুমি ত আমার আমিত্ব, তুমি জাগাইলে আমি নিশ্চয় জাগিয়া বসিব। তখন এই শব-শিবাসমাকীর্ণ সংসারের মহাশ্মশানে জাগিয়া বসিয়া, হয়ত আমি শবসাধনা করিতে পারিব। শক্তিধর হইয়া আমার শবদেহ শিবত্ব লাভ করিবে।

কেমন করিয়া তোমায় জাগাইব? ভক্ত রামপ্রসাদ বাৎসল্যরসের সাহায্যে এক বার তোমায় জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। উমা ঘুমাইয়া আছেন; বালারুণের প্রথম রক্তিম আভা আকাশ ভেদ করিয়া আসিয়া মায়ের উৎপলসদৃশ ঘুমন্ত মুখখানিকে কহ্লারের শোভায় বিমণ্ডিত করিয়াছে; নাসার বেশরমণি সূর্য্যকরস্পর্শে বিদ্যুদ্দামবিকাশের ছলনা করিতেছে। হাতখানির উপর অলক্তকরাগ অরুণকিরণে যেন পদ্মরাগমণি গালিয়া ঢালিয়া দিয়াছে;—আর শ্রীচরণযুগলের উপর প্রথম প্রভাতের স্নিগ্ধ স্বচ্ছ জ্যোতি সোহাগের লোহিত ঢেউ তুলিয়া কত খেলা খেলিতেছে; এমন সময়ে শয্যাপার্শ্বে জননী মেনকা আসিয়া দাঁড়াইয়া নিজের অপরূপ রূপের বিভায় ক্ষণে ক্ষণে উপচীয়মান সূর্য্যকিরণকে যেন স্তব্ধ করিয়া—আচ্ছাদনে রাখিয়া, স্নেহের কৌমুদীদীপ্তিতে উমাকে ঢাকিয়া রাখিয়া বলিলেন—জননি, জাগৃহি! জাগ মা, জাগ মা উমে! তুমি জাগিলে জগৎ জাগিবে, তুমি জাগিলে আমি জাগিব, তোমার শ্রীচরণের নূপুরধ্বনিতে আমি চারি বেদের ঝঙ্কার শুনিতে পাইব; আমার মেধা, মনীষা, বুদ্ধি, বিদ্যা, সবই জাগিয়া উঠিবে। উঠ মা, জাগ মা, জাগিয়া দাঁড়াইয়া এক বার তেমনি তেমনি—তেমনি করে নাচ মা! সে নাচ দেখিয়া আমার মানবজীবন সার্থক হউক, ধন্য হউক। আমার হৃদয়, হিমালয়ের দুলালী আমার—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, চারি মহলের নটন্তী বালিকা আমার—জাগ মা—জননি, জাগৃহি।

ইহা আমার পূর্ব্বজ বাঙ্গালী সাধকের স্নেহময়, রসময়, ভাবময়, জাগরণ। আমরা এই জাগরণই ভালবাসি। ইউরোপ তোমাকে অন্য রূপে, অন্য ভাবে জাগাইয়াছে। ইউরোপ তোমাকে রুদ্রাণী, সংহারমূর্ত্তিতে জাগাইয়াছে। শত বৎসর ব্যাপিয়া ইউরোপ জ্ঞান, বিজ্ঞান, সায়ান্স—পদার্থতত্ত্ব মন্থন করিয়া তোমার ভীমা ছিন্নমস্তা রূপেরই সাধনা করিয়াছে। ইউরোপের যত বুদ্ধি, যত মনীষা, সবটাই মানুষ মারিবার কল বাহির করিতে ব্যস্ত ছিল। তাহার ফলে তুমি এখন ভীমা ছিন্নমস্তারূপে ইউরোপে দেদীপ্যমান। ইউরোপ নিজের শোণিত নিজে পান করিতেছে, নিজের পিপাসিত ছিন্ন মুণ্ডে নিজের শোণিতের অজস্র ধারা ঢালিতেছে, নিজের উদ্ভাবিত জড়শক্তির বিপরীত-রতিকে নিজেই পদতলে মথিত করিতেছে, নিজের বিলাসের এবং অর্থলিপ্সার ডাকিনী যোগিনী এখন তাহারই শোণিত পান করিতেছে—তাহারাই যুদ্ধোদেযাগের লাভ, তোপখানা বারুদখানার লাভ খাইতেছে। আমরা দূর হইতে অমন ভীম ভৈরবীমূর্ত্তি দেখিয়া দূর হইতেই তাহাকে সভয়ে প্রণাম করিতেছি। মা, তুমি তোমার নিগমে বলিয়াছ যে, আমার দশ মহাবিদ্যার বিকাশ অনুসারে পৃথিবীতে দশ প্রকারের পুরুষকারের বিকাশ হইয়াছে—দশ রকম মানুষ, দশ রকম জাতি, দশ রকমের মেধা, মনীষা, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ফুটিয়াছে। আমাদের এই ভারতভূমিতে অতীত কালে তুমি কখনও বা ধূমাবতী, কখনও বা ছিন্নমস্তা, কখনও বা মাতঙ্গী, কখনও বা বগলারূপে প্রকট হইয়াছিলে বটে; আমরা কিন্তু তোমার সে রূপ এখন আর দেখিতে চাহি না। জানি বটে, আজ ইউরোপের ছায়া যত দূর পড়িয়াছে, জগতের যতখানি পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তত দূর, ততখানিতে তোমার ছিন্নমস্তার বিকট বিকাশ ঘটিতেছে। তবে আমরা না কি মায়ের ছেলে, আমাদের মতন এমন গালপোরা, বুকভরা মা নামে তোমাকে ত আর কেহ ডাকে নাই; তাই আব্দার করিতেছি, ব্রহ্মাণ্ডের এই মহাজাগরণের মহামুহূর্ত্তে এস মা উমে, আমাদের স্নেহময়ী, সোহাগময়ী, আদরমাখা, যত্নমাখা নব বালিকারূপে দেখা দাও। এমন দীন হীন কাঙ্গালের দলকে জাগাও যদি মা, তবে যেন জাগিয়া উঠিয়া নয়ন মেলিয়া তোমাকে কন্যারূপে, জননীরূপে দেখিতে পাই।

"আদর করে হৃদে রাখ
আদরিণী শ্যামা মাকে।
আমি দেখি আর তুমি দেখ মন
আর যেন কেউ না দেখে॥"

তখন আমি নয়নময় হইয়া, মীনের ন্যায় নির্নিমেষ নয়নে তোমার পালনকর্ত্রী, জগদ্ধাত্রী, স্নেহময়ী, জ্ঞানময়ী, কৃপাময়ী, ক্ষেমঙ্করী মূর্ত্তি যেন অনবরত, অবিশ্রান্ত দেখিতে পাই। সেই রূপ দেখিব বলিয়াই আজ শ্যামাপূজার দিনে মায়ের কাছে আব্দার ধরিয়াছি—

"জাগিয়ে দে চৈতন্যময়ী
এবার যেন জেগে যাই।"

জাগাও মা, কোলের ঘুমন্ত ছেলেকে জাগাও মা, অপরিসীম স্নেহের সোহাগের চুম্বনে চুম্বনে জাগাও মা!

কেন জাগিতে চাই—জান? আজ যে শ্যামাপূজা। তোমারই জাগরণের সাধনার কাল! জাগিয়া তোমার কোলে বসিয়া তোমারই লীলা দেখিব। এমন লীলা ত সদাসর্ব্বদা মানুষের অক্ষিগোচর হয় না। এমন লীলা ত মানুষ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে দেখিতে পারে না। এ লীলার আগাগোড়া দেখিতে হইলে মায়ের কোলে বসিয়া দেখিতে হয়। মায়ের কোলে ছেলে থাকিলে তাহার কোনও ভয়ই থাকে না, মায়ের কোলে ছেলে থাকিলে মা থাকিতে সে ছেলে মরে না। তোমার কোলে বসিয়া, জীবনমরণভয়শূন্য হইয়া তোমার লীলা দেখিবার সাধ হইয়াছে; তোমার কোলে বসিয়া তোমার চণ্ডীমাহাত্ম্যের মর্ম্ম বুঝিবার বাসনা হইয়াছে; তাই জাগিতে চাহিতেছি। তুমি জাগিলে আমি জাগিব, আমি জাগিলে তুমি জাগিবে। কিন্তু স্বয়ং স্বেচ্ছায় আমার ত জাগিবার সামর্থ্য নাই, তাই কাতর স্বরে তোমায় বলিতেছি—জাগিয়ে দে মা! কেন না, তুমি যে চৈতন্যময়ী, চিন্ময়ী চৈতন্যরূপিণী—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চিতিরূপেণ সংস্থিতা"—আমার যে তোমার চিন্ময়ী মূর্ত্তির উপর এই আব্দারটুকু চলে;—তাই আবার বলিতেছি—জাগিয়ে দে মা! যে ইউরোপে তুমি ছিন্নমস্তারূপে প্রকট হইয়াছ, সেই ইউরোপ আমাকে বিলাসের হিন্দোলে ঘুম পাড়াইয়াছে। সে নিদ্রা ভাঙ্গিতে একা তুমিই পার—কারণ, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।" নিদ্রাময়ী নিদ্রে, তুমি বিলাসিনীরূপ

সংবরণ করিয়া একটু সরিয়া না দাঁড়াইলে এ নিদ্রা ভাঙ্গিবার নহে মা! তাই আবার বলিতেছি—তোমার ও নিদ্রারূপ পরিহার করিয়া চৈতন্যময়ীরূপে এক বার আমাদের সম্মুখে দাঁড়াও মা—আমি সহস্র বর্ষের জড়তা, স্থবিরতা, মোহমূঢ়তা বর্জ্জন করিয়া, মায়ের ছেলে হইয়া তোমার কোলে বসি।

তাই এবার আমাদের অন্য সাধ, অন্য বাসনা নাই। তাই বাঙ্গালার পঞ্চ কোটি নর নারী তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাতর স্বরে বলিতেছে—

"জাগিয়ে দে চৈতন্যময়ী
এবার মোরা জেগে যাই।"

জননি! জাগৃহি—জাগো জাগো ভাই, মা আমাদের জাগিয়াছেন। এইবার মায়ের ছেলে আমরাও জাগিব, উঠিয়া বসিব। শুন শুন, চারি দিকে জাগরণের কোকিলকলরব উঠিয়াছে। ('নায়ক,' ২৭ কার্ত্তিক ১৩২৪)

ভারততিলক

শ্রীযুত বালগঙ্গাধর তিলক

এস ব্রাহ্মণ, আজ সঞ্জীবিত বঙ্গভূমির শ্যামল শস্পাস্তরণে আসিয়া আসন পরিগ্রহ কর। তোমায় কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া আহ্বান করিলাম; কেন না, ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের একনিষ্ঠার পরিচয় তুমিই দিয়াছ। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে তোমার সুর কখনই বিগড়ায় নাই, তোমার কণ্ঠের বেদমন্ত্র অকম্পিত ধ্বনিতে চিরকাল উচ্চারিত হইয়াছে। তোমায় ব্রাহ্মণ বলিয়া আহ্বান করিলাম,—কেন না, তোমার উপর দিয়া যতটা ঝড় ঝাপটা গিয়াছে, যতটা পেষণ নিপীড়ন নির্য্যাতন গিয়াছে, এতটা আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। তুমি রাজার শাসন সহিয়াছ, সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের কর্কটদংশনজ্বালা অহরহ সহিতেছ। পুরাণের ব্রাহ্মণের মতন অটল অচল ভাবে স্থির থাকিয়া ভারতবর্ষের ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের রাজনীতিচর্চ্চার ক্ষেত্রে একা তুমিই সনাতনী ব্রাহ্মণ্য প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছ। একা তোমারই কপালে দারিদ্র্যের নির্যাতনের হোমের ফোঁটা ফুটিয়া আছে—তোমারই ভালে ভারতশ্মশানের শ্মশানভস্মের

ত্রিপুণ্ড্রকের রেখা স্পষ্ট রহিয়াছে। তাই তুমি ভারততিলক গঙ্গাধর তিলক। তোমায় আমরা বার বার নমস্কার করিতেছি।

এস এস লোকমান্য লোকনাথ, গঙ্গাধর তিলক, গঙ্গাজললবস্নিগ্ধ, গঙ্গামৃত্তিকাপরিপুষ্ট, গঙ্গাধরনিকেতন, বঙ্গদেশের সমতট ক্ষেত্রে আসিয়া আমাদের দুর্দ্দশা অবলোকন কর। যে বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণ-শাসিত, ব্রাহ্মণ্য মর্য্যাদার আকরস্বরূপ ছিল, ভবদেব হইতে রাখালদাস পর্য্যন্ত অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অপূর্ব্ব মনীষাসমুজ্জ্বল যে বঙ্গভূমি স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক এবং গুরু ছিল, সেই বাঙ্গালাদেশ এবং বাঙ্গালী জাতিকে এক বার দেখ ; এক দিন তোমার কঙ্কণ, মহারাষ্ট্র, দ্রবিড়, দ্রাবিড়, এই বাঙ্গালার জানু স্পর্শ করিয়া নব্য ন্যায় শিক্ষা করিয়াছিল, বাঙ্গালার নবদ্বীপ এবং ভট্টপল্লী তোমাদের অনেকের গুরুধাম ছিল। এস এস ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য স্পর্দ্ধার প্রচারক তুমি, ব্রাহ্মণ-মনীষার পরিচায়ক তুমি, ব্রাহ্মণের স্থৈর্য্য গাম্ভীর্য্য তিতিক্ষার অবতার তুমি, এস গঙ্গাধর তিলক, তোমার মহিমার হরিচন্দনের বিজয়তিলক আমরাও সাদরে আমাদের শুষ্ক কপালে অনুলিপ্ত করি। এত দিন যে বাঙ্গালার কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ত্রিরেখা শোভা পাইত, সে রেখা মুছিয়া যে বাঙ্গালা সাহেব সাজিতে উদ্যত হইয়াছিল, এস এস ব্রাহ্মণ, এস এস ঋষিপ্রতিম জটিল তপস্বী, সেই বাঙ্গালার বাঙ্গালীর ভালে তোমার অপার স্নেহের ও সাধনার অগুরুলেপ—কাশ্মীররাগ ফুটাইয়া দেও—আমাদের ধন্য কর।

"সর্ব্বস্বং ব্রাহ্মণস্যেদং"—হে ভূদেব সন্ন্যাসী! তোমারই ত সকলই, এই সপ্তসরিদ্বরা ভারতভূমি, এই হিমালয়কিরীটিনী, সাগরোর্ম্মি-প্রক্ষালিতচরণা আর্য্যভূমি—ইহার ভাব, ভাষা, আচার, নিষ্ঠা, মানবতা, সিদ্ধি, সাধনা, ইহার সর্ব্বস্ব ত তোমারই। তুমি ইহার অনন্ত গৌরব-গাথামণ্ডিত অতীত, তুমিই ইহার অবসাদ-জাড্যসম্মূঢ়, অবিশ্বাস-প্রমাদ-শিথিলীকৃত বর্ত্তমান, তুমি ইহার আশাকাঙ্ক্ষাবিমণ্ডিত নবরাগরঞ্জিত ভবিষ্যৎ। তোমারই ভারতবর্ষ, তুমি ভারতবর্ষের—তুমিই ইহার বৈশিষ্ট্য, তুমিই ইহার শ্লাঘা, তুমিই ইহার জাতি বর্ণ ধর্ম্ম। তোমার ব্রাহ্মণ্য, তোমার আমিত্ব এই ভারতবর্ষেই ফুটিয়াছে—এই ভারতভূমিতে সনাতন ভাবে সুরক্ষিত আছে। এস ব্রাহ্মণ, তোমার সনাতন ভাব, তোমার ত্রিকালব্যাপী স্থিতি, তোমার অক্ষয়, অজর, অচ্যুত বৈশিষ্ট্যের কবচ লইয়া আমাদের

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও। আমরা এক বার নির্নিমেষ নয়নে তোমায় দেখি। পরিবর্ত্তনের তুঙ্গ তরঙ্গপৃষ্ঠে ভাসিয়া, ডুবিয়া, উলটপালট আছাড় খাইয়া আমরা বিহ্বল বিভ্রান্ত হইয়াছি; তোমার স্থিতির অপরূপ রূপ দেখিয়া ক্ষণেকের জন্যও পরিতৃপ্ত হই। এস ব্রাহ্মণ, বিলাতী বিলাসবিমূঢ় এই বাঙ্গালার অতীত ও অনাগতের সম্মেলন ঘটাইয়া এক বার দাঁড়াও—আমরা দেখি। যাহা দেখিয়া, যাহা শুনিয়া আমরা এত কাল স্থির ছিলাম, সে চৈতন্যতনুদীপ্তি আর নয়নকোণে ঝলসিয়া উঠে না, সে শ্রদ্ধার সোহাগ-নিক্কণ আর যে শ্রবণগোচর হয় না; তাই কাতরকণ্ঠে বলিতেছি—ভূদেব ব্রাহ্মণ, তুমি একবার ভূদেবের রূপে দাঁড়াও, আমরা দেখি।

এস ব্রাহ্মণ, যে কংগ্রেসমণ্ডপ ইউরোপের সহিত ভাব ও বৈশিষ্ট্যের আপোষ ঘটাইতে চাহিতেছে, তাহার প্রতীকরূপে বিরাজ কর। এস ব্রাহ্মণ, যে রাজনীতিচর্চ্চা ইউরোপের অনুচিকীর্ষণসঞ্জাত সেই চর্চ্চার মধ্যে তোমার সনাতনী বুদ্ধির বিকাশ কর। যাহা অন্যত্র পাইব না, তাহা তোমার কাছে পাইতে পারি বলিয়াই তোমায় আহ্বান করিতেছি। এবার অতীত ও অনাগতের সন্ধিযুগ, তাই অতীতের জয়পতাকা তুমি, তোমাকে পুরোভাগে রাখিয়া অনাগতের জন্য মঙ্গলগীতি গান করিব। তুমি ব্রাহ্মণ, কংগ্রেসমণ্ডপে দাঁড়াইয়া এক বার তোমার সনাতনী স্থিতির মহিমা ঘোষণা কর,—সে নির্ঘোষে ভারতভূমি আবার অমরত্ব লাভ করুক—আবার চিরজীবী, সর্ব্বজয়ী হউক। ('নায়ক,' ১১ পৌষ ১৩২৪)

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

এস ভারতের মোহনদাস, এস ভারতের করমচাঁদ! বাঙ্গালাকে গুণগরিমায় মুগ্ধ করিয়া, বাঙ্গালীকে নিষ্কাম ধর্ম্মের দীক্ষা দাও। আমরা কর্ম্মহীন, আমাদিগকে কর্ম্মের আদর্শ দাও—ব্রতের বিধান দাও, নিরাশায় অন্ধকার বাঙ্গালায় আশার সুবর্ণদীপ জ্বালিয়া দাও। এস করমচাঁদ মোহনদাস গান্ধী! কেমন করিয়া দরিদ্রনারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে হয়, কেমন করিয়া দেশের ও দশের অঙ্গীভূত হইয়া তাদাত্ম্যের

সাধনা করিতে হয়, কেমন করিয়া আপনার জীবনে দীনতার প্রতিষ্ঠা করিয়া পুরুষকারের প্রভাবে শত সিংহবিক্রমের অধিকারী হইয়া দেশের হীনতা চূর্ণ করিতে হয়, বাঙ্গালীকে তাহা শিক্ষা দাও।

তোমার জীবন—ত্যাগের জীবন। তোমার কথা ও কার্য্য, মন ও মুখ, বাহির ও ভিতর এক। তোমার ত্যাগ সাধনাসিদ্ধ সাধকের ত্যাগ। তুমি দেশের কল্যাণকামনা ভিন্ন আর সকল কামনা, সকল বাসনা জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিয়া নিষ্কাম হইয়াছ। তোমার নিষ্কাম কর্ম্মে ভারতের নিষ্কাম ধর্ম্ম পারিজাতের মত ফুটিয়া ভারতের নৈমিষ আলো করিয়াছে। তোমার আদর্শই ভারতের আদর্শ।—এস কর্ম্মবীর, এস ধর্ম্মবীর! বাঙ্গালায় নিষ্কাম ধর্ম্মের ও নিষ্কাম কর্ম্মের অমর বীজ বপন করিয়া যাও। যুগযুগান্তেও তাহার ফল ফলিবে।

বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্মের দাস্য তোমার স্মরণীয় জীবনে সার্থক—চরিতার্থ হইয়াছে।—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তোমার জীবনে অন্বর্থ হইয়াছে। তুমি তৃণ অপেক্ষাও নম্র, বনস্পতির অপেক্ষাও সহিষ্ণু, তুমি অমানী, তুমি মানদাতা। শ্রীহরি শয়নে স্বপনে জাগরণে তোমার সদা স্মরণীয়। তোমার লৌকিক জীবন ফলভারনত তরুর মত বিনয়নম্র। দক্ষিণ আফ্রিকার মানস সংগ্রামে তুমি সহিষ্ণুতায় বসুন্ধরাকেও পরাজিত করিয়াছ। তোমার জীবনে মানের কামনা, মানভিক্ষা নাই, অথচ তুমি সকল মানের আধার। ব্যষ্টির মানে তুমি উদাসীন; কিন্তু তোমার জাতির সমষ্টিকে মান দিয়া মানী করিয়াছ। কন্যাকুমারী হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ আজ তোমার মানে মানী। তুমি জননীর লাঞ্ছনালাঞ্ছিত শিরে মানের মুকুট পরাইয়া দিয়াছ। শ্রীহরি তোমায় কৃপা করিয়াছেন। বড় হরির বড় কথা তিনিই জানেন আর তুমিই জান। কিন্তু সংসারে দরিদ্রনারায়ণরূপ ব্যষ্টীভূত হরিই যে তোমার দিবসের, রজনীর, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের স্মরণীয়, তাহা সমগ্র ভারতের প্রত্যক্ষ। হে পরম বৈষ্ণব! তোমায় কোটি কোটি নমস্কার।

দীনের দুঃখে তোমার প্রাণ কাঁদে, দীনের লাঞ্ছনায় তুমি প্রদীপ্ত হুতাশনের মত উদ্দীপ্ত হও। সংযমে তোমার বীর্য্য, তোমার ওজস্বিতা

সংযত, সংহত ও প্রভাবশালী। তুমি ভবভূতির ভাষায়—বজ্রের অপেক্ষাও কঠোর, কুসুমের অপেক্ষাও কোমল। সেবায় তুমি কোমলতার মূর্ত্তি। অত্যাচারের সহিত সংগ্রামে তুমি বজ্রের বিগ্রহ। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী!

লোকোত্তরাণাং চেতাংসি
কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি।

তোমার লোকোত্তর চরিত্র কেমন করিয়া বুঝিব,—কেমন করিয়া বুঝাইব? তোমার মহান্ চরিত্র দেবতার বিগ্রহের মত দুরবগাহ; কিন্তু জাতির আরাধনার বস্তু। জানি না, কেমন করিয়া যূথীর মত সুকুমার হৃদয়ে বিধাতা গরুত্মানের শৌর্য্য, মারুতির বিক্রম, পার্থের কর্ম্মশক্তি ঢালিয়া দিয়াছেন। কেমন করিয়া সে চরিত্রের বিশ্লেষণ করিব? দেবতার বিগ্রহ ত বিশ্লেষণ করি না। পূজা করিয়াই তৃপ্ত হই। তোমার চরিত্র জাতীয়তার মন্দিরে, হৃদয়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হউক—তাহার প্রভাবে জাতি প্রভাবিত, অনুপ্রাণিত হউক।

স্বদেশপ্রেমের অবতার! তোমার প্রেমসাধনাও অতুলনীয়! গোপী যেমন ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনই ভগবানের জড় বিগ্রহ এই সোনার ভারতে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বদেশপ্রেম লাভ করিয়াছ, সেই প্রেমবৈভবে কুবের হইয়াছ।

তোমার জীবনে দেখি,—প্রথম স্তরে তুমি সাধন করিয়াছ—"তবৈবাহম্"—দেশরূপী! আমি তোমারই। তোমার জীবনে বহু বার প্রতিপন্ন করিয়াছ—তুমি আর কাহারও নও; ধনের নও, জনের নও, তুমি আপনারও নও, তুমি ভারতের। তোমার জীবনের দ্বিতীয় স্তরে "মমৈব ত্বম্।" হে ভারত, তুমি আমারই। তুমি আর কাহারও নও। আর কাহারও হইতে পার না। প্রথমে আমি তোমার ছিলাম; এখন তুমি আমার হইয়াছ। আমি তোমাকে আমার করিয়াছি। আমি তোমার, তুমি আমার।

তোমার জীবনসায়াহ্নে তোমার জীবনে সেই ভাবের চরম পরিণতি—"ত্বমেবাহম্।" এখন আর তুমি নাই, এখন বুঝি তুমিই আমি। আর "আমি"ও নাই, "তুমি"ও নাই। এখন আমি ও তুমি বর্জ্জন করিয়া তুমি ও আমি এক অভিন্ন হইয়াছি। এখন তুমিই দেশ, দেশই তুমি।

ভক্তিমার্গের পথে তুমি দেশপ্রেমের যে উচ্চ মার্গে উপনীত হইয়াছ, সেই উচ্চ ভূমি হইতে আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সেই প্রেমের কণা মাত্র লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি।

সুফী সাধক চিরজীবন তপস্যা করিয়া সাধনমন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বারে উপনীত হইলেন। সে দ্বার চিররুদ্ধ। চরণসাধনায় সিদ্ধ সাধক ভিন্ন আর কাহারও ভাগ্যে সে দ্বার মুক্ত হয় না। সুফী মহাত্মা দ্বারে করাঘাত করিলেন—'দ্বার মুক্ত কর।' রুদ্ধ দ্বার রুদ্ধই রহিল। গর্ভগৃহের অন্তর হইতে প্রশ্ন হইল—"কে?" সাধক বলিলেন—"আমি"। উত্তর হইল "চলিয়া যাও"। সাধক ফিরিলেন; বহু কাল তপস্যা করিয়া আবার সেই সাধনমন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বারে উপনীত হইলেন। আবার প্রশ্ন হইল—"কে?" সিদ্ধ সাধক বলিলেন—"তুমি"। দ্বার মুক্ত হইল।

ভারত-স্বদেশভক্তিসাধনের পবিত্র মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া তুমি তন্ময়চিত্তে বলিয়াছ—"তুমি"। তাই সে দ্বার মুক্ত হইয়াছে। তুমি সেই রহস্যময় গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া সাধনার গূঢ় রহস্য লাভ করিয়াছ। দেশের জ্ঞানী গুণী নায়কগণ দ্বার হইতে ফিরিয়াছেন। "স্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্যান্ সাধয়তি?" তাই জাতির সাধনা বিপথগামী হইয়াছে। স্বদেশ-প্রেমের সিদ্ধ সাধক! জাতিকে সাধনধর্ম্মে দীক্ষা দাও; মুক্তির পথ মুক্ত হউক। ('নায়ক,' ১১ পৌষ ১৩২৪)

নন-কো-অপারেশন

অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ

"ঐখানে দাঁড়ায়ে থাক, রাইয়ের কুঞ্জে আর এস না।"

ইহাই আমাদের নন-কো-অপারেশনের মূল মন্ত্র। যিনি বৃন্দা দূতীর এই স্পর্দ্ধার উক্তির মর্ম্ম ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তিনিই আমাদের বিবৃত নন-কো-অপারেশনের ভাব ও ভঙ্গী বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা ইংরেজকে—ইউরোপকে স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে উদ্যত হইয়াছি যে, আমার আঙ্গিনার বাহিরে, আমার প্রাচীরবেষ্টিত বাস্তু ভিটার বাহিরে তুমি দাঁড়াইয়া থাক,—খবরদার! ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা

করিও না। আমার নিকান-চোকান, কোমল স্নিগ্ধ, পবিত্র শীতল অঙ্গনে তোমার বুটের মচমচানি হইলে, গোবর-গঙ্গামৃত্তিকার প্রলেপ নষ্ট হইবে, তুলসীমঞ্চ অপবিত্র হইবে, আমার গৃহস্থলীর নিত্যপূত আবরণ ছিন্ন হইয়া যাইবে। বিদেশীয় তুমি, পর তুমি, বিজেতা দাম্ভিক তুমি, আমার কোমল আয়তনের মধ্যে তোমাকে আসিতে দিতে পারি না। তুমি বাহিরে দাঁড়াইয়া থাক; আমি দরজার ভিতরে, আমার গণ্ডীর মধ্যে দাঁড়াইয়া তোমার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইব, প্রয়োজন বোধ হইলে তোমার কোন কোন সামগ্রী আমার রুচির মতন করিয়া আকারান্তরিত করিয়া আমি গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু সাবধান! প্রেমভক্তির, মাধুর্য্যের ও রসের আয়তন আমার গৃহপ্রাঙ্গণে সবুট চরণ লইয়া, বিলাসপ্রমত্ততার বংশীধ্বনি করিয়া প্রবেশ করিতে উদ্যত হইও না।

আমি বাঙ্গালী,—মাধুর্য্যের নিত্য সেবক। তুমি ইংরেজ, তোমার মধুর কথা শুনিয়া সত্যই আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম। বিনা মূল্যে তোমার নিকটে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলাম। সে বেসাতির ফলে আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে; আমাকে কাঙ্গাল ফকীর সাজিতে হইয়াছে,—উদরান্নের জন্য, লজ্জা নিবারণের বস্ত্রের জন্য তোমার দ্বারের কাঙ্গাল ভিখারী হইতে হইয়াছে। আমার ছিল সব, গিয়াছেও সব। শিল্পকলা ছিল, ধনৈশ্বর্য্য ছিল, বিদ্যা বুদ্ধি ছিল, উদ্যম উত্তেজনা ছিল, নিত্যতৃপ্তি ও তুষ্টির শ্যাম শ্যামার প্রেমভক্তিমূলক কীর্ত্তন ও গান ছিল, চরিত্র ছিল, মনুষ্যত্ব ছিল, শৌর্য্য বীর্য্য ছিল। আবার বলি—ছিল সব, যাহা থাকিলে একটা জাতি সভ্য ও বরেণ্য হইতে পারে, তাহার সবটাই ছিল। তোমার সংস্পর্শে আসিয়া, তোমার নকলনবীস হইয়া মরুমারুতশীর্ণ যূথিকাস্তবকের ন্যায় আমার সকল ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে আর কাহারও সাহচর্য্য করিয়া আমার এতটা দুর্দ্দশা ঘটে নাই। হূণ, শবর, চীন, তাতার, মোগল, পাঠান প্রভৃতি পূর্ব্বগামী কোন বিজেতা জাতির সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে আসিয়া আমাকে এতটা সর্ব্বস্বান্ত এবং সর্ব্বস্বহীন হইতে হয় নাই। তোমার যেন "উপাসের" (upas) আওতা—তেঁতুলের ছায়া! দেড় শত বর্ষ কাল এই ব্রিটিশ তিন্তিড়ীতলে বাস করিয়া বাঙ্গালী আমরা কুষ্ঠরোগীর তুল্য স্থবির পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। এত দিন পরে রোগের অনুভূতি এবং বোধোদয় ঘটিয়াছে,

তাই তোমারই ভাষায় নন-কো-অপারেশনের ডঙ্কা মারিয়া আমাকে বলিতে হইয়াছে,—

"যা রে বিদেশী বঁধু, আমি তোরে চাই না।"

তুমি করগ্রাহী রাজা আছ, তাহাই থাক; আমি কিস্তি কিস্তি তোমার টেক্সসকল আদায় দিব, তোমার আইন-কানুন মানিয়া চলিব, তোমায় দেখিলে দূর হইতে সভয়ে সাত সেলাম করিব। পরন্তু আর উপযাচিকার ন্যায় তোমার ভজনা করিব না, তোমার ধামা ধরিব না, উন্নতি এবং অনুচিকীর্ষার খাল কাটিয়া তোমার দেহসর্ব্বস্ব বিলাস ব্যসনের পঙ্কিল কর্দ্দমপ্রবাহে গৃহ পল্লীকে আর ডুবাইয়া দিব না। জর্ম্মন যুদ্ধে তোমার ইউরোপকে খুব চিনিয়াছি, পাঞ্জাবী কাণ্ডে—জালিয়ানওয়ালার বীভৎস ব্যাপারে তোমাকেও চিনিতে পারিয়াছি! নৈরাশ্যের মুকুরে আমার সর্ব্বস্বহীন দেশের এবং জাতির ছবি আমি দেখিয়াছি। তাই পণ করিয়াছি—বাঁচি আর মরি, হারি বা পারি, আমরা কৃষ্ণকায় ভারতবাসী—"ধলা পানে আর চাব না; ধলার প্রেমে আর মজ্‌ব না, ধলার সঙ্গ আর কর্‌ব না।"

ইহাই আমাদের নন-কো-অপারেশন, স্বরাজ-প্রাপ্তির সাধনা;—অসহযোগের শবসাধনা!

চরকা

চরকা চালাইবার উপযোগিতা সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিবার, তাহা বলিয়া রাখিয়াছি; তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, চরকা চালাইতে পারিলে আমাদের জাতিগত এবং চরিত্রগত কল্যাণ সম্ভবপর হইবে। চরকা আমাদের পক্ষে সুদর্শন চক্রের কাজ করিবে। মহাত্মা গান্ধীও ঐ একই কথা কহিতেছেন, চরকা চালাইবার আদেশ বার বার করিতেছেন। কিন্তু এজন্য ইংলিশম্যানের এতটা গাত্রদাহ হয় কেন? আমরা ভুল বুঝিয়া থাকি ত আমরাই ঠকিব, তোমার তজ্জন্য এতটা ভাবনা কিসের? তুমি স্পষ্টই বলিয়াছ, চরকা চলিলে, আমরা আবার মোটা কাপড় পরিতে শিখিলে এবং অভ্যস্ত হইলে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলওয়ালাদের কিছু ক্ষতি হইবে। ভারত গবর্ম্মেণ্টের বা ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা

নাই। পাল্টা জবাবে আমরা বলিব যে, আমরা কাহারও ক্ষতি করিবার জন্য উদ্যত নহি; আমরা পণ করিয়াছি যে, ঘরের চরকায় কাটা মোটা সুতায় গ্রামের তাঁতী যে কাপড় বুনিয়া দিবে, কেবল তাহাই পরিধান করিব। এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে, যদি কাহারও ক্ষতি হয় হউক; আমরা তজ্জন্য চিন্তিত নহি। আমাদের মহিলাবর্গ কোন কালে কেবল স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী ছিলেন না, তাঁহারা সহধর্ম্মিণী, সহচারিণী ছিলেন। যাহাতে আবার তাঁহারা অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী পত্নী হইতে পারেন, সে চেষ্টা করিব। চরকা সে সাধনার প্রথম এবং প্রধান মন্ত্রী। এ কথা তোমরা বুঝিবে না, তোমাদের বিলাতী বীফ-ব্রাণ্ডিপূর্ণ মস্তিষ্কে আমাদের ভাবের কথা স্থান পাইবে না। সে চেষ্টা বৃথা, তেমন চেষ্টা আমরা করি না। তথাপি তোমরা বাবু ও সাহেবের দল, আমাদিগকে উল্‌টা কথা বুঝাইবার জন্য এতটা ব্যস্ত কেন? কেন তোমাদের এতটা রোষ, এমন বিরক্তি? তোমরা মদরত দল ঘরের কোণে বসিয়া কেন উৎকট আস্ফালন করিতেছ? কেন তোমাদের ন্যাতার দল স্থানে অস্থানে আমাদের উপর উল্‌টা চাপ দিবার জন্য এতটা উদ্যত? আমরা স্বরাজ, নন-কো-অপারেশন প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম। পার ত বিতণ্ডা চালাও। ('নায়ক,' ৮ বৈশাখ ১৩২৮)

"মুস্কিল আসান"

'ইয়া পীর,—মুস্কিল আসান।'

সূচীভেদ্য অন্ধকারে একটা আলোকের গোলক হস্তে করিয়া পঞ্চমের উপর তান চড়াইয়া ঐ ফকীর নগরের অলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং সকলকে আশ্বাস দিয়া কেবল হাঁকিতেছে—এস, এস পথিক ও পথভ্রান্তগণ, আমি তোমাদের মুস্কিল আসান করিয়া দিব, তোমাদের সকল অসুবিধা দূর করিব;—আমার হাতে পীরের প্রোজ্জ্বল প্রদীপ বিদ্যমান, এই প্রদীপের নির্ব্বাণ সম্ভবপর নহে; চোর, ডাকাত, নরঘাতক দস্যুতে এ প্রদীপ নিভাইতে পারে না,—এমন কি, ঝঞ্ঝাবাতে—ঘূর্ণাবর্ত্তে—বারিবর্ষণেও এ প্রদীপ নিভিবার নহে। এস—এস, যাহারা আলোক

চাও—নিরাপদে এই অন্ধকার রাত্রে নগরের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে চাও,—আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, আমি তোমাদের সকল মুস্কিল আসান করিয়া দিব।

মুস্কিল আসানের সেই ফকীর সেই যুগের মানুষ, যে যুগে নগরের রাজপথে আলোক দেওয়া হইত না, যে যুগে মিউনিসিপ্যালিটি ছিল না। তখন রাত্রি এক প্রহর শেষ হইলে সকল দোকানপাট বন্ধ হইত, নগরের অলি গলি অন্ধকারে আবৃত হইত। তখনকার দিনে লণ্ঠনের প্রচলন এমন ছিল না; ধনীর গৃহেই অভ্‌ভ্রের বা কাচের লণ্ঠন থাকিত। তখন অন্ধকারে আলো করিবার উপায়স্বরূপ মশাল ছিল। কথায় কথায় মশাল জ্বালিতে দরিদ্র গৃহস্থে পারিত না। সহসা কাহারও গৃহে রোগীর অবস্থা খারাপ হইলে, চিকিৎসক ডাকিবার প্রয়োজন হইলে, কাহারও গৃহে কেহ মরিলে, তাহার সৎকারের আয়োজন করিতে হইলে, কোন প্রেমিক পথহারা হইলে—এই মুস্কিল আসানের ফকীর আলো দেখাইয়া বিপন্ন গৃহস্থকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইতেন। মুস্কিল আসানের ফকীর প্রদীপহস্তে সঙ্গে থাকিলে চোর ডাকাতে আক্রমণ করিত না। মুস্কিল আসানের ফকীর একাধারে নগরের পুলিসের কাজ করিতেন এবং আলোকদাতা পরোপকারকের কাজ করিতেন।

অন্ধকার—অন্ধকার—সূচীভেদ্য তমিস্রা, যেন চাপ চাপ অন্ধকার চারি দিকে জমাট বাঁধিয়া আছে,—এক পদ অগ্রসর হইতে হইলে যেন অন্ধকার ঠেলিয়া যাইতে হয়! এমন অন্ধকারে আলো দেখাইবার কেহ ত নাই, এই অজ্ঞানতমিস্রা ভেদ করিয়া যাইবার পক্ষে জ্ঞানালোকের সুব্যবস্থা গবর্মেণ্ট ত করেন নাই। তাই কাতরকণ্ঠে পুরাতনের আহ্বান করিতেছি,—মুস্কিল আসানের ফকীরকে তারস্বরে ডাকিতেছি। যে অন্ধকারে উত্তুঙ্গবিন্যস্ত দামিনীদীপ্তি সুবিধাজনক নহে, যে তমিস্রার ভিতরে গ্যাসালোক স্বর্ণবিন্দুর ন্যায় দেখায়, আলোক বিকিরণ করে না, সেই অন্ধকারে ফকীরের প্রদীপ ছাড়া আর কে আমাদের মুস্কিল আসান করিবে! ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ, শিষ্টাচার, সবই নষ্টপ্রায়, কেহ কোন বিঘ্ন মানিতেছে না;—সবাই যেন পুরাতন সামাজিক প্রাচীর ভাঙ্গিতে উদ্যত,—গড়িবার দিকে, বজায় রাখিবার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই—সবাই ধ্বংসবাদের মদিরায় প্রমত্ত। এমন সময়ে, এমন অন্ধকারে ভারতবাসীর

অগণ্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অলিতে গলিতে—ভারতবর্ষের নানা জাতি, নানা বর্ণের সহজবিন্যস্ত জনপদসকলে,—মানবতার এমন গোলকধাঁধায় আলোক দেখাইয়া লইয়া যাইবার, নিরাপদে অগণ্য বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া ঈপ্সিত স্থানে লইয়া যাইবার আর ত কেহ নাই,—আছে সনাতন কালের ফকীর মুস্কিল আসান।

মুস্কিল কি কেবল প্রজাবর্গের! মুস্কিলে পড়িয়াছেন রাজা এবং শাসক-সম্প্রদায়! অগ্রসর হইলেও তাঁহারা গালাগালি খাইতেছেন, পশ্চাৎপদ হইয়া স্থবির ভাবে দাঁড়াইলেও তাঁহারা তিরস্কৃত হইতেছেন। অথচ রাজ্য রক্ষার ভার তাঁহাদের উপর বিন্যস্ত, সমাজে শান্তি ও সংস্থিতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহারা জগতের নিকট দায়ী। এদিকে ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে যে বিধিনিষেধের দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন, এখন আর সে বিধিনিষেধের বন্ধনী কেহ মান্য করিতেছে না। সব ছাড়িয়া, সব ভুলিয়া তাহারা কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ভাবের বা অবস্থার লালসায় যেন উন্মত্তবৎ হইয়াছে। এমন সন্ধিক্ষণে

"ইয়া পীর, মুস্কিল আসান"

বলিয়া কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এমন দুর্য্যোগে পীর পয়গম্বর ছাড়া আর কেহ ত বুক ঠুকিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে না। যে দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিয়াছে, যে বিধিনিষেধের বাহিরে গিয়াছে, অথচ যাহার হস্তে আলোকবর্ত্তিকা আছে, সেই ত এমন দুর্দ্দিনে অগ্রসর হইতে পারে, অন্ধকার ঠেলিয়া সকলকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারে। কোথায় সে ত্যাগী সংযমী, পথিকসহচর ফকীর? কোথায় সে জ্ঞানদাতা, আলোকদাতা, বিপন্নের সহায়

মুস্কিল আসান!

('নায়ক,' ২৬ পৌষ ১৩২৮)

এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

ঐ শুন,—উত্তাল তরঙ্গভঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে, অগ্রগামী জলপ্রবাহ বন্ধুর ধরাবক্ষকে যেন দীর্ণ করিয়া যাইতে যাইতে কেমন শ্রবণভৈরব

আরাবের, কেমন ভয়ানক নাদের সৃষ্টি করিতেছে। দূরাগত মেঘডম্বর শ্রবণমনোহর হইলেও অতি গম্ভীর, অতি প্রগাঢ়,—কদাচিৎ বিভীষিকা-প্রদ। দূরাগত জলকল্লোল-কোলাহল স্নিগ্ধ, শীতল, আরামপ্রদ হইলেও উহার সান্নিধ্য-সম্ভাবনা ভয়ানক। পরনরকণিকাসমাহারজাত জাতির বিপ্লবকোলাহল, অসন্তোষের কল কল, ছল ছল ধ্বনি সুমধুর হইলেও, আশাপ্রদ হইলেও, উহার সমাগম-সঞ্জাত অতি ভয়ানক, উহার প্লাবনলীলা অতি ভীষণ। দূরে—ইউরোপে, রুষের ও জর্ম্মন দেশের কুক্ষিগতে এই প্লাবন-লীলা ঘটিয়া পুরাতনকে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দিতেছে, অতীতের স্মৃতিস্তম্ভসকলকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিতেছে বটে, কেবল দূরত্ববশতঃ উহার ভীষণতা আমরা অনুভব করিতে পারি নাই,—পারিতেছি না। সেই আরাব, সেই নাদ, সেই কল্লোল কোলাহল ভারতক্ষেত্রের এক দিগ্‌দেশ হইতে উত্থিত হইতেছে; আগত প্রবাহের ও বন্যার শীতল সংস্পর্শ অনেকে নগ্ন চরণতলে অনুভব করিতেছেন। তাই ভবিষ্যৎ পরিণাম জানিয়া এবং বুঝিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে

এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?

ঐরাবত পারে নাই, উচ্চৈঃশ্রবা পারে নাই, বিরাট্‌কায় সিংহবিক্রমের মল্লগণ তরঙ্গাভিঘাতে কোথায় তলাইয়া গিয়াছিলেন ;—অভ্রচুম্বী পর্ব্বত-চূড়া চূর্ণ হইয়া ভাসিয়া গিয়াছিল,—ত্রিতাপহারিণী ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা-প্রবাহমুখে সব নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছিল,—শুনা যাইতেছিল কেবল জলরাশির ঘাতপ্রতিঘাতে গদগদ নাদ এবং ভগীরথের বিজয়শঙ্খনাদ। সে সর্ব্বলোকতারিণী, সর্ব্বরোগসংহন্ত্রী গঙ্গাপ্রবাহের কল্যাণময়ী লীলা যখন কেহ সামলাইতে পারেন নাই, তখন এই আগামী লীলার ঘাত-প্রতিঘাত সামলাইবে কে ? আছেন এক জটাজূটভূষণ, শ্মশানবাসী, মৃত্যুঞ্জয় সদাশিব,—আর আছেন ত্যাগী, সংযমী, সাধনপরায়ণ, সিদ্ধ সাধক জহ্নু মুনি। কেবল এই দুই জনে সে পুরাকালের জলতরঙ্গ প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিলেন। আর এই নবীন যুগের জগদ্ব্যাপী বন্যার অতিভয়ানক জলতরঙ্গ কে প্রতিরুদ্ধ করিবে ? কোথায় সে বাঘাম্বর, দিগম্বর, শ্মশানশায়ী মহাদেব ? কোথায় সে বল্কলধারী, গলিতপত্রভোজী ঋষি মুনি ? এ সময়ে তাঁহাদের কাহাকেও যে খুঁজিয়া পাই না।

কেবল আছ তুমি, ভগীরথসদৃশ, সাগরমেখলা গুর্জ্জরজাত, সগরবংশ-সমুদ্‌ভূত, সন্ন্যাসশীর্ণ, অস্থিশূন্য

মহাত্মা গান্ধী!

তোমারই শঙ্খনাদে অবসাদের অনাদি ও সনাতন তুষার-বিস্তার গলিত করিয়া এই অভিনব জলতরঙ্গ জাতির সকল পর্ব্ব ভেদ করিয়া সমতলে আসিয়া খেলা করিতেছে। তোমারই শঙ্খনাদের আহ্বানে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ নরনারী কণিকারূপে প্লবময়ী হইয়া নবগঙ্গার সৃষ্টি করিয়াছে! তাহাদেরই কল্লোল কোলাহল, দূরাগত বংশীধ্বনির তুল্য সাগরাম্বুরাশি উত্তীর্ণ হইয়া কাননকুন্তলা বাঙ্গালার অগণ্য কুঞ্জে কুঞ্জে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তুমিই শীর্ণ তর্জ্জনী হেলাইয়া সে আরাব ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ করিয়াছ। পারিলে তুমিই এ জলতরঙ্গ রোধ করিতে পারিবে, তুমিই পুরাতন ও সনাতন সৃষ্টির পরম্পরা রক্ষা করিতে পারিবে। তেমনই পৌরাণিক যুগের ভগীরথের মতন পাঞ্চজন্য শঙ্খহস্তে তুমিই প্লাবন-তরঙ্গের মুখে দাঁড়াইতে পার—দাঁড়াইয়া আছও। যাহাতে আমাদের সর্ব্বস্ব ভাসিয়া না যায়, নির্দ্দিষ্ট খাতে প্রবাহিণী হইয়া এ বন্যার বিস্তার সাগরে যাইয়া মিলিতে পারে, সাগর-সন্তান বাঙ্গালীর উদ্ধারসাধন সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা তুমিই করিতে পার। দাঁড়াইবে কি? তেমনি, তেমনি, তেমনি ভাবে,—সেই সনাতন পুরাতনের আদর্শ অনুসারে,—তেমনই ভগীরথসদৃশ দাঁড়াইবে কি? নহিলে আর ত তেমন শক্তিশালী পুরুষ দেখিতে পাই না! যখন প্রবাহবেগ প্রশমিত করিয়াছ, তখন দয়াপরবশ হইয়া এক বার আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াও! আমরা আশ্বস্ত হই, নির্ভয় হই, নিশ্চিন্ত হই!

অসহযোগ খেলা

তুমি আত্মবান্ হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলে রাজনীতির ক্লেদকর্দ্দম পরিহার করিয়া, বাদবিতণ্ডার বালুকাবিস্তার পরিহার করিয়া আমরা অসহযোগের খেলা নিশ্চিন্তে খেলিতে পারিব! আমরা জগদভিরাম রামনামের গণ্ডী কাটিয়া, গণ্ডীমধ্যে থাকিয়া আত্মোন্মেষের সাধনায় দীক্ষিত হইতে পারি,—আমরা খদ্দর পরিয়া, শাকান্নভোজী হইয়া, আত্মতুষ্টিপরায়ণ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি। তুমি সম্মুখে দাঁড়াইলে শ্বেতাঙ্গের

প্রশংসায় প্রলুব্ধ হইয়া, আমরা ভারতবর্ষের মহাশ্মশানে ছুটাছুটি করিয়া, চিতাচুল্লীর জ্বালামালার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মবলি দিব না। তুমি সম্মুখে দাঁড়াইলে আমরা ইউরোপের মহামোহে আত্মহারা হইতে পারিব না। কাজ কি আমাদের রাজনীতি চর্চ্চায়,—কাজ কি আমাদের শ্বেতাঙ্গের সহিত সমকক্ষতায়! সর্ব্বস্বান্ত, সর্ব্বস্বাপহৃত, আত্মপরিচয়-বিনষ্ট ভারতবাসীর ত পরের প্রতি দৃষ্টি করিতে নাই। ভেক হইয়া গজরাজের তাণ্ডব ত আমাদের অনুকরণযোগ্য নহে। সর্ব্বাগ্রে

মানুষ হইতে

হইবে। মানুষের মতন মানুষ হইয়া তবে ত অন্য বর্ণের মানুষের সহিত সমকক্ষতা করা চলিবে। ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান, তোমাদের এই কথা অহরহঃ স্মরণ রাখিতে হইবে—তোমাদের ছিল ত সব, গেল কেন সব ? শব হইয়াছ বলিয়াই তোমাদের সব গিয়াছে। আবার যদি শবত্ব বর্জ্জন করিয়া

শিব

হইতে পার, "যত জীব তত শিব" এই বোধে উদ্‌বুদ্ধ হইতে পার, তবে পূর্ব্বে যেমন মেদিনীমণ্ডলকে লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিতে পারিতে, এখনও আবার তেমনই অপূর্ব্ব খেলা খেলিতে পারিবে। আবার যাহা ছিল, তাহাই পাইবে,—যেমনটি ছিলে, তেমনই হইবে! তাই মহাত্মা গান্ধী, তোমাকে বলিতেছি—সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও! তোমায় দেখিলে আমরা আশ্বস্ত হই, নব বলে বলীয়ান্ হইয়া নব ব্রতে ব্রতী হই! মত-বিরোধের কথা অনেক বলিয়াছি ; যাহা বলিয়াছি, তাহাই এখন ঘটিতেছে ; তজ্জন্য স্পর্দ্ধা করি না। তোমার দোহাই দিয়া অর্থোপার্জ্জন করি নাই, অসহযোগের ডঙ্কা বাজাইয়া পয়সা কুড়াই নাই, গোপনে বিলাতীর সেবা করি নাই। তথাপি তোমাকেই এখন আমরা এ জলতরঙ্গ রোধের প্রকৃত পুরুষ বলিয়া বিবেচনা করি। তাই কাতরকণ্ঠে তোমাকে আহ্বান করিতেছি। এখন যে তুমি খাঁটি মানুষ হইয়াছ, দেশাত্মবোধপ্রবুদ্ধ বলদেবের তুল্য বলশালী হইয়াছ, তাহা বুঝিয়াছি। তোমার নিরাবিল, নির্ম্মল জাতিপ্রীতি আমাদের কল্যাণদায়িকা হইবেই। তাই বলিতেছি, রাজনীতির কঙ্কালখটখটা স্তব্ধ করিয়া, মনুষ্যত্বের কারিকর সাজিয়া একবার

ভগীরথরূপে

ভারতবর্ষের সম্মুখে দাঁড়াও। হিন্দু মুসলমান তোমাকে দেখিয়া কর্ম্মসাধনায় ব্রতী হউক, হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত হউক, একাত্ম হউক, ভীষণ বন্যার কল্লোল কোলাহল স্তব্ধ হউক, বৈষম্য ও বৈরূপ্য অপসারিত হউক। ('নায়ক,' ২৫ ফাল্গুন ১৩২৮)

শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরীপূজা

বাবুর দল লম্বশাটপটাবৃত হইয়া, বঙ্গদেশের ও দশের কোন খবর না রাখিয়া, আধা ইংরেজী আধা বাঙ্গালী বুলিতে কেবল

DEPRESSED CLASS

বা পতিত জাতির উদ্ধারের বোলোয়ারী আওড়াইয়া থাকেন। বাবুরা জানেন না যে, শূন্যপুরাণ হইতে অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় সকল মহাকাব্যেই পতিত জাতির বিবরণ আছে। বরং বৈষ্ণব সাহিত্যে একটু আধটু ব্রাহ্মণের গন্ধ পাওয়া যায়, পরন্তু শিবায়নে, ধর্ম্মমঙ্গলে, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে, মনসামঙ্গলে ব্রাহ্মণের উল্লেখ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। গন্ধবণিক্, কৈবর্ত্ত, পোদ এবং নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিই বাঙ্গালায় পূর্ব্বে প্রবল ছিল। তাহারাই রাজা, তাহারাই ধনী, তাহারাই সমাজরক্ষক ছিল; তাই বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কবিগণ তাঁহাদের লিখিত মহাকাব্যসকলে বণিক্, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতিরই জয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার রচিত 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে বণিক্ জাতির প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণের অবস্থান ও কর্ম্ম সম্বন্ধে সুন্দর চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কালকেতু, ফুল্লরা, লহনা, লাউসেন প্রভৃতির সমুজ্জ্বল চিত্র বাঙ্গালার মুসলমান যুগের মহাকাব্যসকলে অঙ্কিত দেখিলে মনে স্থির বিশ্বাস হয় যে, ইংরেজের আমলের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় Depressed Class বলিয়া কোন শ্রেণী ছিল না। ইংরেজের আমলেই "ভদ্রলোক" এবং "ছোটলোক" এই দুই শ্রেণীর বিভাগ নির্দ্দেশ হয়। ইংরেজের আমলেই ইংরেজীনবীস বাবু-চাকুরে, উকীল, ব্যারিষ্টার এবং স্কুলমাষ্টার প্রভৃতি ভদ্রলোক অভিধান পান, আর দোকানদার, ব্যবসাদার, কৃষক, ফিরিওয়ালা অনেকটা "ছোট-

লোক” বা “অভদ্র” শ্রেণীভুক্ত হন। যে ইংরেজী জানে না, শার্ট কোট পরে না, সে গণনার মধ্যেই নহে, এমন ধারণা কেশবচন্দ্রের আমলের ইংরেজীনবীস মাত্রেরই মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল। এই ধারণা জন্য দাশু রায়, রাধামাধব, প্রামাণিকগণ তখনকার বাবু-সাহিত্যে স্থান পান নাই। এই ধারণা জন্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া অন্য জাতির মধ্যে কেমন সকল উৎসব আনন্দ প্রচলিত ছিল, তাহার কোন খবর বাবুর দল রাখেন নাই। তাই গন্ধেশ্বরীর পূজার খবর বাবুসমাজে তেমন জানা নাই। একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিব ঃ—খাঁটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত Depressed Classএর বিচার করেন না। তাঁহারাই ত ব্যবস্থা দিয়া রাজবংশী, পোদ, নমঃশূদ্র প্রভৃতিকে উন্নতজাতীয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যবস্থা পাইয়া আজ কায়স্থ ক্ষত্রিয় সাজিতেছে। ভদ্রলোক ও ছোট-লোকের বিচার ইংরেজীনবীস বাবু ব্রাহ্মণেই অধিক করিয়া থাকে। এই জাতীয় ব্রাহ্মণই “বেণে” বলিয়া নাক শিট্‌কায়।

বাঙ্গালা বেণের দেশ

সোজা কথা বলিতে হইলে বলিব যে, বৌদ্ধ যুগে এবং মোগল পাঠানের আমলে বাঙ্গালা “বেণের দেশ” ছিল। মুকুন্দরাম, ঘনরাম, মাণিক গাঙ্গুলী-প্রমুখ মোগল পাঠানের আমলের ব্রাহ্মণ কবিগণ বেণের গুণগান করিয়া নিজ নিজ মহাকাব্য পূর্ণ করিয়াছেন। সেই গন্ধবণিক্ জাতির “গন্ধেশ্বরী”র পূজা গত কল্য রাত্রে হইয়া গিয়াছে। এবার আমাদের পাড়ায় এবং বরাহনগরে গন্ধেশ্বরীর মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা হইয়াছে। নহিলে সাধারণতঃ ঘটস্থাপনা করিয়া পূজা হয়। গন্ধেশ্বরীর পূজা যাঁহারা করেন, তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নহেন। গন্ধেশ্বরীর পূজায় ছাগ—খাসী বলিদান হইত, এখনও আঙ্গুল আড়াল দিয়া নিকটস্থ কালীমন্দিরে ছাগ বলি দিয়া গন্ধেশ্বরীর পূজা পূর্ণ করা হয়। আমাদের মনে হয়, গন্ধেশ্বরীর পূজার পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমাদের এই ধারণা বলবতী হইয়াছে যে, বাঙ্গালার গন্ধবণিক্ সমাজ পূর্ব্বে বজ্রযানী বৌদ্ধ ছিল, এখন শাক্তরূপে পরিণত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালায় হীনযানী বৌদ্ধ মতের বেদীর উপরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রভাবে বাঙ্গালায় বজ্রযানের খুব সঙ্কোচ ঘটিয়াছিল। পরন্তু গন্ধবণিক্ সমাজে গন্ধেশ্বরীর

[illegible] হয় নাই। এই গন্ধেশ্বরীর পূজার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে পার? তাহা হইলে বুঝিবে, বাঙ্গালায় Depressed Class ছিল না। উহার একটু আধটু আমেজ যাহা পাওয়া যায়, তাহাও দাক্ষিণাত্যের প্রভাবে, বল্লালের আমলের পরে। শেষ ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য ঘটে ইংরেজের আমলের গোড়ায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রভাবকালে। এখনও আছে, তবে বর্ণগত জাতি নাই—ছিলও না। বাঙ্গালায় জল-অনাচরণীয় ব্যবস্থা জেতা বিজিতের হিসাবে এবং বৌদ্ধবিদ্বেষের ফলে ঘটিয়াছে। যদি খবর লইতে জানিতে, তাহা হইলে এত কথা কহিতে হইত না।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী গ্রন্থখানা যদি অভিনিবেশ সহ পাঠ করিতে, তাহা হইলে জানিতে পারিতে যে, চণ্ডীর পূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে কখনই আহ্বান করা হইত না। ফুল্লরা স্বয়ং চণ্ডীর ঘটস্থাপনা করিতেন। কেবল দশ কর্ম্মে, শ্রাদ্ধশান্তিতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকা হইত। বর্ণব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণের কোন শ্রেণী পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ছিল না। কেবল কুলীন কয় ঘর অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী থাকিতে চেষ্টা করিতেন, বাকী সকল ব্রাহ্মণই কৈবর্ত্ত, পোদ ও বণিক্‌জাতির প্রতিপাল্য ছিল। কালকেতুর কেমন জীবন? হরি হোড় কি করিত? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা এখনও কেহ করে নাই। ইউনিভারসিটিও তেমন অভিজ্ঞ পণ্ডিত রাখেন নাই, কাজেই বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস বাঙ্গালী বাবু জানেন না। গন্ধেশ্বরীর কথা তুলিয়া গোটাকয়েক অবস্থার ইঙ্গিত করিলাম মাত্র; পরন্তু এখন ত আর বাঙ্গালার পঠন-পাঠন নাই, বঙ্গসাহিত্যের বিশ্লেষণও কেহ করে নাই। সে ইঙ্গিত বুঝিবার লোকের বাঙ্গালায় অত্যন্তাভাব ঘটিয়াছে। এই বৈশাখী পূর্ণিমার সঙ্গে যে কত কি জড়ান মাখান আছে, জয়মঙ্গলবার আছে, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত আছে, আরও কত কি আছে, তাহা এখনকার বাঙ্গালী জানে না। পূর্ণিমায় গন্ধেশ্বরীর পূজা হয় কেন? ওলাই চণ্ডীর পূজাও পূর্ণিমাতে হইত। বজ্রযানের খবর যদি থাকিত, সহজ মতের সহিত যদি পরিচয় থাকিত, বাঙ্গালার মধ্যযুগের কাব্যগাথা যদি পড়া থাকিত ত এ সকল গুপ্ত রহস্য বুঝিতে পারিতে। এখনও যে বাঙ্গালায় কত বৌদ্ধ আচারপদ্ধতি প্রচ্ছন্নভাবে প্রচলিত আছে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালী লেখাপড়া শিখিতেছে বটে, পরন্তু ঘরের খবর রাখিতে ভুলিয়াছে। আমাদের সেই দুঃখই বড় দুঃখ। ('নায়ক,' ২৯ বৈশাখ ১৩২৯)

রসাল-তত্ত্ব

এইবার রসাল বা আম বা আম্র বা ম্যাঙ্গোর কথা কহিব। আমাদের "কালা নরেন" আমাদিগকে আম দিয়াছে, সুতরাং আমের কথা কহিতে হয়।

বলিতে পার—mango শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? ইংরেজ এ শব্দটা কোথা হইতে পাইল? ভারতবর্ষের কোন জাতি ত ম্যাঙ্গোর অনুরূপ কোন শব্দ ব্যবহার করে না। জন বীম্‌স, র‍্যাভেন্‌শা, ইউল প্রমুখ রসাল-রসাস্বাদবিমূঢ় বড় বড় সিবিলিয়ানের মধ্যে কেহই "ম্যাঙ্গো" এবং "ম্যাঙ্গোষ্টিন" এই দুই শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থির করিতে পারেন নাই। কে একজন বকেয়া সাহেব সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, ম্যাঙ্গো শব্দ ব্রহ্মদেশের কোন প্রাদেশিক ভাষার অন্তর্গত শব্দ। কেহ বলেন, শ্যামদেশে, কাম্বোডিয়ায় এবং সিঙ্গাপুরে ম্যাঙ্গো শব্দের প্রচলন আছে। হইতে পারে, পরন্তু আমরা এ ব্যাখ্যায় তুষ্ট নহি।

আম্রের আদি স্থান

পূর্ব্বের এনাম, কাম্বোডিয়া হইতে পশ্চিম-পঞ্জাব পর্য্যন্ত এই ভূখণ্ড আম্রের উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা আছে। ভারতসাগরের দ্বীপ-পুঞ্জেই আম্রের প্রাচুর্য্য খুব অধিক। তবে র‍্যাভেন্‌শা সাহেব বলেন যে, শ্রীহট্ট, মালদহ, ভাগলপুর, মিথিলা, পাটনা, কাশী, লক্ষ্ণৌ, এই কয় জেলার মাটিতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল আম উৎপন্ন হয়। মান্দ্রাজ প্রদেশে মাদুরা প্রভৃতি জেলায় ভাল আম হইয়া থাকে। মাটিতে চূণ ও সোরা না থাকিলে ফল ভাল হয় না। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরে ভাল আম জন্মায়।

আমের কলম

আমের কলম করিতে আমরা ইংরেজের নিকট শিক্ষা করিয়াছি। পাটনার ডেভিস সাহেব সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে কলমের সাহায্যে বোম্বাই আমের উদ্ভব সাধন করেন। আমাদের বালককালে পাটনা ও ভাগলপুরে এত বোম্বাই আমের প্রাচুর্য্য ছিল না। তখনকার বোম্বাই

আম আকারে খুব বড় হইত এবং একেবারেই বর্ণচোরা হইত, অর্থাৎ পাকিলে লাল বা হল্‌দে রং ধরিত না। সে আমের রস ঠিক আলতা-গোলা লাল হইত। এখন বোম্বাই আমের অধোগতি চলিতেছে, আম আকারে ছোট হইতেছে, স্বাদও পূর্ব্ববৎ নাই। কলমের গাছ পঁচিশ বছরের অধিক টিকে না। পঁচিশ বৎসর অতীত হইলে কলমের বাগান কাটিয়া নূতন কলমের চাষ করিতে হয়। ডেভিসের উপদেশ অনেকে ভুলিয়াছে, সে বহি এখন পাওয়া যায় না, তাই তাহার সৃষ্টি বোম্বাই আম জাতি হারাইতেছে। মনে থাকে যেন, বোম্বাই আম বোম্বাই প্রদেশে পাওয়া যায় না।

চশমা ও খাসি

আমাদের দেশে পূর্ব্বে ডালে কলম করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। আঁটির গাছই হইত, সার ও মাটির গুণে একটা গাছের আম অতি সুস্বাদু হইত। তবে ছিল খাসি করা এবং চশমা লাগান। একটা বড় সার-কুড়ে আমের আঁটি পুঁতিয়া রাখা হইত। সেই আঁটির গাছগুলা এক হাত পরিমাণ বড় হইয়া উঠিলে, একে একে তাহাদিগকে তুলিয়া মাঝের বড় শিকড়টাকে কাঁচি দিয়া অৰ্দ্ধেক কাটিয়া দেওয়া হইত; সেই কাটা গাছগুলাকে পংক্তি অনুসারে পুঁতিয়া দেওয়া হইত। এক একটি বড় গহ্বরে ইন্দুরের মাটি, পচা মাছ, গোবর এবং কঙ্করচূর্ণ পূর্ণ করিয়া রাখা হইত। সেই মাটিতে গাছগুলি রোপণ করা হইত। ইহাকে বলে খাসি করা। খাসির বাগানে দুই শত বর্ষ পর্য্যন্ত গাছে ফল ধরে। মিথিলা, ত্রিহুত এবং উত্তর-ভাগলপুরে খাসির বাগান অনেক ছিল, এখনও আছে। চশমা করাই আসল grafting, আম্রের নবীন কিশলয় অঙ্গে অন্য গাছের কিশলয় অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়। একটি ভাল চাকু ছুরির সাহায্যে ডাঁটাটি কিঞ্চিৎ চিরিয়া নূতন twig বা কিশলয় বসাইয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। সেই কিশলয়মুখে যে নূতন ডাল বাহির হয়, তাহাই বজায় থাকে, অন্য ডাল কাটিয়া ফেলিতে হয়। ডেভিস সাহেব দুই গাছের দুইটা ডাল কলমের মত চাঁচিয়া, সেই দুইটাকে বাঁধিয়া কলম করিতেন। তাঁহার পদ্ধতি অনুসারে ফল শীঘ্র হয়। তাই চশমা ও খাসির পদ্ধতি ছাড়িয়া দিয়া অধুনা ডেভিস-পদ্ধতি সর্ব্বত্র অনুসৃত হইতেছে।

রসালতত্ত্ব অনন্ত ও অনাদি। আমরা উহার জানিই বা কতটুকু! যতটুকু জানি, সাক্ষাতে ও পরোক্ষে দেখিয়া শুনিয়া জানি ও বুঝি, তাহার এতটুকু লিখিতে হইলে দশখানা 'নায়ক' পূর্ণ হইয়া যাইবে। তাই রসালের কথা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। পাঠক পাঠিকে, নিত্য আম খাও এবং নিত্য আম্র-সমাচার নায়কে পাঠ কর—সুখ পাইবে, আনন্দ পাইবে, দেহ সবল ও সুস্থ হইবে। ('নায়ক,' ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯)

বাজারে প্রচুর আম আমদানি হইতেছে। এবার ফসলটা খুব হইয়াছে। এমন Mango crop বা আমের ফসল ইদানীং আমরা দেখি নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অতএব আমের কথা আবার বলিতে হইল।

আম্রের বিশিষ্টতা

আম্রফলের একটা অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা আছে, যাহা জগতের অন্য কোন ফলে নাই এবং ঘটান যায় না। আতা, জাম, কাঁঠাল, পেপে, আনারস, কলা প্রভৃতি স্বদেশী ও বিদেশী ফলের এক স্বাদ, এক রস বাঁধা থাকেই। আতা বা পেঁপের যত উন্নতি সাধনই কর না কেন, ভাল সার দেও, ভাল জল যোগাও, তাহার প্রভাবে বড় জোর ফলটা বৃহদায়তনের হইবে, বীচি ছোট হইবে এবং উহার মজ্জাগত স্বাদ তীব্রতর হইবে। পরন্তু আতা আতাই থাকে—পেঁপে, কলা, আঙ্গুর, পেয়ারা, প্যারা, সকল ফলই তাহাদের মৌলিক প্রকৃতি বর্জ্জন করে না। পরন্তু পাটসাটের ফলে, সার দেওয়ার প্রভাবে, চশমা এবং খাসি করার ব্যবস্থায় আমের প্রকৃতি একেবারে বদলাইয়া যায়। ঝেলো, এঁশো, টোকো আম অতি উপাদেয় ফলে পরিণত হয়। তাহার পর বেলতলী, ক্ষীরতলী, আনারসী, গোলাপখাস, তালফলী, খরমুজা প্রভৃতি নানাবিধ আমের নানাবিধ রস এবং আস্বাদ। এখন সে সকল আমের আদর নাই, বাবুমহলে তাহাদের প্রচলনও নাই। বেলতলীর গন্ধ ও আস্বাদ ঠিক বেলের মতন, আনারসী আম পক্কাবস্থায় ঘরে রাখিলে ঘরটা আনারসের গন্ধে পূর্ণ হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে যে সকল আম গোলাপখাস বলিয়া পরিচিত, তাহা ঠিক গোলাপ-খাস নহে। গোলাপখাস আমে ঠিক বস্‌রাই গোলাপের গন্ধ বাহির

হয়। ভাগলপুরে জরদালু বলিয়া এক রকমের আম আছে, তাহার সৌগন্ধ্যে ঘর ভরপুর হইয়া থাকে। এই হেতু আমকে অমৃতফল বলা হয়; উহাতে সকল রকমের অমৃতরস ফুটান চলে, উহার আকারও নানাবিধ হইয়া থাকে। ঠিক চালতার মতন, পেঁপের আকারের, এমন কি, কামরাঙা ঢঙ্গের আম আমরা দেখিয়াছি। ভাগলপুরে আমাদের এক আত্মীয়ের বাগানে সত্যই একটা গাছে কামরাঙার আকারের আম ফলিত। আমের এই প্রকৃতি অবলম্বনে মিথিলায় ও অযোধ্যায়, মুর্শিদাবাদে ও মালদহে অনেক রকমের সংস্কৃত ও ফার্সী পদ্য বা সায়ের প্রচলিত ছিল। র‍্যাভেন্‌শা সাহেব তাহার সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

আম্রভোজন-পদ্ধতি

সত্য বলিতে কি, তোমরা আম খাইতে জান না, বানুরে খাওয়া খাইয়া থাক, অর্থাৎ প্রাপ্তিমাত্রেণ ভক্ষয়েৎ হিসাবে আম খাইতে নাই। আম পাড়িবার পদ্ধতিও এখন তেমন প্রচলিত নাই। আগে আম পাড়ার তত্ত্বটা বলিব। আম ঠেঙ্গাইয়া বা ডাল নাড়া দিয়া পাড়িতে নাই। যে আম সজোরে মাটিতে পড়িবে, সেই আমেই জাম্‌ড়ো ধরিবে। তাই **জালির** সাহায্যে এক একটি করিয়া আম পাড়িতে হয়। একটা বড় বাঁশের আঁকশির মুখে জাল দিয়া থলির মতন করিতে হয়। একটু রং-ধরা আম আঁকশি দিয়া টানিলেই ঐ জালের থলির মধ্যে পড়ে, মাটিতে পড়ে না। এই ভাবে এক একটি করিয়া আম পাড়িয়া, আমের পাতার বা সোঁদালের পাতার অথবা কার্পাস তুলার মোটা আস্তরণের উপরে জাগাইয়া রাখিতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টা জাগান না দিলে আম ভোজনের যোগ্য হয় না। যে সকল আম ভোজনের যোগ্য হইয়াছে, তাহাদিগকে বাছিয়া বাহির করিয়া ঠাণ্ডা জলে অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তাহার পর সেই আমের—বাঁশের চেঁচাড়ির বা তালের বাল্‌দোর বা হস্তিদন্তের অথবা কাচের ছুরির সাহায্যে খোসা ছাড়াইতে হয়। লৌহনির্ম্মিত কোন অস্ত্রের দ্বারা, বঁটি বা ছুরির দ্বারা আম ছাড়াইতে নাই। আমের খোসায় টারপিনের মত একটা স্নেহজ পদার্থ আছে, আমের রসে ম্যালিক এসিড আছে, লৌহ অস্ত্রে আমের খোসা ছাড়াইলে এই দুইটা এক হইয়া যায়, আম খাইতে বিস্বাদ হয়। পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের

ও মালদহের সকল ভদ্রলোকের বাটীতে আমের ছুরি স্বতন্ত্র থাকিত। অতি সুন্দর তালের বাল্‌দোর ছুরি আমরা দেখিয়াছি। খোসা ছাড়ানতেও একটু চাতুরী আছে। বাম করপুটে আম রাখিয়া, তাহাতে হিসাবমত ছুরি বসাইয়া, ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খোসা ছাড়াইতে হইবে, আমের গায়ে সবুজ খোসার লেশ মাত্র থাকিবে না। আধুনিক বাবুদের মধ্যে তদ্বির করিয়া আম খাইতে ও খাওয়াইতে পারিতেন মুর্শিদাবাদের পুরাতন উকীল বাবু মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর। বৈকুণ্ঠনাথ বাবু সেকালের হিসাবের একজন বড় বাবু ও সৌখীন ছিলেন; তিনি প্রধানতঃ ভোজনবিলাসী ছিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধে তাঁহার মনোমত করিয়া দরিদ্র কাঙ্গালীদের আম খাওয়াইবার সমাচার পাইলে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইব। আমের আদর করিবার মানুষ যে ক্রমে বাঙ্গালায় বিরল হইল।

দান ও বিতরণ

আম একা খাইতে নাই। ইষ্টদেবতাকে দিয়া, ব্রাহ্মণ সজ্জন, পল্লীর প্রতিবেশী সকলকে এবং কাঙ্গাল ফকীর দলকে পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াইয়া তবে নিজে পরিবারবর্গ সহ আম খাইতে হয়। ইহাই সেকালের ব্যবস্থা ছিল, হিন্দু মুসলমান, সকল বাঙ্গালী গৃহস্থই এই ব্যবস্থানুসারে আম খাইতেন এবং খাওয়াইতেন। এই পদ্ধতি অনুসারে সেকালে কাজ হইত, তাহার একটু পরিচয় দিব,—

(১) ৺কানাইলাল শীলের উইলে ব্যবস্থা করা ছিল যে, প্রতি বৎসরে আমের সময়ে দেব, দ্বিজ, কাঙ্গালীদিগকে পাঁচ শত টাকা মূল্যের আম খাওয়াইতে হইবে।

(২) ৺মোহিনীমোহন রায়, ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ উকীল আম বিতরণের ও ভোজনের জন্য পাঁচ শত টাকা প্রতি বর্ষে ব্যয় করিতে বলিয়া গিয়াছেন।

(৩) মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের এমনই ব্যবস্থা ছিল এবং বোধ হয়, উইলেও সে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বার্ষিক প্রাপ্য আমের ঝুড়ি পাই না।

(৪) পুণ্যশ্লোকা মহারাণী স্বর্ণময়ী মুর্শিদাবাদ এবং বহরমপুরের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থপ্রমুখ সকল ভদ্রজাতীয় গৃহস্থদিগের আম্র ভোজনের জন্য তিনটা আমবাগান স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। এমন কি, ভাগলপুরে থাকিতেও আমরা মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রদত্ত আম খাইয়াছি। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র এ বাজে খরচ উঠাইয়া দিয়াছেন।

(৫) বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বিস্তীর্ণ ভাবে আম্র বিতরণ করিতেন। মহারাজাধিরাজ মহাতাব্ চন্দের আমল হইতে আমরা ভাগলপুরে বসিয়া বর্দ্ধমানের আম খাইতাম। বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজও আমরা কলিকাতায় আসিলে কয়েক বৎসর আমাদিগকে আম খাওয়াইয়াছিলেন। শাসন-পরিষদের সদস্য হইয়া বর্ত্তমান মহারাজ বিগড়াইয়াছেন, আম্রবিতরণ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

(৬) দিনাজপুরের বুড়া মহারাজা ৺গিরিজানাথ সেকালের হিসাবমত আম্র বিতরণ করিতেন। বর্ত্তমান মহারাজার নিকট হইতে এখনও আম পাই নাই ; বোধ হয়, পুরানা চাল বন্ধ হইল।

কত আর নাম করিব, সেকালের বাঙ্গালার বড়লোক মাত্রেই আম খাওয়াইয়া তবে খাইতেন। বলিব কি দুঃখের কথা, ৺গণেশচন্দ্র চন্দ্র এবং তস্য পুত্র ৺রাজচন্দ্র চন্দ্র রীতিমত আম্র ভোজ করাইতেন, ঝুড়ি ঝুড়ি আম গৃহে গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। রাজচন্দ্রের পুত্র কু-সঙ্গে পড়িয়া সে ব্যবস্থা বন্ধ করিয়াছে। বাপপিতামহের ধারা বজায় রাখিতে পারে না। ইহা কি কম লজ্জার কথা!

আমের কথা লিখিতে হইলে একখানা বড় পুস্তক রচনা করা চলে। তাহার ইঙ্গিত শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় করিয়া দিয়াছেন। একটা কথা জোর করিয়া বলিব—চশমা, কলম, খাসি, এ সকলই ভারতবর্ষের নিজস্ব ; ভারতবর্ষ হইতেই মোগল, পাঠান, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, হিস্পানী, ইংরেজ, সবাই কলম করা শিক্ষা করিয়াছে। ডেভিস সাহেব ডালে কলম করিতে শিখাইয়াছিলেন বটে, তাহাও তাঁহার আবিষ্কৃত নহে। পুরাতন মালীর দল ডেভিসের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে চাহিত না ; কারণ, উহার সাহায্যে আম শীঘ্র পাওয়া যায় বটে, পরন্তু কুড়ি পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কলমের গাছ নষ্ট হয়, ফল ভাল ধরে না। "ফিঙ্গে চশমায়" যে কলমের গাছ তৈয়ারি হয়, তাহা শতাধিক বর্ষকাল টিকে। মালদহের

কাছারিবাড়ীর ভিতরে দুইটা ফিঙ্গে কলমের আমগাছ ছিল, বোধ হয় এখনও একটা আছে। এ দুইটাই শতাধিক বর্ষের অধিক পুরাতন। একটা ঝড়ে পড়িয়া যাওয়াতে তাহার কাঠই নিলামে দুই শত টাকায় বিকাইয়াছিল। গাছ পড়িলে পরে জানা গেল যে, উহা ফিঙ্গে কলমের গাছ ছিল। বাবুদিগের বোধার্থে ফিঙ্গে কলমকে dovetailing বলিতে পারি। একটা আঁটির চারা প্রথমে তৈয়ার করিতে হয়, তাহার পর তাহার মাথাটা কাটিয়া, নীচের গুড়ি খানিকটা চিরিয়া দিতে হয়, সেই চেরার মধ্যে আর একটা ভাল গাছের মাথা কাটিয়া আনিয়া তাহার নিম্নদেশটা ফিঙ্গে (dovetail)-এর মতন করিয়া বসাইয়া দিতে হয়; পরে উহাদের একসঙ্গে বাঁধিয়া গোবরমাটি দিয়া জড়াইয়া রাখিতে হয়। কলম জুড়িয়া যাইলে গোড়ার মাটি ক্রমে উচ্চ করিয়া ফিঙ্গে কলমের মুখ বা জোড় পর্য্যন্ত তুলিয়া দিতে হয়। এ কলম বানাইতে পরিশ্রম অধিক, কিন্তু এক বার কলম ধরিয়া এক হইলে, নূতন বৃক্ষ দীর্ঘজীবী হয় এবং উহাতে পর্য্যাপ্ত ফল ধরে। ফিঙ্গে কলমের গাছকে দশ বৎসর কাল অতি যত্নে পালন করিতে হয়।

বগুড়ার একটি ভদ্রলোক পুরাতন রীতি অবলম্বনে আমের চাষ করিয়া থাকেন। তিনি নানাবিধ কলমের সাহায্যে অপূর্ব্ব রকমের আমের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ইহার খবর দিতে পারেন।

আজকাল বাবুমহলে যে সকল আমের আদর অধিক, তাহার সব কয়টাই আধুনিক এবং আংশিক ইংরেজের আবিষ্কৃত। একটু পরিচয় দিব।

(১) **ফজলি**—মালদহের পূর্ব্বেকার জেলার কালেক্টার র‍্যাভেন্‌শা সাহেব ফজলির আবিষ্কর্ত্তা। ফজলি নামে এক মুসলমানী গৌড়ের জঙ্গলের পার্শ্বে বাস করিত, তাহারই আঙ্গিনায় এই আমের গাছ হইয়াছিল। বৃদ্ধা অতি যত্নে আমগাছটি রক্ষা করিত এবং ফকীর সন্ন্যাসী তাহার বাটীতে অতিথি হইলে তাহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া আম খাইতে দিত। এই হেতু সেই বৃদ্ধাই ঐ আমের নাম ফকীরভোগ রাখিয়াছিল। র‍্যাভেন্‌শা সাহেব শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বৃদ্ধার গৃহে যাইয়া অতিথি হন। তাঁহাকেও একটি আম খাইতে দেওয়া হয়, তিনি পরিতৃপ্ত হইয়া উহার নাম ফজলি রাখেন। আমরা মূল গাছের আম খাইয়াছি, তাহার সহিত

বাজারে প্রচলিত ফজলির আকাশ পাতাল প্রভেদ। কলমের কলম, তস্য কলম করিয়া, ডেভিসের পদ্ধতিক্রমে ডালে ডালে কলম বানাইয়া ফজলির জাতিনাশ ঘটিয়াছে, degenerate হইয়াছে। মূল গাছটা বোধ হয় এখনও আছে, থাকিলে উহা শতাধিক বর্ষের পুরাতন বৃক্ষ হইবে।

(২) **ল্যাংড়া**—ইহার আদিস্থান হাজিপুরে। এক ল্যাংড়া ফকীর এই গাছতলায় বাস করিত। পাটনার বিভাগীয় কমিশনার কোবর্ণ (Cockburn) সাহেব ল্যাংড়ার আবিষ্কর্ত্তা। ল্যাংড়ার মূল গাছের গোড়ার আদর আমরা দেখিয়াছি। হাথুয়া, বেতিয়া, দ্বারভাঙ্গা, ডুমরাও প্রভৃতির মহারাজগণ মূল ল্যাংড়ার গাছের এক একটা ডাল জমা লইতেন। সে সান্ত্রী পাহারা, সে তদ্বির তদারক দেখে কে? এখন সে সকল কথা যেন স্বপ্নবৎ মনে হয়। হাতুয়ার দেওয়ান বাবু ভুবনেশ্বর দত্তের কৃপায় আমরা মূল ল্যাংড়ার ফল খাইয়াছি। পূর্ব্বে সোমবারী মেলার সময়ে আসল ল্যাংড়া পাটনায় আমদানি হইত; এক টাকায় ছয়টার অধিক পাওয়া যাইত না। সে ল্যাংড়া এখন আর বাজারে দেখিতে পাই না। এখনকার যে ল্যাংড়া কলিকাতার বাজারে প্রচলিত, তাহা কাশীর শ্যামা নামক পুরাতন আমের সহিত আসল ল্যাংড়ার কলমজাত জারজ ফল। কলিকাতায় যে ল্যাংড়া আইসে, তাহার অধিক অংশই কাশীর ও এলাহাবাদের জারজ শ্যামা। আসল ল্যাংড়া ওজনে প্রত্যেকটা এক পোয়া, তাহার ছালের রং ঘোর সবুজবর্ণ—bottle-green, খুব পাতলা ছাল এবং কাগজের মতন পাতলা আঁটি। কিন্তু কলিকাতার বাজারের ল্যাংড়া অনেকটা pea-green, মটরশুঁটির মতন ফিকে সবুজ, আকারে ছোট, আঁটিও মোটা। ল্যাংড়া ও ফজলিতে একেবারেই আঁশ থাকিবে না। হাজিপুরী ল্যাংড়া ক্রমে যেন লোপ পাইতেছে, degenerate হইতেছে। ল্যাংড়ার আঁটির ও খাসির বাগান দ্বারবঙ্গের মহারাজা বানাইয়াছেন।

(৩) **কিষণভোগ**—ইহার গোড়ায় নাম ছিল "দরভঙ্গীয়া," ইহা দ্বারবঙ্গ জেলার পূর্ব্বাংশের আম। ইহার আদর বাড়াইয়া যান ভাগলপুরের বিভাগীয় কমিশনার বার্লো সাহেব। মিথিলার একজন ব্রাহ্মণ জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুরের বাগানের আম প্রথমে রপ্তানি হওয়াতে ভাগলপুরেই উহার নামকরণ হয় "কিষণভোগ"। এ আম বেঁড়ে—প্রায় গোলাকার,

ভিতরটা বেশ লাল; কলিকাতায় আসল কিষণভোগ কমই আইসে। সতালু আম ও কিষণভোগের কলমজাত এক জারজ বোঁটারাঙা আমই কলিকাতার বাজারে কিষণভোগের আদর পায়।

(৪) **বোম্বাই আম**—ইহাকে গোড়ায় ভাগলপুর বিভাগে Davis breed বলিত। গোপালভোগ ও গঙ্গাসাগর বা কালুয়া, এই দুই আমের তৃতীয় সংস্পর্শের কলমের ফল বোম্বাই আম। গত ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে উহার প্রচলন হয়। উহার যে কেন বোম্বাই নাম হইল, তাহা ত খুঁজিয়া পাই না। এ আম সম্পূর্ণ বর্ণচোরা, পাকিলেও ঘোর সবুজবর্ণ থাকে। একেবারে রং ধরে না। উহার ভিতরের শাঁস ঠিক আলতার বর্ণ, এ আমের মিষ্টতা অতি তীব্র। এক একটা আম আধ পোয়া, এক পোয়া পর্য্যন্ত ওজনে হইত। উহার ছাল মোটা, আঁটি মোটা, কিন্তু ছোট। পাটনার ও ভাগলপুরের সে পুরাতন ভুতো বোম্বাই আমের অতিমাত্রায় অধঃপতন হইয়াছে; এখন রং-ধরা আমও বোম্বাই নাম পাইয়া বাজারে বিকায়। ভাগলপুরের বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বোম্বাই আমের পাট করিতে জানিতেন, তাঁহার বাগানের আম অত্যুৎকৃষ্ট হইত; সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বেকার কথা। সে সব পুরাতন কলম এত দিনে বিগড়াইয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া জরদালু, গোপালভোগ, নবাবভোগ, বেগমপ্যারী প্রভৃতি অসংখ্য অত্যুৎকৃষ্ট আমের প্রচলন পূর্ব্বে ছিল। লক্ষ্ণৌয়ে প্যারাফুলি আমের আকারের এক অত্যুৎকৃষ্ট আম আছে, তাহা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাহার মূল্য অধিক, কুড়ি টাকায় এক শতের অধিক পাওয়া যায় না। ইংরেজী নামের আমও আছে—Alfonso, Hastings, Ryland প্রভৃতি নামধেয় আম পাওয়া যায়। বাঙ্গালার বা উত্তর-ভারতের আমে একটা সুগন্ধ ও সুস্বাদ আছে, যাহা মান্দ্রাজী ও বোম্বেয়ে আমে নাই। নিজামের হায়দরাবাদের হাফিজপ্যারী আম ভাল বটে, পরন্তু বাঙ্গালার বা মালদহের আমের তুল্য সুগন্ধপূর্ণ ও সুস্বাদু নহে। পরে খাঁটি দেশীয় বাঙ্গালী আমের খবর দিব। আজ এই পর্য্যন্ত।

('নায়ক,' ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯)

রামেন্দ্রসুন্দর

আমাদের দেশে ভদ্র মধ্যবিত্ত সমাজে যখন প্রথম ইংরেজী লেখাপড়ার প্রচলন আরম্ভ হয়, তখন যাঁহারা ইংরেজী শিখিতেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই যেন সমাজের প্রতি ও জাতির প্রতি একটা কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইত। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ কাল বাঙ্গালার ইংরেজীনবীস কেবল ব্যক্তিগত অভ্যুদয়ের চেষ্টায় বা আশায় ইংরেজী শিখিতেন না। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই যেন এক একটা 'মিশন' থাকিত। তাঁহারা প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে, আমরা ইউরোপের যে বিদ্যা শিখিতেছি, তাহা আমাদের একার উপভোগ্য নহে। জাতি এবং সমাজের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সে বিদ্যালাভের আনন্দ উপভোগ করিতে হইবে। কেবল টাকার জন্য, কেবল ভোগায়তন দেহের তুষ্টি পুষ্টি সাধন উদ্দেশ্যে বাঙ্গালার প্রথম ও মধ্যযুগের কোন ইংরেজী-নবীসই উচ্চাঙ্গের ইউরোপীয় বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী, শেষ কর্ম্মী ও বিদ্যার সাধক ছিলেন। সত্যই তিনি একটা 'মিশন' লইয়া সারা জীবনটা কাটাইয়া গিয়াছেন। 'নবজীবনে'র প্রথম সন্দর্ভ লেখার সময় হইতে তাঁহার মৃত্যুর কাল পর্য্যন্ত এই 'মিশন' বা এই সাধনা তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারার স্বরূপ ছিল, কখনই তাহাকে দৃষ্টির বাহিরে থাকিতে দেন নাই। রামেন্দ্রসুন্দর যে অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা বাঙ্গালা গদ্যে লিখিয়া গিয়াছেন, সে সকলের বিশ্লেষণ করিলে এই জীবনব্যাপী সাধনার কথাটা বেশ ফুটিয়া উঠে। এই 'মিশন' বা সাধনা রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে তিন ভাগে বা তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। প্রথম ভাগ ইউরোপের বিজ্ঞান-প্রচারের ভাগ। ইউরোপের আধুনিক সায়েন্স কি সব পদার্থতত্ত্বের, কি সব নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারই সমাচার তিনি বাঙ্গালী পাঠককে দিতে প্রথম যৌবনে উৎসুক হইয়াছিলেন। এই কার্য্যটি করিতে যাইয়া রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালার গদ্যের ব্যাপ্তি এবং ব্যঞ্জনাশক্তি শতগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালীকে দেখাইয়া যান যে, ইউরোপের সায়েন্সের কথা

কেমন বাঙ্গালা গদ্যে লিখিলে তাহা বহুজনবোধ্য হইবে। তিনি যখন এই চেষ্টায় ব্রতী হন, তখন বাঙ্গালায় তাঁহার মত শিক্ষিত ব্যক্তি ও-কার্য্যে রত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞান-রহস্যে গোটাকয়েক সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রামেন্দ্রের মত সায়েন্সে তত পণ্ডিত ছিলেন না এবং সায়েন্সের কথা সরল বাঙ্গালায় ব্যক্ত করিবার শব্দসম্পৎ পর্য্যাপ্ত ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না।

২। রামেন্দ্রের মনীষার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তিনি ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে আমাদের ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্র ও রসায়নাদি কষিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি ইউরোপ ও ভারতবর্ষকে তুলনার সমালোচনায় 'তুলিত' করিয়া উভয়ের যাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ যাচাইচেষ্টাও রামেন্দ্রের পক্ষে অপূর্ব্ব; তিনি ইহাতেও তাঁহার প্রতিভার পরিচয় অতুল্য ভাবে দিয়াছিলেন। কিন্তু এই তুলনায় সমালোচনা করিতে যাইয়া রামেন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতীয় সিদ্ধান্তের পুঁজি তাঁহার বড় কম। তিনি অমনি বেদ পড়িতে আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রেরও আলোচনা আরম্ভ করিলেন এবং শেষে তন্ত্রের পরিচয়ও বেশ লইয়াছিলেন। বাঙ্গালার কোন এক মনীষী লেখক এক বার বলিয়াছিলেন যে, রামেন্দ্রবাবু সায়েন্সেই খুব বড় পণ্ডিত, শাস্ত্রকথা তিনি কতটুকু জানেন? এইটুকু রামেন্দ্রের কানে যায়। তার পর সাত বৎসর কাল রামেন্দ্র যেরূপ অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের সহিত বেদ-বেদান্ত, তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন, তাহা দেখিয়া সত্যই আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। দিনের বেলায় রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজ, সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকের কাজ সুন্দর ভাবে নির্ব্বাহ করিয়া, রামেন্দ্র বিনিদ্র রজনী আগাগোড়াই বেদ ও তন্ত্রের আলোচনায় কাটাইয়া দিতেন। এই উৎকট পরিশ্রমের ফলেই তাঁহার যকৃৎরোগ হয় এবং সেই রোগেই তাঁহাকে অকালে দেহত্যাগ করিতে হয়। রামেন্দ্র পরের মুখে কখনই ঝাল খাইতেন না, প্রত্যেক বিষয়টাই নিজে দেখিয়া, নিজে যাচাই করিয়া লইতেন। তাই তাঁহাকে অতিমাত্রায় পরিশ্রমও করিতে হইত। এই পরিশ্রমের ফলে রামেন্দ্র যে কয়খানি পুস্তিকা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব এবং তাহার তুল্য আর কোন পুস্তক যে শীঘ্র লিখিত হইবে, এমন আশা আমাদের নাই।

৩। তৃতীয় পর্য্যায়ে রামেন্দ্রের ব্রাহ্মণ্য-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এই সময়ে তিনি যে কয়খানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার সাহায্যে বাঙ্গালার বিদ্বজ্জনসমাজকে তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইউরোপের বিদ্যার মাপকাঠিতে ভারতের বিদ্যা মাপিলে ছোট ত হইবেই না, উপরন্তু ভারতে এমন অনেক জিনিস আছে, অনেক ভাব আছে, যাহা ইউরোপের মাপকাঠির বাহিরে; ইউরোপ এখনও সে ভাবজগতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বেদ সম্বন্ধে তাঁহার যে কয়টি সন্দর্ভ বাহির হইয়াছিল, তাহা এই ভাবেই ভরপূর এবং তেমন বৈদিক বিদ্যার পরিচয় দিয়া বৈদিক সন্দর্ভ ভারতবর্ষের আর কেহ লিখিতে পারেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সঙ্গে 'শব্দ-কথা,' 'কর্ম্ম-কথা' প্রভৃতি পুস্তিকাগুলিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'শব্দ-কথা'র ন্যায় পুস্তক ত বাঙ্গালা সাহিত্যে নাই। ব্যাকরণশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত তিনি অতি সোজা কথায় লিখিয়া গিয়াছেন। যে দিন এই সকলের প্রতি বাঙ্গালীর দৃষ্টি পড়িবে, সেই দিন বাঙ্গালার বিদ্বজ্জনসমাজ এই সকল পুঁথি মাথায় করিয়া রামেন্দ্রের স্মৃতির পূজা করিবে। রামেন্দ্র জীবিত থাকিলে তন্ত্রোক্ত শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লিখিয়া যাইতেন। বিধাতা বাদী না হইলে পুরাণের বিশ্লেষণও তিনি করিয়া যাইতেন। আমাদের ভাগ্যদোষে আমরা সে সকলে বঞ্চিত আছি। জানি না, বিধাতার কৃপায় ভবিষ্যতে রামেন্দ্রের এই অপূর্ণ কার্য্য বাঙ্গালার কোন মনীষী পূরণ করিতে পারিবেন কি না।

ইহাই রামেন্দ্রের বিদ্যা-আরাধনার খুব স্থূল পরিচয় বলিয়া আমাদের মনে হয়। আজকাল লেখাপড়া শিখিয়া ইউনিভার্সিটির উচ্চ উপাধিধারী হইয়া বাঙ্গালী যুবক টাকার জন্য পাগল হইয়াছে। এবং অর্থোপার্জ্জনের চিন্তায় বিদ্যাকে দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করিয়াছে। তাই শঙ্কা হয়, রামেন্দ্রের জীবনের কর্ম্মসূত্র রামেন্দ্রের শ্মশানচুল্লীতেই বুঝি বা দগ্ধ হইয়া গেল; সে ধারা রক্ষা করিবার মানুষ ত আর দেখি না। রামেন্দ্র টাকা চাহেন নাই, পদমর্য্যাদা চাহেন নাই, উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইবার আকাঙ্ক্ষা জীবনে কখনও প্রকাশ করেন নাই;—অথচ এ সকলই তিনি ইচ্ছা করিলে পাইতে পারিতেন। রামেন্দ্র দেবী ভারতীর একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন, তাঁহার আরাধনায় জীবন, যৌবন, ঐহিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা—সবই বলিদান

দিয়াছিলেন এবং নীরবে নিজের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। সে সিদ্ধি কর-আমলকবৎ মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। সে সিদ্ধির ঐশ্বর্য্যে স্বদেশবাসীকে পূর্ণমাত্রায় ঐশ্বর্য্যশালী করিবার অবসর তাঁহার জীবনে ঘটিল না। ইহা আমাদের পক্ষে বড় শোকের, বড় ক্ষোভের কথা।

সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি, তাহার পুষ্টি ও বিস্তৃতির চেষ্টা রামেন্দ্র-জীবনের এই সাধনার অঙ্গীভূত ছিল। এই সাধনার সিদ্ধিগত ঐশ্বর্য্য-লাভের যোগ্যতা যাহাতে বাঙ্গালার বিদ্বজ্জনসমাজ পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে, তাহারই জন্য রামেন্দ্র সাহিত্য-পরিষদের সেবায় জীবনপাত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার মজ্জাগত জাতিপ্রীতি—ন্যাশন্যাল্‌ইজম্‌-এর অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। জাতিটাকে বড় করিতে হইলে গোড়ায় জাতীয় ভাষাটাকে ব্যাপক ও সর্ব্বভাবদ্যোতক করিয়া তুলিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সে ভাষাকে রাজভাষার অধিক আদরের, অধিকতর শ্লাঘার সামগ্রী করিয়া তুলিতে হইবে। মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় ও অবিচলিত শ্রদ্ধা-বুদ্ধি না থাকিলে যে কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, ইহা রামেন্দ্র মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেন। তাই সাহিত্য-পরিষদের সেবায় রামেন্দ্র সত্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্দ্রের বিদ্যা-সাধনার বীরাসন ছিল, সেই বীরাসনে বসিয়া বীর কর্ম্মী বাঙ্গালীকে বীরের ভাষা দান করিয়া গিয়াছেন—বীরের সঞ্জীবন-মন্ত্র শুনাইয়া গিয়াছেন। বলিতে পারি না, বাঙ্গালার বিদ্বজ্জনসমাজ বীরের গাথা ঠিকমত বুঝিয়াছে কি না;—বুঝিলে আজ সাহিত্য-পরিষদের রামেন্দ্রের কর্ম্মসূত্র ধরিয়া বহু বিদ্যাসাধক নির্ম্মৎসর ভাবে দেবী ভারতীর আরাধনা করিতেন। আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে, কর্ম্মীর কর্ম্ম ব্যর্থ যায় না, সাধকের সাধনা কর্পূরের মত আকাশে উবিয়া যায় না,—এই নশ্বর জগতে কর্ম্ম ও সাধনাই অবিনশ্বর; কাল পূর্ণ হইলে, মায়ের কৃপা ফুটিয়া উঠিলে রামেন্দ্রের সে সাধনার পরম পারম্পর্য্য, সে কর্ম্মের ধারা আবার প্রকট হইয়া উঠিবে। তাই ভাবের মুখে বলিয়াছিলাম, রাম আমাদের বাঙ্গালার বিদ্যামন্দিরের শেষ রাম, এ রামের বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার সময় আসে নাই, তাই আমরা তেমন আর একটি রাম বাঙ্গালার কোন ভাব-কুঞ্জে খুঁজিয়া পাইতেছি না। যে দিন তেমন আর একটি

রাম অবতীর্ণ হইবেন, সেই দিনই রাম-লিখিত কথা-পুস্তকগুলির প্রকৃত পঠন-পাঠন আরব্ধ হইবে, রামবার্ত্তা বুঝিবার সামর্থ্য বাঙ্গালায় আবার ফুটিয়া উঠিবে। ভারতবর্ষের কর্ম্মীর পদাঙ্ক বালুকা-বিস্তারের উপর অঙ্কিত হয় না, উহা দু দিনেই বিলীন হইয়া যায় না; ভারতবর্ষের কর্ম্মী ও সাধকের পদাঙ্ক অপরিবর্ত্তনীয়, মর্ম্মরাসনে অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহা মুছিয়া যায় না, কেহ মুঝিতেও পারে না। তাই ভারতবর্ষের অনন্ত অতীতে কর্ম্মি-প্রধানগণের পদাঙ্ক ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গে খচিত হইয়া রহিয়াছে এবং সেই সঙ্গে রামেন্দ্রের পদাঙ্কও অনপনেয় লেখায় ভারত-নগেন্দ্রের গাত্রে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। পুরাণের এই সিদ্ধান্তে প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই আজ এই ঘোর নিশায় ভারত-মহাশ্মশানে মনীষার দিব্য দ্যুতি আবার দেখিবার আশায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছি। এ জীবনে সে আশা পূর্ণ না হইলেও নিরাশ হইব না, আবার ফিরিয়া আসিয়া সে আশা-পথ চাহিয়া থাকিব। ১৩২৬

দ্রষ্টব্য ঃ পাঁচকড়ি-রচনাবলীর ১ম খণ্ডে দুই-চারিটি মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। "ডিক্রি" (পৃ. ৮৪, পংক্তি ৩০), "রাখিলাম্বিকে" (পৃ. ২৮২, প. ১) ও "অসার" (পৃ. ৩৪৩, প. ২) যথাক্রমে ডিগ্রী, বাখিলাম্বিকে, ও অসাড় হইবে।